বাংলা

সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যচর্চা

বহুমাত্রিক চেতনায়

মেদিনীপুর সিটি কলেজ ও দি গৌরী কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত
সপ্তম আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে নির্বাচিত গবেষণা প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ

৩

সম্পাদনায়

তপন মন্ডল • দীপঙ্কর মল্লিক
রাকেশ জানা • অভি কোলে

দিয়া পাবলিকেশন
৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

Bangla Samaj-Sanskriti-Sahityacharcha : Bahumatrik Chetanay

Vol. III

Edited by

Tapan Mandal ● Dipankar Mallik
Rakesh Jana ● Abhi Kole

Published by

Diya Publication
44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 6291811415
e-mail : diyapublication@gmail.com ‖ diyapublication64@gmail.com
website : https://diyapublication.in/
facebook : দিয়া পাবলিকেশন কলকাতা
facebook page : https://www.facebook.com/diyapublicaton/

Collaboration with

Midnapore city college
Kuturiya, Bhadutala, Midnapore, Pachim Medinipur
&
The Gouri Cultural & Educational Association
Social Welfare Organisation & Research Institution of
Society, Culture & Education
Registration No. S/IL/34421/2005-06 ● Established : 23.9.1995

ISBN : 978-93-87003-46-0

প্রথম প্রকাশ : ২.০৬.২০২৩

শোভন সংস্করণ : মূল্য ৫৯৯/-

সূ | চি | প | ত্র

নাটক নিয়ে ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ **১-৯০**

‘কৃষ্ণকুমারী’ : বাংলা নাট্যকলায় আধুনিকতার অনুক্রমণী
দীপক কুমার মণ্ডল
১

মধুসূদন দত্ত-র নাটকের সংলাপ : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
কৌশিককুমার দত্ত
১১

রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ : প্রান্তজন
সন্দীপ বর
২২

‘আলিবাবা’ নাটকে গানের ভূমিকা
বিবেকানন্দ পাল
৩০

নাট্যসাধনায় প্রমথনাথ বিশী
দিবাকর দাস
৩৬

নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
স্বরূপ দে
৪১

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে নারী : প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিতে পঞ্চাশের মন্বন্তর
সংহিতা ব্যানার্জী
৪৭

বিজন ভট্টাচার্যের ‘দেবীগর্জন’ নাটকের লৌকিক উপাদান
কৃষ্ণময় দাস
৫৩

কৃষ্ণকৌতুকীয় নাটক ‘অতুলনীয় সম্বাদ’ এবং শম্ভু মিত্র : একটি পর্যালোচনা
সত্যজিৎ বসাক
৫৮

মহাভারতের নবনির্মাণ : ‘প্রথম পার্থ’ ও ‘নাথবতী অনাথবৎ’
রঞ্জিত আদক
৬২

‘অগ্নিজাতক’ : আলোকজ্যোতি ভাবনা
আশিস রায়
৬৯

মুক্তিস্বাদ আস্বাদনে নারী : প্রসঙ্গ পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক
সৌভিক পাঁজা
৭৬

সময়ের অমেয় আঁধারে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের ‘অন্যভুবন’ নাটক : একটি সমীক্ষা
গোলক পতি ধল
৮১

বিনোদিনী : এক নটী ও সাহিত্যিকের জীবন ও সৃষ্টি
গোবিন্দ মণ্ডল
৮৫

প্রবন্ধ নিয়ে ■■■■■■■■■■■■■ **৯১-৯৯**

বিহারীলালের ‘বঙ্গো বর্গী’ : একটি পর্যালোচনা
মৃণাল কান্তি রায়
৯১

শম্ভু মিত্রের প্রবন্ধ : ‘কয়েকটি অভিনয়ের জন্মকথা’
লিপিকা সরকার
৯৫

সাহিত্য নিয়ে ■■■■■■■■■■■■■ **১০০-১৯৩**

মধ্যযুগের বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট : প্রসঙ্গ মঙ্গলকাব্য
সোহম চ্যাটার্জী
১০০

বঙ্কিমের উপন্যাস ও বঙ্গদর্শন
সংহিতা মাল
১০৫

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ নজরুল
বুবাই পিরি
১১৩
রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার
লোপামুদ্রা জানা
১১৮
বুদ্ধদেব বসুর আত্মজীবনী : আত্মআবিষ্কারের শিল্পরূপ
সুলগ্না ব্যানার্জী
১২৪
বাংলা গানের রূপ ও রূপান্তরে সুরস্রষ্টা নজরুল
সুলগ্না চক্রবর্তী
১৩২
সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' : শতবার্ষিকীর আলোয় ফিরে দেখা
শ্রেয়সী দাস
১৩৮
সুকুমার রায়ের সাহিত্য : খেয়ালী কল্পনা ও ব্যঙ্গচিত্রের খতিয়ান
সোনালি গোস্বামী
১৪৩
শরদিন্দুর গল্প-উপন্যাসে বিধবার প্রেমের জটিলতা ও সামাজিক প্রেক্ষিত
সুনেত্রা ব্যানার্জী
১৫১
অনালোচিত কথাকার তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য ভাবনা
প্রসেনজিৎ মণ্ডল
১৫৮
সুবোধ ঘোষের কিশোর গল্প : সময়ের ছায়া, সমাজের ছবি
শতাব্দী শিকদার
১৬৭
বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকের নির্বাচিত বিদেশি লেখকগণ
নির্মল বিশ্বাস
১৭৪
আনিসুজ্জামানের 'আমার একাত্তর' : একটি পর্যালোচনা
কৃষ্ণপ্রসাদ চ্যাটার্জী
১৮০
ভারতসন্ধানী লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
পার্বতী দাস
১৮৫

বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি
বাপী মণ্ডল
১৯০

রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ **১৯৪-২০৮**

বিজ্ঞানচেতনা ও রবীন্দ্রনাথ
অনিরুদ্ধ বারিক
১৯৪

‘বিশ্বপরিচয়’ গ্রন্থে বিজ্ঞান ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ
অর্পিতা বারিক
২০০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা
রফিকুল ইসলাম খান
২০৪

সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ **২০৯-২৪৯**

সাহিত্যের আলোকে সমাজ-সংস্কার : প্রসঙ্গ রাজা রামমোহন রায়ের ‘সতীদাহ-প্রথা’র উচ্ছেদ
রাজেশ্বর পাল
২০৯

রামমোহন রায় : এক ধর্মনিষ্ঠ যুক্তিবাদী সংস্কারক
মিঠু জানা
২১৫

সাহিত্যের সংস্কার, সংস্কারের সাহিত্য : ইতিহাস নির্মাতা বিদ্যাসাগর
সৌমিতা মুখার্জী
২১৯

বাংলা সংস্কৃতি চর্চায় বিনয় ঘোষ ও তাঁর সংস্কৃতি ভাবনা
নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য
২২৭

আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার রাভা জনজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর
উত্তম সরকার
২৩৪

নগর সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে কলকাতার উদ্ভব এবং তার অন্ধকার
দেবলীনা সেন
২৩৮

মুসলমান বাঙালির মাতৃভাষা সংকট : প্রসঙ্গ সওগাত পত্রিকা
গীতশ্রী সরকার
২৪৩

অন্যান্য বিষয় ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ **২৫০-২৯৭**

বৌদ্ধ ধর্ম ও নারীদের নির্বাণ
সঙ্কেত সরদার
২৫০

মগনলাল মেঘরাজ : ফেলু কাহিনির এক দুর্ধর্ষ প্রতিনায়ক
শাখী ঘোষ
২৫৬

নন্টে ফন্টে : শিশু মনের বিকাশ
দীপাঞ্জনা দেব
২৬১

মূকাভিনয় : নৈঃশব্দ্য যখন বাঙ্ময়
বর্ষা পণ্ডা
২৬৯

আধুনিক বিজ্ঞানে আধ্যাত্মিকতার প্রসার
শান্তিময় ঘোষ
২৭৫

বাংলা দলিল-দস্তাবেজ : কৃষি-অর্থনীতি বিকাশের প্রামাণিক ঐতিহাসিক উপাদান
পিন্টু শীট
২৮০

মৌসুনী দ্বীপের ইতিকথা : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান
গুরুপদ দাস
২৮৫

উদারনীতিবাদের মূলতত্ত্ব, উৎস ও বিকাশ প্রসঙ্গে
মহঃ আমিরুল ইসলাম
২৯২

Society, Culture & Literature **298-352**

Understanding Colonial Bengal and Reconstructing Bengali Culture and Ethos, Through
the Lens of Detective Fiction: Kaushik Majumdar's
Mason Trilogy (Surjotamosi, Nibarsaptak & Agniniroy)
Ayan Dutta
298

Laso Mung and Lepchas' Fight for Survival
A Political Interpretation of Lepcha Movement
in the Darjeeling District of West Bengal
Abhsihek Chakravorty & Dr. Arpita Raj
304

Climatic Thoughts of Rabindranath Tagore
An Ecocritical Study
Agnidev Manna
309

Partition and Vilification of Body : Exploring
Violence against Marginalized Women in the
Select Writings of Dalits in Bengal
Biswadeb Rajbanshi
315

The Effect of Imperial Propagandas on the
Conscience and Consciousness of
Bengali People and Deconstructing the
Usage of Subtext in Children's Literature
A Postcolonial Study of Satyajit
Ray's The Tree with Golden Leaves
Subhranil Ghosh
319

Tiger of Bengal, A.K Fazlul Haque
in the Light of history
Sk. Ekramul Hossain & Debalina Debnath
323

Bengal Famine of 1943 and Indian People's
Theatre Association (IPTA)
Bijoy Mandal
334

110 Kurmi Movement in Post-Colonial Bengal: A Social Survey of
Jangalmahal.
Somnath Rana
343

A Brief Study of the Scientific Temperament, Ethical Sensibility, and
Exploitative Aspects of it in Bengali Culture through Select Texts of
Saradindu Bandyopadhyay
Ekta Kar
348

‘কৃষ্ণকুমারী’ : বাংলা নাট্যকলায় আধুনিকতার অনুক্রমণী

দীপক কুমার মণ্ডল

সংস্কৃতি-মনস্ক মানুষের নকল অথবা অনুকরণ করার প্রবণতা থেকেই যেন নাট্যসাহিত্য শিল্পের সূত্রপাত। চর্যাপদে উল্লিখিত বীণাপাদের একটি পদে ‘বুদ্ধনাটক বিসমা হোই’[১]—এই বাক্যবন্ধে সে কথার প্রতিধ্বনি বিদ্যমান। বাংলা সাহিত্যে অনুকরণজাত উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক এই নাট্য শিল্পের সূত্রপাত হয়েছিল অনেকদিন আগেই। রুশ মনীষী গেরাসিম স্তেপানভিচ লেবেডফের তত্ত্বাবধানে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর তদানীন্তন কলকাতার ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রিট) একটি নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হয়। যা ‘বেঙ্গালী থিয়েটার’ নামে খ্যাত। এখানেই প্রথম ‘The Disguise’-এর বাংলা অনুবাদ মঞ্চস্থ হলেও তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বিদেশিরই। এ তো গেল নাটক মঞ্চায়নের ইতিহাস। অন্যদিকে মৌলিক নাট্য-সৃষ্টির ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রথমেই আমাদের ‘কীর্তিবিলাস’-এর কথা মনে আসে। ১৮৫২ সালের ট্রাজেডিধর্মী এই নাটকের রচয়িতা ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। বঙ্গ নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাসে এটা শুভ সূচনা ও শুভলগ্ন বটে। বাংলা নাট্য-প্রকরণ সৃষ্টির এই সূচনালগ্নের অব্যবহিত কালেই মাইকেলের আবির্ভাব।

বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে প্রকৃতপক্ষে নাট্য প্রকরণেই তাঁর পাকাপাকি হাতেখড়ি। বেলগাছিয়ার পাইক পাড়ার সিংহ বাড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের আমন্ত্রণে ‘রত্নাবলী’র (১৮৫৮) অভিনয় দেখে তিনি বিস্মিত হন। অলীক কুনাট্য ‘রত্নাবলী’ চিত্ত-হরণ অপেক্ষা বিরাট এক বিতৃষ্ণা নিয়ে আসে তাঁর মনে। বাংলা নাটকের এমন দৈন্য দশা, এমন শ্রীহীনতা তাঁকে একপ্রকার চ্যালেঞ্জের পথে নিয়ে যায়। (যদিও সংস্কৃত নাটকের রূপ-রস এবং যাত্রার অভিনয়ের কলা-কৌশলের পারম্পর্যে জন্ম নেয় বাংলার এই পর্বের নাট্য সাহিত্য)। এই

চ্যালেঞ্জের প্রথম ফল বাঙালি হাতে হাতেই পেয়ে যায়—‘শর্মিষ্ঠা’র (১৮৫৯) মাধ্যমে। এর পর ‘পদ্মাবতী’ (১৮৬০) এবং তাঁকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠাকারী ‘কৃষ্ণকুমারী’ (১৮৬১)। বলাবাহুল্য সেদিন চোখের সামনে দেখা বাংলা নাটকের অকাল বার্ধক্য দশা ঘোচাতে যে সংকল্প তিনি নিয়েছিলেন, তার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব দান করেন ‘কৃষ্ণকুমারী’ উপহার দিয়ে। যেখানে মধ্যযুগীয় আবেশের শিথিলতা পরিত্যাগ করে, স্বদেশীয় শ্বাশত ঐতিহ্যকে বুকে ধরে, পাশ্চাত্য উপকরণ-উপাদানের সংমিশ্রণের এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখল বাঙালি নাট্য পিপাসুগণ। দেশীয় নাটকের দৈন্যতা, শ্রীহীনতায় সংযোজিত হল পাশ্চাত্য সাহিত্যের বীররস এবং দৈনদিন মানুষের সংঘাতময় দ্বান্দ্বিক জীবনের হলাহল। নব গতি পেয়ে বাংলার নাট্য-নদী প্রবাহিত হল আধুনিক নাট্য সাহিত্যের সমভূমিতে। কৃষ্ণকুমারীর এই পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও আধুনিকীকরণ সম্পর্কে তিনি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি আকারে লিখে জানালেন—

> In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of fairylands. The genius of the drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems.[২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার চালু হয়। একাধিক বিদেশি শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় এই সময় গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি নব নব বিষয়ের পঠন-পাঠন শুরু হয়ে যায়। এই শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে নব্য ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হতে থাকে ইংল্যান্ডীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি। এই আকর্ষণ দিনে দিনে ক্রমান্বয়ে প্রবল থেকে প্রবলতর আকার ধারণ করতে থাকে। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির সংস্পর্শে আসা বৃহৎ বাঙালি সমাজও বহিঃসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এইভাবে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিক থেকে বাঙালি সমাজের শিরা-ধমনীতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সিস্টোল বইয়ে দেয় ইংরেজরা। আর সেই উষ্ণস্রোতের হিল্লোলে স্বদেশীয় নব্য সাহিত্যিকরা ভেসে যেতে থাকেন কী অনুবাদে, কী স্বীয় সৃষ্টিতে।

যার ছাপ এই সময়কার বেশিরভাগ নাট্যকারের নাট্যসৃষ্টিতে বিদ্যমান। যেমন—যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের বিয়োগান্তক নাটক ‘কীর্তিবিলাস’ কৃষ্ণকুমারীর নয় বছর আগে লেখা অথচ সেখানে সংস্কৃত নাটকের কলাকৈবল্য, নান্দী, প্রস্তাবনার পাশাপাশি শেকসপিয়রের ‘হ্যামলেট’-এর প্রভাব যথেষ্ট। নাট্যকার প্রাশ্চাত্য প্রভাবের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন নাট্য সূচনাতে। আবার তারাচরণ শিকদারের কমেডি নাটক ‘ভদ্রার্জুন’ (১৮৫২) সেখানেও বিদেশীয় নাট্যরীতির অঙ্গসজ্জা বর্তমান। নাট্যকার ইউরোপীয় নাটক অনুসরণে ‘ভদ্রার্জুন’ লিখেছেন তা পাঠক সমাজকে জানিয়ে দিয়েছেন। এমনকি হরচন্দ্র ঘোষের ‘ভানুমতী চিত্তবিলাস’ (১৮৫৩) লেখা হয়েছে ‘The Merchant of Vanice’ অবলম্বনে। এরই পাশাপাশি রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, উমেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখেরা মাইকেলের আগেই বেশ কিছু নাটক লিখে গেছেন, যেখানে কেবলই প্রাচ্য সংস্কৃতের প্রভাবই লক্ষণীয়, পাশ্চাত্যের নয়। তবে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ এঁরা নিজেদের নাটক সম্বন্ধে বা নাট্যভূমিকায় যতই পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুসরণ করা হয়েছে বলে স্বীকার করুন না কেন স্বীয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেবল

বহিরঙ্গের অলঙ্কার পরিয়েছেন মাত্র। নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়ণে পাশ্চাত্যরীতির ধারে কাছে এঁরা কেউই ঘেঁষতে পারেননি। সেদিক থেকে কৃষ্ণকুমারীর রূপকার অনেক বেশি এগিয়ে।

'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) দিয়ে যে পদযাত্রা শুরু, 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) তে এসে তার পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষণীয়। তবে মাইকেল পূর্ববর্তী নাট্যকারদের সৃষ্টিতে নাট্য-বাঁধন শিথিলতা, কৃত্রিম সংলাপের বাড়-বাড়ন্ত আর বিকৃত রুচির আখড়া বলে দেগে দেওয়া যাবে না। কারণ এই সময় সাহিত্যের ভাবরূপ ভাষা তার সুদীর্ঘকালের পদ্যের খোলস উন্মোচন করে সবে মাত্র গদ্যে পা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তখনও সর্বজনগ্রাহ্য বাংলা গদ্যের আদর্শ ও মার্জিতরূপ গড়ে না ওঠার কারণে নাটকে ঠিকঠাকভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাত গড়ে তোলা যায়নি। অন্যদিকে বাস্তবের হলাহল নাট্যকারদের মাথায় থাকলেও তারা তা ঠিকমতো ভাষার ব্যবহার করে উঠতে পারেননি।

এই ইচ্ছাপূরণ হল ওই শতাব্দীর ছয়ের দশকে। ততদিনে বাংলা গদ্যের চলিত আদর্শ বেশ কিছুটা সাবলীল হয়ে উঠেছে। এমন মাহেন্দ্রক্ষণে মাইকেলের আবির্ভাব যেমন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি এই সুযোগ পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট নাট্যকার সহজেই হাতছাড়া হতে দেননি। যে কারণে তাঁর রচিত পূর্বের নাটকগুলি থেকে 'কৃষ্ণকুমারী'কে সহজেই পৃথক করা যায়। এ নাটক আগের থেকে অনেক বেশি পরিশীলিত, অনেক বেশি পুরাণবর্জিত।

'কৃষ্ণকুমারী' লেখা হয় ১৮৬১ তে। তখন প্রাশ্চাত্যকরণ দেশে প্রবল আকার ধারণ করলেও বাংলা নাটকের মঞ্চ সাফল্যটাই যেহেতু ছিল প্রধান কথা, তাই স্বদেশীয় দর্শকদের কথা মাথায় রেখে নাট্যকারেরা মঞ্চসজ্জা, নাটকের গঠন-আকৃতি, অঙ্কবিন্যাস এককথায় নাটকের বাহ্যিক অনুসঙ্গগুলো ইউরোপীয় ধাঁচে করলেও নাটকের মূল ঘটনাগুলো থাকত দেশীয় ছাঁচে ঢালা। 'কৃষ্ণকুমারী'ও তাই। ১৮২৯ ও ১৮৩২ খ্রি. দুখণ্ডে লন্ডন থেকে প্রকাশিত কর্নেল টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan'-এ বর্ণিত ভারতীয় ইতিহাসের কিংবদন্তী কাহিনিই ছিল 'কৃষ্ণকুমারী'র মূলাশ্রয়।

উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের একমাত্র অপরূপা কন্যা কৃষ্ণকুমারী। যার সৌন্দর্যই জীবন-যৌবন ও সাম্রাজ্যের পক্ষে কাল এবং এই রূপের মধ্যেই মৃত্যুবীজ রোপিত হল। গূঢ় অর্থে যাকে বলে 'আপনা মাসে হরিণা বৈরী'। বিবাহযোগ্যা সুন্দরী কৃষ্ণার পাণীগ্রহণে মত্ত হয়ে উঠলেন দুই সাম্রাজ্যের দুই সম্রাট। একজন কামাসক্ত অগস্ত্যতুল্য জয়পুর রাজ জগৎসিংহ অপরজন অদৃশ্য মরুরাজ মানসিংহ। প্রথমজন কানে শুনে পাগল, দ্বিতীয়জন চক্রান্তে বুঁদ। জগৎসিংহের রক্ষিতা বিলাসবতী ও তার পরিচারিকা মদনিকা এই চক্রান্তের নায়িকাদ্বয়। উদ্দেশ্য, যেন বিলাসবতীর কাছ থেকে কোনও মতে রাজা জগৎসিংহ হাতছাড়া না হয়। পরিকল্পনামাফিক মদনিকা তাই জগৎসিংহকে বিলাসবতীর কাছেই রাখতে ছদ্ম পুরুষবেশের আশ্রয় নিয়ে যায় উদয়পুরে। সেখানে গিয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে সম্বন্ধ পাকাপাকি করার জন্য পাঠানো জগৎসিংহের দূত লোভাতুর ধনদাসকে জব্দ করার ছক কষে। 'অতি চালাকির গলায় দড়ি' নামক প্রবাদের ভিত শক্ত করতে মদনিকার পাতা প্রথম ফাঁদে পা দেয় ধূর্ত ধনদাস। ওদিকে যৌবনোচ্ছ্বল কুমারী কৃষ্ণাকে একটি রূপবান পুরুষের ছবি দেখিয়ে মদনিকা আসল পাখিকে দ্বিতীয় ফন্দি নামক খাঁচার পুরে ফেলে। যে তসবির হল মদনিকার ভাষার মরুরাজ মানসিংহ।

ঘটনাক্রমে কৃষ্ণা মানসিংহের প্রতি অজান্তেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আর জগৎসিংহের দূত ধনদাস ঘটি-বাটি খুইয়ে চুন হয়ে দেশে ফেরে। উদয়পুরের রাজার যদিও জগৎসিংহ সম্পর্কে অমত ছিল না। ইতিমধ্যে কৃষ্ণাকে মরুরাজের ব্যাপারে পাগলিনী করে তোলার পর তৃতীয় ফন্দি খাটিয়ে মরুরাজকে কৃষ্ণা সেজে চিঠি দেয় মদনিকা। শুরু হয়ে যায় ঘটনার ঘনঘটা। রূপান্ধ মরুরাজও কৃষ্ণাকে পাওয়ার জন্য ভীমসিংহের কাছে দূত পাঠায়। ভীমসিংহের দরবারে জগৎসিংহের শঠ প্রবৃত্তির দূত ধনদাস ও মানসিংহের দূতের মধ্যে নিজ নিজ রাজার স্তুতি শুরু হয়ে যায়। হাসতে হাসতে শুরু হয়ে যায় শিবের গীত। কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে দুই আগন্তুক। অবশেষে সেই রেষারেষি হাতাহাতির দিকে মোড় নেয়। এই যাত্রায় কোনও মতে ক্ষান্ত হয়ে দু'জন দেশে ফিরে নিজ নিজ রাজার কাছে অন্য দূতের রাজ-অপমানের কথা জানায়। ক্ষিপ্ত হয়ে রোষে ফুঁসতে থাকে দুই রাজা। কৃষ্ণাকে না পেলে কেউই উদয়পুরকে ছেড়ে কথা বলবে না। এরই মধ্যে মদনিকার চক্রান্তে দূত ধনদাসের প্রতি মোহভঙ্গ ঘটে জগৎসিংহের। কপাল নিতান্ত মন্দ হওয়ার কূটকৌশলী ধনদাসকে তাই নেড়া হয়ে মাথায় ঘোল ঢালা অবস্থায় জয়পুর নগরের বাইরে চলে যেতে হয়। এরপর জগৎসিংহ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ওদিকে উদয়পুরের 'দেশবৈরী' মহারাষ্ট্ররাজ ঘটনাক্রমে মানসিংহের পক্ষ নিলে রাণা ভীমসিংহ তা জানতে পারে। পুনরায় বুঝি দেশের অর্থনাশ! এই ভয়ে ভীমসিংহ তখন দিশেহারা। এমন অবস্থার দুই পক্ষ আক্রমণ করলে ক্ষমতা, সম্পদ, সম্মান সব কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হবে—এই আশঙ্কায় ভীমসিংহের মাথায় তড়িৎ গতিতে এক বুদ্ধি খেলে যায়। কুমারী কৃষ্ণাকে ইহ-জীবনের মতো সরিয়ে দিতে পারলেই সবদিক রক্ষা! দিশেহারা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় কৃষ্ণা-পিতাকে সেই টোপ খাওয়াল গুণধর মন্ত্রীমশাই। টোপ গিলতে একটুও দেরি হল না ভীমসিংহের। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাই বলেন্দ্রসিংহকে কৃষ্ণাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। বড়ো ভাই পিতাসম, তাই তার আজ্ঞা শিরোধার্য। আরও পাথেয় করে গভীর নিশিথে খড়্গ নিয়ে ভীমসিংহ ভ্রাতা পৌঁছে যায় কৃষ্ণার শয়নকক্ষে। ভাইজির শিহরে দাঁড়িয়ে বিহ্বল হয়ে যায় কাকা। ঘটনাক্রমে তন্দ্রাচ্ছন্ন কৃষ্ণা জেগে উঠে কাকার কাছে হেতু জানতে চেয়ে যখন বুঝতে পারে নিজেই এ রাজ্যের আসন্ন পতনের কেন্দ্রবিন্দু, তখন পূর্বে স্বপ্নাদেশ পাওয়া কৃষ্ণা কালবিলম্ব না করেই ঐ খড়্গাঘাতে নিজেকে নিজেই শেষ করে দেয়। এই অবস্থা দেখে কৃষ্ণামাতা অহল্যা দেবী হতচকিত হয়ে পড়ে। সে ও দ্রুত গতিতে সেখান থেকে প্রস্থান করে এবং আত্মহত্যা করে বসে। গোটা রাজ পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। বিশেষ করে রাজা ভীমসিংহ, তাঁর সহোদর, রাজ-অন্তপুরের সুখ, দুখের চির সাথী তপস্বিনী সহ গোটা রাজসভার হাহাকার পড়ে যায়।

এই কাহিনি একেবারে ঐতিহাসিক ভাবে সত্য না হলেও আংশিক সত্য। বিশেষত বেশকিছু চরিত্র সরাসরি ইতিহাস থেকে আনয়ন করা। যারা সময়ের মদ-মত্ততা অপেক্ষা এই নাটকে অনেক বেশি মানবিক। বিশেষ করে ভীমসিংহ তো বাঙালি ঘরের সন্তান হারানো যন্ত্রণাক্লিস্ট অসহায় পিতৃসত্তা। নাট্যকার চিন্তার সূক্ষ্ম মায়াজাল বুননে এই নাটকে এমন একটি ঐতিহাসিক রোমান্টিক গাথা প্রণয়ণ করেছেন যা ইতিপূর্বে বিরল। তবে এত বড়ো একটি ট্রাজিক ঘটনা, যেখানে রাজ-রাজড়ার ব্যাপার, সেখানে মাত্র এগারো জন প্রধান চরিত্রের দ্বারা পরিসমাপ্ত করে নাট্যকার নাটকে বেশ কিছু ফাঁক ও অসঙ্গতি তৈরি করে ফেলেছেন। তাতে নাট্য রসের ব্যাপক খামতি না ঘটলেও বেশ কিছু প্রশ্ন পাঠকের মনে উঁকি দেওয়াই স্বাভাবিক। তবে

এটা সত্যি যে, মঞ্চায়নই নাট্যকারদের কাঙ্খিত বিষয় হওয়ার জন্য এই বিপত্তি। পাশাপাশি তখনকার দিনে রক্ষণশীল নারী সম্প্রদায় যেহেতু অভিনয় জগৎ থেকে দূরে ছিল, একই সময়ে আবার দক্ষ পুরুষ অভিনেতারও যথেষ্ট অভাবই নাট্যকারকে এই পথে চালিত করতে বাধ্য করেছে বলে ধারণা। তবুও কলা-কুশলী স্বল্পতাহেতু এমন একটি কাহিনিকে মাটি হতে দেওয়া চলে না। আবার চরিত্রের ভিড়ে মূল নাট্য প্রবাহ এলোমেলো হয়ে যাক এমন ঘটনাও অনাকাঙ্ক্ষিত। যাইহোক ঐতিহ্য ও আধুনিকতায় ঋদ্ধ মাইকেলের তথাকথিত বুদ্ধিবৃত্তির দিকে তাকালে এবং অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্সের কথা আমাদের মাথার এলে এই ট্রাজেডির বেশ কিছু অসংগতি চোখে পড়ে—

● কৃষ্ণার মৃত্যুর জন্য মানসিংহ যথেষ্ট দায়ী। আবার এই মানসিংহ নাটকে দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে অনেকটাই নাট্য ঘটনা সম্পাদন করেছে কিন্তু সমগ্র নাটকে তার উপস্থিতি দেখা গেল না। কৃষ্ণা বুদ্ধিমতী, সুদর্শনা, সংগীতজ্ঞা অথচ কোথাকার মদনমোহন? কী তার পরিচয়? তার দেওয়া ও বলা একটি ছবি দেখে সুশিক্ষিতা কৃষ্ণার মজে যাওয়া বাস্তবসম্মত হয়নি। সুশিক্ষিতা রাজকন্যার অনুধাবনশক্তির চেয়ে বিবেচনাবোধ যথেষ্টই কাঙ্খিত ছিল। কৃষ্ণার মধ্যে যে বোধশক্তি নাটকের শেষে দেখা গেছে, তা প্রথম থেকে অতি প্রয়োজন ছিল।

● ভীমসিংহ প্রথম থেকেই দুর্বল। বিশেষ করে তপস্বিনীর সঙ্গে কথপোকথনে তার কাঙালীপনা বেরিয়ে পড়েছে। রাজার রাজকীয় আস্ফালন দেখতে না পেয়ে পাঠক হতাশ নয় কী?

● জগৎসিংহও আরেক রাজা। তিনি এতই কামাসক্ত যে তার রক্ষিতার পরিচারিকা মদনিকার কথায় অন্ধের মতো চালিত। অথচ এই রক্ষিতার কোপানলে তার কৃষ্ণার মতো রূপ-ভাণ্ডার লুটে নিতে ব্যর্থ হতে হল; ভুলেও তা রাজা হয়ে টের পেলেন না! আবার এই জায়গার ধনদাসের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া—'এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুষতে লাগলে, সাগরে কি আর বারি থাকে'—নারীর সম্মান হানিকর এই বাক্যবন্ধ পর্ণোগ্রাফির ইন্ধনসূচক বটে।

● অদৃশ্য মরুরাজ মানসিংহ আরেক বিবেচনাহীন রাজা। কৃষ্ণা সেজে মদনিকার দেওয়া একটা চিঠিতেই সে কাবু। রাজার আরাধ্যকে আর চোখে দেখার প্রয়োজন হল না। এমনই সে বিন তুঘলক!

● ভীমসিংহ কৃষ্ণার বিষয়ে জয়পুর রাজ সম্পর্কে যথেষ্টই আস্থাবান। জগৎসিংহের কাছে কৃষ্ণাকে সঁপে দেওয়ার ইচ্ছা তার পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অথচ তাকেই বশ করে ভীমসিংহ কেনইবা দেশবৈরী মহারাষ্ট্র অধিপতি কিম্বা মরুরাজের বিরুদ্ধে যৌথ আক্রমণে নেমে পড়লেন না—প্রশ্ন জাগে। আবার জগৎসিংহ সম্পর্কে যদি ভীমসিংহ ওয়াকিবহাল থাকে তাহলে রাজা হিসাবে জগৎসিংহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা ভীমসিংহের সম্পর্কে জানাটাই স্বাভাবিক। নাটকে দেখা গেল কামাতুর জগৎসিংহ তার কিছুই জানে না। এমনকি ভীমসিংহের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে সে হাওয়ায় ভাসা সংবাদ পায় এবং সে বিষয়ে, সে নিশ্চিত হতে পারে না। এ কেমন যুক্তি!

● জগৎসিংহ, মানসিংহ, ভীমসিংহ কারোরই স্বাধীন বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ শক্তি, ক্ষত্রিয়ের বীরোচিত আস্ফালন দেখা যায়নি। সবাই যেন অন্যের দ্বারা চালিত এবং নিয়তির দাস। ছদ্মবেশে উদয়পুরের রাজদরবারে আচমকাই ঘাঁটি গাড়লো মদনিকা। অথচ তার চালাকি রাজ-অন্তঃপুরের কোনো প্রাণীই টের পেল না! ভীমসিংহ-কন্যা প্রায় সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম। অথচ তার মধ্যে যেমন কোনো প্রাণোচ্ছলতা নেই, আবার সে সহজেই যেন বোকা বনে যেতে পারদর্শী!

● চরিত্রের মুখে মুখে যত্র-তত্র পুরাণকেন্দ্রিক উপমার ব্যবহার। সকল চরিত্র তাহলে কী ভারতীয় পুরাণে বিজ্ঞ? সামান্য একজন রাজমন্ত্রী, সে কী করে এক সন্ততির জনক তথা রাজা ভীমসিংহকে নিজ কন্যা হত্যার বীজমন্ত্র ঢুকিয়ে দিল? কোন মন্ত্রবলে রাজা আপন স্নেহের কন্যাকে হত্যার জন্য মেতে উঠল—এই জায়গার যদি রাজা এতই নিষ্ঠুর তবে মহারাষ্ট্র অধিপতি, মানসিংহ কিংবা জগৎসিংহের বেলায় গর্তে প্রবেশের ভাব কেন? তাহলে রাজা কি রাজভোগ চায়, না কি তার বিপরীত? যদি চায় তবে যুদ্ধে অসমর্থ থেকে কন্যা মৃত্যুতে তার বিলাপ করা সাজে না। আর বিলাপের আগে কেনই বা তার সকল বুদ্ধি, বিচার-শক্তি লোপ পেল? এখানে ভীমসিংহ আপন সুখের কাঙাল, না স্নেহ-বৎসল, নাকি রাজৈশ্বর্যভোগী তা বিচারে পাঠকের ধন্দে পড়তে হয়। এই ঐতিহাসিক ট্রাজেডিতে জাঁকজমক, রাজৈশ্বর্যশালী, আড়ম্বরপূর্ণ, বিশেষণযুক্ত ভাষার ব্যবহার চোখে পড়ে না।

● এক একটি চরিত্রের অন্তর্ধানের পিছনে কোনো সার্বিক যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। ধনদাসকে শাস্তি দিয়ে নগরের বাইরে বের করে দেওয়ার পরে পুনরায় তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। এই নাট্যকারেরই 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নারীরা দেখেছি তাদের স্বামী, দেবতা বা প্রেমিকদের ভুল-ত্রুটি পেলে বা অন্যায় করলে তাদের বিরুদ্ধে চাঁচা-ছোলা ভাষায় গর্জে উঠতে কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের শেষের দিকে ভীমসিংহ পত্নী যখন জানতে পারল যে, তার স্বামী একমাত্র কন্যার মৃত্যুর কারণ, তবু এত বড়ো অন্যায় সত্ত্বেও বিদ্রুপের শেল না ছেড়েই আচমকাই সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল!

● নাটকে যে গানগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি রাজ-অন্তঃপুরের রাজাদের বিনোদন উপলক্ষ্যে একটিও ব্যবহার করা হয়নি। অথচ কৃষ্ণাও সংগীতের তালিম নেয়, সেখানে কিম্বা রাজ অন্তপুরের জলসার আসর বসিয়ে গানের ব্যবহার করলে তা হত বিধিসম্মত।

● নাটকে যথেচ্ছ স্বগতোক্তির ব্যবহার, তৎসম শব্দ ও প্রলম্বিত উপমাসূচক বাক্য, বিশেষ করে নাটকের পরিসমাপ্তির দিকে দীর্ঘ সংলাপ নাট্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যথেস্ট তাল কেটেছে। তাছাড়া মঞ্চ, নির্দেশিকার ব্যাপারে নাট্যকার প্রায়ই নির্বিকার।

● কৃষ্ণা মাতার যখন তখন অহেতুক 'রোদন' এবং প্রথম থেকেই সে বিষণ্ণ, বেদনায় মূহ্যমান। রাজপত্নীর এহেন আচরণ মানায় না—'বাঃ কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর এই করুণ যেন এতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কোনো ব্যাঘাত না জন্মে। নাটকের পরিণতি যে কৃষ্ণার মৃত্যু ও ট্রাজেডি— শোকাবহ সেই সংকেত মদনিকা উপরোক্ত বাক্যটির দ্বারা তৃতীয়াঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে পাঠককে আঁচ পাইয়ে দেওয়ার পরিণতিতে শোকের মূর্ছনা অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে।

● নাট্য ঘটনায় নারীত্বের জয় হল ঠিকই; বিলাসবতীর অন্তিম ইচ্ছাটাই পূরণ হল কিন্তু বিলাসবতীর শেষ ক্রূর হাসিটি বা জয়ের উল্লাস পাঠক বা দর্শক দেখতে পেল না। পরিশেষে, নাটকে মানসিংহের উদয়পুর আক্রমণের কোনো প্রস্তুতিই দেখা যায়নি। তাছাড়া দুই পক্ষের যৌথ আক্রমণ হল না; ভীমসিংহ তখনও অক্ষত, অথচ কীসের গন্ধ শুঁকে তিনি একমাত্র কন্যা কৃষ্ণাকে হত্যা করতে মনস্থ করলেন তা ভগবানই জানেন।

পাঠক মনে এইরকম নানান প্রশ্নের উঁকি দেয় বটে। তবে সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে 'কৃষ্ণকুমারী' আর নাটকই হতো না, একথা যেমন সত্য তেমনি কিছু কিছু ঘটনা—কার্য-কারণ

সম্পর্কে গেঁথে ফেলা যেত কিন্তু তা হয়নি। যাইহোক পরবর্তী কালের রচনার খাতে ফেলে পূর্ববর্তী সাহিত্যের বিচার যথার্থ নয়। পূর্ববর্তী সৃষ্টির পারম্পর্যে তুলনীয় বিচারই সাহিত্য সমালোচনার সঠিক মাপকাঠি বলে মনে হয়। সেদিক থেকে 'কৃষ্ণকুমারী' যথার্থই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও সফলতম ঐতিহাসিক ট্রাজেডি। এ কথার বোধহয় কোনো দ্বিমত নেই। 'কৃষ্ণকুমারী' মধুসুদন দত্তের শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। এর পূর্বে রচিত দু'টি নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের মায়াজাল কাটতে পারেনি। 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' দুটিতেই ছিল পুরাণ কাহিনি। একটি হিন্দু পুরাণের কায়া আর দ্বিতীয়টিতে ছিল গ্রিক পুরাণের ছায়া। 'পদ্মাবতী' লেখার পর রাজনারায়ণ বসুকে তিনি জানিয়েছিলেন যে, এরপর যদি তিনি আর নাটক লেখেন তবে তিনি বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য দর্পণ' দ্বারা চালিত হবেন না। তাহলে এই কথায় পরিষ্কার যে, পরবর্তী নাটকে পাশ্চাত্যের ছাপ অবশ্যই থাকবে। কিন্তু এই কথা বলার বেশ কিছু দিন পরে 'কৃষ্ণকুমারী' লিখতে বসে সেই পণরক্ষা করা তাঁর হল না। পুরাণ বর্জন করে ইতিহাসকে আশ্রয় করলেন বটে তবু তার পরতে পরতে অন্তঃসলিলার মতো ভারতীয় পুরাণাদির ব্যবহার দেখা গেল। তা না হলে নাটক লেখার মূল উদ্দেশ্যটাই বিনষ্ট হতো। যেহেতু দর্শকই নাটকের সাফল্য এনে দেয়। আর সেই দর্শকই হল বাঙালি। যাদের তখনকার চাওয়া-পাওয়া, জানা-বোঝা পুরাণকেন্দ্রিক। তাই এই শ্বাশত ঐতিহ্যের বিশ্বাস ছিন্ন করে উদ্ভট কাহিনি রচনা করা মাইকেলের পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর ছিল। তাইত নাট্যকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'কৃষ্ণকুমারী'তে পুরাণের একাধিক প্রসঙ্গ অজ্ঞাতসারেই এসে গেছে। যেমন অগস্ত্য, শৈলরাজ, কর্ণ, দ্রুপদ, পার্থ, রাজা দশরথ, যাজ্ঞসেনী, নলরাজা, দময়ন্তী, মন্দাকিনী, রাবণ প্রভৃতি ঐতিহ্যের এই প্রসঙ্গগুলি নাটকের চবিত্রদের সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে। এতো গেল নাটকের চরিত্র গুলির ভাষার দিক; তাছাড়া কোনো কোনো চরিত্রই তুলে আনা হয়েছে সরাসরি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে। যেমন ভীমসিংহের সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গী তপস্বিনীকে নাটকে কখনো কখনো ডাকা হয়েছে 'কপালকুণ্ডলা' বলে। মাইকেলের এই নামকরণের মূলাশ্রয় ভবভূতির 'মালতী মাধব' নাটকের কাপালিকের শিষ্যা। অবশ্য ভবভূতির কপালকুণ্ডলা এবং 'কৃষ্ণকুমারী'র তপস্বিনী কপালকুণ্ডলা নামকরণের দিক থেকে উত্তরের সাদৃশ্য থাকলেও দুজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'But that Madanika is my favourite'[৩] বললেও তা ভারতীয় আদর্শে সমুজ্জ্বল। সংযুক্তাকে লাভের আশার পৃথ্বীরাজের নিযুক্ত ধাত্রী এবং বাণ ভট্টের পত্রলেখার স্মরণে চরিত্রটি অঙ্কিত। বিলাসবতীও তাই। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বারাঙ্গনা চরিত্রের সঙ্গে মদনিকা ও বিলাসবতীর মিল পাওয়া যায়। যোগীন্দ্রনাথ বসুর ভাষায়—

> অনেক সময় বারাঙ্গনা চরিত্রেও এমন দুই একটি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাহা কুললললনারও পক্ষে অনুকরণীয়। সংস্কৃত সাহিত্যে বসন্তসেনার চরিত্র ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কৃষ্ণকুমারী নাটকের বারাঙ্গনা মদনিকার ও বিলাসবতীর চরিত্র মধুসূদন সম্ভবত মৃচ্ছকটিকের মদনিকার ও বসন্তসেনার আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন। মৃচ্ছকটিক নাটকের মদনিকার ন্যায় কৃষ্ণকুমারীর মদনিকা ও বুদ্ধিমতী, চতুরা, দয়াবতী এবং সেই সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে ক্রুরস্বভাবা।—কৃষ্ণকুমারী নাটকের বিলাসবতীও মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার ন্যায় প্রণয়াস্পদের প্রতি আন্তরিক অনুরাগিণী।[৪]

এছাড়া 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের শঠ, অর্থলোভী চরিত্র ধনদাস যেন সংস্কৃত নাটকের বিদূষকেরই নামান্তর। বলাবাহুল্য ঐ মৃচ্ছকটিক নাটকের চরিত্র রাজ শ্যালকের সামান্য প্রভাব ধনদাসের উপর বিদ্যমান। তবে ভিলেন রাজ শ্যালক অপেক্ষা ধনদাস অনেক বেশি রসিক, জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। আপন বুদ্ধিতে অটল বিশ্বাসী, লাভের হিসেব-নিকেশে বড়ই যত্নবান। আবার তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কৃষ্ণকুমারীর যে স্বপ্নদর্শনের কথা বর্ণিত হয়েছে তাতে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলে মনে হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, বাঙালি দর্শক মাত্রেই পুরাণ-বিশ্বাসী এবং পুরাণের কতনা অবিশ্বাস্য কাহিনি রয়েছে যা দর্শক সমাজ অবগত। সেদিক থেকে চিত্রদর্শনে কৃষ্ণকুমারীর প্রেমে পড়াটা তেমন কোনো অলৌকিক বা অন্যায়ের ব্যাপার হবে না। যে জন্য অনায়াসেই এমন একটি ঘটনার সংস্থাপন তিনি করতেই পারেন। যার স্বীকারোক্তি চিঠি আকারে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যারকে জানিয়েছিলেন এইভাবে—

> Kissen Kumari falling in love with a man she has never seen before, is by no means uncommon in our own ancient History or Feble; the name of Rukmini will occur to you at once, I believe there are allusions to her in the play.[৫]

তবে পুরাণে যে অলৌকিতা, চমৎকারিত্ব, আকস্মিকতা থাকে নাটকের ক্ষেত্রে সবসময় তা সমর্থনযোগ্য নাও হতে পারে। কৃষ্ণকুমারী নাটকের পরিসমাপ্তিতে বিশেষ করে কৃষ্ণা—পিতা ভীমসিংহের বিচার বুদ্ধি শূন্যতার মাঝে হাহাকার কিংবা দিশেহারা অবস্থার মধ্যে কৃষ্ণার সমাধান সূত্র খোঁজা বা তার আত্মহত্যা সম্পর্কে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তাঁর সাহিত্য সমালোচকগণ যাই বলুন না কেন, অন্তিম পর্বের এই জায়গায় কোথাও যেন রূপকথা বা গীতিকার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালার কথা আমাদের অবিদিত নয়। সেখানে বিবেকশূন্য প্রেম হন্তারক সর্দার হুমরা বেদে, পালিত কন্যা মহুয়ার ভালোবাসা—রাজপুত্র নদ্যার ঠাকুরকে মেনে নিতে না পারায় মহুয়ার হাতে বিশালক্ষের ছুরি তুলে দিয়ে নদ্যার ঠাকুরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু অপূর্ব এক নৃত্য কৌশলের মাধ্যমে মহুয়া আকস্মিকভাবে সেই ছুরি নিজ বুকে বসিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করে। এরপর একমাত্র পালিতা কন্যার মৃত্যুতে হুমরা বেদের যে হাহাকার ধ্বনিত হয়েছিল তা যেমন গগনভেদী তেমনি অত্যন্ত শোকাবহ। একপেশে জেদের ফলে পরক্ষণেই জ্ঞানচক্ষুর উদয় হয়েছিল হুমরা বেদের। 'কৃষ্ণকুমারী'র অন্তিম পরিণতিও একই কথা বলে। যশোরের অদূরে ময়মনসিংহ। আর যশোরেই জন্ম ও বাল্য শিক্ষা মধুসূদনের। পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক এ পালা আবিষ্কৃত হলেও রূপকথার এ রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান 'মহুয়া' কতদিন ধরে শ্রুতি বেদের ন্যায় মানুষের মুখে মুখে ফিরছে কে জানে! মাইকেল বাল্যকালে এ রূপকথার সাথে হয়তোবা পরিচিত থাকতেও পারেন। তাই বলে এই রূপকথার অনুকরণে কৃষ্ণার পরিণতি অঙ্কিত, এমন কথা বলা সমীচিন হবে না। তবে কৃষ্ণকুমারী ও মহুয়ার পরিণতি যেন একই সুতোয় গাঁথা দুটি মৃত্যুফুল। আর ভীমসিংহ ও হুমরা বেদেও যেন জীর্ণ মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

অপরদিকে 'কৃষ্ণকুমারী'তে পাশ্চাত্য প্রভাব মাইকেলের কাঙ্খিত ছিল। মনে প্রাণে চেয়েছিলেন সংস্কৃত-পুরাণাদির বিধি-বিধান 'কৃষ্ণকুমারী'তে ছিন্ন করে দেবেন। তা হয়নি। তবু

কথা ও কাজের ক্ষেত্রে বিরাট একটা গরমিলও হয়নি। কথানুযায়ী ‘কৃষ্ণকুমারী’তে সংস্কৃত সাহিত্যের অবাধ প্রবেশ অনেকটাই তিনি রোধ করেছেন। সংস্কৃত নাটকের মতো নান্দী, প্রস্তাবনা এখানে দেখা যায়নি। নাটকের মূল কাহিনি দেশীয় হলেও তা সংগ্রহ করা হয়েছে বিদেশীর (কর্ণেল টড) রচিত গ্রন্থ থেকে। নাট্য ঘটনার শেষ পর্যায়ে ভীমসিংহ কন্যাস্নেহ ও রাজ্যরক্ষা দুটোর কোনটা বাছবেন, সে নিয়ে দোলাচলে। এমন অবস্থায় কৃষ্ণার আত্মাহুতি দানে পিতৃরাজ্য রক্ষা এবং তার ফলে পিতার উন্মাদ দশার সঙ্গে প্রসিদ্ধ গ্রিক নাট্যকার ইউরিপিডিস রচিত ‘ইফিজেনিয়া ইন অলিস’ নাটকের বেশ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। যে নাটকে রাজা আগামেমন দেবী আর্টিমিসের ক্রুদ্ধতাকে থামাতে কন্যা ইফিজেনিয়াকে বলি দেন। ‘ইফিজেনিয়া ইন অলিস’ নাটকের এই ঘটনার সঙ্গে সাম্রাজ্যের কল্যাণে কৃষ্ণার আত্মাহুতির বেশ যোগসূত্র আছে। ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে গ্রিক নাটকের প্রভাব কতটা ছিল বা আদৌ ছিল কিনা সে বিষয়ে মাইকেলের কোনো চিঠি বা বন্ধুবর্গের কাছে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে দেখা যায়নি। তবে সমালোচকরা গ্রিক নাটকের প্রভাব আছে বলে মনে করেন। কারণ মাদ্রাজে থাকাকালীন দৈনিক রুটিনে দুপুর বারোটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত তাঁকে গ্রিক ভাষা অনুশীলন করতে দেখা গেছে। এর থেকে সমালোচকদের ধারণা হয় তাঁর গ্রিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকাটা অযৌক্তিক কিছু নয়। শুধু তাই নয় ফরাসি নাটকের প্রভাব থাকাটাও সম্ভবপর বলে মনে হয়। কারণ ফরাসী নাটক ‘ইফিজেনি’র সঙ্গে ‘কৃষ্ণকুমারী’র সাদৃশ্য টড তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করে গেছেন। সেই হেতু মাইকেল এই ‘ইফিজেনি’র সাথে পরিচিত থাকতেও পারেন। আচরণগত দিক থেকে দুর্বৃত্ত চরিত্র ধনদাসের সঙ্গে শেকসপিয়রের ভিলেন চরিত্র ইআগোর মিল রয়েছে। কিন্তু মাইকেলের একটি পত্রে দৃঢ়কণ্ঠে উলটো সুর পাওয়া যায়—

> As for Dhanadass, I never dreamt of making him the counterpart of Yago. The plot does not admit of such a Character, even I could invent it-which I gravely doubt.[৬]

তবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের ভীমসিংহ-ভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহকে ‘King John’ নাটকের বাস্টার্ড চরিত্রের আদলে গড়তে চেয়েছিলেন; যার স্বীকারোক্তি এইরকম—“I wish Bullender to be serious and light, like the Bastard in King John.”[৭] তবে বাস্টার্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলেন্দ্রসিংহে কিছুই মেলে না। মাইকেলের ফেবারিট চরিত্র মদনিকার ছদ্মবেশী আচরণ ‘অ্যাজ ইউ লাইক ইট’ -এর গ্যানীমিড কিংবা ‘মার্চেন্ট অফ ভেনিস’ -এর পোর্সিয়ার কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের অলৌকিকতা বিষয়ে কোনো কোনো সমালোচক শেকসপিয়রের ‘হ্যামলেট’ ও ‘ম্যাকবেথ’-এর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। একই সাথে গ্রিক নাটকের দৈবাদেশের প্রভাব, কৃষ্ণকুমারীর স্বপ্নে পদ্মিনীর আদেশ লাভের সঙ্গে তুলনীয় বলে ঐসব সমালোচকগণ মনে করেন। আবার ‘কিং লিয়র’ চরিত্রের সঙ্গে ভীমসিংহের অন্তিম হাহাকারের যথেষ্ট মিল রয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। তবে দুজনের যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশে বিস্তর ফারাক লক্ষ করা যায়। ‘কৃষ্ণকুমারী’র সঙ্গে উপরিউক্ত বেশ কিছু পাশ্চাত্য নাটকের আদৌ যোগসূত্র আছে কিনা সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তের যেহেতু পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল, তাই পাশ্চাত্য নাটকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ অবশ্যই ছিল বলে আমরা

মনে করতে পারি। সব শেষে 'কৃষ্ণকুমারী'র আঙ্গিক রীতিতে যে পাশ্চাত্যের ছায়া বিশেষ করে শেকসপিয়রীয় প্রভাব অবশ্যম্ভাবী, এ কথা জোর গলায় বলা যায়।

যাইহোক ঐতিহাসিক ঘটনার আবর্তে সৃষ্ট 'কৃষ্ণকুমারী' প্রাচ্যের রসদে এবং আধুনিক পাশ্চাত্যের বিবিধ সাহিত্যিক উপাদানের যৌথ সম্মিলনে পুরোপুরি অত্যাধুনিক বিশুদ্ধ ট্রাজেডি না হয়ে উঠলেও ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় নাট্য-সৃষ্টির তুলনায় অনেক বেশি সার্থক এবং পরিপূর্ণরূপে যে একটি আধুনিক নাটক হয়ে উঠতে পেরেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার নাট্যশালার 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত হওয়ার পর, ১১ ফেব্রুয়ারি তদানীন্তনকালের অত্যন্ত জনপ্রিয় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় 'কৃষ্ণকুমারী'কে খুবই সুখ্যাতি ও স্তুতিপূর্বক 'বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মৌলিক নাটক' বলে অভিহিত করা হয়। এতদিন ধরে কেবলমাত্র দেশীয় পৌরাণিক বিষয়াদি কিংবা ধর্মীয় কাহিনীর ঘনঘটা নিয়ে যে নাটক রচনার হিড়িক চলছিল এবং প্রাচ্য সংস্কৃত স্বর্ণ-সাহিত্য-খাঁচার রীতি-নীতি ও কলা-কৈবল্যবাদে বাংলা নাট্য-সাহিত্য যেভাবে বন্দি দশায় ছটফট করছিল—'কৃষ্ণকুমারী' সেই সেকেলে পিঞ্জরের শলা কাটা পাখি। বলার অপেক্ষা রাখে না এখানে নাট্যকারের শিল্প নৈপুণ্যে-চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে; জটিল হৃদয়দ্বন্দ্বের আবর্তে; ঐতিহাসিক বিষয়বোধের নিষ্ঠায় কাহিনি-উপকাহিনির নব সংযোজনায় মনোগ্রাহী ঘটনার ঘনঘটায়-এই প্রথম বাংলা নাটকে আধুনিক নাটকীয় উৎকর্ষতা অত্যন্ত সার্থকভাবে রক্ষা পেল। বিশিষ্ট সমালোচকের ভাষায়—"বাঙ্গালা ভাষার এ পর্যন্ত যে সকল বিষাদান্ত নাটক রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অতি অল্পই ইহার সমকক্ষতা দাবি করিতে পারে।"[৮]

উৎসের সন্ধানে

১. নির্মল দাশ : 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ-জুলাই ২০০৯, পৃ. ১৫৯
২. অজিতকুমার ঘোষ : 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৭৭
৩. তদেব : পৃ. ৮০
৪. অলোক রায় সম্পাদিত : 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৩৯
৫. তদেব : পৃ. ৩১
৬. তদেব : পৃ. ৩৭
৭. তদেব : পৃ. ৩৭
৮. উৎস-২, পৃ. ৮১

মধুসূদন দত্ত-র নাটকের সংলাপ : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

কৌশিককুমার দত্ত

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বাংলা নাটকের সংলাপের ভাষা কী হবে তা নিয়ে সংশয় ছিল। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাটকের সংলাপে বিভিন্ন রীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়—১. সাধু গদ্য, ২. চলিত কথ্য গদ্য, ৩. সাধু-চলিত মিশ্রিত গদ্য, ৪. সাধুঘেঁষা চলিত, ৫. চলিতঘেঁষা সাধু, ৬. পদ্য।

সংলাপে গদ্যরীতির আদর্শ কী হবে তা নিয়ে যেমন দ্বিধা ছিল তেমনই পদ্যরীতির প্রয়োগে দর্শক মনোরঞ্জনের চেষ্টাও ছিল। এই দ্বিধা থেকে উত্তরণের পথ দেখালেন মধুসূদন দত্ত। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি নাটকেই সংলাপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'তে ক্রিয়া-সর্বনামে তিনি সর্বত্র চলিতরীতি গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ ক্রিয়া-সর্বনামে সাধুরীতি পরিত্যাগ করলেন। কচ্চি, কচ্চো, হচ্চো, কত্যে, হচ্চেন প্রভৃতি রাঢ়ী উপভাষার চলিত ক্রিয়াপদের সার্বিক ব্যবহার করলেন নাটকে। তবে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ভাষাকে আমরা সাধুঘেঁষা চলিতরীতিই বলবো। পাশ্চাত্য আদলে নাটক রচনা করার ইচ্ছা থাকলেও সংস্কৃতরীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি নাটককার মধুসূদন। পাত্র-পাত্রীর সংলাপে বাক্যের সুদীর্ঘ আলংকারিক বিন্যাস, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বর্ণনার অতি বাহুল্য, ক্লান্তিকর দীর্ঘ স্বগতোক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার এবং সংস্কৃত নাটকের মতো কল্পনাপ্রসারী কবিত্ব সৃষ্টির প্রবণতায় নাট্যভাষা তার স্বাভাবিকতা হারিয়েছে। এবং নাট্যগতিও হয়েছে শ্লথ। সংস্কৃত নাটকের প্রভাবে এই নাটকের সংলাপেও গদ্য-পদ্যের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। দ্রষ্টব্য রাজার সংলাপ ২/২।

শর্মিষ্ঠার এই সংলাপগত ত্রুটি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা দেখা গেল

'পদ্মাবতী'তে। গ্রীক পুরাণ অবলম্বনে লেখা নাটক 'পদ্মাবতী'তে মধুসূদন সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটালেন। সমকালীন বাংলা নাটকের আড়ষ্ট গদ্য ও পয়ার-ত্রিপদীর গতানুগতিক কৃত্রিম সংলাপে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাই খুব অল্প পরিসরে হলেও এই নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করে সংলাপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। নাট্য সংলাপের প্রবহমানতা তথা গতি অক্ষুণ্ণ রাখতে অমিত্রাক্ষর যথেষ্ট উপযোগী হতে পারে বলে মনে করেছিলেন মধুসূদন। ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারলে গদ্যের মতো শোনাবে এই ছন্দ আবার একটা অন্তর্লীন সুর-মাধুর্য ক্লাসিক উচ্চতায় নিয়ে যাবে নাটকের আবেদন। মধুসূদনের বিশ্বাস ছিল অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য। তবে নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্বিক প্রয়োগ সফলতায় তিনি সন্দিহান ছিলেন। তাই ব্যাপকভাবে গোটা নাটকে অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ না করে নির্বাচিত অংশে যেমন দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কঞ্চুকীর স্বগতোক্তিতে, চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কলির স্বগতোক্তিতে, চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কলির স্বগতোক্তিতে এবং শচী, মুরজার কথোপকথন প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ করলেন। নাটকের শেষ সংলাপও লিখলেন অমিত্রাক্ষরে। খুব সামান্য পরিসরে অমিত্রাক্ষর প্রয়োগ করে তিনি বুঝতে চাইলেন বাঙালি দর্শকের কান প্রস্তুত হয়েছে কিনা অমিত্রাক্ষর শোনার জন্য। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শচী, কলি, মুরজার সংলাপে অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ লক্ষ করা যাক—

শচী প্রণাম। হে দেববর, কি করেছ, বল?
কলি পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রানী,
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।
শচী (ব্যগ্র ভাবে) কোথায় রেখেছ তারে?
কলি এই ঘোর বনে
সখি সহ আনি তারে, রেখেছি, মহিষি। (সহাস্যবদনে)
রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,
সেসকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে!
মুর (স্বগত) হেন দুরাচার আর আছে
কি জগতে?
(প্রকাশে) ভাল কলি দেব
কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে?[১]

এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে সংলাপ-শৃঙ্খলের অংশ হিসেবে অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ ঘটেছে নাটকে। অমিত্রাক্ষরে রচিত দীর্ঘ স্বগতোক্তিগুলি ক্লান্তিকর হলেও এই সংলাপ শৃঙ্খলের অংশ হিসেবে অমিত্রাক্ষর স্বচ্ছ ও সাবলীল। মধুসূদনের এই সংলাপ-নিরীক্ষা বাংলা নাটকের সংলাপের বিবর্তনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছিল। পরবর্তীকালে অমিত্রাক্ষরকে ভেঙে সহজ করেই গড়ে উঠল গৈরিশ ছন্দ। সে আলোচনা আমরা পরবর্তী সময়ে করব। যাই হোক, মধুসূদন আর কোনো নাটকে অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ করলেন না। কারণ হিসেবে তিনি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের উৎসর্গ পত্রে বিশিষ্ট অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখলেন—"অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; অমিত্রাক্ষর এখনও এদেশে এতদূর পর্যন্ত

প্রচলিত হয় নাই যে, তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি।"[২] অর্থাৎ জনরুচির দাসত্ব এখানে কাজ করেছিল, আর কাজ করেছিল বাঙালি অভিনেতাদের উচ্চারণরীতি, শিক্ষা আর বাঙালি দর্শকের কান সম্পর্কে মধুসূদনের অবিশ্বাস। সত্যিই মধুসূদন তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে এতটাই অগ্রবর্তী ছিলেন যে বাঙালির পক্ষে তাঁকে গ্রহণ করা পরিশ্রমসাধ্য ছিল। নাটকের শ্রোতার কান প্রস্তুত করার দায়িত্ব নিলেন তিনি কবিতার জগতে অমিত্রাক্ষরের সফল প্রয়োগ করে। তবে মধুসূদন নিজে আর অমিত্রাক্ষরে নাটক লেখায় হাত না দিলেও পরবর্তীকালে 'রাজা ও রানী' নাটকে অমিত্রাক্ষরের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিয়েছেন ১৮৬০-এ মধুসূদন যা করতে চেয়েছিলেন তাতে কিছুমাত্র ভুল ছিল না। বরং মধুসূদন যদি অমিত্রাক্ষরে সম্পূর্ণ নাটক লিখতেন তাহলে তা 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মতোই আরেকটি মাস্টারপিস হতে পারত।

'পদ্মাবতী' নাটকের গদ্যভাষা 'শর্মিষ্ঠা' থেকে অনেক সহজ এবং সাবলীল হয়েছে। 'শর্মিষ্ঠা'-র পরোক্ষে গল্প বলা থেকে বেরিয়ে এসে প্রত্যক্ষ ক্রিয়া এখানে অনেক বেশি। শচী, রতি, মুরজার সংলাপ চলিতরীতির ও সাবলীল। স্বগতোক্তি ছাড়া অন্যত্র ছোটো ছোটো সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এ নাটকের গাঁথুনি 'শর্মিষ্ঠা'র তুলনায় আঁটোসাঁটো। বিদূষকের সংলাপে কথ্য চলিতরীতির প্রয়োগে হাস্যরস সৃষ্টি, সংলাপ প্রয়োগে মধুসূদনের ক্রম-পরিণতির বিবর্তন সুস্পষ্ট করে—

বিদূ : ওলো তুই আবার কোতথেকে লো?
নেপথ্যে : কে লো?
বিদূ : তুই লো।
নেপথ্যে : তুই লো।
বিদূ : মর, তোর মুখে ছাই।
নেপথ্যে : মুখে ছাই।
বিদূ : কার মুখে লো? আমার মুখে কি তোর মুখে?
নেপথ্যে : তোর মুখে।
বিদূ : বাহবা! বাহবা!
নেপথ্যে : বোবা।
বিদূ : মর, গস্তানি, তুই আমাকে গাল দিস।
নেপথ্যে : ইস্
বিদূ : যা, এখন যা।
নেপথ্যে : আঃ
বিদূ : ও কি লো? তোর কি আমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না লো
নেপথ্যে : না লো।
বিদূ : দূর মাগী, তুই এখন গেলে বাঁচি।
নেপথ্যে : অ্যাঁ ছিঃ।
বিদূ : মাগীকে তাড়াবার কোন উপায়ই দেখি না।
নেপথ্যে : না।
বিদূ : বটে? তবে এই দেখ। (মুখাবৃত করিয়া শিলাতলে উপবেশন)[৩]

—প্রথম অঙ্ক

পর্বত প্রদেশে বিদূষকের ধ্বনি ও নেপথ্যে রাজা ইন্দ্রনীলের বিদূষকের শেষ ধ্বনি ধরে প্রতিধ্বনি নাটকে হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। বিদূষকের মুখে কথ্য চলিতে মেয়েলি ধরনের বাক্যবন্ধের ব্যবহার 'ও মাগী', 'লো', 'গস্তানি' ইত্যাদি মেয়েলি শব্দের ব্যবহার প্রচলিত সংলাপ রীতির মধ্যে অসঙ্গাতি তৈরি করেছে এবং এই অসংগতি থেকেই জন্ম নিয়েছে হাস্যরস।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকে এ ধরনের সিচ্যুয়েশন তৈরি করে হাস্যরস ও কথ্য চলিতের এত সাবলীল প্রয়োগ লক্ষ করা যায় না। তাই নাট্য সংলাপের দিক দিয়ে বিচার করলে 'পদ্মাবতী', 'শর্মিষ্ঠা'-র তুলনায় সাবলীল ও পরিণত নাটক। তবে এ নাটকে গ্রিক পুরাণের কাহিনি অবলম্বনে করলেও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। নাটকের শেষে সংগীত যোজনা এবং শেষ স্বস্তিবচন কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের সমাপ্তির ভরতবাক্যের আদর্শে রচিত।

১৮৬১ সালে মধুসূদন লিখলেন তাঁর শেষ পূর্ণাঙ্গ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'। নাটকের ভাষা আগের দুটি পূর্ণাঙ্গ সিরিয়াস নাটকের ভাষা থেকে আরও সহজ ও সাবলীল। 'পদ্মাবতী'-তে অমিত্রাক্ষর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও 'কৃষ্ণকুমারী'-তে সে পথ থেকে সরে এলেন। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে অমিত্রাক্ষর ব্যবহার না করার কারণ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। 'কৃষ্ণকুমারী'-তে সংগীত ছাড়া আর কোনো পদ্য ব্যবহার করা হয়নি। আদ্যন্ত গদ্যে লেখা নাটক। অলংকার ব্যবহারও আগের দুটি নাটকের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে কম। এ নাটকের নাট্যসংলাপে মানবীয় উপলব্ধি ও ট্র্যাজিক ভাবের প্রকাশে মধুসূদন অনেকখানি সফল হয়েছেন। মধুসূদনের সিরিয়াস নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যায় বেশ একটা জমাটি কাহিনি উপহার দিতে চেয়েছেন নাটককার। যদিও ধনদাস ও মদনিকার অতিসক্রিয়তায় এ নাটকের প্লট বেশ দুর্বল। তবুও দুই যুযুধান প্রতিপক্ষ শক্তির হাত থেকে রাজ্য ও পরিবারকে রক্ষা করার ধর্মসংকটে পড়ে ভাগ্য-বিড়ম্বিত রাজার ক্ষোভে, দুঃখে উন্মাদপ্রায় অবস্থার করুণ চিত্র পাঠকের মনে করুণা ও ভয় সঞ্চার করে। নিজের কন্যাকে হত্যা করার সিদ্ধান্তে হতাশা ও আত্মগ্লানিতে ভোগা রাজার অসংলগ্ন টুকরো টুকরো কথা, জিজ্ঞাসা, শব্দ ও ধ্বনিতে একাকার হয়ে গিয়ে হৃদয়স্পর্শী ট্র্যাজেডির রসকে ঘনীভূত করে।

রাজা। বলেন্দ্র! ছিঃ ভাই! এমন কর্মও করে। (গাত্রোত্থান করিতে করিতে) কর কি, কর কি না,—না, নানা,—মানসিংহ, মানসিংহ,মানসিংহ! হুঁঃ! তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চল্যেম। (কিঞ্চিৎ গমন) এই যে আমার কৃষ্ণা! কেন, মা কেন—মা একবার বীণাধ্বনি কর।—মা, একটি গান কর।—আহাহা—ঐ, ঐ, হা আমার কুল লক্ষী! তুমি কোথা গেলে! (রোদন)[৪] ৫/৩

রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি চরিত্রগুলি সাধারণ গড়পড়তা মানুষ থেকে অনেকটা দূরবর্তী এবং সময়কালের দিক থেকেও অনেকটা প্রাচীন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সংলাপে তৎকালীন মানুষের কথ্যরীতি ব্যবহার করা হয়নি। চলিত ভাষায় সংলাপ বলা হলেও শব্দ নির্বাচনে ও বাক্য গঠনের দিক থেকে মধুসূদন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেয়েছেন, যা খুবই স্বাভাবিক। রাজাও মন্ত্রীর সংলাপেও সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। রাজা ও মন্ত্রীর পারস্পরিক কথোপকথনে রাজা যেখানে প্রত্যক্ষ বাচনে direct speech কথা বলেছেন বা আমরা বলতে পারি কর্তৃবাচ্যের ব্যবহার করেছেন সেখানে মন্ত্রী যেহেতু তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী সেহেতু তাঁর বাচন অধিকাংশ সময়েই পরোক্ষ বাচন (Indirect speech) অথবা ভাববাচ্যে। রাজাকে পরামর্শ দানের

ক্ষেত্রেও মন্ত্রী প্রত্যক্ষ বাচন ব্যবহার না করে ভাববাচ্য ব্যবহার করেছেন এখানে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য সরাসরি ব্যবহারের পরিবর্তে ভাববাচ্যের ব্যবহার রাজার প্রতি বা কর্তার প্রতি সম্ভ্রমবশত।

রাজা : দেখ, মন্ত্রীবর, মহারাজ ভীমসিংহের কি কোন সন্তান সন্ততি আছে?
মন্ত্রী : আজ্ঞা, হাঁ আছে
রাজা : কয় পুত্র, কয় কন্যা, তা তুমি জান?
মন্ত্রী : আজ্ঞা, না, এই আশীর্বাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রুত আছে।
ধন : মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণা নাকি পরম সুন্দরী?
মন্ত্রী : লোকে বলে যে যাজ্ঞসেনী স্বয়ং পুনরায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েছেন![৫]

উপযুক্ত উদাহরণে আমরা দেখতে পাই রাজা প্রত্যক্ষ বচনে জিজ্ঞাসা করলেও মন্ত্রী পরোক্ষ বচনে তাঁর উত্তর দিচ্ছেন। অনুরূপভাবে রাজাকে কোনো বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনুজ্ঞাবাচক বাক্য, কর্তৃবাচ্যের পরিবর্তে ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হয়েছে—

রাজা : ...তা এখন এ বিষয়ে কি কর্তব্য, বল দেখি?
মন্ত্রী : আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।
রাজা : ...মন্ত্রী, তুমি যে আমাকে আপন পরিচয় দিতে আরম্ভ কল্যে?
মন্ত্রী : আজ্ঞা, তা নয়। তবে কিনা আমার পরামর্শে এ বিষম কাণ্ডে সহসা প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না।[৬]

মন্ত্রী রাজার তুলনায় বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও রাজার পদমর্যাদার প্রতি স্বাভাবিক সম্মানবশত প্রত্যক্ষ বাচনে পরামর্শ না রেখে পরোক্ষ বাচনে রেখে, নিজের উপদেশকে চাপিয়ে না দিয়ে রাজার বিবেচনাকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। এ নাটকের সংলাপের এটি একটি উল্লেখযোগ্য গুণগত দিক।

স্ত্রী চরিত্রের সংলাপ রচনায় মধুসূদন এই নাটকে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। বারাঙ্গনা বিলাসবতী ও তার সখী মদনিকার সংলাপ নারীসুলভ লৌকিক ভাষা সমৃদ্ধ।

বিলা।...ওলো মদনিকে, একবার দেখত ভাই, আমার মুখখানা আজ আরসিতে কেমন দেখাচ্যে?

মদ। আহা, ভাই, যেন একটি কনকপদ্ম বিমল সরোবরে ফুটে রয়েছে! তা ও সব মরুক গে যাক!

বিলা। কি, ভাই? মহারাজ বুঝি আসচেন?

মদ। আর মহারাজ! মহারাজ কি আর তোমার আছেন যে আসবেন?

বিলা। কেন? কেন? সে কি কথা কি হয়েছে, শুনি—

মদ। আর শুনবে কি? ঐ যে ধনদাস দেখচো, ওকে তো তুমি ভালো করে চেন না। ও পোড়ার-মুখোর মতন বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর দুটি আছে?[৭] ১/২

অন্যদিকে ভীমসিংহের স্ত্রী রানী অহল্যাদেবী, কৃষ্ণকুমারী ও তপস্বিনী প্রভৃতি রাজপরিবারের নারীদের সংলাপ কথ্যরীতিবর্জিত, তৎসম শব্দবহুল, মার্জিত রাজঅন্তঃপুরের ভাষা। রাজপুরুষদের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার বিশেষ পার্থক্য নেই। এমনকি মদনিকা যখন ভীমসিংহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে মানসিংহের দূতীরূপে বা পুরুষ বেশ ধারণ করেছে তখন তার সংলাপেও রাজ ভাষার স্ট্যাম্প পড়েছে। সেখানে নারীসুলভ কথ্যরীতি অনুপস্থিত। দূতী হিসেবে ও পুরুষ বেশে মদনিকার সংলাপ বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্যের যুগল মিলন। তবে মদনিকার সংলাপে

বুদ্ধি ও কৌশলের মিশেল থাকলেও মাঝে মাঝে তার কর্মক্ষমতা অতিনাটকীয় ঠেকে। একজন সামান্য বারবনিতার সহযোগীর মুহুর্মুহু ছদ্মবেশ ধারণ, ছদ্মবেশে রাজঅন্তঃপুরে অবলীলায় প্রবেশ করে সকলের চোখে ধুলো দেওয়া, এককথায় প্রায় সব চরিত্রকে কৌশলে পরাস্ত করে এককভাবে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করা নাট্যসংহতিকে ক্ষুণ্ণ করেছে ও প্লটকে দুর্বল করেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) নাটকে তৎকালীন বাংলার নব্য ইংরেজি শিক্ষিত বাবু সম্প্রদায়ের সভ্যতার নামে মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি, অশ্লীল আচরণকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করা হয়েছে। কালীনাথ, নবকুমার ও বাবুদলের সংলাপে ইংরেজি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ইংরেজি ভাষা ও শব্দের প্রতি অন্ধ আনুগত্য কতদূর যেতে পারে তা নবকুমারের একটি সংলাপ-শৃঙ্খল থেকেই পরিষ্কার হয়?

নব। বসো, ভাই সকলে বসো (সকলের উপবেশন) দেখ ভাই, আজ আমাদের এক্সকিউজ কর্তে হবে, আমাদের একটু কর্ম ছিল বলে তাই আসতে দেরি হয়ে গেচে।

শিবু। (প্রমত্তভাবে) দ্যাটস এ লাই।

নব। (ক্রুদ্ধভাবে) হোয়াট, তুমি আমাকে লাইয়র বল? তুমি জান না আমি তোমাকে এখনি শুট করবো?

চৈতন। (নব কে ধরিয়া বসাইয়া) হাঃ যেতে দেও, যেতে দেও, একটা ট্রাইফ্লিং কথা নিয়ে মিছে ঝকড়া কেন?

নব। ট্রাইফ্লিং! ও আমাকে লাইয়র বললে আবার ট্রাইফ্লিং? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্লে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললে না কেন? তাতে কোন শালা রাগতো কিন্তু লাইয়র এ কি বরদাস্ত হয়?[৮]

নবকুমারের এই শেষতম সংলাপ প্রমাণ করে তৎকালীন নব্য ইংরেজিশিক্ষিত বাবুদের বাংলা ভাষার প্রতি তীব্র উন্নাসিকতা এবং অন্ধ ইংরেজি আনুগত্য। এ-নাটকের মঞ্চনির্দেশের ক্রিয়াপদে সাধুভাষা ব্যবহৃত হলেও সংলাপে সর্বত্র কথ্য চলিতের ব্যবহার হয়েছে। চরিত্র অনুযায়ী ভাষা-সংলাপের ব্যবহারে নাটককার মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। নব্য ইংরেজিশিক্ষিত বাবুদের সংলাপ নিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে, বাকি চরিত্রগুলির মধ্যে বৈষ্ণব কর্তামহাশয়ের সংলাপ চলিতরীতির হলেও তৎসম শব্দবহুল, আর বাবাজীর সংলাপে কিছুটা মেয়েলি ঢঙের পরিচয় পাওয়া যায়। বাবাজীর সম্বোধন অন্য পুরুষ চরিত্র থেকে তাকে কিছুটা স্বতন্ত্র করেছে, বাবাজীর কয়েকটি সংলাপের দিকে লক্ষ করা যেতে পারে—

বাবাজী। ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার বাড়ী?[৯]

বাবাজী। কি সর্বনাশ! বেটা কি পাষণ্ড গা...?[১০]

বাবাজী। (স্বগত) কি বিপদ! রাধে কৃষ্ণ! (প্রকাশে) না বাছা, তোমরা যাও, আমার ঘাট হয়েছে।[১১]

এছাড়াও বাবাজীর সংলাপে ক্রিয়াপদে 'লাম' এর পরিবর্তে 'লেম'-এর ব্যবহার 'না'-এর পরিবর্তে 'নে'-এর ব্যবহার করেছেন। যেমন হলেম, করিনে, পড়লেম, জানিনে, চাইনে ইত্যাদি। সম্ভবত তাঁর একনিষ্ঠ বৈষ্ণবীয় ধর্ম নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ রেখে তাঁর মুখে এই ধরনের সংলাপ বসানো হয়েছে।

ইংরেজ সার্জেনের মুখে হিন্দুস্থানি ও ইংরেজি মিশিয়ে বাক্য ব্যবহার এবং 'ত' স্থলে 'ট', 'থ' স্থলে 'ঠ', 'দ' স্থলে 'ড' উচ্চারণ, ইংরেজ সাহেবদের দেশীয়(বাংলা) ভাষার নির্দিষ্ট উচ্চারণরীতিকে স্পষ্ট করে—দেখে > ডেকে, থানেমে > ঠানেমে, তোম > টোম, আলবৎ > আলবট, মাংতা > মাংটা, দেখতা > ডেকটা, দেও > ডেও, চৌকিদার > চৌকিডার, বাত > বাট প্রভৃতি।

মহিলাদের অন্দরমহলে তাস খেলার বিনোদনে তাসের সঙ্গে জড়িত শব্দবন্ধগুলো মহিলাদের নিজস্ব জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া উনিশ শতকের বাঙালি উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের নারীদের স্বাভাবিক কথোপকথন ও সম্বোধন উঠে এসেছে নাটকের সংলাপে। নাটকের সংলাপ ছোটো ও টানটান। প্রহসন হিসেবে সংলাপে হাস্যরসের উপাদান আছে প্রচুর। বাবাজীকে কেন্দ্র করে, কালীনাথের সন্তান সাজাকে কেন্দ্র করে, নবকুমারদের মাতাল অবস্থায় অদ্ভুত আচরণকে কেন্দ্র করে সংলাপে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। কর্তা মহাশয়ের জিজ্ঞাসায় মাতাল কালীনাথ যখন 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'-কে 'শ্রীমতি ভগবতীর গীত' এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-কে ব্যোপদেবের 'বিন্দাদূতী' নামে বিকৃত উচ্চারণ করেছে তখন সেই বিকৃতি সংলাপে নির্মল কৌতুকরসের সৃজন ঘটিয়েছে।

গ্রামীণ হিন্দু জমিদারের লাম্পট্য ও ধর্মীয় ভণ্ডামিকে কটাক্ষ করে 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'(১৮৬০) নাটকটি লেখা হয়েছে। এই নাটকে গ্রামীণ হিন্দু বৃদ্ধ জমিদার ভক্তপ্রসাদ বাবু জনৈক চাষি হানিফ গাজীর বউ ফতেমার উপর কুদৃষ্টি দিয়েছেন এবং ছলেবলে অর্থের লোভ দেখিয়ে ফতেমাকে ভোগ করার বাসনায় গদাধর ও পুঁটিকে নিয়ে পরিকল্পনা সাজিয়েছেন। কিন্তু হানিফ গাজী ও পঞ্চানন বাচস্পতির উপস্থিত বুদ্ধিমত্তায় শেষপর্যন্ত ভক্তপ্রসাদের ষড়যন্ত্র ও কুকর্ম হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে এবং ভক্তপ্রসাদ তাঁর কৃতকর্মের সমুচিত শাস্তি পেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

প্রহসন হিসেবে এ-নাটক টানটান উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। ছোটো ছোটো সংলাপে ঘটনার আকস্মিকতা, পরিকল্পনা, ষড়যন্ত্র ও ভণ্ডের নাকাল হওয়াকে কেন্দ্র করে একটি চমৎকার সুসংহত রচনা এই নাটক। নাটকটি আগাগোড়া কথ্য চলিত ভাষায় লেখা। সাধুরীতি সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছে। ছোটো ছোটো সংলাপ নাটকটিকে টানটান রেখেছে। নাটকটির পটভূমি যেহেতু গ্রামীণ তাই আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও সম্ভবত দর্শক ও পাঠকদের বোধগম্যতার কথা খেয়াল রেখে নাটককার মধুসূদন কোথাও কোথাও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করলেও সার্বিকভাবে নির্দিষ্ট প্রত্যন্ত আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করেননি এই নাটকে।

মুখ্যত রাঢ়ী উপভাষার উপর নির্ভর করেই নাটকটি রচিত। আসচেন, হয়েচেন, হচ্যেন, বলচি, দেখচি, আসতেচে—এই জাতীয় ক্রিয়াপদের অন্ত্যব্যঞ্জনের অল্পপ্রাণতা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য। নগর কলকাতার প্রেক্ষাপটে রচিত 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নাটকেও রাঢ়ী উপভাষার সার্থক ব্যবহার হয়েছে। নাটকে ছটি পুরুষ চরিত্র ও চারটি নারী চরিত্র আছে প্রত্যেকটি চরিত্রকেই টাইপ চরিত্র বলা যায়। পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে ভক্তপ্রসাদবাবু গ্রামীণ হিন্দু জমিদারের টাইপ, পঞ্চানন বাচস্পতি প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতের টাইপ, আনন্দবাবু কলকাতার শিক্ষিত বাবুর টাইপ, হানিফ গাজি দরিদ্র মুসলমান চাষির টাইপ, গদাধর ও রাম চাকরের

টাইপ, পুঁটি চাকরানী বা দাসীর টাইপ, ফতেমা মুসলমান গৃহিণীর টাইপ, ভগী ও পঞ্চী নিম্ন-মধ্যবিত্ত হিন্দু ঘরের নারীর টাইপ প্রভৃতি।

এই ছোট্ট নাটকে এতগুলি বিভিন্ন সামাজিক ভাষার কোড[১২] ব্যবহার করেছেন নাটককার। রাঢ়ী উপভাষার কথ্য চলিত হলেও প্রত্যেকের সংলাপেই নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থানের স্বাতন্ত্র্য আছে। ভক্তপ্রসাদবাবু গ্রামীণ হিন্দু জমিদার হলেও হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের প্রজা নিয়ে তাঁর কারবার এবং তিনি ইংরেজি শিক্ষিত নন, তাই তাঁর সংলাপে তৎসম, অর্ধ-তৎসম, দেশি, কথ্য ও আরবি-ফারসি শব্দ নির্দ্বিধায় ব্যবহৃত হয়েছে।

ভক্তপ্রসাদ যখন মুসলমান প্রজা হানিফের সাথে কথা বলেন তখন তাঁর সংলাপে আরবি-ফারসি, দেশি কথ্যশব্দের বাহুল্য। যখন স্বগোতক্তি করেন তখন একদিকে যেমন পুরাণ অনুষঙ্গে তৎসম শব্দের বাহুল্য, অন্যদিকে দেশীয় শব্দের হুড়োহুড়ি। মুখ্যত স্ত্রীলোকের রূপ-ঐশ্বর্য বর্ণনায় মহাভারতের আশ্রয় নিচ্ছেন আবার প্রবৃত্তির প্রকাশে কথ্য শব্দের কদর্য হুড়োহুড়ি দেখা যাচ্ছে। সংলাপে এভাবে বিভিন্ন কোডের মিশ্রণ ঘটেছে (code mixing)। আঞ্চলিকতার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য মিশে গেছে মান্য চলিতের সঙ্গে। ভক্তপ্রসাদের স্বগতোক্তিগুলি তাঁর চরিত্রের ভণ্ডামি, কামুকতা ও নীচ প্রবৃত্তিকে স্পষ্ট করে। ভক্তপ্রসাদের চরিত্র বোঝার জন্য স্বগতোক্তিগুলিই যথেষ্ট।

ভক্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা কি আজ আর ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পঞ্চী ছুঁড়ীকে পাওয়া দুষ্কর, কি দুঃখের বিষয়! এমন কনক-পদ্মটি তুলতে পাললেম না হে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় করে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হল্যেন। যা হউক, এখন যে হানফের মাগটাকে পাওয়া গেছে এও একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নব যৌবন মদে একেবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে যৌবনে কুক্কুরীও ধন্য![১৩]

আবার যখন পণ্ডিত বাচস্পতি এবং ইংরেজি-শিক্ষিত আনন্দবাবুর সঙ্গে সংলাপ বিনিময় করেন তখন ভক্তপ্রসাদের সংলাপে তৎসম শব্দের প্রয়োগ অনেক বেশি। দু-একটি আরবি-ফারসি শব্দ ছাড়া প্রায় পুরো সংলাপ জুড়ে শিষ্ট ভাষা শিষ্ট ঢঙে ব্যবহারের প্রতি ঝোঁক লক্ষ করা যায়। বাচস্পতির সঙ্গে সংলাপে ভক্তপ্রসাদের কৃপণতা ও স্বার্থপর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং আনন্দবাবুর সঙ্গে সংলাপে পুত্র সম্পর্কে উৎসুক পিতা ও হিন্দুয়ানির মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও ভক্তপ্রসাদের কর্মে ও কথায় কোনো সাদৃশ্য খুঁজতে যাওয়া বৃথা, ভৃত্য গদার সংলাপে তা পরিষ্কার—

গদা। (স্বগত) নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়ে নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বাঃ! কত্তাবাবুর কি বুদ্ধি![১৪]

ভক্তপ্রসাদ এ নাটকের প্রধান নেতিবাচক চরিত্র। তিনি অর্থবান জমিদার। কৃপণতা তাঁর স্বভাবজাত। বৈষ্ণবীয় মালা ধারণ করে তিনি সমাজের উপরের স্তরে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। অন্যদিকে ভিতরে ভিতরে নারীলোলুপ একজন লম্পট। মানুষকে অর্থগতভাবে ঠকানো যেমন তার পেশা তেমনি নারীদের সম্মান ইজ্জত নষ্ট করা তার নেশা। সুতরাং চরিত্রটি বৈচিত্র্যময় ফলে তার সংলাপও বিচিত্র গামী। নাটকের শুরুতে হানিফ গাজীর সালামের প্রত্যুত্তরে ভক্ত প্রসাদের সম্বোধন ও বিশেষণ প্রয়োগ একদিকে তার জমিদারি ঔদ্ধত্য (বিত্তবানের বিত্তহীনের

প্রতি আচরণ) ও অন্যদিকে শ্রেণির ভিত্তিতে বিভক্ত সমাজে উচ্চবর্ণের নিম্নবর্ণের প্রতি সংলাপ প্রয়োগের দৃষ্টান্তকে তুলে ধরে।

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি!

ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হ্যারে হানফে, তুই ব্যাটা তো ভারি বজ্জাত। তুই খাজনা দিস নে কেন রে, বলতো (মালা জপন)[১৫]

অন্যদিকে আবার নাটকের শেষে এই ভক্তপ্রসাদ যখন হানিফের কাছে ধরা পড়েছে তখন হানিফ গাজীকে 'বাবা' সম্বোধন, বিকৃতিহীন নাম উচ্চারণ ও 'তুই' সর্বনামের 'তুমি'-তে উত্তরণ ভক্তপ্রসাদ চরিত্রের দ্বিচারিতা ও ভণ্ডামীর ছবিটি পাঠক ও দর্শকদের সামনে স্পষ্ট হয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেমনি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি আর কেন এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতে ও রাজি আছি, কিন্তু বাপু এ কথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি![১৬]

উচ্চাবস্থ (superiors) নিম্নাবস্থকে (inferiors) 'তুই' সম্বোধন করবে এটাই স্বাভাবিক তথাপি ভক্তপ্রসাদ হানিফ গাজীর কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়ায় ক্ষমতার কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত হয়েছে এবং বিপাকে পড়া ভক্তপ্রসাদ হানিফ গাজীকে 'তুই'-এর পরিবর্তে 'তুমি' সম্বোধন করেছে। এখানে পরিস্থিতির কারণে স্বাভাবিক সম্বোধন বিপর্যস্ত হয়েছে। সুতরাং সবসময় যে দুই ব্যক্তির মধ্যে একই সম্বোধন থাকবে তা বলা যায়না। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কখনো কখনো তা পালটে যেতেও পারে। ক্ষমতা ও সর্বনাম ব্যবহারের এই পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বিশদ আলোচনার জন্য ব্রাউন এবং গিলম্যানের 'The Pronouns of Power and Solidarity' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।[১৭]

ধর্মগত বিদ্বেষমূলক মনোভাবও ভক্তপ্রসাদের সংলাপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দরিদ্র মুসলমান প্রজা সম্পর্কে অর্থবান জমিদারের ধর্ম-বিদ্বেষমূলক মনোভাব সময়ের মানসিকতাটি স্পষ্ট ধরিয়ে দেয়। কথায় বলে 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়', ভক্তপ্রসাদের আজ্ঞাবহ পুঁটির সংলাপেও একই রকম অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ লক্ষ করা যায় কিন্তু বাচস্পতির সংলাপে এই জাতীয় কোনো বৈশিষ্ট্য নেই সুতরাং বলা যেতে পারে মধুসূদন খুব সচেতনভাবেই নেতিবাচক চরিত্রে তথা অপ্রিয় চরিত্রগুলির মুখে ধর্মবিদ্বেষ রাখতে চেয়েছিলেন।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভকভক করে বেরোয় তা মনে হল্যে বমি এসে।

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো[১৮]

পুটির ধর্ম বিদ্বেষ মূলক সংলাপ

পুঁটি।...আমাদের যত লাজ তোর তো তত নয়। আমরা হল্যেম হিঁদু, তুই হলি নেড়েদে'র মেয়ে, তোদের তো আর কুলমান নাই, তোরা রাঁড় হল্যে আবার বিয়ে করিস।[১৯]

নাটকটিতে ভক্তপ্রসাদবাবুর বিপ্রতীপে ইতিবাচক চরিত্র হিসেবে হানিফ গাজীকে লক্ষ করা যায়। হানিফ গাজী দরিদ্র মুসলমান প্রজা। তাঁর সংলাপে মুসলিম জাতির নিজস্ব ভাষা-কোড অসাধারণ দক্ষতায় ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ধর্মীয় অনুষঙ্গমূলক শব্দ

চরিত্রটিকে জীবন্ত করেছে। হানিফের সংলাপে ব্যবহৃত এই জাতীয় শব্দের একটি তালিকা করলে সহজেই বোঝা যায় মধুসূদন মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ ভাষা ব্যবহার কতটা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ও প্রয়োগ করেছেন—

পিরির(পির), খোদাতালার মর্জি, ছিন্নি, হা আল্লা, সালাম, ওয়াকিফ, বন্দা, মেহেরবানি, দোয়াই, আল্লাতালা, হারামজাদা, বিচে, এনছাফ, কাফের, মকদুর, নওয়াব, কসবগিরি, শালা, গস্তানী, ইজ্জত, ইয়াদ, সমঝে, থোড়া, বাৎচিত, লেকিন, বিবি, বেইজ্জৎ, দোসরা, ঠ্যাকনা, লহু, নিসপিস, গোসা, আখেরে, তল্লাস, টুঁড়তি টুঁড়তি, তজদি, তোবা তোবা, নাড়্যে প্রভৃতি।

হানিফের সংলাপে অর্ধ-তৎসম শব্দের ব্যবহার ও ব্যাপক ধ্বনিপরিবর্তন তার শিক্ষাগত ও শ্রেণিগত পিছিয়ে পড়া অবস্থানকে স্পষ্ট করে কিন্তু তা সত্ত্বেও হানিফ গাজী এই নাটকের প্রোটাগনিস্ট চরিত্র। স্ত্রীর উপর হওয়া এই অপমানে তার ক্ষোভ সংগত ও স্বাভাবিক। এবং তার প্রকাশও খুব বাস্তবসম্মত। তবে নাটকের শেষেও কর্তাবাবুকে সেলাম জানিয়ে তার সংলাপ উপস্থাপন আমাদের ভাবিয়ে তোলে। নাটকের শুরুতে জমিদারকে সেলাম করা স্বাভাবিক হলেও নাটকের শেষে এতকিছুর পরও হানিফের কর্তাবাবুকে সেলাম করার মধ্য দিয়ে শ্রেণিগত অবস্থানের পার্থক্য ও নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রান্তিক অবস্থানের অসহায়তার ছবিটি চোখে পড়ে। শত অত্যাচার করলেও জমিদারকে সেলামের রীতিটি হানিফের মত সাধারণ দরিদ্র কৃষক-প্রজার মনে আমূল গেঁথে দেওয়া হয়েছে তা সে ভোলে কী করে?

শ্রেণিবিভক্ত সমাজের শ্রেণিবৈষম্যের এই নগ্ন রূপটি অসাধারণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নাটককার। অর্থের বিনিময় গরিবের ইজ্জত কিনতে চাওয়া লম্পট জমিদারের মুখে কৃষক প্রজার থাপ্পড় বেশ জোরেই বেজে ছিল সেদিন তাই তো প্রায় কোনো শখের থিয়েটারে এই নাটকটি মঞ্চ পায়নি। একে বর্ণহিন্দু তাই জমিদার তাই অর্থবান তাই লম্পট ও মুসলিম বিদ্বেষীএসবের সমাহারে মধুসূদনের এই নাটক নিশ্চিতভাবেই তৎকালীন থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকদের চটিয়ে দিয়েছিল তাই সমকালে প্রায় কোনও কদর পায়নি এই অসামান্য দিকনির্দেশক প্রহসনটি।

হানিফ গাজীর স্ত্রী ফতেমার সংলাপেও আরবি-ফারসি শব্দ ও মুসলমান ধর্মের নিজস্ব শব্দের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। তাছাড়া অর্ধ-তৎসম শব্দ ও ধ্বনিপরিবর্তনের নিদর্শনও প্রচুর। দাসীর পরিবর্তে বাঁদী, ভাগ্যর পরিবর্তে নসিব, যুবকের পরিবর্তে জওয়ান, স্বামীর পরিবর্তে খসম ও আদমি, খাবারের পরিবর্তে খানা শব্দের ব্যবহারে মুসলিম পরিবারের গৃহ জীবনের ছবি তথা ধর্মীয় ভাষার কোডটি বাস্তবসম্মতভাবে ফুটে উঠেছে। এর আগে বাংলা নাটকে মুসলিম গৃহ জীবনে ব্যবহৃত শব্দাবলীর এত প্রাচুর্য কোনও নাটককারের কলমে উঠে আসেনি।

ভক্তপ্রসাদের স্নেহধন্য মেয়ে-টাউট পুঁটি চরিত্রটিও তাঁর সংলাপের গুণে আকর্ষণীয়। একদিকে ভক্তপ্রসাদের নিষ্ঠার প্রতি কটাক্ষ ও ঘৃণা অন্যদিকে সুকৌশলে কেবলমাত্র টাকার জন্য অন্য স্ত্রীদের চরিত্র নষ্ট করার পরিকল্পনা ও রূপায়ণ চরিত্রটিকে মহিলা খলনায়িকার মর্যাদা দিয়েছে।

উৎসের সন্ধানে

১. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত : মধুসূদন দত্ত 'মধুসূদন রচনাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৮৬
২. তদেব : দ্রষ্টব্য ভূমিকা অংশ মধুসূদন দত্তের 'জীবনকথা', পৃ. ৫৬
৩. তদেব : পৃ. ২৬৯-২৭০
৪. তদেব : পৃ. ৩৩৮
৫. তদেব : পৃ. ২৯৯
৬. তদেব : পৃ. ৩২৩-৩২৪
৭. তদেব : পৃ. ৩০১
৮. তদেব : পৃ. ২৪৭
৯. তদেব : পৃ. ২৪২
১০. তদেব : পৃ. ২৪২
১১. তদেব : পৃ. ২৪২
১২. Code'An arbitrary, pre-arranged set of signals', H.A Gleason, 'An introduction to descriptive linguistics' Holt, Rinehart and Winston of Canada Ltd, Revised Edition, January 1, 1961, P. 374
১৩. উৎস-১, পৃ. ২৫৯
১৪. তদেব : পৃ. ২৬০
১৫. তদেব : পৃ. ২৫৩
১৬. তদেব : পৃ. ২৬৪
১৭. R. Brown, A. Gilman, 'The pronouns of power and solidarity', In Sebeok T.A(ed), style in language, Cambridge, MIT press, 1960, P. 253-276
১৮. উৎস-১, পৃ.২৫৪
১৯. তদেব : পৃ. ২৫৭

রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ : প্রান্তজন

সন্দীপ বর

প্রাচীনকাল থেকে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অস্তিত্ব যেমন ঐতিহাসিক সত্য রূপে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে, তেমনি আবহমান কাল ধরে ভারতের জীবনধারার গতিপ্রকৃতি দেশ ও মাটির সঙ্গে মিশে নদীর প্রবহমান ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে বন্ধন সম্পৃক্ত। সামাজিক ক্ষমতার কাছে পরাজিত হয়ে একটি শ্রেণি শোষিত পদদলিত অপাংক্তেয় পতিত রূপে চিহ্নিত বঞ্চিত ও অবহেলিত হয়। এরাই সময়ে সাধারণ ব্রাত্য, অন্ত্যজ, প্রান্তিক বলে অভিহিত হয়। এরা আর্থসামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ। এদের পিছিয়ে পড়ার পিছনে আছে বর্ণগত বৈষম্য ও অর্থনৈতিক শ্রেণি বৈষম্য। এই বিসমতা নিয়ে যুগ যুগ ধরে উঁচু-নিচুর সমবায়ে ধনতন্ত্রের যে ইমারত গড়ে তোলা হয় তার একদম নিচের তলায় থাকে অন্ত্যজশ্রেণি যাদেরকে নিম্নবর্গ বা প্রান্তজন বলে আখ্যায়িত করা হয়। এরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্থবির। আজও এদের উত্তরণ নেই। এরা পরিত্যক্ত, স্বীকৃতিহীন, ব্রাত্য অন্ত্যজ, প্রান্তিক। সমাজের তথাকথিত সভ্যতাদর্পী উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছ থেকে কোনো না কোনো ভাবে এক অজানা কারণে এরা আজও বিভিন্ন। আর এই বিচ্ছিন্নভাবে সমাজের অধিকার বঞ্চিত অপাংক্তেয়, ব্রাত্য, পতিত প্রান্তজন হয়ে কতদিন এদের থাকতে হবে তার কোনো উত্তর নেই। ইতালির কমিউনিস্ট নেতা দার্শনিক আন্তেনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) ‘সাবলটার্ন’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় আধিপত্যবাদ এক শ্রেণির মানুষকে সমাজের উঁচুতে স্থান দেয়, আর একশ্রেণির মানুষকে সমাজে সর্বনিম্নে স্থান দেয়। আর এই সমাজে সর্বনিম্নে থাকা মানুষদেরকেই নিম্নবর্গ বা প্রান্তজন বলে অভিহিত করা হয়। সুতরাং নিম্নবর্গ, অন্ত্যজ বা প্রান্তজন ইতাদি শব্দগুলির মধ্যে কোথাও যেন লুকিয়ে আছে একটা পরাধীনতার জ্বালা, যা একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক চেতনাকে স্তম্ভিত করে দেয়।

সাহিত্যকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। নাটক সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রধান শাখা। নাটক হয় জীবনভাষ্য। জীবন বহু-ব্যাপক, রহস্যময়, দুর্জয়ে বিচিত্র তার প্রকাশ, অদ্ভুত তার আচরণ, শত সহস্র উপাদান ও বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং নানা শাস-প্রশাখায় তা পল্লবিত। নাটকে সেই জীবন প্রতিফলিত, চিত্রায়িত, রূপায়িত, বাস্তবায়িত। আর সেই কারণেই নাটক বিষয়ে পরিধি বহু ব্যাপক বিস্তৃত ও প্রসারিত। গবেষকের কাজ 'সমুদ্র মন্থনে অমৃত উদ্ধারে'র মতো। গবেষক তার অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে নাটক বিচার-বিশ্লেষণ করে কখনও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, কখন বা সমাজজীবনের পটভূমিতে। আমাদের আলোচ্য বিষয় "রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী : প্রান্তজন"-এ আমরা কতটা আলোকপাত করতে পারি সেটাই দেখার।

রবীন্দ্র নাট্য-দর্পণে শ্রেণিবিভক্ত সময়ের এক নিখুঁত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। দীর্ঘ আশি বছরের জীবনে রবীন্দ্রচেতনায় সমাজভাবনার ক্রমবিবর্তন ঘটেছে দেশ-কাল কিংবা মানবজীবনের নানান রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মানুষের ওপর থেকে কোনোদিন বিশ্বাস হারাননি বলেই মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি তাঁর অন্তরে চিরকাল প্রজ্বলিত ছিল। আজীবন ভূমির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রান্তিক মানুষদের সর্বহারা হওয়ার ইতিহাস কবির অজানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে আক্ষরিক অর্থে হয়তো 'সমাজতন্ত্রী অভিধায় ভূষিত করা যায় না, কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। ধনতন্ত্র অপেক্ষা সমাজতন্ত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে গভীর আকর্ষণ ছিল জীবনের শেষ লগ্নে এসে কবি রাশিয়ার চিঠিতে সেকথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন নানা জাতি-ধর্ম-ভাষা, পরিধান আচার-আচরণ সত্ত্বেও সেখানকার জাতীয় চেতনা ও সংহতি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যার গুরুভার লঘু করেছে। যা থেকে তিনি ভারতের সমস্যার স্বরূপ ও সমাধানের পথ খুঁজে পেলেন। এর পেছনে কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথের অধিকার সম্পর্কিত মানবিক ধারণা। তাঁর অধিকার চেতনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্তর থেকে বহুকেন্দ্রিকতার দিকে প্রসারিত। তাই স্বদেশ ও সমাজের তথাকথিত সাধারণ প্রান্তিক বা নিম্নবর্গ কৃষক-শ্রমিক বা অন্ত্যজ পতিতশ্রেণির প্রতি ছিল তাঁর সহমর্মিতা। তিনি জমিদার ছিলেন, তাই আপন জমিদারিতে (শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর) প্রান্তিক প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে দুঃসহ কষ্ট অনুভব করেন। 'ছিন্নপত্রাবলী'তে (১৮৯৩) এই সব প্রজাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করছেন। তিনি 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১১১ নম্বর পত্রে (২১ আগস্ট, ১৮৯৩) বলেছেন—

> আমার কাছে এই সমস্ত দুঃখপীড়িত অটল বিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন এক কোমল মাধুর্য আছে এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ সমাজের তথাকথিত অবহেলিত প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাধিকারের দিকেই আলোকপাত করতে চেয়েছেন। কেননা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন প্রজানুরঞ্জক আদর্শবান জমিদার প্রজাদের প্রতি তার অন্তরের সহানুভূতির অন্ত ছিল

না। তাঁর সমকালে তাঁর মতো এমন প্রজাহিতৈশী, প্রজাপালক দীনহীনের রক্ষক খুব কমই ছিল। সামাজিক বিপ্লব তথা রক্তপাতের বিষয়কে দূরে সরিয়ে রেখে ভালোবাসার বাণী উচ্চারণ তাঁর মতো জমিদারের মুখেই একমাত্র শোভা পায়। শিলাইদহে এসে তিনি অনুধাবন করেন জমিদার ও তার নায়ের গোমস্তা, সেরেস্তাদার মহাজনদের হাতে দরিদ্র প্রান্তিক মানুষদের হেনস্থা ও উৎপীড়নের ভয়াবহ রূপটি। তাই তিনি নেমে আসেন মাটির কাছের মানুষদের কাছে। দাঁড়ান তাদের পাশে। আর এখান থেকেই তিনি অতি দুঃখের সঙ্গে জমিদারদের জন্য হৃদয় পরিবর্তনের কথা বলেন। তিনি মানবিক আদর্শ ও নৈতিক দাবির উপর ভিত্তি করে সমাজ গঠনে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই এমন কথা বলতে পেরেছেন। এর থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ কতটা প্রান্তিক মানুষের প্রতি সহমর্মী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সাম্যবাদী আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হলেও কোনোদিন সশস্ত্র সংগ্রামে যেমন অংশ গ্রহণ করেননি তেমনি সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থনও করেননি। সত্য ও ন্যায় ধর্ম প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে তিনি এক অনাবিল শান্তি অহিংসবাদী আদর্শয়িত জগতের স্বপ্ন দেখে গেছেন। ফলে স্বাভাবিক নিয়মে রবীন্দ্র-নাটকে নিম্নবর্গরূপে চিহ্নিত কৃষক, শ্রমিকসহ প্রান্তিক মানুষের কথা। বর্ণগত শ্রেণি বৈষম্য ও শোষণ বঞ্চনার চিত্রের পাশাপাশি জাতি ধর্ম ও বর্ণ ভিত্তিক অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে একাধিক নাটকে। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক শ্রেণি বৈষম্য ও শোষণ বঞ্চনা এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে কবি যেমন বলিষ্ঠ প্রতিবাদী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তার নাটকে তেমনি সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ-ব্রাত্য শ্রমজীবী প্রান্তজনের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' (১৯৯৬) নাটকে উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

বিশশতকের প্রথম দিকে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও উৎপীড়ন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে সমাজের নিচের তলার পতিতশ্রেণি তথা প্রান্তিক মানুষজন। সমাজের এই নিচেরতলার মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে আন্তরিক প্রীতি ও সুগভীর সহানুভূতিবোধ তা খুবই উল্লেখযোগ্য। সমাজের নানাশ্রেণির (অর্থনৈতিকভাবে নিচের তলার মানুষ) মানুষ তাঁর নাটকে বিশিষ্ট চরিত্রের মর্যাদা লাভ করেছে। ধনীর কাছে দরিদ্র-সর্বহারাশ্রেণি চিরকাল অবাঞ্ছিত ও অবহেলিত। একদিন যারা গ্রামের ভূমিভিত্তিক প্রান্তিক কৃষক ছিল, তারা জমিদার-জোতদারদের অত্যাচার-শোষণে কৃষিজীবন ছেড়ে উৎখাত হয়ে শ্রমিকশ্রেণিতে পরিণত হয়। কিন্তু তাতেও শোষণের যে রূপ তার কোনো পরিবর্তন হয় না। বিরোধ বাধে শোষিত শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে শোষক ধনতান্ত্রিক মুনাফালোভীদের। আর এই বিরোধে শ্রমিকশ্রেণির জয় দেখানো হয়েছে 'রক্তকরবী' নাটকে।

'রক্তকরবী' নাটকে প্রবেশের পূর্বে আমাদের গুটিকতক ঘটনা উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অপূর্ণ থেকে যেতে পারে, তাই সেই দিকে একটু আলোকপাত করে নেওয়া যেতে পারে। 'রক্তকরবী' নাটকটি রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শিলং যান গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে। এখানেই তিনি অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শিলং ও বোম্বাই-এর কারখানার শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের দুরবস্থার কথা জানতে পারেন। এই সমস্ত নিপীড়িত শোষিত পতিত শ্রমিকদের কথার বাস্তব চিত্র এই নাটকে তিনি তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি আর একটি জিনিস রবীন্দ্রনাথকে ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়েছিল... রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা ভ্রমণে গিয়েছিলেন

(১৯২০-২১) এবং সেখানে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন; তা যেমন তিক্তকর তেমনি ভীতিময়। আমেরিকার ক্রমবর্ধমান আর্থিক সমৃদ্ধি এবং তার জন্য যে অভিনব শোষণ-প্রক্রিয়া, আর তার সাথে ধনতান্ত্রিকের শাসনের অহংকার ও ভয়াবহ রূপ যে মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই ধনতন্ত্রের দানবীয় লোভ ও সমাজব্যবস্থার কথাই ব্যক্ত কয়েছেন 'রক্তকরবী'-তে।

কৃষিজীবি মানুষের গোত্রান্তর ঘটার ফলে পরিণত হয়েছে শ্রমজীবীতে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দানবীয় লোভের টানেই' কৃষি প্রায় আত্মবিস্মৃত কৃষিজীবি মানুষ ধনতান্ত্রিক-পুঁজিবাদের উৎকট চাপে গ্রামের পর্ণকুটির ছেড়ে শ্রমিকে পরিণত হয়ে অতি জঘন্য নারকীয় পরিবেশ যুক্ত শ্রমিকপল্লিতে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। আর এরই সুস্পষ্ট চিত্র রয়েছে 'রক্তকরবী' নাটকে বর্ণিত যক্ষপুরীতে। শ্রমিকরা এই যক্ষপুরীতে সর্বরিক্ত ও সর্বহারা হয়ে যান্ত্রিক মানবতা বর্জিত নিষ্ঠুর জঘন্য পরিবেশে পশুর মতো বাস করতে বাধ্য হয়। এখানে একশ্রেণির মানুষের গুপ্তচর বৃত্তির কথাও প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এই নাটকে সুড়ঙ্গ খোদাইকর শিশুশ্রমিকেরও পরিচয় বিদ্যমান। নাটকের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই কিশোর শোষকের লাঞ্ছনা ও পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আর তাকে নন্দিনী সাবধানে পথচলার নির্দেশ দেয়। কিন্তু কিশোর একেবারে বেপরোয়া। শুধু কিশোর নয়, এই নাটকে খনির কুলিধাওয়া বিপ্লবের নেতৃত্ব নিতে এগিয়ে এসেছে শ্রমজীবি বিশু পাগল। আর অন্ধ সংস্কারে অবরুদ্ধ ফাগুলাল, চন্দ্রা, গোকুল প্রমুখ নিস্প্রাণ শ্রমিকদের মধ্যে প্রাণের উৎসাহ জাগিয়ে তোলার দায়িত্বে অবতীর্ণ হয়েছে নন্দিনী। নন্দিনী যেন শোষণের কালো আঁধারের মাঝে আনন্দ ও মুক্তির উজ্জ্বল ও সোনালি আলোকবিন্দু। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে সকলকে আলোকময় মুক্তির পথ দেখায়। তার সমস্ত কাজকর্মে জীবনজয়ের আনন্দ। তাই সে শোষণের পাষাণ আঁধার কারাগার ভেঙে ফেলতে সবাইকে উদ্‌বুদ্ধ করে। মুক্তির আশায় প্রকৃত সত্যবাণী উচ্চারণের ফলস্বরূপ বিশু হয়েছিল বন্দি। ফাগুলাল বন্দিশালা থেকে মুক্তির আশায় সোচ্চার। তাই চন্দ্রার প্রতি তার বলিষ্ঠ উচ্চারণ... 'চন্দ্রা, মিছে বকাবকি করে কী হবে। কারিগর পাড়া থেকে দলবল জুটিয়ে আনি। বন্দিশালা চুরমার করে ভাঙব।' অবশেষে একদিন যক্ষপুরী যায় ভেঙে এবং ক্ষমতার হয় ভুলণ্ঠিত। আসলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শাসকশ্রেণির শোষণ-বঞ্চনার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে ভীষণভাবে ব্যথিত করছিল। তিনি উপলব্ধি করছিলেন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এই অমানবিক শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে শুধুমাত্র প্রান্তিক বা নিম্নবর্গীয় কৃষককুলকে দিয়ে হবে না, প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণিকেও। তাই বলা যায় শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী ভূমিকাকে উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত নাটক 'রক্তকরবী' রচনা করেছিলেন। সেই কারণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শোষিত-নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদ সংগ্রামই হয়ে উঠেছে এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদ বিদ্রোহ ও সংঘাতের অনিবার্য পরিণতিতে যক্ষপুরীর কঠিন অর্গল ভেঙে ফেলার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পথের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। আর এই দিক দিয়ে 'রক্তকরবী'র পথ নির্দেশ রক্তের স্বাক্ষরে সমাজতন্ত্রেরই পথ নির্দেশ। আর এখানেই শোষণহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রির

ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে প্রান্তিক মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দরদী মনোভাবটি সুস্পষ্ট। 'রক্তকরবী' নাটকে রূপকের আড়ালে-প্রতীকের মাধ্যমে-সংকেতের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ যেন শ্রেণিদ্বন্দ্বের যথার্থ ব্যঞ্জনা আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কোনো দিনই সরাসরি বা প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু তার লেখনি কোথাও থেমে থাকেনি। যেখানেই প্রতিবাদের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছেন, সেখানেই তিনি কলম ধরেছেন। ধনতান্ত্রিকতা তার ব্যতিক্রম নয়। ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে 'রক্তকরবী'তে শ্রমিক-বিপ্লব দেখিয়েছেন। এতে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদকল্পে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অনুভব ও পথনির্দেশ রয়েছে। তার ধারণা ইতিহাসের নিয়মে কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের এই নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা একদিন নিজেই নিজেকে মারবে। মানুষের মনুষ্যত্ব, নৈতিক চরিত্র তার পশুসুলভ আচার-আচরণের উপর জয়ী হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাই বলেছেন—

> সেই ধ্বংসশাপগ্রস্থ ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের/অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে/মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করেছে;/এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না।/আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধুলানিবিড় আঁধি/ক্ষণকালের জন্য সূর্যকে পরভূত করে নিয়ে/তারপর নিজের দৌরাত্মের কোনো চিহ্ন/না রেখে চলে যায়, এসব তেমনি করেই/শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।' (পশ্চিম যাত্রীর ডায়রি)[১]

যদিও তিনি শুধুমাত্র শ্রমিক-জাগরণ এবং বিদ্রোহকেই ধনতন্ত্রের বিনাশের কারণ বলে কখনই অনুভব করেননি। ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক অপমৃত্যুকেও এর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। রক্তকরবীর খনি-শিল্পের রাজা তাই আর কেউ নয়, নিরাকার ধনতন্ত্রেরই ব্যক্তিরূপ। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় উত্তরোত্তর পুঞ্জীভূত ধনসঞ্চয় এমনতর জটিলতার সৃষ্টি করবে যে তা থেকে তার নিজেরই পরিত্রাণের পথ থাকবে না, আষ্টেপৃষ্টে জটিলতায় বাঁধা হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে। তবে এর সঙ্গে অবশ্য আবদ্ধ দাসত্বে পরিণত হওয়া প্রান্তিক মানুষদের আত্মশক্তি নিয়োগও নিশ্চিতভাবে যুক্ত থাকবে। কেননা তিনি নিষ্ঠুর অমানবিক ধনতন্ত্রকে অভিশাপ দিয়েছেন বারবার। তিনি যন্ত্র ও শিল্পের সমর্থক হলেও জনকল্যাণের জন্যই তা সীমিতভাবে যন্ত্রের সপক্ষতা করেছেন। খনির কুলি-ধাওড়ায় বিপ্লবের নেতৃত্ব করেছে 'রক্তকরবী'তে বিশুপাগল, যে আদতে প্রান্তিক মানুষ বা প্রান্তজনের প্রতিনিধি।

বিশু যথেষ্ট শিক্ষিত। সে ফাগুলাল গোলকদের মতো মূর্খ না। তবুও সর্দাররা তাকে সকলের সঙ্গে কোদাল চালানোর কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। এর পিছনে অবশ্য অন্য উদ্দেশ্য ছিল। জড়বাদী যক্ষপুরীর শোষণের কাজ চালানোর জন্য শোষিতদের মনের খবর জানা দরকার, আর এই মনের খবর জানার জন্য চরের কাজে লাগাতে চেয়েছিল সর্দাররা। আমরা এ কথা জানতে পারি ফাগুলালের কথা থেকে—

ফাগুলাল : আমাদের খবর নেবার জন্যে ওরা তোমাকে চর রেখেছিল।[২]

কিন্তু এ কাজে তাকে এনে সর্দাররা ভুল করেছিল। সে নীরস জড় যক্ষপুরীতে শান্ত অথচ দৃঢ় প্রতিবাদ। সেই যক্ষপুরীর স্বরূপ স্পষ্ট করে দেয়। একদিকে সে প্রতিবাদ করে সর্দারের কথার, অন্যদিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে থাকে শোষিত নিরীহ মানুষগুলোকে। বিশুর আচার-আচরণ কার্যকলাপ যক্ষপুরীর নিয়ম-নিষ্ঠার পরিপন্থী। তাই সর্দার তাকে বিষ নজরে দেখে। সর্দারের কথায় বিশু চুপ করে থাকে না। ফাগুলালকে সে তাই বুঝিয়ে দেয় কে তাদের মাথায় করে

রাখা সর্দারদের কানে পৌঁছেছে।—

বিশু : তোদের আদর পড়ে যেখানে সর্দারের দৃষ্টি পড়ে সেখানেই—সোনাব্যাঙ যতই মকমক শব্দে কোলাব্যাঙের অভ্যর্থনা করে, সেটা কানে গিয়ে পৌঁছয় বোড়া সাপের।[৩]

এই নাটকে বিশু যেমন প্রত্যক্ষভাবে প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে পারে, কিন্তু অধ্যাপক নামক চরিত্রটি সেভাবে পারে না। তার সহানুভূতি থাকে পরোক্ষভাবে বিশুদের বিপ্লবের দিকেই। সরাসরি বিশুর মতো বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে না পড়ার পিছনে কাজ করা তার জীবিকা। জীবিকার জন্য তাই অধ্যাপককে ধনতন্ত্রের সেবা করতে হয়। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে সে সমাজের স্বরূপ বোঝে এবং বিশ্লেষণ করতে পারে। মন থেকে মেনেও নেয়। ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক হওয়ার জন্য সে সর্বহারা শ্রেণির বিদ্রোহে যোগ দিতে পারে না। কিন্তু সহানুভূতি থাকে এই প্রান্তিক মানুষদের প্রতি। সে অনুভূতি-সম্পন্ন হৃদয়বান একজন মানুষ। রাজা, সদর বা মোড়লদের মতো তাই অধ্যাপক ভয়ংকর মানুষ নয়। সমাজের স্বরূপ অনুভব করতে পারে বলেই অধ্যাপকের কণ্ঠে শোনা যায়—

অধ্যাপক : উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ বা রাজা, কেউ বা ভিখিরি।[৪]

অধ্যাপকের এই কথা থেকেই বোঝা যায় যে, সে সমাজ সম্পর্কে কতটা অবগত। সে বোঝে সমাজে রাজা এবং ভিখিরি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারই সৃষ্টি। একথা জানা বা বোঝা সত্ত্বেও অধ্যাপক আপন জীবিকার স্বার্থে ধনতন্ত্রের সেবক বা স্তাবক বৃত্তি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে যে প্রান্তিক শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী আদর্শকে সমর্থন করে, তার পরিচয় পাওয়া যায় নন্দিনীর সঙ্গে কথোপকথনের ভিতর দিয়ে। অধ্যাপকের ভাষায়—

অধ্যাপক : আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি। তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে।[৫]

এর মধ্যে দিয়ে অধ্যাপকের মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। পরোক্ষভাবে সে বোঝাতে চায় আমি তোমাদের সমর্থক, কিন্তু জীবিকার তাগিদে সরাসরি তোমাদের সঙ্গ দিতে পারি না। আসলে এখানে নাট্যকার সুকৌশলে অধ্যাপকের মধ্যে দিয়ে সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমর্থন যে প্রান্তজনের ক্ষমতায়নের পক্ষে সেটাকে চিহ্নিত করে সমাজতন্ত্রের সমর্থনের বার্তা দিয়েছেন।

'রক্তকরবী' নাটকের সব থেকে আকর্ষণীয় এবং রহস্যময়ী চরিত্র হল নন্দিনী। নন্দিনী হল যক্ষপুরীর মধ্যে প্রাণের সঞ্চারক। এই নন্দিনী সম্পর্কে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিজেই অনেক কথা বলেছেন। যক্ষপুরীর মধ্যে তাল তাল সোনা তোলার নিরস কাজে আঘাত করার জন্য এই চরিত্রটির অবতারণা। এই কথাটি শোনা যায় নাট্যকারে কাছেই—

> জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে মাঝে অখাদ্য জাতের জলচর জীব আটকে পড়ে। তাঁদের দ্বারা পেট-ভরা বা ট্যাঁক ভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে বেড়ার আরালে থাকেন সেইটেকে এই মেয়ে এই মেয়ে টিকতে দেয় না বুঝি।[৬]

অদ্ভুত একটা জালের অন্তরালে রাজাকে থাকতে দেখে নন্দিনী ইচ্ছা প্রকাশ করে অধ্যাপকের কাছে—

নন্দিনী : তোমাদের ঐ সুড়ঙ্গের অন্ধকার-ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ঐ বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষকে উদ্ধার করি।[৭]

আসলে নাটকে দেখানো হয়েছে আকর্ষণজীবী অর্থাৎ ধনতন্ত্রের সঙ্গে কর্ষণজীবী বা সমজীবী প্রান্তিক মানুষের বিরোধ। আর নন্দিনী প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি। সে চায় সমস্ত শোষণ-বঞ্চনার অবসান। নন্দিনী যেন যক্ষপুরীর মধ্যে একচিলতে ফাগুনের বাতাস। যে বাতাসে সব জঞ্জাল উড়ে যাবে, মানুষ বাঁচবে আপন অধিকার বলে—নন্দিনী সেই বলের সঞ্চারক। সমাজকে সুস্থ করার উদ্দেশ্য নিয়েই তার আগমন। তাই তার মধ্যে কাজ করে এক অদ্ভুত প্রাণশক্তি, যা দিয়ে সে যক্ষপুরীর অন্ধকারের মধ্যে আলোর সঞ্চার করে। শোষিত মানুষ গুলোকে বাঁচার শক্তি জোগায়। সাধারণ মানুষ নয়, ধনতন্ত্রে প্রতিভূ রাজাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। দুর্দান্ত প্রতাপ অমিত শক্তিধর মকররাজও নন্দিনীর স্পর্শ পেতে চায়। নন্দিনীর চোখে মুখে প্রাণের লীলাসঙ্গো—রাজা সেই লীলায় ডুব দিতে চায়। আসলে নন্দিনীর প্রাণশক্তিতে রাজা বশীভূত হয়ে, সে-ও যেন জালের আবরণ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। কেননা ধনতন্ত্রের প্রতিভূ থেকে রাজার যেন মুক্তি খোঁজে—নন্দিনী যক্ষপুরীর আঁধার থেকে সেই মুক্তির চাবি।

যক্ষপুরীতে সকলে কাজ করলেও নন্দিনী ব্যতিক্রম। সে কোনো কাজ করে না বলে চন্দ্রা-গোকুলরা তাকে সন্দেহ করে। তাদের সাথে বিরোধ বাধে, তাদের অবিশ্বাস তুঙ্গে ওঠে। কিন্তু তাতেও নন্দিনী পিছুপা হয় না। সে জানে তার কি কাজ। নিজ কর্মে সে অবিচল। প্রাণহীন দানবীয় শক্তির প্রতি বিস্ময় আছে কিন্তু ভালোবাসা নেই। ধনতন্ত্রের দানবীয় শক্তির হাতের যন্ত্র সৌন্দর্যের লীলাভূমিকে ধ্বংস করে—নন্দিনী তারই বিরোধী। অসংখ্য নিরীহ অসহায় মানুষকে দলিত মথিত করে কেউ কেউ বড় হয়ে উঠেছে। নন্দিনী এইভাবে বড় হয়ে ওঠার রাক্ষসের তত্ত্বের বিরোধী। তার সংগ্রাম মনুষ্য সমাজ থেকে দূর করার জন্য।

নন্দিনী প্রাণশক্তি। সে বুঝতে পারে কোথায় প্রাণ আছে—তাকে তাই সে সহজেই টেনে আনতে পারে। প্রাণশক্তির টানেই বিশুর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা। বিশুকে সে বলে, তোমার-আমার মাঝখানে একখানা আকাশ বেঁচে আছে। রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণ বিশুকে বিচারশালায় ধরে নিয়ে গেলে নন্দিনী ঝলসে ওঠে। সর্দারের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার জন্য সে প্রস্তুত হয়। সে কাউকেই ভয় করে না। যক্ষপুরীর প্রধান সেনাপতির সাথে তার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল। শুধু সেনাপতি কেন, ধনতন্ত্রের প্রতিভূ মকররাজকেও সে ভয় করে না। দীপ্তকণ্ঠে নন্দিনী সবাইকে জানিয়ে দেয়, এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছে তারা ভয় করতে একদিন লজ্জা পাবে। রাজা তাকে ভয় দেখায়, পালিয়ে যেতে বলে। কিন্তু নন্দিনী পালিয়ে যাওয়ার পাত্রী নয়। সে দুর্জয়, দৃঢ়তার সাথে সে জানায়—

নন্দিনী : এই রইলুম দাঁড়িয়ে। কী করতে পারো করো।[৮]

প্রতি মুহূর্তে নন্দিনীর মধ্যে কাজ করেছে বদলার আগুন। বন্ধন মুক্তির নেশা। সে দেখেছে কিশোর রঞ্জনের মৃত্যু। তাই যখন বিশুকে সর্দাররা ধরে নিয়ে যায়, তখন তার বিদ্রোহীসত্তা আরও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে রাজাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে জয় করতে চায় মুক্তিকে। এই মুক্তি কেবল মাত্র নন্দিনীর নিজের একার নয়। এই মুক্তি তাদের সমস্ত প্রান্তজনের। নাটকের শেষে তাই দেখা যায় ক্লান্ত রাজাও তাল তাল জমানো সোনার খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। নন্দিনীর হাত থেকে সে রক্তকরবীর গুচ্ছ নিতে চায়। রাজার কণ্ঠে তাই শোনা যায় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মুক্তির বাণী—

রাজা : আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক তাতেই আমার মুক্তি।[৯]

শেষে তাই দেখা যায় ধনতন্ত্রের প্রতিভূ রাজাও মুক্তির জন্য কাতর হয়ে উঠেছে। আর এর মধ্যে দিয়ে শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষের জয় ঘোষিত হয়েছে। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ সাম্যবাদে বিশ্বাসী ও সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল বলেই সুকৌশলে শোষকের মুখ দিয়ে মুক্তি ঘোষণা করে শোষিতদের জয়গান গেয়েছেন। নাটকের শেষে তাই শোনা যায়—

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আ য় আ য় আয়
ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে
মরি হা য় হা য় হায়।[১০]

উৎসের সন্ধানে

১. ক্ষুদিরাম দাস : 'সমাজ : প্রগতি : রবীন্দ্রনাথ', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম (করুণা) সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ১৩৩
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রক্তকরবী', বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৩৮৮, পৃ. ৩৬
৩. তদেব : পৃ. ৩৭
৪. তদেব : পৃ. ১৩
৫. তদেব : পৃ. ৩৬
৬. সুজয় বসাক : 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী বহুমাত্রিক পাঠ'।, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১০ মার্চ, ২০১১, পৃ. ১৬০
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রক্তকরবী', বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৩৮৮, পৃ. ১৩
৮. তদেব : পৃ. ৬০
৯. তদেব : পৃ. ১০৭
১০. তদেব : পৃ. ১১৩

‘আলিবাবা’ নাটকে গানের ভূমিকা
বিবেকানন্দ পাল

‘গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে চিনি’ আধুনিক যুগের আগে সাহিত্য এবং সংগীত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। প্রায় সব দেশেই সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে পদ্যে, পরে গদ্যে। পৃথিবীতে প্রথম যে শব্দ সুরময়, তাল এবং লয় যুক্ত তা হল পদ্যে। পৃথিবীর তরলায়িত রূপ থেকে যখন কঠিন হচ্ছে তখন তার সংকোচনের অনুরণিত প্রকাশময় রূপ হল কবিতা বা সুর। তাই সাহিত্য সৃষ্টিতেও আমরা দেখি কবিতা বা সুরের প্রথম উৎপত্তি হয়েছে।

বাংলা ভাষা চিরদিনই গানকে নিয়ে চলে। নাটকের সঙ্গে গানের সংযোগ বহু পুরনো ব্যাপার। শেকসপিয়রের সময় থেকে বিশ শতকের নাট্যকারদের রচনায় গান একটি আনুষঙ্গিক বিষয়। ভারতবর্ষের মাটিতে যেসব নাটক জন্মেছে সেখানেও গান বাদ দিয়ে নাটক ভাবাই যায় না। বাংলা নাটকের সঙ্গেও গানের সংযোগ অনুরূপ। একেবারে আদিপর্ব থেকেই লক্ষ্য করা যায় এই সংযোগ। পরবর্তী সময়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন থেকে শুরু করে মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমূখ নাট্যকার গান বাদ দিয়ে নাটক লেখার কথা কল্পনাও করেননি।

বাংলা নাট্য সাহিত্যে গিরিশোত্তর যুগে মঞ্চাভিনয়ের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)। তার অজস্র নাটক রচনার সাফল্য শুধু সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, বিষয়বস্তু আঙ্গিক ও বৈচিত্র্যের অবদান সে সাফল্যকে উজ্জ্বলতর করেছে। নাটকগুলি পড়তে গিয়ে দেখা যায়, তাতে সমকালীন যুগ প্রভাব যেমন আছে তেমনি নাটকগুলি থেকে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পারা যায়। মূলত তিনি পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক ও গীতিনাট্য রচনা করেছেন।

আমাদের গীতি কাব্যের দেশে গীতকে বাদ দিয়ে নাটক হত না। গান ছাড়া নাটক আমাদের অনেকের কাছে বিরস বলে মনে হয়। এই সূত্র ধরে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সৃষ্টি করলেন অপেরা ধর্মী গীতিনাট্য 'আলিবাবা'। ১৮৯৭ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয় এবং ঐ বছরই ২০ নভেম্বর শনিবার প্রথম অভিনীত হলো ক্লাসিক থিয়েটারে। এই সংগীতবহুল নাটকটি অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করেছিলেন ক্লাসিকের কর্ণধার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। নাটকটি মঞ্চপযোগী করার জন্য তিনি কিছু কিছু পরিবর্তন করলেন। নতুন গানও সংযোজন করা হল। নাট্যকার নিজেই জানিয়েছেন, "অভিনয়ের উপযোগী করিবার জন্য তিনি এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন।" পরিমার্জিত গীতিনাট্যটির আংশিক রূপান্তর গিরিশচন্দ্রের হাতেই হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং প্রস্তাবনার গানটি লিখে দিয়েছিলেন। 'রঙ্গালয়ে নেপেন' প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র জানিয়েছেন, "রঙ্গালয়ের অভিনয়ওপযোগী পরিবর্তন করিয়া শ্রীমান অমরেন্দ্রনাথ পরিবর্তিত পান্ডুলিপি আমার নিকটে আনেন। আমার সামান্য সাহায্যও লন।"

বর্তমান প্রসঙ্গে আলিবাবা নাটকের উল্লেখযোগ্য গানগুলির প্রথম কয়েকটি লাইন উল্লেখ করে তারপর গানটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এখানে স্মরণীয়—

> গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না, সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহন মাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো—বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনিবর্চনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারেনা না গান তাহাই বলে।[১]

নাট্য সংলাপ যখন অচল হয়ে পড়ে তখন আমরা গান বা কবিতার আশ্রয় নিয়ে থাকি। দৃশ্যসজ্জায় অল্প সময়ে সব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে না, তখন গানের মধ্য দিয়ে তা সম্ভব হয়ে ওঠে। এখানেই গানের গুরুত্ব। সংলাপে যা ভাষ্যমান নয় তা গানের স্রোতে প্রবাহ পায়। একথা স্মরণে রেখে আলিবাবা নাটকের গানগুলি কতখানি নাটকীয় উদ্দেশ্য প্রকাশে সার্থক হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

আলিবাবা আরব্য উপন্যাসের আখ্যানকে ভিত্তি করে রচিত। আলিবাবার বিশাল অর্থ প্রাপ্তি নাটকের মূল আখ্যান। আর সেই আখ্যানকে রূপ দিতে নাটকীয়তা, সাসপেন্স, নাট্য বিরতি, নাট্য ঘটনা কে সংলাপের বিকল্প রূপে পরিবেশন, দীর্ঘ নাট্য ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত করার প্রয়াস,

ইত্যাদি ক্ষেত্রে গানগুলি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। নাটকটি তিনটি অঙ্কে বিন্যস্ত। এতে গানের সংখ্যা ৩৬। এতগুলি গানের ব্যবহার অবশ্যই তাৎপর্য রাখে। এটি অপেরাধর্মী নাটক। নাচ,গান হৈ-হুল্লোড়, রঙ্গাব্যঙ্গা, আশা-নৈরাশ্য, আনন্দ-বেদনা হল অপেরার বৈশিষ্ট্য এবং তা এখানে আছে। কিছু কিছু গানের সাথে নাচ যুক্ত হয়েছে। এত গান তবু নাট্য কাহিনি কোথাও দুর্বল, গতিহীন হয়নি বরং চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। দিনের পর দিন মঞ্চে সাফল্যের সাথে অভিনীত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গানের ব্যবহার স্বাভাবিক রীতি নীতি কে অনুসরণ করেছে। কখনো গানই হয়ে উঠেছে নাটক আবার নাটকেই হয়ে উঠেছে গান। গানগুলির প্রয়োগ ঘটেছে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে

পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী, কখনো গানগুলি ছোটো ছোটো পংক্তিতে তুলে ধরা হয়েছে, কোথাও একটি গান শেষ হতেই অন্য চরিত্র আরেকটি গান গেয়ে উঠেছে। নাটকের প্রস্তাবনায় একটি গান আছে—

> বাজে কাজে মিনসেকে আর যেতে দেব না।
> নিত্যি বনে পাঠিয়ে দেব, পরব কত, সোনা দানা।[২]

এতে মূল কাহিনির বীজ নিহিত আছে। প্রস্তাবনায় সাধারণত গদ্য ভাষার আশ্রয় নিয়ে নাটকের বক্তব্য বিষয়, উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়। এখানে গিরিশচন্দ্র রচিত একটি ছোটো গানের মধ্যে দিয়ে বক্তব্য বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। গানটি যে গেয়েছে তার উল্লেখ নেই। তবে গানটির বক্তব্য বিষয় থেকে বোঝা যায় গানটি আলিবাবার স্ত্রী ফতিমার গাওয়া গান। নাটক শেষও হয়েছে গানের মধ্যে দিয়ে। নাটকে সন্নিবেশিত গানগুলির মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য গানগুলির অবস্থান তিন অঙ্কে অর্থাৎ প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক এভাবে চিহ্নিত করে প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ করা হলো—

● **প্রথম অঙ্ক**

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গেয়ে ওঠা গানটি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল সেকালে লোকের মুখে মুখে শোনা যেত—"ছি ছি এত্তা জঞ্জাল/এত্তা বড়া বাড়ি এসমে এত্তা জঞ্জাল।।/হরদম লাগতা ঝাড়ু তববি অ্যায়সা হাল।।"[৩] কাসিমের গৃহপ্রাঙ্গানে মরজিনা এই গানটি গেয়ে উঠেছে। এই দৃশ্যে দুটি গান সন্নিবেশিত, অপরটি হল—"আয়া হুকুম বরদা/আয়া হুকুম বরদার।।/বড়ি কামপিয়ারা হরদম লেও ভরপুর কামদার।।"[৪]

গানটিতে কাসিম ও সাকিনার সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, ও কপটতার ছবি আছে। এত বড়ো বাড়ি মনের জঞ্জালে পরিপূর্ণ। এই গানটির পরেই নাট্যকারের একটি সংলাপ মরজিনার মুখে শোনা যায়, "আমি কি বেগম হতে পারি না" এই সংলাপ নাট্য কাহিনিতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। পরবর্তী ঘটনা পরম্পরায় দেখতে পাই মরজিনার বাদী জীবন থেকে বেগমে উত্তরণ নাট্য কাহিনিতে বিশেষত্ব এনেছে। নাটকটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ এর সংলাপ ও গানের মেলবন্ধন। যেখানে সংলাপ কৌতুক রস পরিবেশনে অনুকূল পথ খুঁজে পায়নি সংগীত এসে সংলাপের পাশে দাঁড়িয়েছে। আবার সংগীত যেখানে থেমে গেছে সংলাপ ঠিক ঠিক জায়গায় নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। পরবর্তী গানটি ফতিমার কণ্ঠে—"(ও মোর দিদি) কেনে ডাক দিছিস মোকে।/আমি কি ছাই আগুন পোষায় এ বিহানের ঝোঁকে।।"[৫]

সাকিনা ফতিমাকে ভোরবেলাতেই ডেকে পাঠায় তার কাছে কাঠ কেনার জন্য। ফতিমা তার মনের কথা গানটির মধ্যে দিয়ে জানিয়েছে। নিত্য রাত্রি বেলা তার স্বামীর কাঠ কেটে আনা, সকালে বিক্রি, তাতে দর কষাকষি। এসব মহাঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে সাংসারিক জীবন জীবন্তভাবে যেন ফুটে উঠেছে।

এরপর দেখতে পাই বন প্রান্তস্থ কুটিরে, যেখানে আলিবাবা ও হুসেনের উপস্থিতিতে বন্য বালকগণের কণ্ঠে গীত হয়েছে—"আয় রে ভাই কাঠ কাটিগে কটাকট।/নইলে বেত লাগাবে পটাপট।।"[৬] গানটিতে কাঠুরিয়াদের মিলিতভাবে কাঠ কাটার মধ্য দিয়ে যে গান

পরিবেশিত হয়েছে তাকে কাঠুরিয়াদের চারণগীতি বলা চলে। এই দৃশ্যেরই শেষে আবদালা মরজিনার গীত—

> আব। আয় বাঁদি তুই বেগম হবি,/খোয়াব দেখেছি,/আমি বাদশা বনেছি।/মর। বেশ হয়েছে আয় তবে তোর/ল্যজটা ছেঁটে দি।/বান্দাবানর বাদশার লেজ লোকে বলবে কি।[৭]

এই গীতিময় সংলাপ নাটকের প্রাণ। নাট্যাবেগকে ত্বরান্বিত করেছে। আবদালা গানের মধ্যে দিয়ে তার কথা ব্যক্ত করেছে মরজিনা তার উত্তর দিয়েছে। দস্যু দলের গাওয়া গানটির মধ্যে দিয়ে দস্যুরা লুঠ করা ধনরত্ন গুহার মধ্যে কিভাবে রাখে তা জানা যায়। 'চিচিং ফাঁক' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং বহুল জনপ্রিয় শব্দ। দস্যুদের গুহার দ্বার উদ্‌ঘাটনে এবং 'চিচিং বন্ধ' শব্দে দ্বার বন্ধ করে তাদের হিরাটের দিকে পুনরায় লুট করতে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। আবদালা ও মরজিনার গীতিময় সংলাপ মাঝে মাঝে গানের ভাষ্য হয়ে ওঠে। কাশিমের নাট্যশালায় কাশিমের বন্ধু ও নর্তকী মদ খেয়ে নাচ ও গানে মত্ত এবং এই গানটির মধ্যে দিয়ে বিত্তশালী মানুষজনের আমোদ প্রমোদের কুকীর্তির কথায় প্রকাশিত হয়। চতুর্থ দৃশ্যের সূচনাতে যে গানটি রয়েছে তাতে বুভুক্ষু মানুষের অন্তর অন্তর্জ্বালা অভিব্যক্ত।

● **দ্বিতীয় অঙ্ক**

আলিবাবা ও ফতিমা দুজনে মিলে এই অঙ্কের শুরুতে যে গানটি গেয়েছে তা উর্দু ও হিন্দির মিশ্রণে রচিত। গুহা থেকে গুপ্তধন নিয়ে আসার পর তাদের যে মানসিক উত্তরণ তা ধরা পড়ে এই গানটিতে—"যেত্তা রূপেয়া তেত্তা দিগদারি।/লাহুল বিলা এ কে ঝকমারি।।/রোপেয়া বাড় যায় দিল ছোটি হো যায়,/ক্যায়সে চলেগা মেরা দিনদারি।"[৮] হঠাৎ বড়োলোক হওয়ার পর ফতিমা ও আলির কথোপকথন বেশ কৌতুককর। কি যে করবে আর কি বা না করবে কিছুই তারা ঠিক করে উঠতে পারছে না। অস্বস্তি আর উদ্বেগের কাটা তাদের অহরহ বিঁধছে। ফতিমা তাই আলির কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে, "আমার প্রাণটা যেন কুঁকিয়ে উঠছে। আমি বসতে পারছি না, দাঁড়াতে পারছি না, শুতে পারছি না। আলিরও একই অবস্থা। আমি হাসতে পারছি না কাঁদতেও পারছি না। ফাতেমা তাই বলে ওঠে, "ওগো, আমার কি হল গো-আমার ঘুম হয় না কেন গো-খিদে পায় না কেন গো—আমার চোখ ফেটে জল আসছে কেন গো?'

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় লোভের বশবর্তী হয়ে কাসিম আলিবাবার কাছ থেকে গুহার সন্ধান নিয়ে গুহায় প্রবেশ করে। তৃতীয় দৃশ্যে ধনসম্পত্তি নিয়ে বেরোবার জন্য কাসিম যখন উদগ্রীব তখন নিয়তি ও দৈবের আবির্ভাবে তার কণ্ঠে শোনা যায় ষোলো সংখ্যক গানটি। এ গানটি অনেকটা যাত্রার বিবেকের গানের মত। এর মধ্যে দার্শনিকতা ধরা পড়ে—

> যত লেখা ছিল, সকলই ফুরাল,/হিসাব-নিকাশ কর রে জীব।/সময় যে যায়, ডাক বিধাতায়, /এ অন্তিমে যদি চায় রে শিব।।/পিতা-মাতা দারা সুতা সুতে রাখি/এখনই মুদিতে হবে দু—আঁখি,।/রহিবে না বাকি হিসাবের ফাঁকি,/ধনবান কী বা হোস গরিব।।"৯

পরবর্তী দৃশ্যে দেখা যায় কাসিম তখনও ফিরছে না, উৎকণ্ঠিত সাকিনার মানসিক অস্থিরতার প্রতিক্রিয়া তার শরীরে ও তার আচার-আচরণে, চলণে-বলনে তার অঙ্গ সঞ্চালনের প্রতিটি পর্বে ফুটে উঠেছে। এখানে যে গানটি পরিবেশিত হয়েছে সেটি কাসিমের বহির্বাটিতে সাকিনা ও মরজিনার উপস্থিতিতে সাকিনা গানটি গেয়েছে। দর্শক ততক্ষণে

অনুমান করেছে হয়তো কাসিম আর ফিরবে না, গানের কথাগুলি থেকে তা পরিষ্কার হয়ে যায়—

> আমার কেমন কেমন কচ্চে কেন মন।/চোখ ছছছল, পা টলমল, রগ কেন টনটন।।/(আমার) শিউরে শিউরে উঠছে কেন গা,/খালি হৃদয় করতেছে খাঁ খাঁ,/(আমার) হাড় মড়মড় বুক ধড়ধড়—/প্রাণ কেন ঝনঝন।।/(এমন) ছটফটানি, প্রাণপোড়ানি—/কি ছাই অলক্ষণ।[১০]

পরবর্তী গানটি কাসিমের মৃত্যু বহনকারী, সাকিনার বিপন্ন হয়ে ওঠা, শোকের মুখে সাকিনার দাম্পত্য জীবনের নানা স্মৃতি ভেসে ওঠা সবেরই বার্তাবাহক। গানটি এক কথায় শোকগীতি—

> আশা রেখেছি প্রাণ সে কি রে আসিবে ফিরে।/সুখ-সাধ-অবসাদ ভাসিতেছি আঁখিনীরে।।/সে মোহিনী প্রেমগান, প্রণয়েরই সুখ তান,/আবেশে আকুল পোড়াপ্রাণ,/জ্বলে জ্বালা ধিকিধিকি জেগে ওঠে ধীরে ধীরে।।[১১]

আবার—"ভালোবাসে তাই ভালোবাসিতে আসে/আমি যে বেসেছি ভালো সে বাসা সে ভালোবাসে।।"[১২] গানটিতে গভীর ভাবের প্রাধান্য ঘটেছে।

● **তৃতীয় অঙ্ক**

তৃতীয় অঙ্কে মোস্তফার দোকানের সামনে পুরুষ, নারীরা গানের মধ্যে দিয়ে তাদের কথা শুনিয়েছে। পরবর্তী দৃশ্যে মরজিনা যখন চর্মকার বাবা মোস্তফার চোখ বেঁধে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে কাসিমের খণ্ডিত দেহ জোড়া লাগাবার জন্য তখন কৌতুককর একটি গান শোনা গেছে। এর পরবর্তী গানটি দস্যুদের গাওয়া এবং তারও পরবর্তী গানটি ফকিররা গেয়েছে এবং গানের মধ্যে দিয়ে তাদের মনের কথাই উঠে এসেছে। হুসেন ও মরজিনার গাওয়া গানটির মধ্যে দিয়ে রোমান্টিক প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মরজিনার অন্তর, চোখের ভিতর, শরীরের সব জায়গা হুসেনময় হয়ে গেছে সে কথাই প্রকাশিত গানটিতে। মরজিনার হৃদয়কন্দরে হুসেনের স্থান ভালোবাসার অনবদ্য ভাষ্য রূপ নিয়েছে এই গানে—

> আমার এই ছাতির অন্দরে।/বন্ধ করে রেখেছি মোর নয়নানন্দরে।।/সন্দ সদা মন্দ বাদিদের, /ঠান্ডা বোলে পিয়ারে আমার পায় যদি গো টের;/এই বন্ধ কুলে সোনার তরী, বাঁধবে তাদের বন্দরে।।[১৩]

গরম তেল ঢেলে ডাকাতদলকে শেষ করার সময় আবদালা, মরজিনা এবং আশেপাশের মানুষজনের মধ্যে গানে গানে কথোপকথন হয়েছে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী এই গানের প্রয়োগ অস্বাভাবিক মনে হয়নি, বরং তা স্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। দস্যু সর্দারকে হত্যার আগে পরিবেশকে হালকা করার জন্য মরজিনা ও আবদালার কণ্ঠে যে গান তা নাট্য প্রয়োজনকে সিদ্ধ করেছে। শেষ গানটি বাদিগনের গাওয়া। যেখানে দেখা যাচ্ছে নাটকে পট পরিবর্তন হচ্ছে, সিংহাসনে আসিন হুসেন ও মরজিনা, সিংহাসন তলে আবদালা, উভয় পার্শ্বে সাকিনা ও ফতিমা—

> চাঁদ—চকোরে/অধরে অধরে/পিয়ে সুধা প্রাণ ভরে।/প্রেম—সোহাগে/প্রেম—অনুরাগে আদরে মনচোরে।।/আবেশে বিভোরা/আপন হারা, প্রেমিক-প্রাণ মাতুয়ারা/যাও দেখে যাও/ছবি এঁকে নাও রেখো এমনি করে/সোহাগ ভরে মনচোরে বেঁধো প্রেমডোরে।।[১৪]

গানটি রোমান্টিক কমিটির যুগোচিত নাট্য পরিণাম। নাটকের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। সংলাপ ও গানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাট্য রচনার উর্বর ক্ষেত্র তার গীতিনাট্যগুলি, সেক্ষেত্রে আলিবাবার মঞ্চ সাফল্য অনেকখানি কৃতিত্ব রাখে। 'আলিবাবা' রঙ্গনাট্যটি ক্লাসিক থিয়েটারের 'বিজয়ী বৈজয়ন্তী'। আলিবাবার গানে সেদিন দেশবাসী মশগুল হয়েছিল। এত গানের সমাহারে নাটকটি কোথাও বিরস বা ক্লান্তিকর মনে হয় না। এখানে সকল শ্রেণির চরিত্রই গান গেয়েছে তাদের নিজেদের সীমানায় দাঁড়িয়ে। গানগুলি চরিত্রের মানস প্রতিফলনে, পরিস্থিতি ও পরিবেশ তৈরিতে, কৌতুক রস পরিবেশনে, সংলাপের বিকল্প রূপে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, "ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্য রচনার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে কাহিনীর মনোহারিত্ব অর্থাৎ প্লটের গল্প রস।"[১৫] কাহিনিগুলির মধুরতা অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে তার গান। অজস্র গানের সম্ভারে ডালি সাজিয়েছেন নাট্যকার। তিনি মূলত কবি। তার কবিসত্তাকে তার নাটকের মধ্যে খুঁজে পাই।

উৎসের সন্ধানে

১. রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড) : 'জীবনস্মৃতি', গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, সুলভ সংস্করণ পুনর মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২১, পৃ. ৪৮৭
২. ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : 'আলিবাবা রঙ্গনাট্য', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, পঞ্চদশ সংস্করণ, পৃ. ৪
৩. তদেব : পৃ. ৫
৪. তদেব : পৃ. ৫
৫. তদেব : পৃ. ৯
৬. তদেব : পৃ. ১২
৭. তদেব : পৃ. ১৫
৮. তদেব : পৃ. ৩৭
৯. তদেব : পৃ. ৪৬
১০. তদেব : পৃ. ৪৮
১১. তদেব : পৃ. ৫২
১২. তদেব : পৃ. ৫৩
১৩. তদেব : পৃ. ৭৭
১৪. তদেব : পৃ. ৯১
১৫. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.

নাট্যসাধনায় প্রমথনাথ বিশী

দিবাকর দাস

প্রমথনাথ বিশী একজন স্মরণীয় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ ছাত্র এবং স্নেহধন্য। এই মানুষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনামের সঙ্গো দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন। তিনি যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্র অধ্যাপক পদে। রাষ্ট্রপতি মনোনীত হয়ে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের রাজসভার সদস্য ছিলেন। টেগর রিসার্চ সোসাইটির সভাপতির পদও সাফল্যের সঙ্গো অতিবাহিত করেছেন।

বাংলার সাহিত্য অঙ্গণে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। কাব্য, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচিত উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র হয়েছে। তিনি প্রাবন্ধিক হিসাবে যেমন সুপরিচিত তেমনি সমালোচক রূপেও খ্যাতির শিখরে উঠেছিলেন। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ রূপে তিনি মূল্যবান আলোচনা করেছেন, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাটক নিয়ে। তাঁর রচিত রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ ও রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ আজও বহুল উচ্চারিত গ্রন্থ। এছাড়াও প্রমথনাথ বিশী বেশ কয়েকটি নাট্য রচনা করেছেন। উপন্যাসিক কিংবা ছোটোগল্পকার রূপে তাঁর যে পরিচিতি নাট্যকার রূপেও সেই খ্যাতি ও পরিচিতি হতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটনা ঘটেনি। অথচ লক্ষণীয় প্রমথনাথের বিশেষ দুর্বলতা ছিল নাটক বিষয়ে। এগারোখানি পূর্ণাঙ্গ, চারটি একাঙ্ক এবং দুটি অপ্রকাশিত নাটক রচনা করেও দুর্ভাগ্যবশত নাট্যকারের প্রাপ্য স্বীকৃতি লাভে বঞ্চিত। অথচ এমন দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয় তাঁর তুলনায় অনেক কম নাটক লিখেও দিব্যি নাট্যকারের স্বীকৃতি ও সম্মান লাভে সমর্থ হয়েছেন। যেমন—বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে এই ব্যর্থতার কারণ কি? তবে কি প্রমথনাথের নাটক রচনার প্রতিভা ছিল না আমরা সেই কারণ অনুসন্ধানের পূর্বে নাট্যকার প্রমথনাথ বিশীর সাধারণভাবে বাংলা নাটক এবং তারপর তাঁর নিজের নাট্য রচনা সম্পর্কে অভিমত জেনে নেব।

প্রমথনাথ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে তিনি অ্যারিস্টফেনিস, মলিয়ের এবং বার্নার্ড শর মতো নাট্যকার। এমনকি এ দাবিও তিনি করেছেন, জর্জ বার্নার্ড শ এবং তাঁর নাটক রচনার প্রেরণা বা উৎস যাই বলি না কেন তা অভিন্ন। বিশী জানিয়েছেন তিনি সাহিত্য রচনায় নিয়োজিত হয়েছেন তাঁর মত প্রকাশের জন্যে, প্রচারের জন্যে। আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনার ইতিহাস। চোদ্দোটি উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলীতে যে কথা অকপটে বলে উঠতে পারেননি, সেই অকথিত বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম রূপে তিনি নির্বাচন করে নিয়েছিলেন 'কমলাকান্ত' চরিত্রটি। তাঁরই বকলমে রচিত হল 'কমলাকান্তের দপ্তর'। একইভাবে বলা যায়, প্রমথনাথ তাঁর যে কথা গল্প, উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধে প্রকাশ করে উঠতে সক্ষম হননি সেই অপ্রকাশিত বক্তব্য প্রকাশের জন্যই তাঁর নাটক রচনা। প্রমথনাথ বলেছেন, 'আমার সমস্ত রচনা দুর্বাসার মত ভস্ম অভিশাপ দিবার জন্য কেবল প্রস্তুত হইয়া নাই, সর্বদা সে অভিশাপ উচ্চারণ করিতেছে; বাঙালি জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই সমুদ্রোপকূলের দেশে সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হইয়াছিল। তাঁরা যে বাঙালি ছিল না এমন কোন প্রমাণ নাই। এবারে আর ষাট হাজার নয়, ছয় কোটি বাঙালির ভস্ম পরিণামের যুগ, আশা করি অধিক দিন বিলম্ব নাই। যে অভিনেতা ভূমিকা ভুলিয়া গিয়াছে, বেশভূষা খুলিয়া ফেলিয়াছে, সে যত শীঘ্র সরিয়া গিয়া রঙ্গমঞ্চ অপরের জন্য ছাড়িয়া দেয় যতই মঙ্গল। বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে নটনাথ অধীর ভাবে অপেক্ষা করিয়া অদৃশ্য অমোঘ আকর্ষণে এই অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘায়িত প্রহসনকে পঞ্চম অংকের গর্ভাঙ্গের দিকে টানিয়া লইতেছেন।' এই ক্রোধোক্তি তাঁর নাটকেও প্রতিফলিত। আপাতভাবে মনে হতে পারে প্রমথনাথ বিশী নিজে বাঙালি হয়েও ছিলেন চরম বাঙালি বিদ্বেষী। কিন্তু তা যথার্থ নয়। পরম বাঙালি হিতৈষী ছিলেন বলেই এতখানি বাঙালি বিদ্বেষের প্রকাশ।

প্রমথনাথের বিশ্বাস ছিল নাটকে action-এর যুগ শেষ। বলেছিলেন শেক্সপিয়ারের নাট্যচর্চায় action প্রাধান্য পায়নি। প্রমথনাথ নাটকের মুখ্য বস্তু রূপে চিহ্নিত করেছেন আইডিয়াকে। এ বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য—

> প্রমথনাথ যখন আইডিয়ার কথা বলেন তখন তিনি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন কমেডি,প্রহসন, ফার্সের প্রতি। নিজে তিনি হাসির নাটক লিখেছেন। নিজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন, সেই কারণে আইডিয়াকে ঘিরে বিশী মহাশয় দাবি করেছেন 'বাণীর ঘাড় হইতে অযথা অ্যাকশানের ভার নামাইয়া ফেলিয়া তাকে মুক্তগতি করিতে হইবে।'...প্রমথনাথ অতএব নাটকে যা তুলে আনেন সেখানে কুশীলব আইডিয়াকেই মূর্ত করে তোলে। এবং কখনও কখনও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি আইডিয়ার বাহন রূপেই চিহ্নিত হয়ে যায়। আর নাটকে উঠে আসে সমস্যা এবং সমস্যাকে কেন্দ্র করে তর্ক।[১]

আবার অন্য একটি স্থানে তাঁর বক্তব্য—

> রঙ্গামঞ্চের দুর্দশার প্রধান কারণ দুইটি; বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত কোন প্রথম শ্রেণির নাট্যকারের উদ্ভব হয় নাই; কাব্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাসে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্যসাহিত্যে তেমন কেউ কোন মহারথী নাই; যাঁহারা আছেন তাঁহারা নিতান্তই পদাতিক। যে নাট্য একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ যোগাইতে পারে, সেই নাট্যই শ্রেষ্ঠ। এদেশে যে নাট্যকার জন্মগ্রহণ করে নাই, তাঁহার কারণ আবার এই জাতির মধ্যেই নিহিত আছে। নাট্য বাস্তব

> শিল্প : এই বাস্তব শিল্পের উদ্ভবের পক্ষে জাতির জীবনে বাস্তবতা অত্যাবশ্যক, বাঙালির মতো এমন অবাস্তব জাতি জগতে দ্বিতীয় নাই।[২]

উপরোক্ত দুটি মন্তব্যই বিতর্কিত মনে হতে পারে। তিনি বোধ হয় নাট্য সাহিত্যের শূন্যস্থান পূরণের জন্যই নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। যাইহোক, তবু লেখকের রঙ্গমঞ্চ ও নাটক সম্পর্কিত ধারণা কি তা পাওয়া গেল।

লেখকের বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য শিল্প সম্পর্কে আরও কিছু মন্তব্য জানা যাক। বলাবাহুল্য, তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সকলেই যে সহমত হবেন এমনটি নয়, তবে নাট্যকারকে বোঝার জন্য এই মন্তব্যগুলি সহায়ক—

> বাংলা থিয়েটার যাত্রা গীতির জারজ সন্তান; যাত্রা ও সার্কাসের সঙ্গমে এর উৎপত্তি।ভদ্র সমাজে নাম ভাঁড়াইয়া নাট্য শিল্প নামে এ পরিচয় দিয়া থাকে।...প্রকৃত নাট্য শিল্পের উপজীব্য মুখ্যত বাক-কলা; অ্যাকশন অত্যন্ত গৌণ...এমনকি, শেকসপিয়ারের নাটকে যে অ্যাকশনের অত্যন্ত প্রাধান্য আছে বলে মনে করা হয় বস্তুত তা সত্য নয়। শেকসপিয়ারের নাটকে পূর্ণোচ্ছ্বাসিত বাক্‌সংগীতের তুলনায় অ্যাকশান অত্যন্ত গৌণ;...বাংলা থিয়েটার এখনও শেকসপিয়ারের পূর্ববর্তী অবস্থায় আছে। বাণী এখানে তথাকথিত অ্যাকশানের দ্বারা পদে পদে প্রতিহত... নাট্য শিল্পীর দিক দিয়া বাঙালি আজও শিশু।[৩]

এই উদ্ধৃতির একমাত্র কারণ লেখকের মানসিকতার উদঘাটন করা। যা তাঁর নাট্যকারের মানসিকতা ও নাটককে বুঝতে সাহায্য করবে। যদিও প্রমথনাথের নাটক আশানুরূপভাবে মঞ্চস্থ হয়নি। নাট্যকার বোধ হয় তা আশাও করেননি। মূলত পাঠের জন্যই তাঁর নাটক। প্রমথনাথ তাঁর নাটকে বার্নার্ড শ-র মতো ভূমিকাকে গ্রহণ করলেন। নাটক রচিত হয় দর্শকের জন্য। কিন্তু নাট্যকার ভূমিকা সংযোজনের মাধ্যমে নাটকে প্রচ্ছন্ন যা আছে তা মেলে ধরলেন। পাছে পাঠক তা বুঝতে পারেন।

আমরা তাঁর রচিত এগারোখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক—'ঋণং কৃত্বা', 'ঘৃতং পিবেত' (সানিভিলা), 'ডিনামাইট', 'সাবিত্রীর স্বয়ম্বর', 'দক্ষিণপাড়ার মেয়েরা', 'মৌচাকে ঢিল', 'গভর্মেন্ট-ইন্সপেক্টর', পারমিট', 'ভূতপূর্ব স্বামী', 'হিন্দী উইদাউট টিয়ার্স', 'জাতীয় উন্মাদাশ্রম', চারখানি একাঙ্ক নাটক—'পশ্চাতের আমি', 'পরিহাস-বিজলপিতম', 'বেনিফিট অব ডাউট', 'কে লিখিল মেঘনাদবধ কাব্য' ও দুটি অপ্রকাশিত নাটক—'স্বর্গ', 'আফিঙের ফুল' নাটকে যা পাই তা হল— প্রমথনাথ নাটকে যা তুলে ধরেন সেখানে কুশীলব আইডিয়াকেই মূর্ত গড়ে তোলেন। সৃষ্ট আইডিয়ার বাহন রূপে চিহ্নিত হয়ে যায়। নাটকে বড় হয়ে ওঠে সমস্যা, সমস্যাকে কেন্দ্র করে তর্ক। প্রমথনাথ বার্নার্ড শ-র অনুসরণে 'তর্ক নাটক' লেখায় অত্যুৎসাহী ছিলেন। 'তর্ক নাটক' মানে একটা সমস্যাকে রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস। আমরা তাঁর লেখা নাটকগুলির মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া দরকার আছে বলে মনে করি—

সংস্কৃতে উপদেশ পাওয়া যায় সংস্কৃতি উপদেশ পাওয়া যায়—'ঋনঙ কৃতবা ঘৃতং পিবেত'। যার অর্থ হল ঋণ করে ঘি খাও। খাওয়াটা জরুরি। বিশেষত্ব ঘি এর মত বলবর্ধক উপাদানের। কিন্তু ঘি সংগ্রহের সামর্থ কয়জনের থাকে! এই জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ঋণ করে ঘি

খেতে কোনো বাধা নেই। বাস্তবজীবনে আমরা অনেকেই এই পরামর্শ মেনে চলি। পরামর্শটি বিশী মহাশয়ের খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই তিনি উপদেশের এই অংশটি নিয়ে দুটি নাটিকা লিখলেন প্রথম অংশ নিয়ে একটি। দ্বিতীয় অংশ নিয়ে আর একটি। প্রথম অংশে ভাববস্তু প্রতিফলিত। আর দ্বিতীয় অংশ হাস্যরসাত্মক। বলা ভাল এই দুটি নাটক নয় নাটিকা, কেননা এর ক্ষুদ্রায়ব। প্রথম নাটিকার আয়তন মোটে ৪৯ পাতায় লেখা হয়েছে। চারটি অংক রয়েছে। চারটি অংকে সর্বমোট ন'টি দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। প্রমথনাথ চিরকালের অভিনবত্বের বিশ্বাসী। তিনি চর্বিত চর্বনে কখনোই বিশ্বাস করতেন না। তাই এই নাটকেও অভিনব বিষয়ের অবতারণা করেছেন। নাটকের মূল চরিত্র তথা নায়ক সনৎ কুমার একটি বিচিত্র স্কুলের শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা। কিভাবে ঋণ শোধ করা যায় তাই শেখান। তাঁর মতে, ঋণ নানা প্রকারের হতে পারে, ক্ষুদ্র অঙ্কের ঋণ, বৃহৎ অঙ্কের ঋণ, অল্প মেয়াদের ঋণ, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। ঋণ শোধের পদ্ধতিও নানারকমের—খেপে খেপে ঋণ শোধ করা যায়, একসঙ্গেও শোধ করা যায়। সনৎকুমার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষার্থীদের কি কি উপায়ে কোন কোন জাতীয় ঋণ শোধ করা সম্ভব তার কার্যকরী শিক্ষাদান করা হয় অর্থাৎ শিক্ষার এই স্কুলে একই সঙ্গে থিওরি ও প্র্যাকটিক্যালের শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলটি ভালই চলছে। শিক্ষার্থীদের কোন অভাব নেই। তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ। কাপড়ের ব্যবসায়ী, সাবানের ব্যবসায়ী, বই ব্যবসার এজেন্ট, প্রেমের মালিক, তিনজন জমিদার এবং একজন রাজাবাহাদুরও আছেন।

সনৎ কুমারের ঋণ শোধের স্কুল খোলার মানসিকতার পিছনে ব্যক্তি জীবনের ঘটনা কাজ করেছে। তার পিতা মঞ্জরীর পিতার কাছে টাকা ধার করে। কিন্তু পরবর্তীতে সনৎকুমার ও মঞ্জরী দুই জনেরই পিতা মারা যায়। তাহলে ঋণ গ্রহীতা ও ঋণ দাতার মৃত্যু হলে ঋণ শোধ করার ব্যাপারও থাকে না। আবার মঞ্জরীকে বিয়েও করেছে। কিন্তু গানের শিক্ষক হর্ষনাথ মঞ্জরীকে বিয়ে করে সব সম্পত্তির মালিক হতে চান ও সনৎকুমারকে ঋণ শোধের জন্য চাপ দেন। এই ঘটনা নিয়েই মজাদার উপভোগ্য হয়ে উঠেছে এই নাটিকা। এই বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব প্রমথনাথকে নাট্যকার হিসেবে পরিচিত দিয়েছে—

> ঘৃতং পিবেত নাটক সম্পর্কে নাট্যকারের মতামতটি বিশেষভাবে গ্রহণীয়
> ঘৃতং পিবেত বিবাহতত্ত্ব বিষয়ক একখানি অল্প রোমান্টিক নাটক।

বিবাহতত্ত্বকে নানা দিক হইতে এই নাটকে যাচাই করিয়া দেখা হইয়াছে। আজকাল বিবাহ যে একটা একান্ত সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মূলে আছে শিথিল চিন্তা। দুইটি ভিন্ন গোত্র ভাব কে আমরা এক করিয়া ফেলিয়া বিপদের সৃষ্টি করিয়াছি। বৈবাহিক প্রেম ও রোমান্টিক প্রেম এক পদার্থ নহে। এই রোমান্টিক প্রেমের নিকটতম বাংলা প্রতিশব্দ পূর্বরাগ।'

কাব্য রচনা করেছেন, ছোটোগল্প লিখেছেন, লিখেছেন উপন্যাস, জীবনী সাহিত্য, এছাড়াও রঙ্গ রসাত্মক রচনাও লিখেছেন। কিন্তু প্রতিবাদী নাটক লিখে নিজের ক্ষোভ তীব্রভাবে উগরে দিয়েছিলেন। নাটক 'ডিনামাইট'-এ প্রধান চরিত্র সুপ্রিয়কুমার সেন পেশায় রাসায়নিক। গবেষণাগারে তিনি তাঁর গবেষণা কর্মে সদাই ব্যস্ত। লক্ষ্য প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরকের আবিষ্কার। এই বিস্ফোরক আবিষ্কারের প্রেরণা তিনি লাভ করেছেন তাঁর শৈশবে। সুপ্রিয়র বাড়ির নিকটেই ছিল পাহাড়। সেখানে রেললাইন পাতার কাজ চলছিল। সেই কারণেই

ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড় উড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই দৃষ্টান্ত তাকে অনুপ্রাণিত করে। ডিনামাইটের তুলনায় অধিকতর ক্ষমতা সম্পন্ন বিস্ফোরক আবিষ্কার। এই বিস্ফোরক মানুষের পথের সব বড় বড় বাধাকে অনায়াসে দূর করবে। দূরের আকাশকে তিনি চেয়েছেন কাছে। স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন তাকে। সুপ্রিয় তাঁর গবেষণায় পূর্ণ সফল না হলেও, আংশিক সাফল্য পেয়েছেন। পুরো সফল তাকে নাট্যকার করাননি। কারণ গবেষণাগারে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ধ্বংসপ্রাপ্তের নামান্তর।

প্রমথনাথ তাঁর নাটকে ঘটনা নয়, পরিস্থিতির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবেগের পরিবর্তে তিনি বুদ্ধির উপর নির্ভর করেছেন। তিনি নাটক রচনায় উদ্ভট ক্রিয়াকর্মে জোর দিয়েছেন। সংলাপকে করে তুলেছেন ক্ষুরধার, ক্ষেত্র বিশেষে চমকপদ পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। নাট্যকার প্রমথনাথ তাঁর নাটকে বাঙালির ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নানাভাবে উপস্থিত করেছেন। হয়তো সে কারণেই তিনি পেশাদার রঙ্গমঞ্চকে অবজ্ঞা করেছেন।

প্রমথনাথের কয়েক শ্রেণির মানুষ এবং কয়েকটি বিষয়ে ছিল প্রচণ্ড ক্ষোভ। যেমন—ডাক্তার, উকিল, সাংবাদিক। এদের সুযোগ পেলেই নাটকের কাহিনি ও চরিত্রের মাধ্যমে এক হাত নিতেন। নোটবই কিংবা গবেষণা কর্মে ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। গণতন্ত্র সম্পর্কেও তিনি ছিলেন মোহমুক্ত। তাঁর নাটক শ্রুতিনাটক রূপে জনসাধারণের কাছে সমাদ্রিত হলেও মঞ্চে তা সফল হয়নি বা কেউ সফল রূপায়ণ করার চেষ্টা করেননি। আগামীতে আশাকরি তাঁর নাটকের উচ্চমানতা নাট্যরসিকেরা বুঝবেন এবং তিনি নাট্যসাহিত্যে একজন সফল মঞ্চসফল নাট্যকার রূপে স্বীকৃতি লাভ করবেন। বাংলা নাট্যজগতে তিনি যে নতুন ধরণের নাট্য বিষয় ও নাট্য আঙ্গিকের আনয়ন করতে চেয়েছিলেন, হয়তো তাতে সম্পূর্ণ রূপে সফল হননি। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সাধুবাদ যোগ্য। তাই অখ্যাত নাট্য প্রতিভা হলেও নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস তাঁর কথা স্মরণ রাখবে।

উৎসের সন্ধানে

১. বিজিতকুমার দত্ত : ভূমিকা 'প্রমথনাথ বিশী নাটক সমগ্র', মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৫, পৃ. ২
২. তদেব : পৃ. ৬২
৩. তদেব : পৃ. ২৪১

তথ্যের সন্ধানে

১. বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত : 'প্রমথনাথ বিশী নাট্য সমগ্র', মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৫, কলকাতা
২. সনাতন গোস্বামী : 'বাংলা নাটকের আলোচনা', কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৫
৩. অজিত কুমার ঘোষ : 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', সাহিত্যলোক, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ
৪. তপন ঘোষাল : 'প্রসঙ্গ : নাট্যসমালোচনা', সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯

নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

স্বরূপ দে

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯১২খ্রি.-১৯৭১খ্রি.) ছিলেন বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার। তাঁর সাহিত্য সংখ্যা কম হলেও, রচনার গুণ এবং পরিসর ছিল অত্যন্ত বৃহৎ। নিজেকে কথাশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেও, নাটক রচনাতেও তিনি সমান জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। কল্লোল যুগের বহেমিয়ানায় তাঁর উত্থান হলেও আধুনিক ইউরোপের গতিবাদের ধারাকে বাংলা সাহিত্যে নিমজ্জিত করেছিলেন তিনি। এককথায় ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন তিনি বাংলা সাহিত্যে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সরাসরি রাজনীতিসম্পন্ন মানুষ না হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বা মুক্তি সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা কম ছিল না। যদিও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছুদিন আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সম্পর্কে জীনাত ইমতিয়াজ আলী বলেন—"তাঁর জীবনদর্শন পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ ওয়ালীউল্লাহর পরিবার, পরিপার্শ, তাঁর বাহির ও অন্তর্জগতের ঘটনাপুঞ্জ, স্রোত-প্রতিস্রোতের মাধ্যমেই হয়েছে ঘনীভূত, সুদৃঢ় ও স্ফটিকায়িত।"[১] প্রথমেই সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচিত গ্রন্থাদির একটি তালিকা নিম্নরূপে প্রদান করা হল—

উপন্যাস :	লালসালু (১৯৪৮ খ্রি.)
	চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪খ্রি.)
	কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮খ্রি.)
ছোটগল্প:	নয়নচারা (১৯৪৪খ্রি.)
	দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫খ্রি.)
নাটক:	বহিপীর (১৯৬০খ্রি.)
	উজানে মৃত্যু (১৯৬৩খ্রি.)
	তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪খ্রি.)
	সুড়ঙ্গ (১৯৬৪খ্রি.)

কথাসাহিত্যিক হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ সুপরিচিত হলেও নাটক সৃষ্টিতেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল অপরিসীম। সমালোচক বলেন—"সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবনবোধ ও তাঁর প্রতিভান শক্তির শব্দসৃজিত রূপকলাভই হচ্ছে তাঁর সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস ও নাটক।"[২]

২

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একজন সমাজ সচেতন নাট্যকার। সমাজ, সময় ও কালচেতনাই তাঁর নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য রচনা তাঁর কাছে বিলাসিতা নয়, বরং সাহিত্যের সময়োপযোগীতাকে তুলে ধরাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বরাবরই বলতেন সাহিত্যিক হতে হবে বলেই লিখতে হবে তা তিনি ঘৃণা করেন। প্রাণের উৎসই সাহিত্যের আধার। আর নাটক অন্যান্য সাহিত্যের প্রকরণের থেকে কিছুটা আলাদা। কেননা নাটকে থাকে বাস্তব জীবনের অনুধ্যান। নাটকের চরিত্ররা হয় বাস্তবের চরিত্র। বাস্তব চরিত্রের সংলাপ, জীবনই নাটকের সংলাপ ও জীবন হয়ে ওঠে। ফলত নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাস্তবিক সমাজজীবনের সেই নিগূঢ় কথা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের পরিচয়, কুটিল নীতি, জাতপাতের ভেদাভেদ, অশিক্ষা, ধর্মান্ধতাকেই নাটকে তুলে ধরেছেন।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ খুব বেশি নাটক লেখেননি, তাঁর নাটকের সংখ্যা মাত্র চারটি। যথাক্রমে সেগুলি হল—'বহিপীর', 'উজানে মৃত্যু', 'সুড়ঙ্গ' ও 'তরঙ্গভঙ্গ'। এই সকল নাট্যরচনায় তিনি ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার পরিচয় রেখেছেন। শুধু তাই নয়, অদ্ভুত তথা অ্যাবসার্ড নাটক সৃষ্টি করেও তিনি বাংলাদেশের নাট্যজগতকে আলাদা মাত্রা প্রদান করেছিলেন। সমালোচক বলেন—

> মানুষ হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল, তীক্ষ্নধী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সচেতন ও সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে সবিশেষ পরিজ্ঞাত। মনোধর্মের এই বিশেষ সংগঠনের কারণেই সমকালের বৈশ্বিক রাজনীতি, ধনবাদী সমাজের আগ্রাসন ও জোটবদ্ধতা এবং কমিউনিস্ট বিশ্বের ভাঙা-গড়া তাঁকে করেছে প্রভাবিত ও স্পর্শিত।[৩]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম নাটক 'বহিপীর'। নাটকটি রচিত হয় ১৯৫৫ সালে। প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। সৈয়দ সাজাদ হোসায়েনের সম্পাদনায় 'মা' ও 'আবর্ত' নাটকের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকটি প্রকাশিত হয়। 'লালসালু' উপন্যাসের সাত বছর পর 'বহিপীর' নাটকটি রচনা করেন তিনি। উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে সময়কাল ভিন্ন হলেও উপস্থাপনা, সমাজ-চৈতন্য ও শিল্পরূপের অভিন্নতা লক্ষ করা যায়। ওয়ালীউল্লাহর 'বহিপীর' নাটক রচনার মূল প্রেক্ষাপটে ছিল 'পি-ই-এন' ক্লাবের 'বাংলা নাটক প্রতিযোগিতা'য় অংশগ্রহণের জন্য। যাতে তিনি দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন। এটি একটি সামাজিক নাটক। নাটকটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পীর প্রথা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত। সূর্যাস্ত তথা সান্ধ্য আইনের কথা নাটকে রয়েছে। শুধু তাই নয় ইসলামি সুফী সমাজের হাত ধরে যে পীর সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল তার কুদিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন নাট্যকার। নাটকে মূল চরিত্রের সংখ্যা পাঁচ। তারা যথাক্রমে হল-বহিপীর, তাহেরা, হাশেম আলী, হাতেম আলী ও খোদেজা বেগম। এছাড়াও রয়েছে একাধিক

অপ্রধান চরিত্র। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—হকিকুল্লাহ।

'বহিপীর' নাটকটি পঞ্চাঙ্ক ও একাঙ্ক কোনো নাটকেরই গঠনরীতি অনুসৃত হয়নি। নেই কোন দৃশ্য সংখ্যাও। কিন্তু মঞ্চ নির্দেশনার অভিনবত্বে, সময় বিভাজনে, ঐক্য সংহতিতে নাটকটির জুরি মেলা ভার। 'বহিপীর' নাটকটির সূচনা হয়েছে নদীতে ভাসমান বজরার দুটি কামরার মধ্যে। যেখানে নাটকের সময়সীমা মাত্র বারো ঘণ্টা। ১৭৯৩ সালে সূর্যাস্ত আইন ঘোষিত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গ আছে 'বহিপীর'-এ। নাটকে জমিদার হাতেম আলী সূর্যাস্ত আইনের দ্বারা জমিদারী হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু সেই সংবাদ তিনি তাঁর পুত্র ও স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করেননি। বজরার কামরায় হাতেম আলীর সঙ্গে বহিপীরের সাক্ষাৎ ঘটে। সেখানে হাতেম আলীা দুঃখিত হওয়ার কারণ জানতে চান বহিপীর। উত্তরে হাতেম আলী জানান—

> সারা বিকাল, সারা সন্ধ্যা কাটল আশায় আশায় যে বাল্যবন্ধু আনোয়ার আসবে। কিন্তু সে এল না আর একটা রাত। এতদিনের পুরনো জমিদারির শেষ রাত। আমার ছেলে ও তার মা এখনও জানে না যে এইটাই তাদের জমিদারির শেষ রাত।[৪]

এমত অবস্থায় পীরসাহেব হাতেম আলীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। কেননা তিনি ছিলেন ধূর্ত উদারচেতা মানুষ। তিনি বলেন—"আমি পীর মানুষ, আমি অত টাকা কোথায় পাইব যাহার দ্বারা আপনার জমিদারি উদ্ধার করা যাইতে পারে।"[৫]

সমগ্র নাটকটিতে এই হাতেম আলী, হাসেম আলী, তাহেরা, বহিপীরের মধ্যে দিয়ে এক বাস্তব সমাজ সচেতনতার দিক নির্দেশ করেছেন নাট্যকার। শুধু সমাজ সংস্কার, পীর প্রথার কু-দিককে তুলে ধরেই নাটক শেষ করেননি নাট্যকার। বরং ধর্মীয় মুসলমান সমাজে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন পীর প্রথার দিক উত্তীর্ণ করে নাটক শেষ করেছেন। হাসেম আলী মানবিক সত্তার জাগরণে, দায়িত্ববোধে তাই বলেছেন—"চলুন আমার সঙ্গে। আপনাকে নিয়েই যাবোই। বলে দিলাম আপনাকে বাঁচাবো। আপনাকে বাঁচাবার সময় আমার হয়েছে। এখন আপনাকে আর ছেড়ে দিতে পারি না।"[৬]

'বহিপীর' নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল বহিপীর। সে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নায়ক চরিত্রও তাকে বলা যায়। তার বাড়ি সুনামগঞ্জে। তিনি একজন ধূর্তবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি যেমন একদিকে উদারচেতা তেমনি অন্যদিকে আশ্রয়লোভী। নাটকে তাই হাতেম আলীর সুযোগের সৎব্যবহার সে করেছে। জমিদারীত্ব বাঁচানোর নামে পীর হিসেবে অসৎ ইচ্ছার কথাও প্রকাশ করেছে। সে হাতেম আলীকে বলেছে—"আপনাকে আমি টাকা কর্জ দিব। এই শর্তে যে আপনার বিবি আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইবেন।"[৭] ফলে সময়োচিত আকাঙ্ক্ষা বহিপীরের মুখ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয় ধৈর্যশীলতাও তার চরিত্রের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহেরাকে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। সে পীর হওয়ার জন্য আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে না, বলে বইয়ের ভাষায় কথা।

'বহিপীর' নাটকের অপর একটি ব্যক্তিত্বশালী চরিত্র হল তাহেরা। সে প্রতিবাদী নারী সত্তা। বহিপীরকে সে স্বামী বলে মানতে চায় না। মাতৃত্বহীন তাহেরা তাই পিতা ও সৎমার কথায় আপত্তি জানায়। হাশেম আলী তাহেরাকে পীর সাহেবের বিবি বলে সম্বোধন করলে সে তাকে

বলে, 'বহিপীরের বিবি। তিনি আমাকে কখনও দেখেননি, তার ঘরও করিনি। খেদমতও করিনি।'[৮] ফলে একজন প্রবল আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী, মর্যাদাবোধসম্পন্ন, নির্ভীক, পরিণামভীতিশূন্য নারী হল তাহেরা। নাটকের নায়িকা সে। 'কাঁদো নদী কাঁদো'র খোদেজা সে নয় বরং 'লালসালু'র জমিলার সঙ্গে মেলে। পরম জেদি তাহেরা তাই বহিপীরকে বলেছেন, আমাকে বিবি সাহেব ডাকবেন না। বিয়েতে আমি মত দিইনি। শুধু তাই নয় জোরের সঙ্গে সে উচ্চারণ করেছে—"আপনি পুলিশের খবর দিতে পারেন। আপনি আমার বাপজান কে ডেকে পাঠাতে পারেন, আমার উপর জুলুম করতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যাব না।"[৯]

হাতেম আলী ও হাশেম আলীও 'বহিপীর' নাটকের অপর দুই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। একজন রেশমপুরের জমিদার। যার জমিদারি ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ে। সান্ধ্য আইনে যার জমিদারি চলে গিয়েছে। বহিপীর তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত বহিপীরের কুপ্রস্তাব সে ফিরিয়ে দিয়েছে। অপরজন হাশেম আলী বহিপীরের বিপরীতে সংযমী দায়িত্ববোধ সম্পন্ন পুরুষ। তাকে নায়ক চরিত্রও বলা যায়। ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছে। তাহেরাকে সে ভালোবাসে।

নাটকে খোদেজা বেগম চরিত্রটি একটি ভীত, ধর্মভীরু, কুসংস্কারাচ্ছন্ন চরিত্র। সে জমিদারের সহধর্মিনী। একদিকে সে যেমন মায়ামমতা সমৃদ্ধ তেমনি অপরদিকে ভীরু। সাধারণভাবে একটি নির্ঝঞ্ঝাট চরিত্র হিসেবে খোদেজা বেগম উঠে এসেছে। হকিকুল্লাহ একটি অপ্রধান চরিত্র। সে বহিপীরের সহকারী। পীরের আজ্ঞা পালনই তার একমাত্র কাজ। সবমিলিয়ে প্রতিটি চরিত্রই নিজ নিজ স্বধর্মে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে নাটকে। ফলত 'বহিপীর' একটি শিল্পসার্থক নাটক হয়ে উঠেছে।

৩

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক 'উজানে মৃত্যু'। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। 'উজানে মৃত্যু' নাটকটি একটি অ্যাবসার্ড নাটক। এক্ষেত্রে তিনি বাদল সরকারের সঙ্গে সমগোত্রীয়। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ও 'বাকি ইতিহাস' এর মতো 'উজানে মৃত্যু'তেও রয়েছে অ্যাবসার্ডিটি। নাট্যকার এই নাটকে চরিত্রের কোনো নামকরণ করেননি। চরিত্র চিহ্নিত করেছেন নৌকাবাহক, সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি, কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি এইভাবে। বিপন্ন মানব চৈতন্যের কথা, ঈশ্বরহীন জগতের কথা, অন্তরানুভূতির কোলাজকে ঘটনাহীন গল্পের মধ্যে দিয়ে, ভাব-অনুভাবের রূপক সাংকেতিকতার সাহায্যে, রূপকল্প, রচনার মাধ্যমে নির্মাণ করেছেন নাটকটিকে নাট্যকার। যা আগাগোড়োই কার্য-কারণ সম্পর্কহীন। নাটকটির কিছু অ্যাবসার্ডিটি মূলক কথোপকথন নিম্নে তুলে ধরা হল—

নৌকাবাহক : বুঝতে পেরেছি। বড়ো শান্তিতেই তার মৃত্যু হয়।

কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি : অন্য মানুষটাও শান্তিতে ডুবে মরেছিলো।"[১০]

৪

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ একজন বৈশ্বিক নাট্যকার। ইউরোপীয় নাট্যধারার যথার্থ প্রতিফলন তাঁর মধ্যে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'তরঙ্গভঙ্গ' তেমনি একটি নাটক যেখানে তিনি অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন প্রাচ্য ও পাশচাত্য নাট্যধারা ও রীতিকে। 'তরঙ্গভঙ্গ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৪

খ্রিস্টাব্দে। এখানে আমেনা নামক এক চরিত্রের মাধ্যমে ঘটনার বিস্তার করেছেন নাট্যকার। আমেনা স্বামী ও সন্তান হত্যার আসামী। তার এই হত্যা বিচারাধীন। কিন্তু বিচারক সেই বিচারের মীমাংসার করতে না পেরে নিজেই আত্মঘাতী হয়েছেন। এখানেই গল্পের নতুন মৌলিকত্ব নিয়ে এসেছে ওয়ালীউল্লাহ। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে নাট্যকারের ভাষ্য—“বিচারালয়ের কায়দা কানুন সে বোঝে না। বিচারকার্য তার কাছে নেহাত রহস্যময় ঠেকে বলে জর্জের প্রতি ভীতি শ্রদ্ধার অন্ত নেই।”[১১] দুই অঙ্কে সৃষ্ট এই নাটক যেন ইউনিস্কীয় নাট্য ভাবনারই প্রভাবে প্রভাবিত।

‘সুড়ঙ্গা’ নাটক ওয়ালীউল্লাহের একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। এটিও একটি অ্যাবসার্ড নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। নাটকটি ‘উজানে নৃত্য’ নাটকের পূর্বেই রচিত। নাটকটিতে লঘু চালের মধ্য দিয়ে ওয়ালীউল্লাহ শব্দ ও নৈঃশব্দের অ্যাবসার্ডিটি তুলে ধরেছেন। সংলাপ কার্য-কারণ হীন। নাটকের কিয়ৎ নির্দেশন নিম্নে তুলে ধরা হল—

রাবেয়া : কি দেখছেন?
যুবক : (সভয়ে থমকে) ও!...
রাবেয়া : ভয় পাচ্ছেন আমাকে
যুবক : ঐ ঐ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি?[১২]

৫

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একজন শিল্প সচেতন নাট্যকার। তাই তাঁর নাটকে বাস্তবতা, কুসংস্কার, ধর্মীয় বাতাবরণই বারবার উঠে এসেছে। কখনও ‘বহিপীরে’র গতিধারায় বাহিত হয়েছে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ছবি, মুক্তিবোধের উদ্ধার আবার কখনও ‘তরঙ্গাভঙ্গা’-এর মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে বিচারালয়ের বিচার পাবার অভীপ্সা। তিনি একাধারে বাস্তববাদী নাট্যকার অপরদিকে অ্যাবসার্ড নাটকের প্রণেতা। আপাত দুই বিরোধী নাট্যবিষয়ের অবতারণা করেছেন নাট্যকার ওয়ালীউল্লাহ। ‘সুড়ঙ্গা’, ‘উজানে মৃত্যু’ তারই প্রতিচ্ছবি। যেখানে কার্য-কারণ সম্পর্কহীন ভাবনা নাটকের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি একদিকে ন্যাচারালিস্ট, অপরদিকে এক্সপ্রেশনিস্ট। একদিকে প্রাচ্য ধারার নাট্যকার, অপরদিকে ইউরোপীয় নাট্যকৃতির কৌশলী। সবমিলিয়ে নাট্যকার ওয়ালীউল্লাহ একজন অস্তিত্ববাদী, দৃঢ়প্রত্যয়ী, বৈশ্বিক অ্যাবসার্ডিস্ট। চাকরিসূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রতা গড়ে ওঠার কারণে ব্যক্তিক জীবনদর্শনের পাশাপাশি নাট্যিক জীবনদর্শনও বহুরূপে প্রতফলিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে জাকার্তায় অবস্থানকালে তাঁর বন্ধু, সহপাঠী এ.কে নাজমুল করিমকে তিনি বলেছেন—

> I am glad to already know something about Indonesia. It is curious country because despite the fect they are supposed to be muslims like us, they are Yet So different. Therefore as you do not come across magnicificient Architectural monuments, you do not also find feudal class.[১৩]

এখানেই ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও দার্শনিক জীবনবীক্ষার পরিচয় মেলে। যা তাঁর নাট্যকৃতিকে করেছে সমুজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যে তাঁর সৃষ্টি ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তারই হেতু তিনি পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য হিসেবে

বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, আদমজি পুরস্কার ইত্যাদি। তাই তিনি 'লেখকের লেখক' হয়ে উঠেছেন।

উৎসের সন্ধানে

১. আলী জীনাত ইমতিয়াজ : 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম', নবযুগ প্রকাশনী, অক্টোবর ১৯৯১, ঢাকা, পৃ. ১৪
২. তদেব : পৃ. ২৯
৩. তদেব : পৃ. ২৭
৪. হোসেন আকরম সৈয়দ সম্পাদিত : 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী', প্রথম বাংলা একাডেমি খণ্ড, জানুয়ারি ১৯৮৬, ঢাকা, পৃ. ৪১১
৫. তদেব : পৃ. ৪২২-২৩
৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : 'রচনাবলী' ২, পৃ. ৪৩০
৭. তদেব : পৃ. ৪২৪
৮. তদেব : পৃ. ৩৯৬
৯. তদেব : পৃ. ৪১৫
১০. তদেব : পৃ. ৫২৬
১১. তদেব : পৃ. ১১৭
১২. তদেব : পৃ. ৫১০
১৩. তদেব : পৃ. ২৬

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে নারী প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিতে পঞ্চাশের মন্বন্তর

সংহিতা ব্যানার্জী

পঞ্চাশের মন্বন্তর সমাজে এক প্রবল বিপর্যয়ের সূচনা করে। মনুর শাসনকাল, বন্যা, বিপ্লব, প্রলয়, দুর্ভিক্ষ—একাধিক অর্থে মন্বন্তর শব্দটি ব্যাখ্যাত হলেও প্রচলিত অর্থে দুর্ভিক্ষকে মন্বন্তর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। 'ভারতকোষ' (১৯৭০)-এ দুর্ভিক্ষের সংজ্ঞা নির্ধারণে বলা হয়েছে—"প্রাকৃতিক অথবা মানবিক কারণে সংঘটিত খাদ্যশস্যের অত্যন্ত অভাবের ফলে ব্যাপক অন্নকষ্ট সৃষ্টি হয়। সাধারণত বহুস্থলে খাদ্যাভাবে মৃত্যু ঘটিলে তবেই অবস্থাটিকে দুর্ভিক্ষ বলা হয়।"[১] অন্যদিকে 'মন্বন্তর' বা 'Famine' শব্দের 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'-য় প্রাপ্ত অর্থ "An extreme and protracted shortage of food. Usually resulting in higher than normal death rates."[২] অর্থাৎ, দীর্ঘস্থায়ী চরম খাদ্যাভাবে যখন অগণিত মানুষ অনশন ও মৃত্যুর শিকার হয় তখন তাকে দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর বলা হয়।

বস্তুত, প্রকৃতিসৃষ্ট কারণে যেমন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি মন্বন্তরের কারণ হতে পারে, তেমনি মনুষ্যসৃষ্ট কারণ যেমন যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধের আশঙ্কায় শস্যবাজেয়াপ্তকরণ, মুনাফালোভী কর্তৃক শস্য মজুতকরণ, মহামারীর প্রকোপে বিপুল প্রাণহানিজনিত কারণে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় মন্বন্তর দেখা দিতে পারে। বলাবাহুল্য পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রাকৃতিক কারণ অপেক্ষা অনেকাংশে মনুষ্যসৃষ্ট কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। বিশ্বরাজনীতিতে ক্রমান্বয়ে সংঘটিত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যাম্ভাবী পরিণামস্বরূপ বাংলায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার পরিণামস্বরূপ '৪৩ এ ব্যাপক খাদ্যসংকট মন্বন্তরের সূচনা করে। একদিকে ১৯৪২ এ অনাবৃষ্টি, বিলম্বে বর্ষার আগমনে পূর্ববাংলায় বন্যা, পশ্চিমবাংলায় প্রবল ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসে শস্য উৎপাদন

ব্যাহত হয়, ১৯৪৩ এ-ও যা অব্যাহত থাকে।[৩] পাশাপাশি ন্যূনতম শস্য উৎপাদনে মানুষের খাদ্য সংকটকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাংলায় বিপুল সৈন্যসমাবেশ সৈন্যখাতে খাদ্যমজুতকরণ, জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করতে সরকার কর্তৃক 'পোড়ামাটির নীতি' গ্রহণ, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সুযোগে একশ্রেণির মুনাফালোভী কর্তৃক কৃত্রিম অভাবসৃষ্টি ও কালোবাজারী, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মহার্ঘ্যতা সৃজন—বাংলার মানুষকে চরম সংকটের সম্মুখীন করে। শহরাঞ্চলে অধিকমূল্যে ন্যূনতম খাদ্যের সংস্থান থাকলেও গ্রামাঞ্চলে চূড়ান্ত অন্নসংকটের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে অনাহার-পীড়িত গ্রামবাসীরা অন্নের আশায় কলকাতা মহানগরীতে শরণার্থী কার্যত ভিখারীতে পরিণত হল। সেইসঙ্গে শহরে ভিক্ষার অপ্রতুলতা দুর্ভিক্ষপীড়িত মানষের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়ে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। অনাহারের যাতনায় পিতা কর্তৃক সন্তান বিক্রি, কন্যা বিক্রি, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী বিক্রি, নারীর পতিতাবৃত্তি অবলম্বন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। "দারিদ্র্যের জ্বালায় পূর্ববঙ্গে অসংখ্য নারীর 'বেশ্যাবৃত্তি' অবলম্বন।বহু অভিভাবক কর্তৃক পুত্রকন্যা বিক্রয়।"[৪] সেইসঙ্গে মন্বন্তর কবলিত অনাহারক্লিস্ট মানুষ খাদ্যাভাবে ও অবস্থা বৈগুণ্যে অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণে মহামারীর প্রকোপে মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হয়। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের পরিসংখ্যান অনুসারে—"The death role in the Second half of 1943 would seem to have been around 38,000 per week."[৫] অন্যদিকে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জ জানিয়েছেন—"The death rate at a lakh per week."[৬] এই বিপুল সংখ্যক প্রাণহানি বাংলাকে চরম সংকটের সম্মুখীন করে—

> ১৯৪২-৪৩ সালে বাংলার চালের উৎপাদন কম হয়েছিল বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হবার মতো কম নয়। বৃহৎ বঙ্গে (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা) চালের উৎপাদন এবং পাঞ্জাবে গমের উৎপাদন আগের বছরগুলির তুলনায় বেশিই হয়েছিল। তবু বাঙালীর খাদ্যে ঘাটতি পড়ল। কারণ বহুবছর ধরেই বাংলার নিজস্ব চালে তা কুলাতো না, বাইরে আমদানী করা চালের ওপর নির্ভর করতে হত। বিশেষ করে বার্মার চাল, ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে জাপানিদের হাতে বর্মার পতন ঘটলে সেখান থেকে চাল আসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। আমদানী বন্ধ হল বটে, কিন্তু রপ্তানী করতে হল প্রচুর চাল।[৭]

মন্বন্তরের অপর এক কারণস্বরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসঙ্গ অবশ্য উল্লেখ্য। কারণ—

> এই বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদারগণ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে শাসকদের নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া কৃষকদের নিকট হইতে ইচ্ছামত খাজনা আদায় ও জমি হইতে কৃষকদের উচ্ছেদ করিবার অবাধ অধিকার লাভ করে। ইহাতে জমির উপর কৃষকদের স্বত্ব অস্বীকার করিয়া কৃষকদের চিরদিনের জন্য জমিদারদের শোষণের শিকারে পরিণত করা হয়। বাংলাদেশে জমিদারদের দেয় মোট রাজস্বের পরিমাণ স্থির হইল চার কোটি দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু এই বন্দোবস্তের প্রথম বৎসরেই জমিদারগোষ্ঠী কৃষকদের নিকট হইতে প্রায় তিনগুণ খাজনা ও কর আদায় করে।[৮]

"অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতের ১৯৪০-৫০ এর মধ্যবর্তী যে দশক সেখানেও কান পাতলে শোনা যায় চল্লিশের মহাগর্জন ও ঘটনাপ্রবাহের উত্তাল বিভীষিকা। ১৯৩৯-৪৫ জুড়ে চলেছে প্রলয়ঙ্করারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪২-এ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী 'আগস্ট বিপ্লব'

বা ভারত-ছাড়ো আন্দোলন। ১৯৪৩-এ ঘটল মহামন্বন্তর, সঙ্গে ভয়াবহ মারী-মড়ক এবং বিপর্যয়কর ঝড়-বন্যা। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু। ক্ষুধার যাতনা ও ক্ষুৎপীড়িতের আর্তনাদ, কঙ্কাল, মৃতদেহ; রেশনের লাইন, লঙ্গারখানায় ভিড়, মহাজন, মজুতদার, কালোবাজার; সাইরেন, এ. আর. পি.(এয়ার রেইড প্রিকশন), ট্রেঞ্চ, সৈন্য-মিছিল, ব্ল্যাক আউটের মহড়া; ব্রিটিশ প্রশাসন ও পুলিশের অত্যাচার, বিনা বিচারে অসংখ্য মানুষের কারাগার জীবন। অমাবস্যার এই কারা সেদিন লুপ্ত করেছিল দেশের মানুষের ভাবনার ভুবনটিকে এক মহাদুঃস্বপ্নের অতলে।—এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরাধীনতার বেদনা ও জ্বালা, অত্যাচার এবং ১৯৪৬—এর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।—বলা যায়, মহাযুদ্ধ, মহামন্বন্তর, মহাপ্রলয়, বিভীষণ দাঙ্গা, উন্মত্ত রাজনৈতিক সন্ত্রাস, দেশবিভাগ, উদ্‌বাস্তু সমস্যা এবং খণ্ডিত স্বাধীনতা—এক দশকের মধ্যে পরপর ঘটে গেল। ভূগোলের 'গর্জনকারী চল্লিশা'র চেয়ে ভয়ংকর, প্রলয়ঙ্কর ও বিপর্যয়কর দেশের ইতিহাসের এই চল্লিশের মহাগর্জন।"[১]

বস্তুত ১৯৪২-এ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নির্মমভাবে 'ভারতছাড়ো' আন্দোলন দমন, ১৯৪২ এ জাপানি আক্রমণকে প্রতিহত করতে ভারতের পূর্ব উপকূলের সীমান্ত ও সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে জলযান বিনষ্টি ও বাজেয়াপ্তকরণ তথা 'ডিনায়াল পলিসি' (Denial Policy) এবং খাদ্যশস্য বিনষ্টি তথা পোড়ামাটির নীতি (Scorched Earth Policy)-গ্রহণ, ১৯৪২ এ ১০ ই মার্চ জাপান কর্তৃক রেঙ্গুন অধিগ্রহণের ফলশ্রুতিতে ভারতের চাল আমদানি বন্ধ হওয়ায় এবং রেঙ্গুনে কর্মরত ভারতীয়ের বাংলায় প্রত্যাবর্তনজনিত সংখ্যাধিক্যের পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সৈন্যদের জন্য খাদ্যমজুতকরণ এবং যুদ্ধের অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরির শিল্প কারখানায় খেত-মজুতদের শিল্প শ্রমিক রূপে যোগদান ইত্যাদি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কারণ এবং ১৯৪২-এ মেদিনীপুর ও দক্ষিণবঙ্গের প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, রোগপোকার আক্রমণ, প্রবল বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ধংসলীলা—১৯৪৩-এ 'মহামন্বন্তর' সংঘটিত করেছিল। এছাড়া মহাযুদ্ধজনিত কারণে মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, তথা মহার্ঘতা মন্বন্তরকে বহুগুণিত করে।

এই জাতীয় বিপর্যয় প্রতিরোধকল্পে ড. বিধানচন্দ্র রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্যার বদ্রীনাথ গোয়েঙ্কার নেতৃত্বাধীনে Bengal Relief Committee, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ, পিপলস রিলিফ কমিটি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি আর্ত মানুষের সাহায্যার্থে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। প্রয়োজনের সাপেক্ষে অপ্রতুল হলেও উক্ত সংগঠনগুলির ইতিবাচক ভূমিকা অনস্বীকার্য। যদিও একশ্রেণির মানুষের নির্লিপ্ততা, ঔদাসিন্য, মুনাফালোভী, স্বার্থান্ধ মানুষের অর্থ ও নারীলোলুপতা তৎকালীন পরিস্থিতিতে বিষময় করে তুলেছিল। তাই কলকাতা পুরসভা, রেলওয়ে, পোর্টট্রাস্ট ইত্যাদি সংস্থার প্রচেস্টা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ এবং তার আনুষঙ্গিক মহামারিতে আনুমানিক ৩০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

সাহিত্য সমাজেরই প্রতিবিম্ব। সাহিত্যরূপ দর্পণে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, সমৃদ্ধি-বিপর্যয়, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, রাজনীতি সবই প্রতিফলিত হয়। স্বভাবতই মন্বন্তররূপ জাতীয় বিপর্যয়ও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। চরমতম সংকট মুহূর্তে মানুষের জীবনযুদ্ধের ইতিবৃত্ত বিশেষত শ্রমজীবী, অভাবী

মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে অগণিত সাহিত্যে। মানবতার পূজারী নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নন।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে কলকাতা মহানগরীর রাজপথে গ্রাম-গ্রামান্তরের বিভিন্ন উপকণ্ঠ থেকে আগত নিরন্ন, বুভুক্ষু মানুষকে রক্ষাকল্পে স্বেচ্ছাসেবক নেতৃত্বদান ও দেশসেবা তথা জনকল্যাণব্রতে আত্মনিয়োজিত নারীদের প্রতিনিধিস্বরূপ 'দীপশিখা' নাটকের লতিকা চরিত্রে নাট্যকার পত্নী সবিতা রানির ছায়াপাত ঘটেছে। অসংখ্য ক্ষুধার্ত সন্তানের জননী ও নিরন্ন অসহায় নারীদের সহায়দাত্রীরূপ লতিকা শ্রমজীবী আন্দোলনের যোদ্ধ্রীরূপে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়েছে। নাটকের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র লতিকাকে দেখা যায় মন্বন্তর কবলিত বাংলার অসংখ্য, নিরন্ন, বুভুক্ষু মানুষের জীবনরক্ষাকল্পে বহুবিধ কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োজিত রূপে। কেন্দ্রীয় আত্মরক্ষা সমিতির সভ্যরূপে সরকার ও জনগণের সম্মিলিত অর্থানুকূল্যে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় পনেরোটি ক্যাম্প এবং অনাথ, নিরন্ন শিশুদের জন্যে পাঁচটি শিশুশিবির স্থাপন এবং বিভিন্ন হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান পরিদর্শনের মাধ্যমে সেই সকল শিশুদের পিতামাতার অনুসন্ধান-লতিকার যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা তার চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে। সমাজে মুনাফালোভী, আত্মকেন্দ্রিক মনুষ্যোদ্ভূত মন্বন্তর থেকে দেশবাসীকে রক্ষাকল্পে এই নারীর এই অনলস কর্মপ্রচেষ্টার চিত্রাঙ্কণের মাধ্যমে নাট্যকার নারীচরিত্রের এক গৌরবোজ্জ্বল রূপের উপস্থাপন করেছেন। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে লতিকার ন্যায় চরিত্রসৃজন নাট্যকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ—

> লতিকা নাট্যকারের আদর্শ সংগ্রামী নারীচরিত্র। তৎকালীন মন্বন্তরগ্রস্ত কলকাতায় মহিলা আত্মরক্ষাবাহিনীর নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ ও সেবাকার্যের মাধ্যমে সর্বহারাদের জীবন রক্ষার চেষ্টা হয়েছিল সর্বতোভাবে। লতিকা সেই মণিকুন্তলা সেনের আদর্শেই নিজেকে মেলে ধরেছে। ত্রাণ শিবিরের যোগ্য পরিচালনায় সেবাধর্মে ও সংগ্রামী চেতনায় সে মহীয়সী নারী হিসাবে চিত্রিত হয়েছে।[১০]

অবশ্য উল্লেখ্য নাট্যকারপত্নী সমাজসেবিকা সবিতা রাণী দেবীরও ছায়াপাত ঘটেছে লতিকা চরিত্রে। '৪৩-এর মন্বন্তর পীড়িত নিরন্ন মানুষদের অন্নদান, সেবাকার্য এবং সমাজকল্যাণব্রতে আত্মনিবেদিতপ্রাণা নাট্যকারপত্নী নারীকল্যাণসমিতি পরিচালনা ও বিবিধ জনকল্যাণমূলক বিশেষত নারীকল্যাণমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ নাট্যকারকে লতিকা চরিত্রাঙ্কণে অনুপ্রাণিত করেছিল—

> যুদ্ধের পটভূমিকায় পঞ্চাশের মন্বন্তর, চাষীর হা-হা-কার তথা মহাজনের অর্থলালসার মধ্যেও মানবিকতার পরিচয় 'দীপশিখা' নাটকে ফুটে উঠেছে। এই 'অন্ধকার' নাটকে দুর্দশা ও দুর্ভোগ, প্রতিরোধ ও সহাবস্থান শেষপর্যন্ত আশার আলো দেখায়। রাজনৈতিক সচেতনতা ও মানবিকতার সংমিশ্রণে মানুষ সে কলের পুতুল নয়, নিজ ভাগ্যের স্রষ্টা ও তাই নাট্যকার গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।মন্বন্তর সকল প্রকার মারণাস্ত্র নিয়ে যে ভাবে মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেখানে মানবিকতাকে রক্ষার জন্যে মানুষের প্রয়াস, করুণা ও ভয় জাগানো দৃশ্যগুলি হতবাক করে রাখে।[১১]

যথার্থ মাতৃত্বের প্রতিমূর্তিরূপে 'দীপশিখা' নাটকের ভিখারিণী চরিত্রটি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। মন্বন্তর কবলিত গ্রামবাংলায় সন্তানদের প্রাণরক্ষা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ায় আহার্যদ্রব্য তথা

অন্নসংস্থানের আশায় মহানগরীর রাজপথে ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে তার সন্তানদের প্রতি স্নেহ ও কর্তব্যবোধই প্রতিকায়িত হয়েছে। একদিকে অন্নহীনতা, রাজপথে দুমুঠো অন্নের জন্য নিষ্ফল ক্রন্দন, অন্যদিকে জাপানী বোমাতঙ্কে বিপর্যস্ত কলকাতা মহানগরীতে সন্তানদের প্রাণরক্ষার আত্যন্তিক প্রচেষ্টায় তার মাতৃত্বের অপরিমেয় শক্তি, বলিষ্ঠতাই প্রদর্শিত হয়েছে। সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে অনাহারক্লিষ্ট পুত্রসন্তানের মৃত্যু এবং কন্যার নিরুদ্দেশ তাকে সর্বশূন্যতায় পর্যবসিত করে। সন্তানহারা জননীর মর্মভেদী হাহাকার পাঠকচিত্তকে আর্দ্র করে। কিন্তু নাটকের পরিণামে সন্তানহারা জননীর অপূর্ণ মাতৃত্ব অসংখ্য অসহায় পিতৃমাতৃহীন সন্তানদের রক্ষাকল্পে পূর্ণতা প্রাপ্তিতে চরিত্রটিকে অভিনবত্ব প্রদান করে। জননীর মাতৃত্বের আবেদন সর্বজনীন, তা নিজ সন্তানকে অতিক্রম করেও বিশ্বময় পরিব্যপ্ত—মাতৃহৃদয়ের অপরিমেয় স্নেহই একমাত্র সত্য-ভিখারিণী চরিত্রটি যথার্থ মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি রূপে তা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

'দীপশিখা' নাটকে অপর যে নারীচরিত্রটিকে নাট্যকার অপার স্নেহের প্রতিমূর্তিরূপে অঙ্কন করেছেন, সে হল বিজলির মা। নাটকের একটি মাত্র দৃশ্যে উপস্থিত থেকেও চারিত্রিক ঔদার্যে দর্শকচিত্তে আপন স্থান অধিকার করেছে। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে ভিখারিণী এবং তার দুই সন্তানের সামান্য ফ্যানের জন্য ক্রমাগত আর্তক্রন্দন ও কাতরোক্তি উপেক্ষা করে যখন বিজলী তাদের বিতাড়নে সচেষ্ট হয়েছে, তখন বিজলীর মা পরম যত্নে সাগ্রহে নিজের দু'মুঠো শাকান্ন তাদের ভাণ্ডে তুলে দিয়েছে। হাজার হাজার নিরন্ন, বুভুক্ষু মানুষের খাদ্যপ্রদান দ্বারা প্রাণরক্ষা কার্যত অসম্ভব হলেও সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সহযোগিতা দ্বারা অন্তত কিছু মানুষের প্রাণরক্ষায় সচেষ্ট হওয়ার পথ প্রদর্শকরূপে নাট্যকার দর্শক সমক্ষে বিজলীর মাকে উপস্থাপিত করেছেন। লক্ষণীয় নাটকে চরিত্রটির কোনো ব্যক্তিনাম প্রদত্ত হয়নি। বিজলী তথা ব্যক্তিবিশেষের জননীর সর্বজনীন জননীতে উত্তরণের চিত্র স্বল্প পরিসরে সুনিপুণ দক্ষতায় অঙ্কিত হয়েছে।

পাশাপাশি 'দীপশিখা' নাটকের অন্যতম প্রধান নারীচরিত্র লতিকা বলিষ্ঠ, ব্যক্তিত্বময়ী নারীর প্রতিনিধি রূপে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে চিত্রায়িত করে নাট্যকাহিনির মূল চালিকাশক্তি রূপে উপস্থাপিত হলেও নাটকের সূচনা দৃশ্যে সমাজ-হিতৈষী, দেশসেবাব্রতে আত্মনিয়োজিত প্রাণা, মন্বন্তর কবলিত অসংখ্য বুভুক্ষু মানুষের সহায়দাত্রী জননীরূপেই তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। গৃহের নিশ্চিন্ত আরাম, বিলাসিতা এমনকি নিজ ভবিষ্যৎ নির্ধারক আসন্ন পরীক্ষা উপেক্ষা করে দেশ ও মানুষের হিতকর্মে আত্মনিয়োগ করেছে। অসংখ্য ক্ষুধার্ত সন্তানের জননী ও নিরন্ন অসহায় নারীদের নেতৃত্ব দিয়ে আইনসভার সদস্য ও মন্ত্রীদের নিকট আবেদন, মিটিং-মিছিল পরিচালনা কিংবা নিরন্ন, অনাথ অসহায় শিশুদের প্রাণরক্ষাকল্পে শিশুশিবির স্থাপন ও বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শনের মাধ্যমে সেই সকল শিশুদের পিতামাতার অনুসন্ধান-লতিকার যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে তার সাংগঠনিক মনোবৃত্তির পাশাপাশি অন্তরে সুপ্ত এক মাতৃহৃদয়ও উন্মোচিত হয়। বস্তুত নাট্যকার পত্নী সমাজকল্যাণব্রতে আত্মনিয়োজিত প্রাণা সবিতারাণীর আদর্শে গঠিত লতিকা চরিত্রটিও দেশমাতৃকার প্রতিভূরূপে আপন স্থান করে নিয়েছে। বস্তুত চরিত্রটি ও তার কর্মসূচীর বাস্তবভিত্তি সম্পর্কে বলা যায় "১৭ মার্চ ১৯৪৩ সালের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে কলকাতার বুকে ৫০০০ গৃহবধূ

রান্নাঘর থেকে সোজা রাস্তায় এবং মিছিল করে বিধানসভা ভবনের চত্বরে। দাবি খাদ্য চাই" ১২ এবং "৭ মে ১৯৪৩ কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এর উদ্যোক্তা কলকাতার জনপ্রিয় 'দিদিমণিগণ' তাঁরা হলেন কম. রেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন, কনক দাশগুপ্ত, বেলা, উষা, কল্যাণী প্রমুখ।"[১৩]

বস্তুত সংবেদনশীল নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার ভাগ্যাকাশের এক ভয়াবহ দুর্বিপাক পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে একদিকে ভাগ্যবিপর্যস্ত নারী, অন্যদিকে বিপর্যয়ের মোকাবিলাকারী সংগ্রামশীল নারীর অবতারণা করেছেন তাঁর 'দীপশিখা' নাটকে। সেইসঙ্গে নারীর মাতৃত্বের আবেদনকে সর্বাগ্রে স্থানদানের মাধ্যমে নারীর মাতৃসত্তার জয়ঘোষণা করেছেন। মন্বন্তরের ন্যায় এক জাতীয় বিপর্যয়ের প্রসঙ্গে নারীশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের অন্যতম সার্থক রূপকাররূপে নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা নাট্যসাহিত্যলোকের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

উৎসের সন্ধানে

১. 'ভারতকোষ', চতুর্থ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৭০, পৃ. ৭৫

২. 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা', চতুর্থ খণ্ড, উইলিয়ম বেন্টন পাবলিশার্স, চিকাগো, ১৯৭৪, পৃ. ৪৬

৪. বিনতা রায়চৌধুরী : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য', কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৯৭, পৃ. ১০

৫. অমর্ত্য সেন : 'পোভার্টি অ্যান্ড ফেমিন', কলকাতা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮১, পৃ. ৫২

৬. কালীচরণ : 'ফেমিনসইনবেঙ্গাল', ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লি:, কলকাতা, ১৯৪৪, পৃ. ৪৯

৭. অনুরাধা রায় : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলার শিল্পসাহিত্য', কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৩৯৬, পৃ. ৯

৮. সুপ্রকাশ রায় : 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', কলকাতা, বুক ওয়ার্ল্ড, ১৯৯৩, পৃ. ১৬

৯. দর্শন চৌধুরী : 'গণনাট্য আন্দোলন', অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৬-৩৭

১০. দশানন শাসমল : 'নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য', কলকাতা, শিক্ষা প্রকাশন, ১৪১২, পৃ. ৯৭

১১. তড়িৎ চৌধুরী : 'পরিচয়', ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯, পৃ. ১৪

১২. পরমা ভদ্র : 'আকালের সন্ধানে ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ', সংবাদ বিচিত্রা, নভেম্বর ১৯৪২-এপ্রিল ১৯৪৫ পৃ. ৪৪

১৩. তদেব : পৃ. ৪৪

বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটকের লৌকিক উপাদান

কৃষ্ণময় দাস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিশ্ব রাজনীতিতে চলতে থাকে ব্যাপক ভাঙ্গাগড়ার খেলা। এই রাজনীতির ঘূর্ণিতে বাংলার নাট্যকাররা থেমে থাকেননি। তৈরি হয়েছে প্রগতি লেখক সংঘ (১৯৩৬)। সারা দেশের প্রগতি-মনস্ক চিন্তাশীল মানুষেরা সমবেত হলেন এক ছাতার তলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বাঙালি ভাবমানসে নৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকটে বাঙালির জীবন জ্বলন্ত বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ নাট্যকারদের নাটকে সমাজ বাস্তবতা রূপায়ণ প্রয়াসের নতুন স্তর যুক্ত হল—বাস্তবধর্মী জীবনিষ্ট জনগণতান্ত্রিক নাটক রচনা হতে থাকল। যার প্রধান আদর্শ সংগ্রামী মানুষের বাস্তবধর্মী জীবনকে নিয়ে নাটক রচনা। তুলে ধরা হবে জীবনের সমস্যা এবং থাকবে মুক্তির উপায়। স্বীকৃতি পাবে ব্যক্তি। ব্যক্তি হবেন শ্রেণির প্রতিনিধি। দেখা গেল গণনাট্য নাটকে ব্যক্তি সমাজের সংঘাত, শ্রেণিগত শোষণ, অবিচারের সঙ্গো নিপীড়িত মানুষের সমষ্টিগত সংঘাত। বাংলা নাট্য অঙ্গনে দেখা গেল গ্রাম বাংলার কৃষক সমাজ। এই নতুন নায়কের জীবন-সমস্যা দর্শকদের অনুভূতিকে তীব্রভাবে নাড়া দিল। বাস্তবসমস্যাকে নিয়ে রচিত হল 'নবান্ন' (১৯৪৪) 'দেবীগর্জনে'র (১৯৬৬) মতো নাটক।

বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটকের মূল বিষয় হল মধ্যসত্ত্বভোগী শোষণকারী জোতদার-মহাজনদের সঙ্গো শোষিত কৃষক শ্রেণির লড়াই এবং তার পরিণতি। এই লড়াই ও পরিণতি দেখাবার জন্য নাট্যকার বেছে নিয়েছেন বীরভূম জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামের সাঁওতাল বাউরী চাষী সমাজকে। এই

আদিবাসী চাষী সমাজের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, যাকে বলা যায় 'কৌমসংস্কৃতি'। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য নাটকে সেই সংস্কৃতির আভাস কতটা দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন আলোচনা করে দেখে নেব। বিখ্যাত সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন—

> দেবীগর্জন বিজন ভট্টাচার্যের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতার সার্থক রূপায়ণের সমাজ বিপ্লবের চূড়ান্ত রূপ ও চরিত্র সৃষ্টি কুশলতার পূর্ণ সফল পরিচয় পাওয়া যায়।... তাহাদের মাটির ভাষা, দৈনন্দিন বাস্তব অভাব অভিযোগ, তাহাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়ে জানিয়েছেন। তিনি নাটকে যে উপাদান সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছেন তা কোন দুরূহ তত্ত্ব বা দুর্বোধ্য মতবাদ হইতে নয়, তা আয়ত্ত করিয়াছেন তাহাদের সঙ্গে নিবিড় ভাবে মিশিয়া ও তাহাদের গভীরভাবে ভালোবাসিয়া।[১]

নাটকের প্রথমে আমরা সেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের কৌমজীবনের একটু আভাস পাই। ভোরের আলো না ফুটতে কুলি-কামিন ছেলে-মেয়েরা যেভাবে লাইন দিয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে, সে গান গাওয়ার ভঙ্গি, ভাষা এবং বিষয় কৌমসংস্কৃতির পরিচয়ক। চাষীরা চাষ ছেড়ে খনিতে কাজ করতে যায় নগদ পয়সা উপার্জনের আশায়, তবে নিজেদের সংস্কৃতিকে বর্জন করতে তারা পারেনি। সর্দারের মতো প্রাচীন প্রতিনিধি তার আদি জাত-ব্যবসা (ঝুড়ি-ঝাঁপি-কুলো-কাটা ইত্যাদি বোনা) ভুলে যায়নি। ঝুড়ি-ঝাঁপি-কুলো-কাটা বোনার কাজটাকে লোকশিল্প বলা যায়। না শিখলে এ কাজ করা যায় না। আর নতুন প্রজন্ম এ কাজ শিখতে আগ্রহী নয় বলেই এই শিল্পের অবসানের সম্ভাবনার ইঙ্গিত নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

নাটকটির নামকরণের মধ্যে বিষয়বস্তুর সঙ্গে রূপক ও পুরাণাশ্রয়ী ব্যঞ্জনার ভাবনা লক্ষ করা যায়। নাট্যকার ভূমিকাতে স্পষ্ট বলেছেন নাটকটির নামের দিক থেকে সার্থক হতে বাধা নেই—"লোকসংস্কৃতি বহতা অক্ষুন্ন রেখেই এই নামটি প্রযোজনার পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক হতে পেরেছে।" ব্যাখা যাই হোক—

> ঊষর লাল মাটির দেশ বীরভূমের পটভূমিতে আদিবাসী ও সাঁওতাল চাষীদের আন্দোলনের ভিত্তিতে, শত্রুকে পরাভূত করে জননীকে খুঁজে পাবার সংগ্রাম সাধনা হচ্ছে বিষয়। আধুনিক নাট্য বিষয়তে নাট্যকার লোকসংস্কৃতির ধারা অক্ষুন্ন রাখতেই পৌরাণিক নাম দিয়ে থাকবেন।[২]

● **লোকাচার ও রীতিনীতি** : 'দেবীগর্জন' নাটকে লোকাচারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাটকে কৌম সমাজের আচার-আচরণ রীতি-নীতিকে নাট্যকার খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। কৌমসংস্কৃতির সার্থক পরিচয় ফুটে উঠেছে বিয়ের অনুষ্ঠানে। নাটকে সর্দারের ছেলে মংলার বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখানো হয়েছে। মানুষ নিম্নবিত্ত হোক আর উচ্চবিত্ত হোক, ছেলে মেয়ের বিয়ে ঘটা করেই দিতে চায়। হাতে টাকা না থাকলে ঋণ করতেও দ্বিধা করে না কারণ বিবাহ একটি আনন্দের অনুষ্ঠান। আর কৌম সমাজের আনন্দ অনুষ্ঠানের প্রধান উপাদান হাড়িয়া মদ, শুকরের মাংস। এই সমাজে হাড়িয়া খাওয়ার ব্যাপারে কোনো বাছ-বিচার নেই। নারী-পুরুষ একত্রে বসে মদ খায়। পুত্রবধূ শশুরের সামনে মদ খেলেও জাত যায় না। হাড়িয়া খেয়ে মাতাল হয়ে উৎসবে অনুষ্ঠানে নাচানাচি করাটাই তাদের সংস্কৃতি। বিয়ের অনুষ্ঠানের আরেকটি লোকাচারকে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন, সেটি হল ধান খেলার অনুষ্ঠান। কোনো কোনো

সমাজের পুরনারীদের সঙ্গো বাজনদারদের ধান খেলার প্রথা আছে। কৌম সমাজ থেকে এই প্রথা ছড়িয়ে পড়েছে তা মনে করা যেতে পারে। এই খেলাটাকে আদিবাসী ও কৌম সমাজের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য বলা যায়। নাচ গান ও খেলার মধ্য দিয়ে একাধিক মানুষের সমবেত যোগদানের যে ছন্দবন্ধ সংগতি ঘটে তার গায়ে কৌম জীবনের ইতিহাস লেগে থাকে।

কিছু স্ত্রী আচারের কথাও নাটকে আছে—বরণ ডালা, চালন, কুলো ইত্যাদি সাজিয়ে জোকার-পুকুরে নব বর বধূকে বরণ করে নেওয়া। বয়স্ক মেয়েরা বধুকে আচার সম্মতভাবে বরের পাশে দাঁড় করিয়ে স্ত্রী আচারপালন করে, দম্পতিকে আশীর্বাদ করেছে।

● **লোকউৎসব :** বিজন ভট্টাচার্য কমিউনিস্ট মতবাদী হলেও হিন্দু ধর্মের দেবদেবী, পুরাণ ও শাস্ত্রীয় কথা তিনি অনেক জায়গায় ব্যবহার করিয়াছেন। এগুলি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া নাস্যাৎ করিবার জন্য নয়, স্বাভাবিক গুরুত্ব দিয়া নাটকের মধ্যে অঙ্গীভূত করিবার জন্য।[৩]

নাটকে আছে ধর্ম ঠাকুরের পুজোর কথা, এই ধর্ম ঠাকুর লোকদেবতা। গাজন উৎসবের কথা আছে, গাজন হল শিব পুজোর একটি বিশেষ অংশ। এই শিব পৌরাণিক নয়, অনেকটা লোকায়ত। "পদ্মপত্রে জনম তোমার ওগো মা ব্রাহ্মণী" এই গানের লাইনটির মধ্য দিয়ে মনসা ঠাকুরের কথা মনে পড়ে, তিনিও লৌকিক দেবী। প্রভঞ্জনের কথার মধ্যে লৌকিক পূজা-পার্বণ ও উৎসবের কথা প্রচারিত হয়েছে। নাটকের শেষে প্রভঞ্জন বধের দৃশ্য দেখানোর সময় নাট্যকার মহিষাসুর বধের একটি স্থির চালচিত্র পশ্চাতে বাঁধের উপর মহাকালীর তাণ্ডব নিত্য দেখিয়েছেন। এখানে নাট্যকার পৌরাণিক চিত্রকে লোকজীবনের সঙ্গো যুক্ত করেছেন।

'দেবীগর্জন' নাটকে পুরনো সেই মিথের মাধ্যমেও লোকায়ত চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে দশরথ সমাবেত চাষীদের উদ্দেশ্যে বলেছে—"আগেকার কালে আসমানের দেবতা এসে মত্তভুমে মানুষকে ছলনা করতেন। শাস্ত্র পুরাণে আপনারা তেনাদের কথাটা শুনেছেন।"

● **লোকসংগীত :** 'দেবীগর্জন' নাটকে যে কয়টি সংগীত ব্যবহৃত হয়েছে তা লোকজীবন থেকেই উঠে এসেছে। নাটকে বিভিন্ন ধরনের গানের ব্যবহার করেছেন—তরজা গান, শ্রমজীবীদের গান, সমবেত কণ্ঠে সংগীত, মহিলা-মহলে প্রচলিত বিয়ের গান।

বাংলা সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ হল তরজা গান। যা মুখে মুখে মানুষ বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনাকে রূপ দেওয়ার জন্য গান রচনা করে। এই নাটকে আমরা দেখি জনৈক তৃতীয় চাষি গান ধরে—

> ই বড় মজার কথা/ই বড় মজার কথা লক্ষণিয়া/বচন তুমার চমৎকার/আমরা কিন্তু তোমাকে জানি/ভুকা পেটের গণৎকার/ই বড় মজার কথা।

নাটকের সূচনাতেই দেখি সকালের পূর্ব মুহূর্তে বাউরি সাঁওতাল কুলিকামিন ছেলেরা আলো হাতে গান গাইতে গাইতে চলেছে। পরিশ্রম লাঘবের জন্য শ্রমজীবী মানুষরা সমবেতভাবে গান করে। তাই নাট্যকার একটি প্রচলিত আঞ্চলিক শ্রমগীতি লোকায়িত চেতনার সঙ্গো মিশ্রিত করেছেন—"হাতে মগের বাতি মাথাত বেতের ঝুড়ি,/চলিলাম দাদা গো পাতালপুরী।/চোখেতে ঘুম ঘুম পায়েলা রুমঝুম/সুমরি শুকরি পাতাল নিঝুম।"

আবার নাটকে জোতদার প্রভঞ্জনের খামার বাড়ির খোলানে মেয়ে-কামিনরা ধান ঝাড়তে ঝাড়তে ছড়া জাতীয় গান গেয়েছে—"গুণের ননদ ময়না/নিশা কালে শিয়াল ডাকে/ঘরেতে মন রয় না।/গুণের ননদ ময়না/ধনীর প্রাণে সয়না।" গ্রামাঞ্চলে আনন্দ-অনুষ্ঠানে বা যাত্রায়, সমবেত কণ্ঠে সংগীত গাওয়া হয়। প্রভঞ্জনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়ানো সঙ্ঘবদ্ধ জনতা—বহুরূপীর দল রক্ত তিলক পরে সমবেত কণ্ঠে গান ধরে—

> মাকে আনতে চল রে ভাই কালিদহের কূল/মাকে আনতে চল রে ভাই খির নদীর কূল/মাকে আনতে/গলার দিব চাঁদ মালা চরণে জবা ফুল।/মাকে আনতে/পদ্মপত্রে জনম তোমার ওগো মা ব্রাহ্মণী/তুমি মা কৈলাসেশ্বরী জগাতি জননী—/মাকে আনতে।

মংলার বিবাহ উপলক্ষ্যে মেয়েরা বরণডালা হাতে নিয়ে নব বর বধূকে সংবর্ধনা জানায় গান গাইতে গাইতে। সেখানেও লোকায়ত প্রচলিত গানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়—

সাজ সীতা সাজ সীতা সুন্দর সাজে
সাজ রামা সাজ রামা সুন্দর সাজে।

'দেবীগর্জন' নাটকে একাধিক লোকায়ত ছড়া ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকের গান এবং ছড়ার মধ্যে পৌরাণিক প্রসঙ্গ এসেছে—২

১. টাকা পয়সা লিব নাই, সোনা দানা রুপা চাই।
২. চোখেতে ঘুম ঘুম পায়েলা রুমঝুম
৩. বৃন্দাবনের দুইটি ফুলে একটি ফুলে রাধা দোলে

● **লোককথা** : বহু প্রাচীনকাল থেকে মানুষ গল্প বলতে এবং গল্প শুনতে পছন্দ করে। গল্প বানিয়ে একে অন্যকে শুনিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রাম বাংলায় বানিয়ে গল্প বলা একটি মনোরঞ্জনের বিষয়। আর এই গল্পের মধ্যে জায়গা করে নেয় রূপকথার রাক্ষস, পক্ষীরাজ ঘোড়া, রাজকন্যা। মংলা তার নব বিবাহিত স্ত্রী রত্নাকে গল্প শুনিয়েছে। গল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছে লোকায়িত জীবনে প্রচলিত লোককথা থেকে। তাই তার গল্পে এসে ভীড় করেছে রূপকথার চরিত্ররা—

> তুই আমার কাঁধটোয় চাপি বসেক, আমি পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটাইতাম। রাক্ষস আর খোক্ষসপুরীর ভিতর দিয়া উড়াল দিতাম যক্ষপুর। যক্ষরাজের অনেক টাকা। সোনা দানায় ভরাভর্তি।

● **লোকভাষা** : "লোক সমাজের সাহিত্য যেমন লোক সাহিত্য, লোক সমাজের ভাষা তেমনি লোক ভাষা"[৪] 'দেবীগর্জন' নাটকের পাত্র-পাত্রীদের জীবন্ত করে তোলার জন্য নাট্যকার বীরভূমের অঞ্চলের লোকভাষাকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। সাঁওতাল পুরুষ-রমণীর স্বাভাবিক সংলাপের ও প্রতিবাদের ভাষা জীবন্ত ফুটে উঠেছে—

"রতন, আমি বাপের এক ছেল্যা, আমার কিন্তু অনেক ছেল্যা, অনেক মেইয়া চাই"

"আজ যে বাচ্চাঠো পয়দা হইয়েছে সেও তো মুট করি চিল্লাইছে, চিল্লাইছে আর বুলছে, আমাক জানে বাঁচাও, আমি বাঁচব, আমাক মারবার তুমার কোনো ইকতিয়ার নাই।"

● **প্রবাদ** : প্রবাদ লোকসংস্কৃতির প্রাচীনতম শাখা। নাটকের সংলাপের মধ্যে কিছু প্রবাদের

ব্যবহার লক্ষ করা যায়—কুম্ভীরের চোখে জল, বিড়াল তপস্বী বটে, ঘর শত্রু বিভীষণ, ধুয়া তুলসির পাতাটো, জুতা সিলাই থিকা চণ্ডীপাঠ, সানকি চাটার বেটা হাড়ি চাটা।

লোকখাদ্য : লোকখাদ্য সংস্কৃতির মধ্যে অন্যতম। নাটকে যেসব লোকখাদ্যের নাম পাওয়া যায় সেগুলি হল—মিঠাই, মণ্ডা, গুয়া পান, তামাক, পচাই মদ, শুয়োর খাসি, বিলাতি মোরগের মাংস, শাল পাতা দিয়ে তৈরি চুটি বিড়ি ইত্যাদি। তামাক, হাড়িয়া, চুটি বিড়ি প্রভৃতি নেশাসামগ্রী স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সর্বসমক্ষে গ্রহণ করার অধিকার এই সমাজে আছে—"লোকায়িত জীবনের গোষ্টিবদ্ধ রূপ, তাদের সংস্কার, বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক উৎসব, তন্ত্র মন্ত্র, অবিচার, গীতি, নৃত্য, বাদ্য সব বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের স্থান পেয়েছে।"[৫]

পশ্চিমবাংলার খেটে খাওয়া মানুষদের সমাজজীবনের বাস্তবচিত্র তুলে ধরার জন্য নাটকটি রচনা করেছেন। লোকায়ত জীবন ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে তার নিখুঁত অভিজ্ঞতা ও লৌকিক উপাদানকে নাটকের শিরায় শিরায় ব্যবহার করে নাটকটিকে অনেক বেশি সজীব করে তুলেছেন। গ্রামীণ সমাজের লোকয়ত ধারার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

উৎসের সন্ধানে

১. অজিতকুমার ঘোষ : 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং বৈশাখ ১৪০৭, পৃ. ৩৮০
২. উষাপতি বিশ্বাস : 'বিজন ভট্টাচার্যের দেবীগর্জন', পৃ. ৪১
৩. অজিতকুমার ঘোষ : 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৪০৭, পৃ. ৩৮০
৪. সনৎ কুমার মিত্র (সম্পা.) : 'বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান', পৃ. ৫৯
৫. অজিতকুমার ঘোষ : 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৪০৭, পৃ. ৮১

তথ্যের সন্ধানে

১. অজিতকুমার ঘোষ : 'নাটক ও নাট্যকার', দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৪০৭
২. অজিতকুমার ঘোষ : 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, আশ্বিন ১৪২১
৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০
৪. সনৎ কুমার মিত্র সম্পাদিত : 'বাংলা লোকভাষাবিজ্ঞান', এপ্রিল ২০২১
৫. উষাপতি বিশ্বাস : 'বিজন ভট্টাচার্যের দেবীগর্জন', ইউনাইটেড বুক এজেন্সী, মে ২০১২

পত্রিকা

৬. বিজন ভট্টাচার্য : 'ফিরে দেখা', শোভন গুপ্ত, পরবাস ৬১তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৫

কৃষ্ণকৌতুকীয় নাটক ‘অতুলনীয় সম্বাদ’ এবং শম্ভু মিত্র : একটি পর্যালোচনা

সত্যজিৎ বসাক

১৯৬৫ সালে ‘অতুলনীয় সম্বাদ’ নামে একাঙ্ক নাটকটি লেখেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র। নাটকটিতে শম্ভু মিত্র নিজের আসল নাম প্রকাশ করেননি। নাটকটির রচনাকালে তিনি ‘সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়’ ছদ্মনামটি ব্যবহার করেছিলেন। ‘গর্ভবতী বর্তমান’ নাটকটির মতো নাট্যকার শম্ভু মিত্র ‘অতুলনীয় সম্বাদ’ নাটকটিকে ‘কৃষ্ণকৌতুকীয় নাটিকা’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আসলে কৃষ্ণকৌতুকীয় নাটক বলতে একধরনের ব্ল্যাক কমেডি নাটককে বোঝায়। এই ব্ল্যাক কমেডি নাটকের বৈশিষ্ট্য হল, নাটকের মধ্যে হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নাটকের অন্তরালে সমাজ ও জীবনের লুক্কাইত, গভীর এক কৃষ্ণচ্ছায়ার অস্পষ্ট প্রকাশ বা ইঙ্গিতকে সঞ্চারিত করে রাখা। এর ফলে কমেডির কৌতুকময় সুখকর ও হাস্যরসাত্মক রূপের আড়ালে এক জটিলতাপূর্ণ অশুভ সংকেতের ইঙ্গিত দেয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে নাট্যকার শম্ভু মিত্রের ‘অতুলনীয় সম্বাদ’ নাটকটির মধ্যে দিয়ে, যেখানে মানুষের জীবনযাপনের পুনরাবৃত্ত বা বারংবার ঘটেছে এমন কিছু একঘেয়েমির নাট্যরূপ দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে আধুনিক সভ্যতার যান্ত্রিক মানুষগুলোর ব্যস্তময় জীবনের মুহূর্তগুলো। যেখানে পরিচিত মানুষগুলি একে অপরের সঙ্গে দেখা হলে পাস কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আর যদি মুখোমুখি দেখা হয়েও যায় সেখানে কথা বলার অবকাশ তারা পায় না। আর অবকাশ পেলেও সেটা দায়সারা গোছের হয়। সেখানে একে অপরকে জানাতে চায় তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা কিংবা আভিজাত্যের কথা কিংবা নানা ধরনের জীবনযাপনযোগ্য প্রকরণসর্বস্ব প্রাচুর্যের কথা। নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, সমাজে বসবাসকারী আধুনিক সভ্যতার আধুনিকবোধ সম্পন্ন মানুষগুলি কতটা স্বার্থপর জালিয়াতি ও ধাপ্পাবাজি চরিত্রের। অথচ এই

স্বার্থপর জালিয়াতি ও ধাপ্পাবাজি চরিত্রের মানুষগুলির মুখে শোনা যায় আত্মপ্রশংসা— "সবাই পাজি, এক আমি ছাড়া।"[১] নাট্যকার শম্ভু মিত্র 'অতুলনীয় সম্বাদ' নাটকটির চরিত্রগুলির মধ্যে সমাজ কতটা স্বার্থপর জালিয়াতি ও ধাপ্পাবাজিতে ভরে গেছে তা নাট্যচরিত্রের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করেছেন—

"১ম : এ যা দেশ হয়েছে, বাঁচা যায় না।

২য় : রিয়েলি। একটা জিনিস পাওয়া যায় না (পকেট থেকে বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট বের করে) নাও।

১ম : আরে, এ ব্র্যান্ড পেলে কোত্থেকে অ্যাঁ

২য় : আমার ভগ্নীপতির—এমব্যাসির সঙ্গে একটু মাখামাখি আছে কিনা—"।[২]

নাটকের নামহীন চরিত্রগুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, দেশের প্রতি ভক্তিরস ও দেশপ্রেমের বুলি কিন্তু ভারতমাতা বা দেশমাতৃকার প্রতি তাদের মধ্যে কোনো রকমের শ্রদ্ধাশীল মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়নি। চোরাকারবারী, মুনাফাবাজী, কালোবাজারী, অসৎ পথে উপার্জন বা ঘুষ, অন্যায় কাজ করা, অন্যায় পথে চলা এসব ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। তাই নাট্যকার শম্ভু মিত্র সেই সমস্ত চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করেছেন তাঁর মনের কথা—

"১ম : কী বুঝছেন? দেশের হালচাল?

২য় : আর বলবেন না মশাই। সব ব্যাটা চোর সব।

১ম : যা বলেছেন। সবাই কেবল নিজের নিজের স্বার্থটা দেখছে।

দেশটার দিকে তো কেউ দেখছে না।

২য় : এই।

কর্মচারী : স্যার্—

২য় : কী?

কর্মচারী : (অনুচ্চ কণ্ঠে) স্যার, আপনি তো দু'হাজার বলেছিলেন?

—রাজি হচ্ছে না। বলছে, চার। দিলেই মাল না—দেখে পাশ করে দেবে। আর নইলে, বলছে পুরো লটকে লট ক্যান্সেলকরে দেবে।

২য় : ব্যাটা রাঘব বোয়াল। তুমি তিনে রাজি করাও।

কর্মচারী : সে হবে না স্যার।—মালও যে একদম ঝড়তি—পড়তিগুলো। গভর্মেন্টকে গছিয়ে দেওয়া ছাড়া ও স্যার কোথাও বেচা যাবে না।

২য় : (বিরক্তভাবে) দাও তবে চারই দাও—। এ দেশ যে কী করে চলবে! কারোর ওপরে বিশ্বাস করা যায় না মশাই!

১ম : যা বলেছেন। সবাই জোচ্চুরি করছে! সবাই ঠকাচ্ছে! এ দেশের কখনো ভালো হতে পারে কক্ষনো না।"[৩]

নাটকটিতে নাট্যকার শম্ভু মিত্র সমকালীন সমাজে নোংরা রাজনীতিতে ভরা দুর্নীতি এবং ব্যভিচারের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। যেখানে পুরোহিত বংশের আদর্শবাদের বুলি থাকা মানুষগুলি কিভাবে ব্ল্যাকমানিকে হোয়াইট করতে হয় তা কতকগুলি সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার নাট্যের মধ্যে সমাজ ও মানবিকতার অবক্ষয়ের চিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গেই নামহীন চরিত্রগুলির কণ্ঠে শোনা যায়—

"কর্মচারী : স্যার, বলছে যে হোয়াইটমানিতে যদি দেন তো তাহলে যেমন কথা হয়েছে—পাঁচেই হবে। কিন্তু যদি ব্ল্যাকমানিতে দেন, তাহলে যেমন বলছেন সেই রকম দুই বলে লিখে দেবো, কিন্তু সাড়ে ছয় দিতে হবে।

১ম : সাড়ে ছয়! মানে, তিন হাজার হোয়াইট করতে দেড় হাজার টাকা! এরা ভেবেছে কী? ন্যায়নীতি বলে কিছু নেই (হটাৎ স্বর পাল্টে ফেলে) বলো, ছয় দেবো।

কর্মচারী : (মাথা নেড়ে) নেবে না স্যার ।

১ম : (বিরক্তভাবে) দাও, তবে সাড়ে ছয় দাও। (ফিরে আসতে আসতে দ্বিতীয়কে) এ দেশ যে কী করে চলবে! কারোর ওপরে বিশ্বাস করা যায় না মশাই!

২য় : এই । আমি তাই খাতাপত্তর সব ক্লিনরাখি। নো ঘুষ, নো ব্ল্যাক্ মানি।

১ম : আমারও মতো তাই। অনেস্ট বিজনেস। নো ঘুষ, নো ব্ল্যাক্ মানি।

আমরা হলাম, বুঝলেন, পুরোহিত বংশ। আমাদের রক্তে কোনো লোভ নেই।"[৪]

নাটকটির রচনাকালে তৎকালীন সমাজে মানুষের মধ্যে যে কমিউনিস্ট চিন্তাভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল সেই কথাও নাট্যকার শম্ভু মিত্র এই নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন—

১ম : আমি তো দেখে শুনে কমিউনিস্ট হয়ে গেছি। মানে, কমিউনিস্ট ফিলজফিটা অ্যাডিট করছি।—সেদিন একটা বিরাট ইম্পালা এসে মারলে আমার স্ট্যান্ডার্ডটাকে! তারপর আবার আমাকেই তড়পাচ্ছে। বললাম—ডোন্টশাউট। ইয়োরডেজ আর নাম্বারড।

কমিউনিজম্ ইজ কামিং।—জাস্ট নাউ এইটাই সবচেয়ে প্রগ্রেসিভ আর মডার্ন্।"[৫]

নাট্যকার শম্ভু মিত্র 'অতুলনীয় সম্বাদ' নাটকটির মধ্যে একজন ছেলে (প্রেমিক) এবং একজন মেয়ের (প্রেমিকা) আচার আচরণের মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন যে, এরা একে অপরের প্রতি মন থেকে ভালোবাসে না। এমনকি তারা দু'জন একে অপরের প্রতি আন্তরিক নয়। তাদের প্রেম একটা অভিনয় মাত্র। একটা কৃত্রিম প্রেমের অভিনয়ে তারা মেতে থাকে। নাটকে ছেলেটির নাম অতুল আর মেয়েটির নাম অতুলনীয়া। অতুল ও অতুলনীয়া এরা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট নয়। এখানে প্রেমিক ছেলেটি মনে করে—"এই একটি মেয়েই একটু ভালো করে প্রেম করতে চায় বাকি সবাই কেবল খরচ করায়।"[৬] অনুরূপভাবে প্রেমিকা মেয়েটিও প্রেমিকের সম্পর্কে ভাবে—"এই একটি মাত্র ছেলেই একটু সিরিয়াসলি প্রেম করে বাকি সবাই একেবারে মৌমাছি—আমি খুব জানি। তাছাড়া এর কথা শুনে মনে হয় এরা খুব বড়ো লোক।"[৭]

নাটকে ১ম ভদ্রলোক হলেন অতুল নামে ছেলেটির বাবা এবং ২য় ভদ্রলোকটি হলেন অতুলনীয়া নামে মেয়েটির বাবা। অবশেষে ছেলেটির ও মেয়েটির বাবার উদ্যোগে অতুল ও অতুলনীয়া দু'জনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এটি একটি প্রেমহীন বিবাহ যেখানে প্রেমহীন সম্পর্ক নিয়ে দৈহিক ঘনিষ্টতায় দুইজন মিলিত হয়।

নাট্যকার শম্ভু মিত্র 'অতুলনীয় সম্বাদ' নাটকটির মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, প্রবাহমান সমাজব্যবস্থার নানা কৃত্রিমতা যা অমার্জিত ও অভদ্রতা আর স্বার্থপরতায় একেবারে পরিপূর্ণ। এখানে মানুষের মধ্যে কোনো সুস্থ চিন্তাভাবনা নেই, নেই কোনো জীবনের প্রতি

ভাবনা। কোনো প্রেম নেই, আন্তরিকতা নেই, নেই মানবিকতাও। ডাইমেনশনহীন এই নাটকটিতে উত্থান-পতন নেই, আছে শুধু মেকি আভিজাত্য, স্ব-স্বার্থ চালাকি, ধাপ্পাবাজি আর কৃত্রিম জীবনাচরণের মধ্যে যেন সমকালের অন্ধ রাজনীতির সুপরিস্ফুটন অনুষঙ্গ।

এই নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন বা অভাব। 'গর্ভবতী বর্তমান' নাটকটির মতো 'অতুলনীয় সম্বাদ' নাটকেরও চরিত্রগুলির কোন নাম দেওয়া হয়নি। আসলে 'গর্ভবতী বর্তমান' ও 'অতুলনীয় সম্বাদ' নাটক দুটির চরিত্রগুলির কোনো বৈচিত্র্য নেই। চরিত্রগুলি দমবন্ধ সমাজের দম দেওয়া পুতুলের মতো। এরা সবাই এক ও একাকার। এই জাতীয় চরিত্রের মানুষগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত অর্থাৎ পরস্পরকে পরস্পর থেকে পৃথক করা যায় না। সবাই মিলেমিশে একাকার। নাট্যকার শম্ভু মিত্র সমাজের এই ধরনের চেহারা দেখে যথেষ্ট ক্ষিপ্ত, রাগান্বিত ও নৈরাশ্য।

উৎসের সন্ধানে

১. শাঁওলী মিত্র : 'শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র'-২, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অতুলনীয় সম্বাদ নাটক, পৃ. ৪৬৪
২. তদেব : পৃ. ৪৬০
৩. তদেব : পৃ. ৪৬১
৪. তদেব : পৃ. ৪৬২
৫. তদেব : পৃ. ৪৬০
৬. জগন্নাথ ঘোষ : 'শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : জুন ২০১৬, পৃ. ৬৭
৭. তদেব : পৃ. ৬৭

মহাভারতের নবনির্মাণ : ‘প্রথম পার্থ’ ও ‘নাথবতী অনাথবৎ’

রঞ্জিত আদক

ভারতবর্ষের অতিপ্রসিদ্ধ দুই পৌরাণিক গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত। বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রথম দিকে এই দুই পৌরাণিক গ্রন্থের কাহিনি বা চরিত্র ব্যবহৃত হয়েছে বহু নাটকে। তারাচরণ শিকদারের ‘ভদ্রার্জুন’ নাটক থেকে শুরু করে হরচন্দ্র ঘোষ, মধুসূদন দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে ভক্তিবাদ দেখা গেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে পুরাণ এসেছে ভিন্ন মাত্রায়। আর রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে, যুগের রুচি অনুসারে নাটকে পুরাণ স্থান পেয়েছে। একালের মতো করে ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন এযুগের নাট্যকারেরা। বুদ্ধদেব বসু বা শাঁওলী মিত্র এদিক থেকে ব্যতিক্রম নন। বুদ্ধদেব বসুর ‘প্রথম পার্থ’ এবং শাঁওলী মিত্রের ‘নাথবতী অনাথবৎ’ নাটকে পুরাণের নবব্যাখ্যা স্থাপিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় বলতে পারি তাঁরা দুজনেই পুরাণের পুনর্জন্ম দিয়েছেন।

প্রথম পার্থ : বুদ্ধদেব বসুর রচিত ‘প্রথম পার্থ’ প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। নাট্যকার নাটকের কাহিনি গ্রহণ করেছেন মহাভারত থেকে। এই নাটকের চারটি প্রধান চরিত্র কর্ণ, কুন্তী, দ্রৌপদী, কৃষ্ণ যা মহাভারত থেকে গৃহীত। নাটকটির স্থান গঙ্গাতীরে এক বনভূমি। কাল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বদিন। নাটকটির কোনো অঙ্ক ভাগ বা দৃশ্য ভাগ নেই। শ্রেণির বিচারে এটি কাব্যনাট্য শ্রেণির। নাটকে দেখি কুন্তী এসেছেন কর্ণের কাছে তাঁর মাতৃত্বের পরিচয় নিয়ে। যে কুন্তী এতদিন নিশ্চুপ থেকেছে সেই তিনিই প্রকাশ করেছেন আসল সত্য। বলেছেন—

> আমিই তাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলাম/যাতে সে প্রকাশিত হতে পারে/যথাকালে, যথাস্থানে/দুর্জনের বিনাশের জন্য, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য/ভারতবংশের সেই প্রথম পার্থ, যার নাম/কর্ণ, পুত্র আমার![১]

দুর্বাসা যখন অতিথি হয়েছিলেন তাঁর পিতৃগৃহে তখন তিনি কুন্তীকে আহ্বান মন্ত্র শিখিয়েছিলেন, যার উচ্চারণে আকৃস্ট হবেন দেবতারা, তাঁর পুত্রের জন্মের জন্য। কুন্তী সেই মতো উচ্চারণ করেছিলেন সূর্য দেবকে স্মরণ করে। সূর্যের তেজঃপুঞ্জে কুন্তী হন গর্ভবতী। জন্ম হয় কর্ণের। জন্মের পর তিনি কর্ণকে জলের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। আর আজকে এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব দিনে মাতৃত্বের গৌরব প্রকাশ করে যুদ্ধ থেকে বিরত করার জন্য কর্ণের কাছে এসেছেন। তিনি জানতেন, অর্জুনের সমান বীর যদি কেউ থাকেন প্রতিপক্ষে তাহলে সে কর্ণ। কুন্তীকে বলতে শুনি—"কিন্তু তোমার কাছে আমি কর্তব্যবোধে আসিনি, কর্ণ, এসেছি রক্তের টানে, হৃদয়ের আজ্ঞায়।"[২] এসেছেন তিনি। কেননা যুদ্ধ হলে তাঁরই সবথেকে বেশি ক্ষতি, অর্জুন-কর্ণ দুজনই তাঁর সন্তান। রক্ত প্রবাহ হলে তাঁর নিজের রক্তপাত হবে। তাঁর মতামত তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন—"আমাকে দেখতে হবে পুত্রের হাতে পুত্রের রক্তপাত।"[৩]

কর্ণকে প্রস্তাব দিয়েছেন যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ হয়ে তাদের সঙ্গে থাকতে। যুধিষ্ঠির থেকে সহদেব প্রত্যেকেই তাঁর অনুগত থাকবে। অনুগামী হবেন অর্জুনও। এমনকি দ্রৌপদীকেও তিনি পত্নী হিসেবে পাবেন। কিন্তু কর্ণ অবিচল থেকেছেন তাঁর সিদ্ধান্তে। তিনি বলেছেন—"আমি শাস্ত্র মানি না; আমার ধর্মের নাম মনুষ্যত্ব।"[৪] যদি পাণ্ডবরা তাঁর ভাই হয় তবে কৌরবেরাও তাই। যদি মনু হন আদি পিতা তবে সকল মানব তাঁর ভাই। তাঁর ঘোষিত জন্ম হীন, কেননা তিনি অধীরথ ও রাধার পুত্র হিসেবে পরিচিত। তবুও দুর্যোধন তাঁকে আতিথ্য দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি তাই তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবেন না, অকৃতজ্ঞ হতে পারবেন না। স্পষ্টতই বলেছেন—"আমারও আছে তাঁর প্রতি কর্তব্য তিনি যেমনই হোন।"[৫] এতসব কিছুই হত না যদি কুন্তী তাঁর পরিচয় যথাসময়ে প্রকাশ করতেন। স্বয়ম্ভর সভায় কর্ণ তাঁর জন্মের জন্য অপমানিত হলেও নিশ্চুপ থেকেছে আর আজ এসেছেন মাতৃত্বের পরিচয় দিতে! কর্ণ তাই তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—"কিন্তু তবু আপনি নীরব ছিলেন, রাজপত্নী।/একমাত্র মা জানেন সন্তানের মাতা কে,/একমাত্র মা জানেন সন্তানের পিতা কে।[৬] তবুও কর্ণ, কুন্তীকে 'মা' সম্বোধন করেছেন। বলেছেন—"আমার সুন্দর স্বপ্ন হয়ে থাকবে তুমি, /যতদিন এই দেহে আছে নিশ্বাস।"[৭]

কিন্তু কুন্তীর প্রস্তাব মেনে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে বিরত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আসলে এই নাটকে নাট্যকার একদিকে যেমন অসহায় কর্ণকে দেখাচ্ছেন তেমনি অন্যদিকে কুন্তীর অসহায়তাকেও দেখাচ্ছেন। মায়ের হৃদয়ের রক্তক্ষরণকে দেখাচ্ছেন। যদি যুদ্ধ হয়, ফলাফল তার যাই হোক, তবু হবে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের হত্যা। তাঁরই দুই পুত্র অস্ত্র হাতে একে অপরের প্রতি। যা সহ্য করা কঠিন হবে তাঁর পক্ষে। আবার নাটকে দেখি দ্রৌপদী এসেছেন কর্ণের কাছে। যদিও তিনি বৈরীপত্নী, তবুও। দ্রৌপদী বলেছেন—"আমি জানি তোমার অধর্ম হবে/দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যদি যাও কখনও।/কিন্তু আছে এক অন্য পথ, তৃতীয় পথ;/সপক্ষে নয়, বিপক্ষে নয় বিবিক্ত।"[৮]

যদি নিরপেক্ষ থাকো, যদি অস্ত্র হাতে না নাও, তাহলে কেউ পারবে না কোনোদিন তোমাকে দোষ দিতে। শাস্ত্রও তোমাকে সমর্থন করবে। কিছু কর্ণ রাজী নন। যে তিনি সভামধ্যে অপমানিত শুধু তাঁর জন্মের জন্য, অযোগ্য বলে নয়, সেই তিনিই কি কখনও ভুলতে পারেন সে দিনের ঘটনা! দ্রৌপদীও ভালোভাবেই জানেন, শুধু কর্ণই আছেন পাণ্ডবের প্রতিশ্রুত শত্রু এবং

পরাক্রান্ত। কর্ণ বলেছেন শুধু গাছপালা, পতঙ্গ দিয়ে গড়া নয় পৃথিবী। এখানে আছে রাজা, রাজপ্রথা, শূদ্র, ব্রাহ্মণ। আছে ন্যায়, আছে অন্যায়। আর অন্যায় থেকেই অন্যায়ের জন্ম। তাই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। পাণ্ডবের পরাজয় ভেবে তুমি এসেছ আমার কাছে। যদি কৃষ্ণ তোমাকে বলে থাকেন পাণ্ডবের জয় নিশ্চিত তাহলে তুমি এসেছ কেন আমার কাছে পাণ্ডবের জয়ে কি তুমি সন্দিহান উত্তরে দ্রৌপদী বলেছেন—"আমি চাই কৌরবের পতন।/কিন্তু সেইজন্য কর্ণের আত্মাহুতি/আমার মনে হয়ে নিতান্তই অনর্থক।"[৯] কিন্তু সত্যিই কি তুমি বাঁচতে চাও না কর্ণ? কেউ নেই যাকে তুমি ভালোবাসো? কর্ণের জবাব—"আমি ভালোবাসার কাঙাল নই, দ্রৌপদী,/আমি আয়ুর ভিক্ষুক নই।"[১০] দ্রৌপদী তবুও আশাবাদী। বলেছেন—"কর্ণ, আমি তোমার বন্ধুতা চাই।"[১১] এরকম সংলাপ মহাভারতে কোথাও নেই। নাট্যকারের সৃষ্টি এইসব। দ্রৌপদীর প্রতি কর্ণের স্থির উচ্চারণ—"তুমি জেনো আমি পাবের বিপক্ষে আছি প্রতিশ্রুত আমার সব অস্ত্র নিয়ে, আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত।"[১২]

অতঃপর কৃষ্ণ এসেছেন কর্ণের কাছে। তিনি সন্ধি চান, যুদ্ধ নয়, কিন্তু সেই সন্ধি তখনই সম্ভব যদি কর্ণ অস্ত্র না ধরেন, বিপক্ষের হয়ে, যদি পাণ্ডবপক্ষে কর্ণ যোগদান করেন। তাহলে দুর্যোধন জয় অসম্ভব জেনে নিজেই চাইবে সন্ধি। ফলে আর যুদ্ধ হবে না। কিন্তু কর্ণ নিজ সিদ্ধান্তে অটুট। তিনি বলেছেন পরাজয় তাঁর চিরকালের সঙ্গী। পরাজিত হতে পারেন কিন্তু দুর্যোধনের প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারবেন না। দুজন নারী যাঁরা তাঁর সব হতে পারতেন তাঁরাও এসেছিলেন, তাঁর কাছে, তাঁদেরকেও ফিরে যেতে হয়েছে—

একজন : আমার অ-দৃষ্টা, অপরিচিতা আমার মা।

আর অন্যজন : আমার অপৃষ্ঠা, দূরচারিণী কান্তা, দুই নারী : আমি যাদের ভালোবাসতে পারতাম।[১৩]

পৃথিবীর প্রভুত্ব, উজ্জ্বল বংশপরিচয় ফিরিয়ে দিয়েছে কর্ণ। শুধু চায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ। কৃষ্ণ জানিয়েছেন—"এ যুদ্ধে সকলেই পরাজিত হবে, কর্ণ জয়ী, বিজিত, হত, উদ্বৃত্ত সকলেই।"[১৪] কিন্তু শুধু—"তুমি থাকবে বিশ্বমানবের স্মরণে-চিরকাল এক ভাস্কর, মহান, পরাজিত বীর।"[১৫] শেষে কর্ণ, কৃষ্ণকে আলিঙ্গান করলেন। বেছে নিলেন মহত্বকে তাঁর মৃত্যুর মূল্যেও। এভাবে নাটকটি শেষ হয়েছে। পুরাণে না বলতে পারা সবকথা নাটকের চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন নাট্যকার। আর এখানেই পুরাণের পুনর্জন্ম হল।

নাথবতী অনাথবৎ : শাঁওলী মিত্র নাটকটি লেখেন ১৯৮৩ সালে। নাটকের আঙ্গিক কথকতা; নাটকে কথকের কোনো পরিচয় নেই; সে শুধুই কথক। গল্প শোনাতে চেয়েছে কথক দর্শক বা পাঠককে। গল্প বলে সে তার মন্তব্য প্রকাশ করেছে; সেই কথকতায় কথক তাঁর অনুভব প্রকাশ করেছে মাত্র। কখনো ব্যঙ্গ, কখনো রসিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। কাশীরাম দাস তাঁর কাছে কাশীদাদা, ইরাবতী হয়ে যান ইরাবতী দিদি। কথকের সঙ্গে আছেন এক জুড়ির দল। তারা গান-বাজনা করে কথকের সঙ্গে আবার কখনো কখনো অভিনয়েও সঙ্গ দেন। কথক তাঁর কথকতার পারদর্শীতায়, কল্পনার অভিনয়ের দ্বারা নাটকের চরিত্রগুলিকে দর্শক-পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেন। কাহিনি ও চরিত্র মহাভারতের। মহাভারতের একটিমাত্র চরিত্র দ্রৌপদীর দৃষ্টিকোণ থেকে সে যুগের সমাজকে, সময়কে দেখতে চেয়েছেন কথক। মহাভারতের বিশাল পরিধির মধ্যে কথক বেছে নিয়েছেন দ্রৌপদীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনিকে। একজন নারীর প্রতি অসম্মান, তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদাহানি গল্পের কথক দর্শক-পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। ১৯৮০-১৯৮২-র মধ্যে দু-তিনটি সামাজিক ঘটনা আঘাত

করেছিল নাট্যকারকে। সে তিনটি কাহিনি নাটকের 'কিছু প্রাসঙ্গিক কথা' অংশে নাট্যকার জানিয়েছেন। এই তিনটি কাহিনিতেই নারীর অমর্যাদা-অসম্মান প্রতিভাত হয়েছে। যে কোনো সহৃদয় হৃদয়সংবেদী মানুষের আত্মাকে আঘাত করে সেইসব ঘটনা। এইসব ঘটনার পরোক্ষ প্রভাব হয়তো নাট্যকারের ওপর পড়েছিল তাই হয়তো তিনি নাটকে দ্রৌপদী চরিত্রটিকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর কথকতার মধ্যে দিয়ে মহাভারতের সবথেকে উপেক্ষিতা, অপমানিতা নারীর কথা দর্শক-শ্রোতাকে শোনাতে চেয়েছেন। সমাজে বেঁচে থাকতে হলে কোনো ধর্ম বা লিঙ্গ নয়, মানুষ হয়ে বেঁচে থাকাটাই অন্যতম শর্ত। জীবন সহজ-সরল হয় না, নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতা আসে জীবনের চলার পথে। সেই পথে চলতে গেলে বিচার-বোধের প্রয়োজন হয়। এই যুগের দৃষ্টিভঙ্গি, বিচারবোধ দিয়ে তাৎকালীন সময়কালকে ধরেছেন তাঁর কলমে। এই নাটক অভিনয়ে তিনিই কথক, তিনিই দ্রৌপদী; তিনিই শাঁওলী মিত্র, এক অভিন্ন সত্তা। এক অনাথিনী যিনি নাথবতী অর্থাৎ দ্রৌপদী, তাঁর কাহিনিই শাঁওলি মিত্র কথকতার ঢঙে তুলে ধরলেন। তাঁর সঙ্গা দিল শুধু জুড়ির দল। নাটকটি দুটি অর্ধে বিভক্ত প্রথমার্ধ এবং দ্বিতীয়ার্ধ। প্রথমার্ধের শুরুতেই নাট্যকার বলেছেন—

> এ নাটকটি লেখা হয়েছে কথকতার ভঙ্গিতে। এর চরিত্র একটাই কথক কথকঠাকুরণ। এ মেয়েটির কিছু বলতে ইচ্ছে করেছে মহাভারতের এক প্রধান চরিত্র দ্রৌপদীকে আশ্রয় করে সে তার কথা বলতে চেয়েছে।[১৬]

এই মেয়েটির গল্প বলার ভঙ্গীই নাটককে পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। আর তার সঙ্গে যোগদান করেছে 'জুড়ির দল' তারা গান গায়, বাজনা বাজায়, কখনো-বা প্রয়োজনে কথকের অভিনয়ে সাথ দেয়। কথক দর্শক-পাঠককে বাবুমশাই বলে সম্বোধন করেছে। একেবারে প্রথমেই বলেছে—"গড় হয়ে নমস্কার করি গো মশায়রা। কাহিনী তো খুঁজে পাই না! কী যে বলি..."[১৭] তারপর সুর করে ছড়া কেটে বলে—"মহাভারতের কথা অমৃত সমান/যুগে যুগে হয় তার নতুন ব্যাখ্যান,/হয় নতুন ব্যাখ্যান!"[১৮] হ্যাঁ এটাই আসল কথা। মহাভারতকে যুগে যুগে নতুনভাবে উপস্থাপন করা চলে। সময়োপযোগী করে তার ব্যাখ্যা করা চলে। নাটকের কথকও এযুগের মতো করে তাকে দেখেছেন, তার বিচার করেছেন।

নাটকটি অভিনয়ের জন্য লেখা। নাট্যকার স্বয়ং কথকের ভূমিকায় প্রেক্ষাপট বলে যাচ্ছেন। আর বলার সময় কথকের ভাষা তীক্ষ্ণ। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা হবে। সেখানে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে লক্ষ্যবস্তুকে যে ভেদ করতে পারবে দ্রৌপদী তার গলায় মালা দেবে। সেই সভায় উপস্থিত সব বড়ো বড়ো বীর, ক্ষমতাবান মানুষ। শল্য, শাল্ব, দুর্যোধন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, জয়দ্রথ, বিরাট রাজা—কে নেই সেখানে! সবার ধারণা এমন সুন্দরীকে জীবনে পেতেই হবে! সামান্য একটা লক্ষ্যভেদ করে নিলেই এই প্রাপ্য অতি সাধারণ বিষয়, তাই প্রত্যেকেই আগে ধনুক ধরতে চায়। লেখিকার ভাষায়—

> রাজারাজড়াদের আত্মবিশ্বাস তো অসীম! সব পুরুষ মানুষ যে! তারা ভাবে কীভাবে যাব, জয় করব, মালাটি পরব, কন্যেটিকে চেপে ধরব হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলে আসব।[১৯]

লক্ষ করার বিষয় এখানে লক্ষ্যবস্তু ভেদকে লেখিকা 'আকাশযন্তর' নাম দিয়েছেন যা মহাভারত বহির্ভূত। এমন করে ১৫ দিন কেটে গেল। ১৬ দিনের দিন দ্রুপদ রাজার ছেলে

ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর দাদা, দ্রৌপদীকে নিয়ে এল। আগুনের মতো রূপ তাঁর। সবাই সেই রূপে আকৃষ্ট। চেষ্টা করল অনেক বীর, সেই ধনুককে তুলে ধরার কিন্তু পারল না। এমনকি দুর্যোধনও যেতে চেয়েছিল। সে বলেছে 'হাম্ যায়েগা!' এখানে লেখিকা সমকালের ভাষা আরোপ করেছেন নাটকে। তাদের মধ্যে শুধু কর্ণ এসে ধনুকটা তুলেছিল। কিন্তু দ্রৌপদী তার গলায় মালা দিতে চায়নি, তাই কর্ণেরও তীর ছোঁড়া হল না। সবাই ব্যর্থ। কথক বলছেন—"কেউ তো পাশ করতে পারছে না! সব একেবারে ফেলুরাম!"[২০] শেষে দর্শকাসনের মধ্যে থেকে উঠে এল এক ব্রাহ্মণ দর্শক, যিনি অর্জুন; যাকে দেখে দ্রৌপদী মোহিত। লক্ষ্যভেদ হল, মালা পরাল দ্রৌপদী—অর্জুনকে।

এই মাল্যদানের পর ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণদের হাতাহাতি শুরু হল রাজসভায়। কৃষ্ণ মধ্যস্থতা করার আগেই অর্জুনের হাত ধরে ভালোবাসার নীড় রচনা করবে বলে দ্রৌপদী বেরিয়ে পড়েছে। যুধিষ্ঠির ও অন্য চার ভাই-এর সঙ্গে দ্রৌপদী কুন্তির কুটিরে প্রবেশ করতে না করতে, কুন্তি বলে দিল 'যা এনেছ, পাঁচজনে মিলে ভোগ কর বাবা!' নাটকে কথক বলছেন, দ্রৌপদী বড়ো অভাগা। তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না! স্থির হয়ে গেল দ্রৌপদী পাঁচজনের ভোগ্য বস্তু, কুন্তী দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে তাঁর মন্তব্যের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করলেও, যুধিষ্ঠির সিদ্ধান্ত নেয় দ্রৌপদী সবার হবে, যদি না হয় তাহলে ভাইয়ে ভাইয়ে সুসম্পর্ক থাকবে না! ব্যাসদেবের মধ্যস্থতায় একে একে পঞ্চপাণ্ডবের সবার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল দ্রৌপদীর, দ্রুপদ রাজার রাজপুরীতে। ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় পাশাখেলায় উপস্থিতি হয়েছে যুধিষ্ঠির সহ পাঁচ ভাই, সঙ্গে দ্রৌপদী। এই পাশা খেলা থেকেই আজকের দিনে গোটা পৃথিবী জুড়ে জুয়া খেলায় মেতে উঠেছে সবাই। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির খেলার পণ রেখেছে চার ভাইকে, এমনকি নিজেকেও, শেষে সর্বস্বান্ত হয়ে দ্রৌপদীকেও। কিন্তু কোনো ভাই প্রতিবাদ করেনি। কেননা জ্যেষ্ঠ ভাই যুধিষ্ঠির। আর সবাই কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠের বলার অধিকার নেই। শেষপর্যন্ত দ্রৌপদীই প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে—

> ধর্মরাজ কি নিজেকে পণ রাখার পূর্বে আমাকে পণ রেখেছিলেন? না পরে, যদি পরে হয় তাহলে আগেই তিনি আমার ওপর অধিকার হারিয়েছেন। সেই অনুসারে আমি সভায় যেতে বাধ্য নই।[২১]

শুধু তাই নয়, দ্রৌপদী আরও বলেছে যে, সে রজস্বলা, একবস্ত্রা। তাকে যেন সভায় সবার সমক্ষে নিয়ে না যাওয়া হয়। মহাভারতে এরূপ কাহিনি নেই। তবে অবশ্য সেই সভায় ক্রোধে উন্মত্ত ভীম প্রতিবাদ জানিয়েছিল। বলেছিল ধর্মরাজ, দ্যুতকারেরা তাদের বেশ্যাকে পর্যন্ত কখনো পণ রাখে না আর আপনি পাঞ্চালীকে পর্যন্ত পণ রেখেছেন! আপনার হস্ত দগ্ধ করব। উন্মত্ত ভীমকে এই কর্ম থেকে নিবৃত্ত করেছে অর্জুন। বীরপুরুষ হয়েও কাপুরুষের মতো সভায় দ্রৌপদীর অসম্মান চুপচাপ মেনে নিয়েছে। সেই দ্রৌপদী যে কিনা সব থেকে বেশি ভালোবেসেছিল অর্জুনকে! দুর্যোধন, কর্ণ সবাই দ্রৌপদীকে 'বেশ্যা' বললেও অর্জুনের কণ্ঠস্বর প্রস্ফুটিত হয়নি। মহাভারতে এরূপ শব্দের প্রয়োগ হয়নি। শুধু তাই নয় নাটকে কর্ণ বলেছে—"যাও, দুঃশাসন যাও, ঐ নারীর বস্ত্রহরণ কর এই সভায়, সবার সামনে। আমরা সব দেখি।"[২২] মহাভারতের কর্ণ এমন কথা বলেননি। দুর্যোধনের ভাই বিকর্ণ এবং কাকা বিদুর শুধুমাত্র তাদের মতামত ব্যক্ত করেছিল কিন্তু তাদের মতামতকে গ্রাহ্যই দেওয়া হয়নি। স্বভাবতই

সভামধ্যে অপমানিতা পাঞ্চালীর পাশে আর কেউ নেই। শেষ পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্র প্রজা বিদ্রোহের ভয়ে দ্রৌপদীকে সব ফিরিয়ে দিল। কিন্তু দ্রৌপদীকে যেতে হল বনে।

নাটকের দ্বিতীয়ার্ধে বনবাসী, দুঃখিনী, অভাগিনী দ্রৌপদী। পঞ্চপাণ্ডবদের অন্য সব বউ ছিল সুভদ্রা, দেবিকা, বিজয়া প্রমুখ। শুধু বনবাসী হয়েছিল দ্রৌপদী অর্জুনকে কাছে পাবে বলে। বীর অর্জুনকে বরণ করেছিল সে। অথচ যুধিষ্ঠির বড়ো, তাই বিয়ের পর ঘর করতে হল যাকে ভালোবেসেছিল, যার গলায় মালা দিয়েছিল, তার সঙ্গে নয়, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে, যুধিষ্ঠির থেকে শুরু করে বয়ঃক্রমানুসারে এক এক ভাইয়ের সঙ্গে এক এক বছর ঘর করেছে দ্রৌপদী। নিয়ম করে দেওয়া হয়েছিল যে, এক ভাইয়ের সঙ্গে বসবাসের সময় যদি অন্য কোনো ভাই ঐ শয়ণকক্ষে কোনোক্রমে প্রবেশ করে তাহলে তাকে বারো বছর ব্রহ্মচারী হয়ে বনে বাস করতে হবে। প্রথম বছরেই বাধ্য হয়েছিল অর্জুন যুধিষ্ঠিরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে, তাই তার হল বনবাস। সকলের সঙ্গে ঘর করা হল সবার বিছানাসঙ্গিনী হল সে। কিন্তু যাকে ভালোবেসে মালা পরিয়েছিল শুধু তার সঙ্গেই ঘর বাঁধতে পারেনি পাঞ্চালী। অর্জুন কিন্তু বনে গিয়েও সঙ্গিনী পেয়েছে উলুপী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা। অর্জুন যখন ফিরে এসেছে বন থেকে তখন দ্রৌপদী চার সন্তানের মা। অর্জুনও একা আসেনি, সঙ্গে এসেছে সুভদ্রা। অর্জুনের পাশে সুভদ্রাকে দেখে যন্ত্রণাবিদ্ধ দ্রৌপদী তখনও আশা করেছে নীড় রচনার।

কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞের জন্য দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়েছে অর্জুন। কৃষ্ণার জন্য কতটুকু সময় দিয়েছে সে কাপুরুষ অর্জুন সেদিনও চুপ থেকেছে। যেদিন সভার মধ্যে তাকে অপমান করা হয়েছিল, আর আজও চুপ! উঠে দাঁড়িয়েছিল ভীম। যাকে হয়তো সেভাবে জীবনে গ্রহণ করেনি পাঞ্চালী। এই দ্রৌপদী কিন্তু মহাভারতের নয়! একালের দ্রৌপদী। তাইতো প্রতিবাদী সে—"আমি দ্রুপদের কন্যা, আমি মহাত্মা পান্ডুর পুত্রবধূ, আমি ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগ্নী, আমি দেবঔরসজাত পঞ্চস্বামীর পত্নী! আমার কেন এমন দশা? কেন এত কষ্ট সহ্য করতে হবে আমাকে?"[২৩] শুধু তাই নয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেও কথা শোনাতে ছাড়েনি সে। বলেছে—"তুমি তো শাস্ত্র জান, শাস্ত্রে তো বলেছে যে দ্যূতক্রীড়া করা অন্যায়। তবু তো তুমি পাশা খেলেছিলে!"[২৪] বারবার অপমানিতা কৃষ্ণা মহাভারতে মুখ বুজে থেকেছে। নাটকে নাট্যকার কিন্তু কৃষ্ণাকে মৌন রাখেননি। প্রথম থেকে যেভাবে অপমানিতা সে, তার বর্ণনা দিয়েছেন—দুঃশাসন কৌরবসভার মধ্যে তার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছে। দুর্যোধন সভার মধ্যেই উরুর কাপড় সরিয়ে তাকে ইঙ্গিত করেছে। কর্ণ আর দুর্যোধন তাকে বেশ্যা বলেছে, দুঃশাসন বস্ত্র ধরে টেনেছে। কীচক তাকে ভোগ করতে চেয়েছে। এভাবে যতবারই সভামধ্যে অপমানিতা হয়েছে সে ততবারই সেখানে উপস্থিত থেকেছে পঞ্চপাণ্ডব। প্রতিকার চেয়েও প্রতিকার পায়নি। ব্যতিক্রম ভীম, তাইতো ভীমের বুকে মাথা রেখে কাঁদতে পেরেছে সে। কৃষ্ণ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মযুদ্ধের কথা জানিয়েছে; কিছু ন্যায় তো হয়নি দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে তাই প্রতিবাদী পাঞ্চালী বলে—

> আমি যদি আমার ব্যক্তিগত অপমান ভুলে যাই সখা কৃষ্ণ, তাহলে কি ধর্মরাজ্য আসবে পৃথিবীতে? তুমি কি এই অঙ্গীকার করতে পারো, যে তাহলে আর কোনো নারী ভবিষ্যতে অনুরূপভাবে লাঞ্ছিতা হবে না, উৎপীড়িতা হবে না।[২৫]

এরূপ জিজ্ঞাসা নেই মহাভারতে! তাই দ্রৌপদীর সব শূন্য মনে হয়। সব অর্থহীন মনে হয়। মনে হয় তার জীবন তো কোনো সার্থকতা পেলো না! নাট্যকার বলেছেন—"মহাভারতে

দ্রৌপদীই হল 'নাথবতী অনাথবৎ'/'নাথবতী অনাথবৎ ও দ্রুপদকন্যা/জীবনভর পেলে তুমি অসহযন্ত্রণা/নাথবতী অনাথবৎ।' "[২৬] দ্রৌপদী যে কষ্ট ভোগ করেছিল, সে বড়ো বাস্তব কষ্ট, সে এই মাটির কষ্ট, এই কষ্ট যদি কেউ বুঝেছিল, সে হচ্ছে ভীম। কেননা যে অর্থে দ্রৌপদী এই মাটির মেয়ে সে অর্থে ভীমও এই মাটির সন্তান। মহাপ্রস্থানের পথে যখন দ্রৌপদী চলল পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে তখন এক ধূসর প্রান্তরে ক্লান্ত দ্রৌপদী পড়ে গেল, পড়ে গিয়ে বুঝতে পারল তার পঞ্চস্বামী চলে যাচ্ছে, কেউ ফিরে আসছে না, শুধু ব্যতিক্রম ভীম। ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলে দ্রৌপদী সতী, দ্রৌপদী অতুলনীয়া তবু সে কেন লুটিয়ে পড়ল? যুধিষ্ঠির বলেছে—"দ্রৌপদী সর্বাধিক ভালোবেসেছিলেন অর্জুনকে, সেই পাপে।"[২৭] সত্যিই তো ভালোবেসে বরমালা পরিয়েছিল দ্রৌপদী অর্জুনকে। কিন্তু অর্জুন কাকে ভালোবেসেছিল? তাঁর জীবনে তো অনেক নারী— উলুপী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা প্রমুখ। সে কি সত্যিই, কাউকে ভালোবেসেছিল? নাকি কৃষ্ণ ছাড়া তার মনের কেউ হদিশ পায়নি? এসব প্রশ্ন নাট্যকার কথকের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তবে হ্যাঁ, দ্রৌপদী যাকে হয়তো সে অর্থে ভালোবাসেনি। সেই তাকে সবথেকে বেশি ভালোবেসেছে, যত্ন করেছে তার। অসম্মানের প্রতিশোধ নিয়েছে। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কীচক, জয়দ্রথ সবাইকে শাস্তি দিয়েছে। মহাপ্রস্থান কালেও কৃষ্ণাকে ছেড়ে যায়নি ভীম। বারবার সমব্যথী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে—"কৃষ্ণা! তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে কৃষ্ণা!"[২৮]

তাইতো দ্রৌপদী তার এই জন্মের ভুল পরজন্মে ঠিক করে নিতে চায়, কাপুরুষ, অর্জুনকে নয়, পঞ্চস্বামীর কাউকে নয়, বীরপুরুষ ভীমকেই শুধুমাত্র স্বামী হিসেবে চেয়েছে। সুন্দরের প্রতীক ফাল্গুনীকে নয়, বিভৎসতার প্রতীক ভীমই হোক তার জীবনকাঙ্খিত পুরুষ—"আর জন্মে তুমি কেবল আমার হোয়ো ভীম।"[২৯]

উৎসের সন্ধানে

১. বুদ্ধদেব বসু : 'অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ', দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৭, পৃ. ৮৫
২. তদেব : পৃ. ৯৫
৩. তদেব : পৃ. ৯৭
৪. তদেব : পৃ. ৯৯
৫. তদেব : পৃ. ৯৯
৬. তদেব : পৃ. ৯৭
৭. তদেব : পৃ. ১০৬
৮. তদেব : পৃ. ১২৫
৯. তদেব : পৃ. ১২৭
১০. তদেব : পৃ. ১২৭
১১. তদেব : পৃ. ১২৮
১২. তদেব : পৃ. ১২৯
১৩. তদেব : পৃ. ১৩৮
১৪. তদেব : পৃ. ১৫৫
১৫. তদেব : পৃ. ১৫৬
১৬. শাঁওলী মিত্র : 'নাথবতী অনাথবৎ', মিত্র ও ঘোষ পালবিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪২৩, পৃ. ১৯
১৭. তদেব : পৃ. ২১
১৮. তদেব : পৃ. ২১
১৯. তদেব : পৃ. ২৩
২০. তদেব : পৃ. ৩০
২১. তদেব : পৃ. ৪৩
২২. তদেব : পৃ. ৪৬
২৩. তদেব : পৃ. ৫২
২৪. তদেব : পৃ. ৫৩
২৫. তদেব : পৃ. ৬২
২৬. তদেব : পৃ. ৬৪
২৭. তদেব : পৃ. ৬৭
২৮. তদেব : পৃ. ৬৯
২৯. তদেব : পৃ. ৭০

‘অগ্নিজাতক’ : আলোকজ্যোতি ভাবনা
আশিস রায়

অগ্রিম বুকিং চলে সব জিনিসের। যেটা আপনি ভেবেও উঠতে পারবেন না, সেই জিনিসেরও। এতদিন ধরে আপনার যে ধারণা ছিল সেই ধারণাও বদলে যাবে। বদলে দেওয়া হবে। বিশ্বাস ছিল এটা ভগবানের দান। সময় হলে তবেই পাওয়া যাবে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় এসে আমরা ভগবানকেও হারিয়ে দিয়েছি। হারিয়ে দিয়েছি সুপার পাওয়ারকেও। হারিয়ে দিয়েছি পুরানো ধ্যান-ধারণাকে। এর জন্য কি বা কতটা ক্ষতি হল সে নিয়ে আমাদের খুব মাথাব্যথা নেই বললেই চলে। চাই শুধুমাত্র নিজের বা নিজেদের ইচ্ছাপূরণ করতে আর এই চাওয়াতেই নিজেদের এবং সমাজের কতটা ক্ষতি করে ফেলছি সে দিকে তাকানোর অবসর আমাদের কাছে নেই। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি সন্তান ভূমিষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের খুব তাড়া। আমরা জন্মাষ্টমীর দিনই আমাদের সন্তান চাই। কৃষ্ণ যেদিন জন্মেছিলেন সেইদিন আমার সন্তান হলে, সেও কৃষ্ণের মতোই হবে। বিশেষ বিশেষ দিনে আমাদের আবদার একটু বাড়ে, এই আর কি! সুতরাং হুড়মুড়িয়ে চলছে আগাধ টাকা দিয়ে ও.টি বুকিং। অথচ সন্তানটির ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় এখন নয়। আমরা সময় অসময় বুঝি না। আমরা শুভ দিন-ক্ষণ বুঝি, পঞ্জিকা বুঝি আর বুঝি সিজারিয়ান। ফলটা যে কতটা মারাত্মক ক্ষতি, সেটা ক্ষতি হওয়ার পরেই বুঝতে পারি। এটারই সাবধান বাণী শুনিয়েছেন নাটককার ঈশিতা মুখোপাধ্যায় ‘অগ্নিজাতক’ নাটকে।

মণিকা এবং বিমান একটি টিভির নিউজ রুমে কাজ করে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসছে এবং টেলিফোন মারফৎ যে সংবাদ আসছে সেই সংবাদ নিউজে দেওয়া হয় না। কোনো পাত্র যে বিবাহের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে চাইছে তো আবার কারো বাড়ি ছ’ইঞ্চি পেয়ারা গাছে দশ ইঞ্চি পেয়ারা ধরেছে। বিমান মজা করে মণিকাকে বলে পাত্রের খবরটা নিয়ে রাখতে, হয়তো তোমার

সঙ্গেই মানিয়ে যেত। দুজনের কথার মধ্যে হঠাৎ ফোন আসে মণিকা ধরেই জানতে পারে University-তে Bomb blasting হয়েছে এবং Sixteen Students dead এই খবরটা কভার করার জন্য এডিটর স্যার তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মণিকা তাদের ইন্টারভিউ নিচ্ছে। বিমান ঘটনার নোট নিয়ে রাখছে। মণিকা আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে আসে। সে dead bodies-গুলো দেখতে পাচ্ছে। তার চোখগুলো অস্বাভাবিক রকম বড়ো হয়ে ওঠে। শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। মুখ থেকে যেনো তীব্র 'না' শব্দ বেরিয়ে আসে। সে আস্তে আস্তে বসে পড়ে। চারিদিক থেকে অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ, পুলিশের সাইরেন, কান্না, আর্তনাদ, আহতদের গোঙানি এসবটা মিলিয়ে বিভৎস একটা পরিস্থিতি। বিমান এগিয়ে এসে মণিকার চোখ দুটো ঢেকে তুলে ধরে।

মণিকা ফ্ল্যাটের ল্যান্ডিং এ দাঁড়িয়ে আছে। ভেতর থেকে হঠাৎ একটা বল গড়িয়ে আসে। আর পিছনে পিছনে একটা বাচ্চা ছেলে পিঠে স্কুল ব্যাগ নিয়ে ঢোকে। বলটা তুলে নিয়ে সে মণিকার দিকে লাজুক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। ছোট্ট বিম্বোই প্রথমে পরিচয় করে। মণিকা জানতে চায় তারা এই ফ্ল্যাটে নতুন এসেছে কিনা। মণিকা বিম্বোকে না দেখলেও বিম্বো মণিকাকে দেখেছে টি.ভি.-তে। স্কুল ছুটির পর ছেলেটা বাড়িতে এসেও ঘরে ঢুকতে পারছে না। অন্যদিন তার কাছে চাবি থাকে আজ সে চাবি নিতে পারেনি। বিম্বো বাড়ির কাজের মোক্ষদা মাসি মাঝে মাঝে একটু বেশি সময় অবধি থাকে। আজকে স্কুল বাস দেরি করে আসার জন্য, মোক্ষদা মাসি চলে গিয়েছে সে চাবি নিতে পারেনি।

দেব মণিকাদের আজকের কভারেজটা দেখেছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোলোজন তরতাজা ছেলেমেয়ে মারা গিয়েছে। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল পড়তে। মণিকা কোনোভাবেই এটা মেনে নিতে পারছে না। দেব বোঝায় সাংবাদিকদের এতটা ইমোশনাল হতে নেই। মণিকা বোঝে কিন্তু ভিতর থেকে তার কষ্ট হচ্ছে। এদের বাবা, মা, ভাই-বোন কারোর দিকে দেখা যাচ্ছে না। মৃত দেহগুলোর কাউকে চেনা যাচ্ছে না। চারিদিকে পড়ে আছে থকথকে রক্ত। জমাট বাঁধা কালচে রক্ত। আর মধ্যে দিয়ে মাঝখানে পড়ে আছে একটা বই, সদ্য কেনা বই, দেখলেই বোঝা যায়। অথচ বইটার কোনো ক্ষতি হয়নি। একফোঁটা রক্ত লেগে নেই কোথাও। আসলে মানুষ মানুষকে হত্যা করে কিন্তু শিক্ষা কখনোই কলুষিত হয় না। তাকে রক্তাক্ত করা যায় না। তাই শত রক্তাক্তের মাঝেও প্রকৃত শিক্ষা বেঁচে থাকে। যে অপরাধীরা এই নির্মম কাজটি করেছে, রক্ত না লেগে থাকা বইটাই তাদের শিক্ষা দিতে চাইছে, শিক্ষা প্রাঙ্গণে বোমা মেরে মানুষ মারা যায় শিক্ষা নয়। বইটা Milton-এর Paradise lost ভাবা যায়। আর বইটার পাশে পড়ে আছে একটা কাটা আঙুল। যেনো আঙুলটা বইয়ের পাতায় গোঁজা ছিল এতক্ষণ। কেউ যেনো বইটা পড়তে পড়তে মুড়ে রেখেছে পাতাটা। চোখ বন্ধ রেখেছে ক্ষণিক মুহূর্তের জন্য। কী ভীষণ দৃশ্য! খুব ভয় করছিল তার একা একা ফ্ল্যাটে ফিরতে। এক এক করে সমস্ত আলো জ্বেলে একা খেতে বসতে। সারাটা সময় ধরে সে দেবকেই ডেকে চলেছে। ভাগ্যিস বাচ্চাটা ছিল বলে সে ফ্ল্যাটে ঢুকতে পেরেছে। দেবও মণিকাকে ভালোবাসে যতক্ষণ তারা দুজনে একসঙ্গে থাকে, যতটুকু সময়, এই শহরটা তাদের কাছে বড়ো সুন্দর হয়ে ওঠে। পুলিশ ঘুষ খায় না, রাস্তার সব আলো ঠিকঠাক জ্বলে ওঠে, বাচ্চা ভিখিরিটা পেয়ে যায়

একটা আস্ত চাঁদিয়াল ঘুড়ি। রাতে আকাশ জুড়ে ভেসে থাকে অলৌকিক রামধনু। মণিকা দেবের কাছ থেকে আরও ভালো কিছু কথা শুনতে চায় এবং আজকের এই বিভৎস ঘটনা সে ভুলে থাকতে চায়। যা কিছু সুন্দর আর শুভ সময় তারা সেটাই দেখতে চাইছে। দুজনের মধ্যে কেটেছে শুভ সময় এবং মিলনও হয়েছে।

মণিকা বসে আছে ডাক্তার চেম্বারের বাইরে। চন্দ্রিমা ডাক্তার বাবুকে বোঝাতে চাইছে সে শুনতে পায়, স্পষ্ট শুনতে পায়, ও কথা বলছে এবং তার সঙ্গে। ডাক্তারের বক্তব্য চন্দ্রিমার advance stage চলছে। এইসময়ে নানা রকমের emotional ব্যাপার চলতে থাকে। চন্দ্রিমার কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না। ডাক্তারও না। কিন্তু সে শুনতে পায় তার বাচ্চা কথা বলছে, সমানে কথা বলছে। ডাক্তারের কাছে এটা very interesting এবং তিনি জানতে চাইছেন সে কী বলছে। চন্দ্রিমার বাচ্চা এটাই বলতে চাইছে সে আসবে না এই পৃথিবীতে। ককিয়ে উঠে বলছে মা আমাদের এনো না এই পৃথিবীতে। আমরা কেউ জন্মাতে চাই না। কেউ না। মা জোর করে আমাদের এনো না। আনতে চেও না। আমরা মরে যাব মা। এই সব কথা চন্দ্রিমা সহ্য করতে পারে না। ডাক্তার বাবু চন্দ্রিমাকে আশ্বাস দেয় যেহেতু সে advance stage-এ আছে সেজন্য দু-একদিন দেখে তারপর ceaser করে দেবেন। ডাক্তারবাবুকে থামিয়ে চন্দ্রিমা বলে ডাক্তারবাবু এমন করবেন না, ও মরে যাবে। আমার বাচ্চা বাঁচবে না। ও বলেছে জোর করে যদি আমি ওকে পৃথিবীতে আনি, ও মরে যাবে। ডাক্তারবাবু আমার বাচ্চাকে মারবেন না। চন্দ্রিমা কথা বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে যায়। বাইরে মণিকা বসে আছে তাকে দেখে চন্দ্রিমা বলতে থাকে তোমার তো তিনমাস। শুনবে, তুমিও শুনবে তোমার বাচ্চা কথা বলছে। ককিয়ে উঠে বলছে, মা আমি আসব না তোমাদের কাছে। কিছুতেই না। তুমিও শুনতে পাবে। আর দেখবে তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, তোমাকে পাগল বলবে। কিন্তু তাতে কারো কিছু যায় আসবে না। বলতেই থাকবে। মণিকা ডাক্তারকে একটা interesting তথ্য দিতে চাইছে। কিছুদিন আগে টি.ভি-র হয়ে অন্তঃসত্তা মহিলাদের ওপর একটা কাজ করছিলেন Mass Communication এর। তাতে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছে সে। অধিকাংশ গর্ভবতী মহিলা Exact সংখ্যাটা মনে নেই বোধ হয় seventy percent of them কোনো labour pain feel করছেন না আর তার জন্যই ceasar করতে হচ্ছে। তার ফলে ঘটছে মারাত্মক ঘটনা, অধিকাংশই বাচ্চা মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করছে। ডাক্তারের কাছে সবটাই অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয়। মণিকা আরও একটা তথ্য দিতে চাইছে, information suported by scientific datas। এটা তো সবাইকে মানতে হবে normal delivery-র সংখ্যা Abnormally কমে গিয়েছে। এমনটা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে কোনো মাকেই আর প্রসব বেদনা অনুভব করতে হবে না। ডাক্তার শুধু হাসছেন।

মণিকা এখন পূর্ণগর্ভা। বিম্বো মণিকাদের বাড়ি দুষ্টুমি করতে থাকে। বিম্বো জানতে চায় সে একা থাকে কেনও। তাকে আর বেশিদিন একা থাকতে হবে না। খুব তাড়াতাড়ি নতুন একজন বন্ধু আসছে। বিম্বো বলে তার বন্ধু এখন পেটের মধ্যে লুকিয়ে আছে। মণিকা বাচ্চাদের মতো করে হাত পা নেড়ে বলতে থাকে তোমার বন্ধু যখন পেটের মধ্যে খুব হাত পা ছুঁড়বে আর চেঁচাবে, বলবে মা আমার আর ভালো লাগছে না ভিতরে থাকতে। আমাকে বাইরে

বার করে দাও। এক্ষুণি বার করে দাও। সে তখনই বাচ্চাটাকে বাইরে নিয়ে আসবে।

মণিকার সঙ্গে এখন তার ভিতরে জন্ম নেওয়া ছোট্ট শিশুটি কথা বলতে থাকে। মণিকার ভিতরে বাড়তে থাকা বেবে বলছে তারা সকলে মিলে ঠিক করেছে তোমাদের পৃথিবীতে আর কেউ জন্মাবে না। কেউ না। জন্মানোর আগেই মারা যাব। মণিকা আর্তনাদ করে ওঠে, অমন কথা বলিস না। তোর নাম রাখব বেবে—তুই ছেলেই হোস বা মেয়ে। বেবেকে সে দেখতে পাবে না, এমনটা হয় নাকি। আর তোরা সকলে এত নিষ্ঠুর কেনো বেবে জানায় তোমাদের পৃথিবীটাকে আমরা কেউ ভালোবাসি না। ভালোবাসতে পারি না। তোমাদের পৃথিবীর বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারি না। আমরা জন্মালে তোমাদের পৃথিবীতে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসবে। আমরা মরে যাব। আমরা যতক্ষণ পেটের মধ্যে থাকি ততক্ষণ আমরা বুঝতে পারি, সব জানতে পারি। কিন্তু ভুলতে শুরু করি জন্মানোর মুহূর্ত থেকে। সেজন্য তোমরা আমাদের বড়ো করো। যেমন ইচ্ছা তেমন করো। যা ইচ্ছা তাই করো আমাদের দিয়ে। বেবেদের ইচ্ছে নয়, তোমাদের ইচ্ছেয় বেড়ে উঠতে হয় আমাদের। আমাদের কর্ম নয়, তোমাদের কর্ম ভোগ করি আমরা। পৃথিবীটাকে তোমরা যেমন ইচ্ছে তেমন রেখে যাও আর আমরা তার ফলভোগ করি, কষ্ট পাই। অথচ এর দায়িত্ব তো আমাদের ছিল না। এ সবটাই তোমরা করতে পারো শুধুমাত্র আমরা জন্মের মুহূর্তে সবটাই ভুলে থাকি সেজন্য। মণিকা ভাবতে পারছে না তার মধ্যে জন্ম নেওয়া শিশুটি এত বড়ো বড়ো কথা কোথা থেকে শিখেছে, এতটা নিষ্ঠুরের মতো কেন কথা বলছে। এই পৃথিবীতে সত্যিই কি ভালো কিছু নেই, যার জন্য এই বাচ্চাগুলো আসতে পারে। বেবের চোখে তেমন কিছু পড়ছে না। তার চোখে পড়ছে খিদে, রোগ, শোক, যুদ্ধ, রক্ত, হিংসা, মৃত্যু। বেবের কথার সঙ্গে যেনো মিলে যাচ্ছে university-র বোমায় আহতদের আর্ত চিৎকার, ইথিওপিয়ার দুর্ভিক্ষ গ্রস্থ শিশু, রোগে বিকৃত শিশু, সোমালিয়ার কঙ্কালসার মা ও সন্তান, ছিন্নভিন্ন শবদেহ, মন্দির-মসজিদ পোড়া, দাঙ্গারত মানুষ—একেবারে দমবন্ধ করা পরিবেশ। বেবের কাতর আবেদন আমাদের এই পৃথিবীতে আনিস না মা। আমরা কেউ আসব না এখানে। মণিকা আর সহ্য করতে না পেরে চুপ করতে বলে।

মণিকার কথা কেউ বুঝতে চাইছে না। বন্ধু বিমানও ভাবছে মণিকা কল্পনাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। imagine টাকে real বলে ভাবছে। এটা এক ধরনের psychic dis-order। মণিকা বলতে চাইছে একসঙ্গে এতজন মহিলা পাগল হয়ে গিয়েছে। এবং তারা সকলেই এক কথা বলছে। মণিকার কাছে তথ্য আছে গত তিন মাসে সাতশো কুড়ি জন মহিলার labour pain হয়নি বলে cesar করা হয়েছিল, এবং প্রত্যেকটা বাচ্চাই মৃত। বিমানের মতে এটা কাকতালীয় ঘটনা। বিমান বিষয়টা যতই সোজা করে দেখুক না কেনো। বিষয়টা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। তার ধারণা আমাদের এই অসভ্য পৃথিবীতে আর কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করবে না। মণিকা বিমানের সাহায্যে টিভির একটা প্রোগ্রাম করে সকল মাকে সচেতন করে সিজারিয়ানের বিরুদ্ধে তার আন্দোলন সোচ্চার করে তুলতে চায়। বিমান চিন্তায় পড়ে যায় সে কি করবে বুঝতে পারছে না। একটা টিভি শোয়ের ক্ষেত্রে ethical কতটা সঠিক সেটা বিচার করার প্রয়োজন আগে। মণিকা বিমানকে বোঝাতে চায়—

> মণিকা : বিমান, কেন বুঝতে পারছ না। সময় থাকতে থাকতে এখনও কিছু করা যায়। তুমি জানো সেই চন্দ্রিমা সান্যালের কথা। যে আমায় প্রথম বলেছিল তার বাচ্চা কথা বলে। তার খোঁজ নিতে গিয়ে কী শুনলাম জানো—চন্দ্রিমার কথাও তো কেউ বিশ্বাস করেনি। না তার বাড়ির লোকেরা না ডাক্তারেরা। বারণ করা সত্ত্বেও ডাক্তাররা জোর করে cesar করতে গিয়েছিলেন বলে nursing home-এর আটতলার cabin থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে মেয়েটি।[১]

মণিকার মধ্যে বাড়তে থাকা ছোট্ট শিশুটি বলে শুনছিস তো সব। কাল সে সব মাকে জানিয়ে দেবে তারা যেনো কেউ আর জোর করে তোদেরকে না আনে। যেনো অপেক্ষা করে তোদের স্বেচ্ছায় আসার দিনের জন্য। তোরা আসবি এই পৃথিবীকে ভালোবেসে। আসবি তোদের মাকে ভালোবেসে। বেবের উত্তর—

> বেবে : তোমাদের পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমাদের ভালো লাগবে। আচ্ছা, তুমি যখন ছোটো ছিলে কেমন, পৃথিবীটা তখন কেমন ছিল, আমাকে বলো মা?[২]

মণিকা মানুষ হয়েছে অনাথ আশ্রমে। তাকে বড়ো করেছে missionary sisters-রা। পড়িয়েছেন Convent-এ। মানুষ করে দাঁড় করিয়েছেন এই পৃথিবীতে। সে নিজেও বিশ্বাস করতে পারে না orphanage-এর কঠিন শৃঙ্খলে থেকে পড়াশোনা করেছে। সে একা লড়াই করে, একেবারে একা লড়াই করে এই পৃথিবীতে এসে দাঁড়িয়েছে। বেবের সপাট প্রশ্ন তুমি কি এদের ভালোবাসতে কি না। মণিকা তাদেরকে ভালোবাসার থেকেও বেশি ভয় করত। তার খুব ইচ্ছা করত sister Bertholonia-র কোলে দৌড়ে গিয়ে মুখ লুকোত। কিংবা অসুখ হলে Mother Supiror এর লম্বা সাদা পোশাকটা একহাতে চেপে ধরে ঘুমিয়ে পড়তে কিন্তু পরত না সে। সেজন্য মণিকা চায় বেবের মতো লক্ষ্মী সোনা এলে সে যা পাইনি আর যা ন্যায্য পাওনা সব একসঙ্গে দিয়ে দিতে। তাকে পেলে সে আর সব কিছু ফিরে পাবে। তার সেই ছেলেবেলা, ছেলেবেলার সেই প্রচণ্ড ভালোবাসার আগ্রহ—আর একটা মানুষের শরীরের ছায়ায় নিজেকে ঢেকে ফেলবার সেই প্রচণ্ড ছটফটানি। যে বেবে তার শরীরের মধ্যে বেড়ে উঠেছে তাকে দেখবে না এটা হতে পারে না। তোরা সকলে এত নিষ্ঠুর কেমন করে হলি। বেবের এসব কথা ভালো লাগছে না, তার এখন ঘুম পাচ্ছে। সে ঘুমাতে চায় হঠাৎ করে তার নাকে কিসের গন্ধ আসে। মণিকা জানিয়ে দেয় আজ বন্ধের দিন বাইরে কোথাও গোলমাল হচ্ছে এসব কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু বেবে বলে—

> বেবে : (মণিকাকে interrupt করে) আমার নাকে বারুদ আর রক্তের গন্ধ ভেসে আসছে। মা আমার দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গুলির শব্দে আমার কানে তালা লেগে যাচ্ছে। ও মা, জানলাটা বন্ধ করে দাও। ধোঁয়ায় আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ও মা। তুমি বন্ধ করো জানলাটা। এক্ষুনি বন্ধ করো। বন্ধ করে দাও।[৩]

মণিকা দ্রুত জানলা বন্ধ করে দেয়। বাইরের কোনো কিছুই আর তাকে বিরক্ত করতে পারবে না। বেবে জানায় শুধুমাত্র একটা জানলা বন্ধ করে দিলেই কি সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। জানলা বন্ধ করলে ঘরের মধ্যে আওয়াজ আসবে না, কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে এই সমস্যা থেকেই যাবে, আমার মতো হাজার বেবের তো এই সমস্যা থাকবে। যদি এই সমাজ

ব্যবস্থা ঠিক করতে না পারো তাহলে আমাদের মতো বেবেদের ডাকছ কেনো। ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত c-section এর একটি পরিসংখ্যা দেওয়া যেতে পারে—

Deliveries conducted at C-section during 2011-15[8]

Year	Total Deliveries	Cesarean Section	Rate
2011	8072	2286	28.32%
2012	7573	1860	24.56%
2013	7029	2110	30.01%
2014	7564	2736	36.1%
2015	7404	2929	39.5%
Total	37,642	11,921	31.67%

মণিকার T.V. interview আরম্ভ হয়েছে, সে বেশ উত্তেজিত। সে একটি পরিসংখ্যান দিয়েছে গত দুমাসে সাতশো কুড়িজন গর্ভবতী মা প্রসব বেদনা ভোগ করেননি বলে ডাক্তাররা জোর করে সিজার করেছেন আর তার ফলে প্রতিটি শিশু মৃত অবস্থায় জন্ম নিয়েছে। ডাক্তাররা তার এই প্রমাণ পাওয়ার পরেও সমস্ত কথা উড়িয়ে দেবেন। সমস্ত ভাবী মায়েরা তো আর উন্মাদ হয়ে যায়নি। তাদের প্রত্যেকের একটা অনুভূতির ব্যাপার আছে কিন্তু সে কথা কে শোনে। বিশ্ববিখ্যাত একজন ডাক্তার হরিশংকর মহান্তিরও মত তাই। এত বছর ধরে বিজ্ঞান চিন্তা করার পরেও জন্মরহস্য তাদের কাছে অসহায় হয়ে আছে। তাঁর মতে গর্ভস্থ সন্তান জ্ঞানী হতে পারে। বৌদ্ধ ধর্মমতে মানুষ পূর্বস্মৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অনেক কিছুই ভুলে যায় তবু থাকে কিছু সংস্কার যা পূর্বজন্মে সংহগৃহীত। জন্মান্তরবাদকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্যারাসাইকোলজি নামে বিজ্ঞানের শাখাটি তো নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে জাতিস্মরদের নিয়ে। মোহন্তির কথা শেষ হওয়ার আগেই টিভির প্রোগ্রামটা কেটে যায়। কেটে দেওয়া হয়। কেউ চায় না সারা পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্পন্ন মানুষেরা থাকুক। শেষ পর্যন্ত সে একটাই কথা বলতে চায় ভাবী মায়েদের জন্য, আমরা কেউ পাগল নই। যদি চান গর্ভের সন্তানকে বাঁচাতে তাহলে পালান এই খুনি ডাক্তার আর সমাজের থেকে। জোর করে আনবেন না আপনার সন্তানকে। বেবে অর্থাৎ তার গর্ভে যে রয়েছে সে বলেছে যে কোন একজন অ-জাত শিশুও যদি সিদ্ধান্ত নেয় পৃথিবীতে আসবে, তাহলে বাকি সবাই মেনে নেবে তার সিদ্ধান্ত— আসতে শুরু করার স্বেচ্ছায় কিন্তু তার আগে কখনোই নয়। সেক্ষেত্রে তারা মৃত্যুবরণ করবে তবু জন্মাবে না। ওদের সঙ্গে কথা বলে বোঝানো দরকার এই পৃথিবীতে আছে সুন্দর ও শুভ জিনিস। আমরা বড়োরা যদি না বুঝি তাহলে সত্যিই তো আমরা কোন পৃথিবী তাদের জন্য রেখে যাব। এই নোঙরা বিভৎস পৃথিবী। সুকান্তও তো এমনটাই চেয়েছিলেন—

> চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
> প্রাণপণে পৃথিবীর সবার জঞ্জাল,

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।[৫]

বেবেরা যেন এই পৃথিবীতে আসতে চায় না। মণিকা বোঝায় যারা পালিয়ে যেতে চায় তারা ভীতু।

বেবে : ভীতু? আমরা ভীতু তোমরা পৃথিবীটাকে যেমন ইচ্ছে তেমন করে রেখে যাবে আর, সেই জঘন্য পৃথিবীটাকে অস্বীকার করলেই আমরা ভীতু হয়ে যাব এতে তোমাদের কোনো দায়িত্ব নেই?

মণিকা : আছে বেবে, একশবার আছে, হাজারবার আছে। আমি তো একবারও অস্বীকার করিনি তা। কিন্তু একটা জিনিস পচ্ছন্দ নয় বলে সেটাকে অস্বীকার করব? সেটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব? face করব না? লড়ে পৃথিবীটাকে বসবাসের যোগ্য করে তুলব না? তোরা তো আমাদের থেকেও বেশি দায়িত্বজ্ঞানহীন বেবে। আমরা আমাদের ভুলে যা নষ্ট করেছি তোরা তোদের যোগ্যতায় তা ফিরিয়ে আনবি না বেবে, আমাদের পরে তোরা।[৬]

যে বেবে আসতে চাইছিল না এই নোংরা, পচা-গলা পৃথিবীতে সে এবার আসতে চাইছে তার মায়ের কথা শুনে, সে এবং তার মতো নবজাতকরা এই পৃথিবীকে বদলে দিতে চায়, মানুষের বসবাসের উপযোগী করে। এই সব দামাল ছেলেরাই তো সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো আছড়ে পড়বে পৃথিবীতে। অনেক খারাপের মাঝে একটু ভালো যা আছে, সেই ভালোকেই আলো করে তুলবে এরা। নতুনের কলতানে পৃথিবী আবার শস্য শ্যামলায় ভরে উঠবে। বুক ভরে বিশুদ্ধ বাতাস নিতে পারবে।

উৎসের সন্ধানে

১. ঈশিতা মুখোপাধ্যায় : 'অগ্নিজাতক', ব্রাত্যজন নাট্যপত্র, কালিন্দী ব্রাত্যজন, কলকাতা, পৃ. ১০৯
২. তদেব : পৃ. ১১০
৩. তদেব : পৃ. ১১০
৪. https://www.medpulse.in/Article/Volume3Issue9/MedPulse_3_9_16.pdf
৫. সুকান্ত ভট্টাচার্য : 'সুকান্ত রচনাবলী', সাহিত্যম, কলকাতা, পৃ. ১৯
৬. প্রাগুক্ত, সূত্র-১, পৃ. ১১৫

মুক্তিস্বাদ আস্বাদনে নারী : প্রসঙ্গ পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক

সৌভিক পাঁজা

নাটকীয় ধারায় ঝরে পড়ছে বৃষ্টি। নানা বর্ণে নানা ছন্দে। মেঘের কোল ঘেঁষে বয়ে চলা নদী পেয়েছে আপন গতি। শিক্ষার আলোকে নারী মন পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। নারী মনের নানান কথা নিয়ে পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ছ'টি নাটক। যেখানে মেয়ে-স্ত্রী-মা এই তিন পরিচয়ের মধ্যেও যে আত্মদর্শন লুকিয়ে থাকে তারই কথা বলেছেন পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখনও সাফল্যের সঙ্গো অভিনয় করে যাচ্ছেন মঞ্চে ও পর্দায়। খুব ছোটো বেলায় নাটকে হাতেখড়ি হলেও উত্তরণ ঘটে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পি টি এ—তে যোগ দানের পর। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে চলচ্চিত্রে ও বেতার নাটকে যোগ। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে নিজের তৈরি নাট্যদল 'শ্রুতি রঙ্গম' প্রতিষ্ঠা করেন এবং মঞ্চ সফল নাটকে দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

সমাজ তার নিজের প্রয়োজনে নারীকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে দিত। আবার তা যদি হয় কাজের মেয়ে তার অবহেলার কথা আমরা কম বেশি সবাই জানি। শিক্ষার আলোয় আলোকিত কাজের মেয়ে উমাকে নিয়ে 'উমার পৃথিবী' নাটক। নাটকে উমা এক গৃহস্থ বাড়ির চাকর। বাড়িতে আছে ছন্দা। ছন্দার বর ও দেওর। দেওর শঙ্করের খোঁচায় উমার লেখাপড়া শুরু করে। একটু একটু করে শিক্ষিত হয়ে ওঠে। উমার এই শিক্ষা ছন্দার শাশুড়ি ও বাড়ির হবু ছোটো বউ মেনে নিতে পারে না। উমা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। ঠিক সেই সময় ধ্বনিত হয়—

> লেখাপড়া শিখলে পৃথিবীর কত কিছু জানতে পারবি। লেখাপড়া শেখাটা তোর জন্মগত অধিকার। তুই নিজে শিখবি তোর মত যারা বাড়ি বাড়ি কাজ করে তাদের শেখাবি। লেখাপড়া না জানার জন্য আমাদের দেশের মেয়েরা কত অসহায়। তোর আশেপাশে একটু খবর নিলেই বুঝতে পারবি আর ওই ভাবেই বা বাঁচবি কেন! এটা তো হেরে যাওয়া। তোকে বাঁচতে হবে লড়াই করে।[১]

এই ধ্বনিত কথাটির মধ্য দিয়ে নাটককার মানুষকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। উমা পরাজিত হয়নি। নাটকের শেষে কাজের মেয়ে গোলাপি, বিন্দু, শেফালি, চঞ্চলাদের নিয়ে লেখাপড়া শেখায়। এবং সে ছন্দাকে লেখা চিঠিতে বাঁচার কথা বলে 'এবার আমি বাঁচব। সবাইকে নিয়ে লড়াই করে বাঁচব।' পাকা দেওয়ালের মধ্যে বসবাস করার কারণে আমাদের হৃদয় কঠোর হয়ে গেছে। শুধু পাকা দেওয়াল নয়, আমাদের মন চরা বালিতে আটকে আছে। ছন্দার শিক্ষায় উমা শিক্ষিত হলে ছন্দার মধ্যবিত্ত মনে হিংসে হয়—

> যখন ও পড়তে পারত না, তোমার দাদা তখন বলল ছন্দা সময় করে ওকে একটু পড়িও। তখন ওকে করুণা করে পড়াতাম, তাতে একটা মহত্ত্বের তৃপ্তি ছিল ধনীরা গরিবদের দান—ধ্যান করে যেমন তৃপ্তি পাই সেই রকম আর কি। নিজেকে খুব ঐশ্বর্যশালী মনে হতএখন হিংসে হয়। মধ্যবিত্তের হিংসে মনে হয় আমি যা জানতাম, একটা গ্রামের অশিক্ষিত মেয়ে আমার বাড়িতে কাজ করতে এসে সেগুলো জানছে, শিখছে, কিছু জেনেও ফেলেছে আদব-কায়দা, কথাবার্তা, চাল-চলন শিক্ষিতদের মতো হচ্ছে যাতে ওর কোন অধিকার নেই মনে হয় আমার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। তখন হিংসে হয়।[২]

ছন্দার শাশুড়ি উমার লেখাপড়া দেখে ঠাট্টা করে বলে 'বিদ্যে সাগরিকা'। নীলা ভয় পায় ছন্দা শিক্ষিত হয়ে হয়তো শঙ্করের প্রিয় হয়ে উঠবে। আভিজাত্য আর আপন স্বার্থের দ্বন্দ্ব উমাকে অশিক্ষার অন্ধকারে রাখতে চায়, পারে না। উমা যে বীরাঙ্গনা।

ঘটে চলা জীবনে নারী নির্যাতন কোনো নতুন ঘটনা নয়। নির্যাতিতের বাবা পুলিশের কাছে সুবিচার চাইলে, পুলিশ পরিহাস করে। আসলে পুলিশ তো রাজনীতির খেলার পুতুল। কিন্তু পুলিশের নিজের ক্ষেত্রে সমস্ত ঘটনা বদলে যায়। পুলিশের এই বর্তমান অবস্থার কথা নিয়ে তিনি লেখেন 'প্রমিলা পিঁয়াজী'। নাটকের প্রথম দৃশ্যে থানার ওসি একটি ছেলেকে ধরে আনে। টিজ করার অপরাধে। আসলে পুলিশ ভুল বুঝে। এমন সময় বান্ধব পল্লির এক অসহায় বাবা মেয়ের অত্যাচারের প্রতিকার চেয়ে পাঁচুর নামে অভিযোগ করে। সে সরকার বাবুর লোক। পুলিশ তাকে ধরতে পারে না। পুলিশ এখন অসহায় গোলাম। পুলিশের উপর নেমে আসে দুর্যোগ। অলোকের ছেলে স্কুলে, বউ বাজারে অপমানিত হয়। অপমান সহ্য করতে না পেরে অলোকের স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে দেশের বাড়ি চলে গেছে। শর্ত পুলিশের চাকরি ছাড়লে তবে সংসারে ফিরবে। আর বিকাশের স্ত্রী বলে "পাহাড়ে চড়া মেয়ে আমি, ভয় ডর আমার নেই, তোমার এই গোলামির চাকরি নিজের হাতে আমি ঘুচিয়ে দেব।" বিকাশের কথায় উঠে আসে দেবাসুরের কথা—

> ভেবে কোনও লাভ নেই অলোক, এ এক অদ্ভুত স্বর্গ অসুরের আত্যাচারে অভিযোগ পেয়ে তুমি যদি তাদের গ্রেপ্তার করো, তোমার ওপর ইট বৃষ্টি হবে দেবতারা এসে অসুরের মুক্তি চাইবে সুতরাং চেপে যাও তুমি দেখ নাই কিছু শোনো নাই কিছু শোনো নাই কিছু।[৩]

ওসি বিকাশের মেয়েকে পাঁচু নির্যাতন করলে পুলিশ তাকে ধরে আনে। সরকারবাবু পাঁচুকে ছাড়াতে থানায় আসে, এই বিষয়টিকে নাটককার দেবাসুরের রূপকে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু পুলিশ তাকে ছাড়ে না। তার নিরাপত্তার কথা ভেবে, রাতের অন্ধকারে তাকে ছেড়ে দেয়। তার মৃতদেহ পাওয়া যায় মুণ্ডেশ্বরী খালের ধারে। সরকারবাবু অ্যারেস্ট হয়।

থানায় প্রমিলারা পুষ্প বৃষ্টি করে। অলোকের সংলাপে যেন লেখকের কথাই ধ্বনিত হয়—"মনে হয় বাড়িতে আমাদের যারা কন্ট্রোল করে, তারাই বোধ হয় এখন গোটা এলাকা কন্ট্রোল করছে।" নচিকেতার গানে বৃদ্ধ বাবা মায়ের যে যন্ত্রণা তা আমদের আঘাত করলেও আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে পারেনি। কারণ দিন দিন আশ্রমের সংখ্যা বেড়ে চলছে। বাবা মাকে আশ্রমে পাঠানোর জন্য আমাদের সামাজ বেশিরভাগ সময় মেয়েদের (স্ত্রী) দায়ী করে। একথা মেনে নেওয়া যায় না। ছেলেরাও সমান ভাবে দায়ী। 'অসমাপ্ত' নাটকে অসহায় শাশুড়িকে সাহায্যের জন্য ছেলের বউ স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিদেশ থেকে দেশের বাড়ি কলকাতায় ফিরে আসে।

মা বাবা তাঁর অপূর্ণ আশা পূর্ণ করতে চাই সন্তানকে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে তারা বাবা মাকে আশ্রমে পাঠিয়ে দেয়। অনেক সময় তাদের ত্যাগ করে। যে সময় তাদের প্রয়োজন পরিবার, সন্তানের স্নেহ সেই সময় তারা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করে। অসহায়ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ও পথ ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে একান্ত আপন। 'অসমাপ্ত' নাটকে রাহুল তাঁর বাবার সম্পত্তি বিক্রি করে মাকে বিদেশ নিয়ে যাওয়ার কথা বলে এয়ারপোর্টে রেখে বিদেশ চলে যান। কর্মচারী কৃষ্ণপদের চেষ্টায় রাহুলের স্ত্রী কৃষ্ণা সমস্ত ঘটনা জানতে পারে। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফিরে আসে কলকাতায়। শাশুড়িকে ফিরিয়ে দেয় তাঁর বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়ি। ছেলে নিজের ভুল বুঝতে পারে। কলকাতায় ফিরে এসে নতুন জীবন শুরু করে। নাটকের শুরুতে 'আশায় আশায় ভবে আসা আসা মাত্র হলো' শাক্ত পদটির অপূর্ণ আশা নাটকের শেষে পূর্ণ হয় কৃষ্ণার প্রচেষ্টায়। সে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়েছে। বাঁচিয়েছে অন্য এক নারীকে। সাঁতার প্রতিযোগিতার মেডেল কৃষ্ণাকে সংসার জীবনে জয়ী করেছে।

নারীর প্রধান পরিচয় মা। সন্তানের শত অপরাধ মাথা পেতে সহ্য করে। শাক্ত পদকর্তা রামপ্রসাদ সেন বলেছেন 'কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা কুমাতা নয় কখনো তো।' আদি মধ্যযুগ অতিক্রম করে বর্তমানে মায়ের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। বাৎসল্যের ধারা আজও ফল্গু নদীর মতো প্রবাহমান। কিন্তু নদী পথকে রুদ্ধ করে বাঁধ তৈরির মতোই মাতার চরিত্রের ঘটেছে পরিবর্তন। 'একুশ শতকের মা' ও 'রায় দেবে কে' দুটি নাটকে দুটি ভিন্ন ধরনের মাতৃ চরিত্র পাওয়া যায়।

'একুশ শতকের মা' নাটকে মা তার ছেলের জন্য চোখের জল ফেলেছে 'আর রায় দেবে কে' নাটকে মা তার মুক্তির জন্য নিজের ছেলেকে হত্যা করেছে। 'একুশ শতকের মা' নাটকে ভালোবাসার আড়ালে রয়েছে স্বাক্ষরতার কথা। অন্ধ কানন ফুল বিক্রি করেও পড়তে চেয়েছে, যোগান দিয়েছে পিতার খাবার। ভালোবেসেছে অরুণকে। অরুণ মাস্টার মশাই। সে মদ্যাসক্ত গদাই এর বিরুদ্ধতা করে। গদাই তা মেনে নিতে পারে না। প্রতিশোধ নেয় কাননকে হত্যা করে। এ হত্যা পাশবিক অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত নারী হত্যা। কিন্তু গদাইয়ের মা সেতো মা। তার আর তো অন্য পরিচয় নেই। তাই সে হত্যাকারী ছেলেকে স্নেহ করে। আবার হত্যাকারী ছেলের মৃত দেহ নিয়ে বসে থাকে। নাটকের শেষে তারই কণ্ঠে শোনা যায় মুক্তির কথা, সে বলে 'তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমি মুক্তি চাই আমি মুক্তি চাই।' প্রত্যেক নারী মনে লুকিয়ে

থাকে মুক্তির স্বাদ। পারে না সে পাখি হয়ে উড়ে যেতে গভীর বনে। মায়ার শিকলে বাঁধা তাদের জীবন। এই মায়ার বন্ধন থেকেই তারা—"যার অপার শুভ্র করুণা মানব জীবনে প্রভাত সূর্যের মতো কিরণ দেয়, বিতরনে কার্পণ্য করে না, প্রতিদান চায় না উন্মুক্ত, উদার কম্পিত আগ্রহে আপনাকে বিলাতে চাই।"[৪] 'রায় দেবে কে' নাটকে দুর্গা, চোর সুলতানের (মোহন) মা। তার বাবা প্রাণের ভয়ে চোরের বংশে মেয়ের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেও চোরদের সংসারে কাটিয়ে দেয় ত্রিশটা বছর—

> সে এক ইতিহাস, সহদেববাবু বলতে গেলে দিন কাবার হয়ে যাবে। শুধু এইটুকু জানুন, আপনি যেমন বাঁচার জন্য চুরির বালাটাকে শর্ত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, আমার বাবাও বাঁচার শর্ত হিসাবে আমাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, আজ ত্রিশ বছর ধরে এই যন্ত্রণা ভোগ করছি, আর পারছি না।[৫]

সে প্রাণের বিনিময়ে মুক্তি পেতে চাইলেও প্রাণের লোভে বেঁচে থাকে। পুলিশ সহদেব সুলতানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করলে, তার চাকরি চলে যায়। অপমানে সহদেব গ্রাম ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আর গ্রাম ছাড়ার আগে সহদেব প্রাণের ভয়ে সুলতানকে চুরি করা বালা ফিরিয়ে দিতে আসে। সহদেবের পরিচয় পেয়ে দুর্গা মুক্তি চাই। বন্ধু ও সাথী হয়ে জীবন কাটানোর কথা বলে। নাটকের শেষে ছেলেকে হত্যা করে দুর্গা, নতুন জীবনের সন্ধানে সুলতানের সঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করে। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—"আমরা নিশ্চিন্তে এলাকা পেরিয়ে যাবসুলতানের ঘুম আর কোনোদিনই ভাঙবে না।" দুর্গা সুপ্রাচীন কাল থেকে অসুররদের নিধন করে আসছে। আপন শক্তিতে। তবুও আমাদের সমাজে নারীদের জীবন না দিয়ে বাধা। এই অচলায়তনের প্রাচীর একটু একটু করে খসে পড়ছে। চোখের জলে পাল তুলেছে জীবন তরী।

পণপ্রথার কুফল নিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন 'বলিদান' নাটক। নাটকে করুণাময় তার তিন মেয়েকে পাত্রস্থ করতে গিয়ে, তাদের জীবন বলিদান দিতে বাধ্য হয়। একারণে নাটককার বলেছেন 'বাংলায় কন্যা সম্প্রদান নয় বলিদান।' পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তবে কেমন হত' নাটকে পণপ্রথার কুফলের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন। পটলের বাবা ছেলের বিয়েতে অনেক টাকা পণ চাই। ছেলে মালে পরিণত হয়। নাটকের শুরুতেই ঘটকের কণ্ঠে শোনা যায়—

> এনেছি সওদা বিয়ের বাজারে/এমন পাত্র বাপু মেলে না হাজারে/মায়েরা বাপেরা শোনো কে কোথায় আছো/সুযোগ এসেছে তোমরা পুচ্ছ তুলে নাচো/বহু পুঁথি পড়ে বাছা হয়েছে বিদ্যান/সরকারি চাকুরি করে বেড়েছে যে মান/বহু টকা খরচ করে করেছি মাল পয়দা/মেয়ের বাবা তরে যাবে পেলে এমন সওদা/মাল দেখে শুনে নেবে বলছি সজোরে/মেয়ের বাবা ধ্বসবে এ মাল পড়লে নজরে।[৬]

'তুমি শুধুই মাল' ছেলের বাবার এই কথা শুনে দর্শক আসনে বসে থাকা পিতাদের অনুশোচনা হলেও বেশিরভাগ বাবা ভুল পথে হাঁটে। পটলের সম্বন্ধ হয় পুঁটির সঙ্গে। পুঁটির বাবা পণ দিতে পারবে না। অথচ পুঁটি ও পটল উভয়কে ভালোবাসে। পটলের মা পণের বিরোধিতা করে। তাঁর জীবনেও পড়েছে পণ প্রথার কুফল। এই প্রথার ফলেই তার কেরানির সঙ্গে বিয়ে হয়। নতুবা অন্য কোন ভালো ঘরে তাঁর বিয়ে হতো। পটলের মায়ের কথায়

সেই আক্ষেপ ধরা পরে "আজ যদি আমার বাবার ক্ষমতা থাকত তোমার মতো নুন আনতে পান্তা ফুরনোর হাতে পড়তাম না।" পটল ও পুঁটি বিয়ের কথা তারা জানতো না। তা জনতে পাড়ায় মায়ের সমর্থনে পটল পুঁটিকে বিয়ে করে।

হাস্যরসাত্মক সংলাপ প্রয়োগ করে নাটককার দর্শকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন নারী মনের গোপন কুঠির। যে কুঠিরে অন্ধকার নয় আছে আলো। যে আলোয় মেয়ে তার বাবার দুঃখে কাতর হয়ে, ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে, পুত্রবধূর পিতার দুঃখ অনুভব করে। বিনা পণে ছেলের বিয়ে দেয়। পণ প্রথার যে জাগরণ গিরীশ যুগে শুরু হয়ে ছিল, সে জাগরণ আজও বাংলাসাহিত্যকে নানাভাবে ভাবিয়েছে। রচিত হয়েছে একাধিক নাটক উপন্যাস ছোটোগল্প। আসলে আমাদের দেশের নারীরা ছিল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। তারা যন্ত্র থেকে মানুষ হতে চাইছে, আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পড়িয়ে দিচ্ছে লক্ষণ গন্ডি। একুশ শতকের নারী শিক্ষিত হয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলেও গন্ডির রেখা একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি।

পুতুল খেলার নারী সময়ের পালাবদলে নিজেকে সুতোর বন্ধন থেকে ছিন্ন করে পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। সমাজ হয়তো উচ্ছন্নে গেল বলে হাহুতাশ করতে পারে। করতে পারে অভিযোগ। কিন্তু থামতে তারা জানে না। চরৈবেতির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তারা কখনো সমাজ বন্ধন ছিন্ন করে আবার কখনো বা সমাজের বন্ধন স্বীকার করে মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছে।

উৎসের সন্ধানে

১. পরাণ বন্দোপাধ্যায় : 'উমার পৃথিবী', "পরাণ বন্দোপাধ্যায় নাটক সমগ্র", দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃ. ২৮
২. তদেব : পৃ. ২১
৩. পরাণ বন্দোপাধ্যায় : 'প্রমিলা পিঁয়াজী', "পরাণ বন্দোপাধ্যায় নাটক সমগ্র", দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃ. ৪২
৪. পরাণ বন্দোপাধ্যায় : 'একুশ শতকের মা', "পরাণ বন্দোপাধ্যায় নাটক সমগ্র", দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃ. ১৮৩
৫. পরাণ বন্দোপাধ্যায় : 'রায় দেবে কে', "পরাণ বন্দোপাধ্যায় নাটক সমগ্র", দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃ. ২৩০
৬. পরাণ বন্দোপাধ্যায় : 'তবে কেমন হত', "পরাণ বন্দোপাধ্যায় নাটক সমগ্র", দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃ. ১৮৭

সময়ের অমেয় আঁধারে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের ‘অন্যভুবন’ নাটক : একটি সমীক্ষা

গোলক পতি ধল

রুস নাট্যকার লেবেডফের এর হাত ধরেই বাংলা নাটকের শুভ সূচনা। একথা কোনো দিনই ভুললে হবে না। আর এই বাংলা নাটকের পথকে প্রশস্ত করেছে তৎকালীন বিশিষ্ট নাট্যকারগণ। তারপর উঠল পালা বদলের ঢেউ, পরাধীনতা, বঙ্গ-ভঙ্গা, বিশ্বযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, ষড়যন্ত্র, মামলা নিয়ন্ত্রণ আইন, ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, কোম্পানি থিয়েটার সর্বত্র। আর এই পালাবদলের সুরে আগুন জ্বালিয়েছিলেন রাজনৈতিক পরিস্থিতি। তৈরি হল গণনাট্য, নবনাট্য, গ্রুপ থিয়েটার। তখন নাটক হয়ে উঠল মানুষের জীবনের বৈচিত্র্য কাহিনির প্রতিচ্ছবি আর এই নাটকেই অবলম্বন করে নাট্যশীল মানব মনের চৈতন্যের জাগরণ ঘটিয়েছে। আর এই জাগরণের জোয়ারে একুশ শতকের নাট্য ভাবনা চিত্রপটে স্থান করে নিয়েছে।

একুশ শতকের প্রথম দশকে এলেন এক ঝাঁক নুতন নাট্যকার। তাদের মধ্যে অন্যতম নাট্যকারগণ হলেন ব্রাত্য বসু, তীর্থঙ্কর চন্দ, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় প্রমূখ। যারা এই সাময়কার বাংলা নাটককে নাড়িয়ে দিলেন কাঁপিয়ে দিলেন। এই একুশ শতকের একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। কবিতার ছত্রে, সাহিত্য হাত পাকিয়ে নাটকের মধ্যে উপস্থাপনা করেন তিনি। তার বিশিষ্ট নাটকগুলি হল আকরিক, অন্তরাল, চারণকবি, মনস চক্ষু, রোমিও জুলিয়েট, ম্যাকবেথ, বঙ্কুবাবুর বন্ধু, ধ্রুবতারা, প্রতিপক্ষ, প্রেমসূত্রম, অন্যভুবন। এক সময়ে বিল্বমঙ্গল নাটকটি রচনা করেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, আর একুশের দশকে এই নাটককে কেন্দ্র করে তাকে অন্যখাতে বইয়ে দিয়েছেন এ সময়ের অন্যতম নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। নাটকটির নাম দিয়েছেন বিল্বমঙ্গাল কাব্য। নাটকটি পরিচালনাও করেছেন তিনি। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবশঙ্কর হালদার।

নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ যোগ্য পূর্ণাঙ্গ নাটক অন্যভুবন। তিনি কলকাতার একটি পুরানো বাড়ির পারিবারিক কলহকে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনি বর্ণিত। আজকের দিনে পারিবারিক কলহ একটা অতি সাধারণ ব্যাপার হলেও নাট্যকার এই সাধারণ ঘটনাকে বাস্তবজীবনের এক অসাধারণ রোমাঞ্চকর কাহিনি দর্শক মন্ডলের কাছে পরিবেশন করেছেন। নাট্যকার নাটকের চরিত্রচিত্রণে একদম বাস্তবসমাজের চরিত্রগুলিকে তুলে এনেছেন। এই নাটকে কল্যাণ চরিত্রটি যেন আমাদের সমাজের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তা এবং যার মধ্যে এখনও আত্মগরিমা এই বৃদ্ধ বয়সেও সমপরিমাণে বর্তমান। তাই কল্যাণ এক প্রকার মনের কষ্ট নিয়ে বলে—

> কল্যাণ : বৃদ্ধদের কথা কেউ মনে রাখে না রে দিদিভাই। না পরিবার, না গভর্নমেন্ট। তার উপর লাইফসেভিং ড্রাগের কল্যাণে মরণও দূর অস্ত। (পৃ. ১১৬)

এই বৃদ্ধের সংসারে পুত্র নাতি নিয়ে এক ভরা সংসার হলেও সে যেন আজ বৃদ্ধ বয়সে একা। একেবারে একা। কল্যাণের পুত্ররাও নিজ নিজ চরিত্রে খুব স্পষ্ট এক বাস্তব চরিত্র হয়ে উঠেছে। এই নাটকে বৃদ্ধের দুই ছেলে গাবলু ও ভোম্বল। এরা তাদের বাড়ির নিয়ে এবং তাদের বাড়ির ভাগাভাগির অংশ নিয়ে প্রতিনিয়তই সংসারে কোলাহল লাগিয়ে রাখে। যেমন এক বৌমা ললিতা শ্বশুর মশাইকে নালিশ জানায়—

> ললিতা : আপনাকে বিহিত করতে হবে বাবা, এই প্রীতির জ্বালায় আমি তো আর পারছি না। দোতলার বারান্দায় ব্যাপারে একটা বন্দোবস্ত করুন বাবা। ওর বারান্দার দিকে এত টপ বসিয়েছে আর তাতে কীটনাশক স্প্রে করে!
>
> প্রীতি : আমি তো তোমার অংশে টব বসাই না। (পৃ. ১২০)

এই ললিতা ও প্রীতির মধ্যে প্রতিনিয়তই ঝগড়া লেগেই থাকে যা আমাদের পরিবারের একদম বাস্তব চিত্র। বর্তমান যুগের এই চিত্র নাট্যকার অত্যন্ত সুন্দর ভাবে নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন যা বর্তমান যুগের দর্শকদের নিজের ঘরের কথা মনে করিয়ে দেয়। আবার পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পুত্র ও দুই ছেলের মধ্যে এক তুমুল বচসা সৃষ্টি হয়।

> কল্যাণ : এ বাড়ি আমার।
>
> ছিটকিনি : মানে গুবলুদা মালিক নন
>
> গাবলু : আবার গুবলুদা বলে! বাবার ছেলে তো আমি, না কি?
>
> ছিটকিনি : না-না একটা ঝনঝাটের গন্ধ পাচ্ছি গাবলুদা।
>
> ভোম্বল : আমি প্রতিবাদসভা করব, জনমত সংগঠিত করব। এটা হেরিটেজ হাউস হবে। গর্ভনমেন্ট টাকা দেবে। ট্রাস্টি বোর্ড করে দেব, আর বেচতে পারবে না। (গোবলু ও ভোম্বলের মধ্যে বিতন্ডা শুরু হয়।) (পৃ. ১২২,১২৩)

আজকের দিনে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে যেই গণ্ডগোল আমরা সমাজে দেখতে পাই নাট্যকার সেই গণ্ডগোলকেই এই নাটকে এনে বসিয়েছেন। আর নাটকের কাহিনি নাট্যকার এমনভাবে বর্ণনা করেছেন এ যেন বর্তমান বাংলা এক হয়ে উঠেছে দর্শকের কাছে। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় ভেলুর মা ললিতার এক রিয়েলিটি শো-তে অংশগ্রহণ করতে যাওয়ার জন্য একদম আনন্দে আত্মহারা।

ভেলু : তারা বাংলায় 'বঙ্গের বধু চ্যালেঞ্জ' প্রতিযোগিতায় মা কনটেসটেন্ট হতে চলেছে। জিতলে পাঁচভরি সোনার গহনা, দশটা শাড়ি।

ললিতা : (আনন্দে যেন উড়ছে) আর গিফট হ্যাম্পার-এর তো শেষ নেই। (পৃ. ১২৫)

নারী যে লোভী, লোভ যে তার চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, নাট্যকার এই ললিত চরিত্রটির মধ্য দিয়ে যা অতীব স্পস্ট করে তুলেছেন। নাট্যকার উক্ত নাটকে যে সমস্ত অপ্রধান চরিত্রগুলি নির্মাণ করেছেন তাদের সংলাপ তাদের চরিত্রের সঙ্গো অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জোজো : ওই যে সামনের উঠোনটা—বুঝলেন শ্যামদা, ওটা নো-ম্যানস ল্যান্ড। পাড়ার লোকজন ওটা দিয়ে শর্টকাট করে।

সরপুরিয়া : ইন্টারেসটিং!

ঘনশ্যাম : ঘরটার কি হাইট দেখেছেনইনক্রেডিবল। (পৃ. ১২৮)

সমাজের এই শিক্ষিত লোকের সুখের কথার বাওয়ালি যে মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে তাদের বক্তব্যকে শ্রোতার কাছে রমনীয় করে তোলে সেই ভাষায় নাট্যকার এই অপরাধ চরিত্র গুলির মুখের ভাষা করে তুলেছেন। নাটকটির আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় এই নাটকের সমস্ত বিষয় সমাজ থেকে সংগৃহীত করেছেন এবং সমাজের একটি পরিবারের সমস্যার দ্বারা এ নাটকের গতি নির্ণয় করেছেন। যৌথ পরিবারের অবলুপ্তি এবং সংসার ক্রমশ ছোটো থেকে আরও ছোটো করার প্রবণতায় এখন সবচেয়ে বেশি প্রকট যা এই নাটকেও পরিলক্ষিত।

নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় তার নাটকের সংলাপ ব্যবহারের দিকে অত্যন্ত সচেতন ভাবে দেখেছেন যে আয়োজকের আজকের দিনে নাটক আর কেউ কাব্যাকারে লিখছেন না, আজকের দিনে কাব্যের ভাষার পরিবর্তে নাট্যকারেরা মুখের ভাষায় সংলাপ লেখেন—

ভবদুলাল : হাউস ওয়াইফরা শুনেছি ক'বছর বাদের ঘ্যানঘ্যানে প্যানপ্যানে হয়ে যায়। সাইক্রিয়াটিস্ট দেখাতে হয়। ভালো সাইক্রিয়াটিস্টের ভিজিট প্রচুর।

কচি : আমার অবশ্য বিয়ে করার শখ।

ভবদুলাল : কর না। সারাদিন ইললিগ্যাল ফস্টিনস্টি না করে— ('কি নিলে ফাউ', পৃ. ১৩)

যদিও নাট্যকার কিছু ভাষা সাহিত্য থেকে নিলেও নাট্যকার যখন সংলাপ রচনা করেছেন তখন চরিত্রটার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। চরিত্রটির কি বলা উচিত ও তার সংলাপ কি হওয়া উচিত নাটক গুলির পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ ও ক্রিয়াকলাপী নাটক। নাটক উত্তীর্ণ হওয়ার প্রথম শর্তই হল সংলাপ। সংলাপ নাটকের প্রাণ। সংলাপের মধ্যে দিয়েই নাটক জীবন্ত রূপ লাভ করে। নাটকের বিষয় যাই হোক না কেন তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নাটকের সংলাপ। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে সংলাপের দাঁড়ায় বিশ্ব সাহিত্যের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। নাটকের সাফল্যের মূলে রয়েছে সংলাপ।

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের সংলাপ মূল ভূমিকা নিয়েছিল। নাটকগুলিকে দর্শন ও পাঠকের কাছে প্রাণবন্ত করতে তার সমস্ত নাটকে সংলাপের মাধ্যমেই নাট্যরস ধর্মকে তিনি সার্থক করার চেস্টা করেছেন। যেমন তার হাসির নাটক কি নিলে ফাও ওরাল ও বেয়াক্কেল

এর মতো নাটকগুলি নাট্য চরিত্র ও সংলাপের দাঁড়ায় পাঠক ও দর্শকের কাছে গ্রহণীয় হয়েছে। তার নাটকের সংলাপে যেন চরিত্র ঘটনা বিষয় প্রকরণ সমস্ত কিছুই ছড়িয়ে গেছে। তার নাটকে জীবন যত সমস্যা নানা দ্বন্দ্ব জটিলতা বাস্তবতা ও এই জীবন সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ সমস্তই তার নাট্য সংলাপের ঘনীভূত ব্যবহারের নাটকগুলোকে এক বাস্তবমুখী জীবন্ত নাটক করে গড়ে তুলেছে।

নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় এর কয়েকটি উদ্ভট চরিত্র বাদ দিলে বাকি চরিত্রগুলিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন। নাটকে তাদের আচরণ বাস্তবতার নিয়ম কানুন মেনেই নিয়ন্ত্রিত। যেখানে অন্যান্য নাট্যকারের চরিত্রে কিছু অবাস্তব ও উদ্ভট অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হয় সেখানে এই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় তার নাটকের চরিত্রগুলিকে আমাদের সমাজের আমাদের পরিবারের চারিত্রিক আচরণের রূপদান দিয়েছেন। মানুষের জীবন কোনো নির্দিষ্ট একটা ছকে বাধা যায় না। তার জীবনে বহুস্তর মাত্রা রয়েছে। বহুমাত্রা ও বহুস্তর নিয়েই মানুষের সম্পূর্ণতা। বরফের টুকরো জলে রাখলে যেমন ভেসে ওঠে তেমনি তার অর্ধেক অংশ জলের তলায় থাকে। সেইরূপ তার নাট্যচরিত্র গুলিকেও তিনি এমন ভাবে অঙ্কন করেছেন যাদের বৈশিষ্ট্য কিছু নাটকে পরিলক্ষিত ও প্রকাশ পায়। কিন্তু বেশিরভাগ অংশেই সেই চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করতে উদ্‌ঘাটিত হবে। নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় চরিত্রচিত্রণে এক নতুন ভাবনা ও নতুন পন্থা অবলম্বন করেছেন। তার চরিত্রগুলি বেশিরভাগই বর্তমান সমাজের এক অতি পরিচিত আমাদের চরিত্র।

উৎসের সন্ধানে

১. উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় : 'তিন নাটক', কলাভৃত পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ২০০৭
২. উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় : 'তিন-টি সরস পূর্নাঙ্গ নাটকের সংকলন', কলাভৃত পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ২০১০
৩. অজিতকুমার ঘোষ : 'নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ', দে'জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০
৪. সুনীল দত্ত : 'নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর', জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭
৫. সুনীল দত্ত : 'বাংলা পৌরাণিক নাটক', নান্দনিক, ১ম সংস্করণ, ২০০৪
৬. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় : 'নাট্যতত্ত্ব বিচার', করুণা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪
৭. সাধন কুমার ভট্টচার্য : 'নাট্যপ্রযোজনা ও পরিচালনা', দে'জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৯
৮. উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় : 'একে একে এগারো', কলাভৃত পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ২০০৮
৯. সুমিতা চক্রবর্তী : 'নাট্যকলায় জীবনশিল্প', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ২০০৭

বিনোদিনী : এক নটী ও সাহিত্যিকের জীবন ও সৃষ্টি

গোবিন্দ মণ্ডল

১৪৫ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের টালির ছাউনি দেওয়া ঘর। মায়ের সঙ্গে একটি ছোটো ভাইকে নিয়ে মাতামহীর এই আশ্রয়ে ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে একটি বালিকা। নাম বিনোদিনী। কে তার বাবা, জন্ম কবে—কিছু জানা নেই। স্মৃতির পাতা বার বার উলটে বিনোদিনীরও মনে পড়ে না বিশেষ কিছু। শুধু মনে পড়ে এই প্রথম আশ্রয়ের কথা। আর মনে পড়ে পাশাপাশি এইসব ঘরে থাকত কিছু লোক, স্বামী-স্ত্রীর মতো যাদের হাবভাব কিন্তু আদতে তারা স্বামী-স্ত্রী নয়। ছোটোবেলায় বিনোদিনীর একটা বিয়ে হয়েছিল। ভাই আর সেই ছোটো ছেলেটির সঙ্গে একত্রে খেলা করত সে। একদিন সেই ছেলেটিকে নিয়ে গেল তার এক আত্মীয় এসে। তারপর সে আর এল না। শোনা গেল বিয়ে করে সে সংসারী হয়েছে। পাঁচ বছরের ভাইকে বিয়ে দিয়ে আড়াই বছরের ভ্রাতৃবধূকে ঘরে আনা হল। কিন্তু সেই ভাইটি অকালে মারা গেল। অভাবের সংসার আর চলে না। এই সময় বাড়িতে এল গঙ্গা বাইজী। বাড়ির একতলার একটি ঘর ভাড়া নিল সে। বহু নামীদামী মানুষের যাতায়াত ছিল গঙ্গা বাইজীর ঘরে। দূর থেকে সেই সব দেখত বিনোদিনী। ক্রমে ভাব হয়ে গেল গঙ্গা বাইয়ের সঙ্গে। তার কাছে গান শিখে তার হাত ধরে মাসিক দশ টাকা বেতনে থিয়েটারে যোগ দিল বিনোদিনী। গায়িকা থেকে ক্রমে সে হয়ে উঠল থিয়েটারের একজন অভিনেত্রী। প্রথম অভিনয় করলো ১৮৭৪ খ্রি. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'শত্রুসংহার' নাটকে পরিচারিকার ভূমিকায়। তারপর ধীরে ধীরে থিয়েটারের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠল, থিয়েটারকে ভালোবাসল—নটী বিনোদিনীর খ্যাতিতে মুখরিত হল তখনকার বাংলার নাট্যজগৎ। কিন্তু খ্যাতির মধ্যগগনে থাকাকালীন একদিন হঠাৎ করে রঙ্গমঞ্চের জগৎ থেকে বিদায় নিল সে (১৮৮৬ খি. ২৬ ডিসেম্বর)। বাংলার নাট্যমঞ্চ তাকে শেষ অভিনেত্রী রূপে পেল 'বেল্লিক বাজার'-এ 'রঙ্গিনী'র ভূমিকায়।

একদিকে বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবন অন্যদিকে তার পারিবারিক জীবন—এই দুইয়ের টানাপোড়েন চলেছে অনবরত। যার মাঝে পড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ব্যক্তি মানুষটি। শুধু থিয়েটার করে তো আর সংসার চলে না। তাই বিনোদিনীদের মতো মেয়েদের যা পরিণাম সেটাকে মেনে নিতে হল তার। এক বাবুর রক্ষিতা হল সে। কিন্তু বিনোদিনীর সঙ্গে ছলনা করে বাবুটি বিয়ে করে সংসারী হল। বড়ো কষ্ট পেল বিনোদিনী। অথচ মুখ বুজে সয়ে যাওয়া ছাড়া কি বা উপায় আছে এ সময়ে নাট্যজগতে বিনোদিনীর পরিচিতরা এসে ধরল তাকে। এক মাড়োয়ারি যুবক নাট্যমঞ্চ গড়তে চায়। কিন্তু বিনোদিনীকে না পেলে সে একটা পয়সাও খরচ করবে না। বিনোদিনীর উপর সবকিছু নির্ভর করছে—তাদের নিজস্ব মঞ্চ, নাটকের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বার বার অনুরোধ করতে থাকল সবাই। বড়ো দ্বিধায় পড়ল বিনোদিনী। একদিকে তার বর্তমান আশ্রয়দাতার প্রতি ভালোবাসা, অন্যদিকে নাটকের প্রতি টান। শেষপর্যন্ত তাঁর নাট্যপ্রীতিই জয়ী হল। গুর্মুখ রায়ের রক্ষিতা হল বিনোদিনী। থিয়েটারের জন্য জমি নেওয়া হল।

গুর্মুখ রায় বিনোদিনীকে অর্ধ লক্ষ টাকা দিতে চেয়ে থিয়েটার থেকে তাকে দূরে সরে থাকতে অনুরোধ করে। কিন্তু থিয়েটারের জন্য বিনোদিনী দেহ দান করেছে। টাকা নিয়ে থিয়েটার থেকে সে দূরে থাকতে পারবে না। তৈরি হল 'স্টার থিয়েটার'। প্রথম অভিনীত হল 'দক্ষযজ্ঞ'। রমরমিয়ে চলছে স্টার থিয়েটার। এসময় নানা কারণে গুর্মুখ রায় থিয়েটারের স্বত্ব ত্যাগ করতে চায় এবং সেটা দিয়ে যেতে চায় বিনোদিনীকে।[১] তখন গিরিশচন্দ্র গিয়ে বিনোদিনীর মাকে বোঝালেন—বিনোদিনী যেন এই থিয়েটারের স্বত্ব না নেয়। ফলে স্টার থিয়েটারের মালিকানা নেওয়া হল না বিনোদিনীর। সেটা কিনে নিল এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত অন্যরা। ইতিমধ্যে নাট্যজীবনে প্রভূত খ্যাতির পাশাপাশি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ পেয়েছে বিনোদিনী। ভিতরে ভিতরে পরিবর্তিত হতে থাকে বিনোদিনী। এসময় বিনোদিনীর জীবনে আসে চতুর্থ পুরুষ। যার হাত ধরে আলোক-উজ্জ্বল মঞ্চ, দর্শক, করতালি—এই সব কিছু ছেড়ে চলে গেল সে। সংসার জীবনের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ ছিল তার। নারায়ণ সাক্ষী রেখে, মালা-চন্দন বদল করে সুদর্শন এই জমিদার-পুত্রের হাত ধরে তার গৃহে করল বিনোদিনী। দীর্ঘ একত্রিশ বছর গভীর বিশ্বাস ও ভালোবাসায় বিনোদিনীকে ভরিয়ে রেখেছিল এই মানুষটি। এক কন্যা সন্তান জন্ম নিল। আদর করে তার নাম রাখল শকুন্তলা। কিন্তু দুষ্ট গ্রহ কিছুতেই পিছু ছাড়ল না। তেরো বছর বয়সে অকালে প্রাণ হারাল কন্যা শকুন্তলা (১৯০৩ খ্রি.)। এর কয়েক বছর পরে স্বামীকেও হারাল (১৯১২ খ্রি.) বিনোদিনী। মৃত্যু-যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বিনোদিনী ফিরে এল ১৪৫ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের সেই ঘরে। দুঃখ-শোক-যন্ত্রণা নিয়ে একাকিত্বে কেটেছে তার শেষ জীবন।

২

বিনোদিনীর অভিনয়-জীবনের ব্যাপ্তি (১৮৭৪খ্রি.-১৮৮৬খ্রি.) বারো বছর। এই সময়ে পঞ্চাশটি নাটকে ষাটটিরও বেশি (মতান্তরে প্রায় আশিটি নাটকে নব্বইটির বেশি) চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছে সে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের দক্ষ নির্দেশনায় অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে যেমন গড়ে পিটে তৈরি করছিল বিনোদিনী তেমনি একই সময়ে গিরিশচন্দ্র ও থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য স্নেহশীল মানুষদের কাছ থেকে সে জেনে নিয়েছিল ইংরেজি, গ্রিক, ফ্রেঞ্চ, জার্মানির বড়ো বড়ো লেখকদের লেখা অনেক গল্প। সে জেনেছিল খ্যাতনামা শিল্পীদের অধ্যবসায়ের কথা,

পরিচিত হয়েছিল বিদেশি অভিনয় রীতির সঙ্গো। অভিনয় দেখে সে সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গো আলোচনা মত বিনিময়ও করতো সে। এসবের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল বিনোদিনীর অভিনয়-ব্যক্তিত্ব। যার সঙ্গো যুক্ত হয়েছিল তার গভীর অধ্যবসায়। গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর সেই অধ্যবসায়ের প্রশংসা করে লিখেছেন—'আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি যে, রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর উৎকর্ষ আমার শিক্ষা অপেক্ষা তার নিজগুণে অধিক।'[২]

অভিনীত চরিত্রের সঙ্গো প্রায়শই তন্ময় হয়ে যেত বিনোদিনী। ভাবতন্ময়তার সেই প্রগাঢ় নিমজ্জিত অবস্থায় কখনও কখনও মঞ্চে লুটিয়ে পড়ত তার সঙ্গাহীন দেহ। দর্শকদেরকে মুগ্ধ করেছিল বিনোদিনীর এই অভিনয়। 'চৈতন্যলীলা'য় বিনোদিনীর মধ্যে ভাবতন্ময় মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ রূপ প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। আশীর্বাদ করেছিলেন বিনোদিনীকে 'মা তোমার চৈতন্য হোক'। তাকে দিয়েছিলেন জপমন্ত্র 'হরিগুরু গুরুহরি'।

ঈর্ষণীয় প্রতিভার গুণে একই সঙ্গো বৈচিত্র্যময় একাধিক চরিত্রে অভিনয় করতে পারত বিনোদিনী। ভাবগভীর অভিনয়ের পাশাপাশি চটুল অভিনয়ও করেছে সে দক্ষতার সঙ্গো। যে চরিত্রাভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিল সে সময়কার সুধীমণ্ডলী। বেঙ্গাল থিয়েটারে 'কপালকুণ্ডলা'র নাম ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় দেখে কেদারনাথ চৌধুরী বলেছিলেন—'এই মেয়েটি যেন প্রকৃত "কপালকুণ্ডলা" ইহার অভিনয়ে বন্য সরলতা উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।'[৩] 'মায়াতরু' নাটকে ফুলহাসির চরিত্রে বিনোদিনীর অভিনয় দেখে 'রিজ এন্ড রায়ত'-এর সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'বিনোদিনী was simply charming'[৪] এমন বহুবিধ মানুষদের সান্নিধ্য আশীর্বাদ প্রশংসা উৎসাহে থিয়েটার সম্পর্কে বিনোদিনীর মনেও নতুন বোধের সঞ্চার হয়। তার নিজের কথায়—'নানাবিধ গুণী, জ্ঞানী, পন্ডিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট উৎসাহ পাইয়া আমার কার্য্যের গুরুত্ব আমি অনুভব করিতে পারিলাম। অভিনয় কার্য্য যে রঙ্গালয়ের রঙ্গ নহে, তাহা শিক্ষা করিবার ও দীক্ষা দিবার বিষয়'।[৫] অভিনয়কে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল বিনোদিনী। তাই জীবন নাশের আশঙ্কা, প্রভূত অর্থের প্রলোভন—এসব কিছুকে উপেক্ষা করে সে দিয়ে যেতে পেরেছিল বাঙালি নাট্যকর্মীদের নিজস্ব নাট্যমঞ্চ।

অভিনয়কে জীবনের ব্রত হিসেবে নিলেও গভীর বেদনা নিয়ে একদিন অভিনয় জীবন থেকে দূরে চলে যায় বিনোদিনী। গুর্মুখ রায়ের রক্ষিতা হয়ে যে থিয়েটার গড়া শুরু হল, কথা ছিল তার নাম রাখা হবে 'বি. থিয়েটার'। কিন্তু রেজিস্ট্রি করা হল 'স্টার থিয়েটার' নামে। তাকে দিয়ে কার্য উদ্ধার করে তার সঙ্গো এই ছলনায় গভীর আঘাত পেল বিনোদিনী। এর পর যারা এতদিন বিনোদিনীকে কাতর অনুরোধ করেছিল নতুন থিয়েটার গড়ার জন্য তারাই এবার বিনোদিনীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে যাতে বিনোদিনী এই থিয়েটারের বেতনভোগী কর্মচারী রূপেও না থাকতে পারে। তাদের চক্রান্তে মাস দুয়েক থিয়েটারের বাইরে থাকতে বাধ্য হয় বিনোদিনী। শেষ পর্যন্ত গিরিশ ঘোষের যত্নে ও গুর্মুখ রায়ের জেদে বিনোদিনী আবার থিয়েটারের সঙ্গো যুক্ত হতে পারে। কিন্তু মানুষের এই বিশ্বাসঘাতকতায় বেদনার যে ক্ষত সেদিন তৈরি হয়েছিল বিনোদিনীর অন্তরে সেখানে প্রলেপ দিতে পারেনি কেউ। গভীর অভিমান ও বেদনা নিয়ে একদিন থিয়েটার থেকে বিদায় নিল বিনোদিনী। কিন্তু সেজন্য কেউ অনুতপ্ত হল না। স্টার থিয়েটার আপন গতিতে এগিয়ে চলল।

৩

শুধু অভিনেত্রী নয়, সাহিত্যিক হিসেবে আর একটি পরিচয়ও আছে বিনোদিনীর। যদিও এই পরিচয়ে সাধারণের কাছে বিনোদিনী পরিচিত নয়। তার মূল পরিচয় অভিনেত্রী। কিন্তু অভিনয়-জীবন অপেক্ষা সাহিত্য-সাধনাতেই জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে বিনোদিনীর। মঞ্চের সঙ্গে বিনোদিনীর যোগ বারো বছরের। আর তার লেখক-জীবনের ব্যাপ্তি চল্লিশ বছর। এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার 'বাসনা' নামক কাব্য, 'কনক ও নলিনী' নামক কাহিনিকাব্য, আত্মজীবনী 'আমার কথা'। এছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে তার রচনা।

অভিনেত্রীরূপে যে ভাবতন্ময়তা বিনোদিনীর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সেই ভাব-বিভোরতাই পরবর্তীকালে গীতিকবি বিনোদিনীর জন্ম দিয়েছে। তার লেখা কবিতাগুলির মূলে আছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা,অনুভূতি—যা গীতিকবিতার মূল। সহজ সরল ভাষায় ব্যক্তিগত প্রেম, দুঃখ, যন্ত্রণা, ভালোলাগার ছবি ফুটিয়ে তুলেছে সে এইসব কবিতায়। ছোটোবেলায় যে শিশু পঙ্কিল জীবন দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিত, স্বপ্ন দেখতো একটি সুন্দর জীবনের বড়ো হয়ে তাকেই বাধ্য হতে হল সেই ঘৃণ্য জীবনকে মেনে নিতে। বার বার মনে হয়েছে তার এই জীবন ছেড়ে বেরিয়ে আসার কথা কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তা। আশায় হাত বাড়িয়েছে একটি সুন্দর জীবনের জন্য কিন্তু দু'হাতে উঠে এসেছে নিরাশার ধূসর পাণ্ডুলিপি। ভাগ্যের নির্মমতায় বিধ্বস্ত সেই জীবনের কথা উঠে এসেছে তাঁর কবিতায় —

> ঘনঘটাপরিপূর্ণ যে দিক হেরিত/কাতর পরাণ মম সেখানে ধাইত,/শুধু বজ্রাঘাত পেতো/হৃদয় ভাঙ্গিয়া যেতো/ভাঙা হৃদে কতবার জোড়াতাড়া দিয়ে/তথাপি নীরদ পানে থাকিতাম চেয়ে।।/শুধু আকাঙ্ক্ষিত প্রাণ রহিল এখন,/কখন না পেলে বিন্দু বারির সিঞ্চন।/এখনও রয়েছে মোর,/দারুণ আশার ঘোর/নিবেও নিবে না তাহা খালি হাহাকার,/এরূপ জীবন শেষ হইল আমার।।[৬]

আশাতেই সে বাঁধতে চেয়েছে ঘর। কিন্তু মানুষের লোভের বাত্যাঘাতে সে ঘরের চালা উড়ে গেছে। জেনেছে সে পুরুষের ক্ষণবাদী প্রেমে নারী শুধু ব্যবহৃত হয় লালসা মেটাতে। পুরুষের প্রতি অভিমান ঝরে পড়েছে তাই তার লেখায়—"জানি হে পুরুষজাতি নিষ্ঠুর নির্দয়/থাকে যবে যার কাছে/যেন সে তাহার আছে/অদর্শনে কোন কথা প্রাণে নাহি রয়।/যাও যাও প্রাণনাথ আদর এ নয়।"[৭] তবে প্রেমহীনতাই শেষ কথা নয়। জীবনের অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছে একথা। হৃদয় দিয়ে হৃদয় পেয়েছে সে। সেই পরিপূর্ণ প্রেমের স্মৃতি সদা জাগ্রত তার মনে। সেই প্রেমের টুকরো টুকরো ছবি হালকা মেঘের মতো উড়ে যায় তার স্মৃতি-পটে সজল শ্যামল ছায়া রেখে—"লইয়া গোলাপ ফুল দিতে গেলে করে,/ফুলে যদি ব্যথা পাই,/দিব কিনা দিব তাই,/এই কথা বার বার ভাবিতে কাতরে।"[৮] ছোট্ট একটি ছবি কিন্তু কত গভীর এই অনুভূতি! বিনোদিনীর প্রেমের আর এক রূপ দেখি তার বাৎসল্যের মধ্যে। নারীর প্রেমের পরিপূর্ণতাকে খোঁজা হয় তার সন্তান স্নেহে। যে পরিচয় রেখে গেছে বিনোদিনী তার কবিতায়—"নেচে নেচে খেলা করে ও যাদুধন/নেচে নেচে তালি দিয়ে,/এস যাদু মা বলিয়ে/জুড়াক আমার প্রাণ হেরিয়ে বদন।/ওরে মোর খুকুরাণী অমূল্য রতন।"[৯] ছোট শিশু কন্যাকে ঘিরে বিনোদিনীর মাতৃহৃদয়ের আনন্দঘন রূপের পরিচয় এখানে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। এবং একই সঙ্গে বাৎসল্য রসের সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে এই কবিতার কয়েকটি লাইনে—"শতকোটি নমি আমি শ্রীহরির পায়/তাঁহার কৃপার বলে,/তোমারে পেয়েছি কোলে,

/দয়া করে দীর্ঘজীবী করুণ তোমায়।/করজোড়ে নমে দাসী,/এই ভিক্ষা চায়।।"[১০]সন্তানের অমঙ্গল ভয়ে ভীত জননী ঈশ্বরের কাছে সন্তানের কল্যাণ, দীর্ঘ পরমায়ু কামনা করছে। এ তো সন্তানবৎসলা মায়ের চিরন্তন একটি ছবি।

বিনোদিনীর রচনা-শক্তির পরিচয় পেতে অবশ্যই আমাদের পাঠ করতে হবে তার আত্মজীবনী। যে রচনা গিরিশচন্দ্র থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বহু গুণী মানুষের কাছে নানাভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আবেগাপ্লুত গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর আত্মজীবনী 'আমার কথা'র ভূমিকায় লিখছেন—'এ জীবনী পাঠে ধর্মাভিমানীর দম্ভ খর্ব হইবে, চরিত্রাভিমানী দীনভাব গ্রহণ করিবে এবং পাপী-তাপী আশ্বাসিত হইবে।'[১১] বিনোদিনীর এই আত্মজীবনীর ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেজন্যও নয়, 'নিছক একটি জীবনের কাহিনী হিসাবেও এই রচনা আমাদের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করে। কেমন করে এক সহায়-সম্বলহীনা বালিকা সমাজের অন্ধকার স্তর থেকে আপন চেষ্টায় ও যত্নে সেকালের অগণ্য মানুষের অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্রী হতে পেরেছিলেন, কত বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিনি জীবনের নিষ্ঠুর সত্যগুলির জ্ঞান অর্জন করেছিলেন,'—এই সমস্ত কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়।[১২]

বিনোদিনী তার এই লেখার মধ্যে দিয়ে সমাজবিষয়ক এমন কিছু কথা, এমন কিছু প্রশ্ন তুলেছে যা পিতৃতান্ত্রিক তথাকথিত সভ্য সমাজের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। একজন বারাঙ্গনা সমাজের চোখে ঘৃণ্য, কলঙ্কিত। কিন্তু কলঙ্ক নিয়ে কেউ জন্মায় না। এই কলঙ্কের জন্য দায়ী কে? প্রশ্ন তুলেছে বিনোদিনী তার আত্মজীবনীতে—' বারাঙ্গানার জীবন কলঙ্কিত ঘৃণিত বটে কিন্তু সে কলঙ্কিত ঘৃণিত কোথা হইতে হয় জননী জঠর হইতে তো একেবারে ঘৃণিতা হয় নাই জন্ম মৃত্যু যদি ঈশ্বরাধীন হয়, তবে তাহাদের জন্মের জন্য তো তাহারা দোষী হইতে পারে না ভাবিতে হয় এ জীবন প্রথম ঘৃণিত করিল কে হইতে পারে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় অন্ধকারে ডুবিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করে কিন্তু আবার অনেকেই পুরুষের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিয়া চির কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া অনন্ত নরক যাতনা সহ্য করে। সে সকল পুরুষ কাহারা যাঁহারা সমাজ মধ্যে পূজিত আদৃত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নন্ কি? যাঁহারা লোকালয়ে ঘৃণা দেখাইয়া লোকচক্ষুর অগোচরে পরম প্রণয়ীর ন্যায় আত্মত্যাগের চরম সীমায় আপনাকে লইয়া গিয়া ছলনা করিয়া বিশ্বাসবতী অবলা রমনীর সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন, হৃদয়ের ভালোবাসা দেখাইয়া আত্মসমর্পনকারী রমনী হৃদয়ে বিষের বাতি জ্বালাইয়া অসহায় অবস্থায় দূরে ফেলিয়া অন্তর্হিত হন, তাঁহারা কিছু দোষী নহেন!

দোষ কাহাদের যে সকল হতভাগিনীরা সুধাবোধে বিষ পান করিয়া চিরজীবন জর্জরিত হইয়া হৃদয় জ্বালায় জ্বলিয়া মরে, তাহাদের কি?'[১৩] বিনোদিনীর এই প্রশ্ন সামাজিক ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছে। এবং একই সঙ্গে প্রতিবাদী নারীবাদী লেখক হিসেবে বিনোদিনীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু নটী বিনোদিনী নামের আড়ালে অনেকাংশে চাপা পড়ে গেছে বিনোদিনীর এই পরিচয়। মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলো থেকে একদিন স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়ে বিনোদিনী সাহিত্যকে বেছে নিয়েছিল তার সঙ্গী হিসেবে। শুধু নটী বিনোদিনী নয়, সাহিত্যিক বিনোদিনীও তাই মনোযোগের দাবি রাখে আমাদের কাছে।

উৎসের সন্ধানে

১. গুর্মুখ রায়ের পুরো নাম —গুর্মুখ রায় মুসাদ্দি। দালালী ছিল তাঁদের পারিবারিক ব্যবসা। বিনোদিনীর চেয়ে বয়সে একবছরের ছোট ছিল তিনি। বিনোদিনীর সঙ্গে তাঁর ছ'মাসের সম্পর্ক ছিল। এরপর গুর্মুখ রায়ের মা ছেলের অধঃপতন, থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি কারণে বিচলিত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আত্মীয়দের চাপে পড়ে থিয়েটার বিক্রি করে দিয়ে সংসারী হয়ে পারিবারিক ব্যবসা দেখাশুনা করতে থাকেন। কিন্তু বিনোদিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের পরে ক্রমশ সে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং ১৮৮৬ খ্রি. বাইশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়।

২. 'বঙ্গ রঙ্গালয়ে শ্রীমতি বিনোদিনী', পরিশিষ্ট ঙ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা', পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, সুবর্ণরেখা, ১৩৯৪, পৃ. ১১৩

৩. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৪. তদেব, পৃ. ৩২

৫. তদেব, পৃ. ৪৬

৬. 'পিপাসা', বাসনা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯-১১

৭. 'সোহাগ', বাসনা, 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

৮. পুরানো প্রেমের স্মৃতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

৯. ওরে আমার খুকি মাণিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

১০. তদেব

১১. 'বঙ্গ রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী', সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

১২. সম্পাদকীয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩

১৩. আমার কথা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ৬২

প্রবন্ধ নিয়ে...........

বিহারীলালের 'বঙ্গো বর্গী'
একটি পর্যালোচনা
মৃণাল কান্তি রায়

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ঘটে যাওয়া এই রক্তক্ষয়ী বিষয়কে নিয়ে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান হয়ে আসছে। এই মর্মবিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সময়ে দু'খানি কাব্য রচিত হয়েছে। একখানি সংস্কৃতে রচিত কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের 'চিত্রচম্পু' (১৭৪৪), দ্বিতীয়ত, গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' (১৭৫১) এবং কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২) কাব্যের গ্রন্থারম্ভে এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। শুধু মধ্যযুগীয় সাহিত্যে নয়, আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য থেকে নাটক, কাব্য-কবিতার পাশাপাশি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যেও বর্গীদের কথা উঠে এসেছে। বিহারীলাল সরকার থেকে ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার এবং আরও অনেকে প্রবন্ধের মাধ্যমে বঙ্গদেশে বর্গীদের অত্যাচার, লুণ্ঠন বিবরণ পর্যালোচনা করেছেন। বিহারীলাল সরকার 'বঙ্গো বর্গী' বইটি লেখার কৈফিয়ত হিসাবে ভূমিকাংশে জানিয়েছেন, তিনি 'ইংরেজের জয়' নামে একটি বই লিখেছিলেন, সেই বই দেখে তাঁর কয়েকজন সাহিত্য-গুণগ্রাহী বন্ধু তাঁকে নবাব আলিবর্দীর জীবনী লিখতে অনুরোধ করেন, এজন্য তিনি 'জন্মভূমি' পত্রিকায় 'আকবর ও আলীবর্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন। এরপর তিনি আলিবর্দীর জীবনী লিখতে শুরু করেন। এইসময় বঙ্গবাসীর সর্বস্ব যোগেন্দ্রনাথ বসু বিহারীলালকে 'জন্মভূমি' পত্রিকার জন্যে 'বর্গী হাঙ্গামা'র বিস্তৃত বিবরণ লিখতে অনুরোধ করেন। বর্গীর হাঙ্গামা আসলে আলিবর্দীর জীবনের বিশিষ্ট ঘটনা। এইসব কারণে তিনি 'জন্মভূমি' পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে 'বঙ্গো বর্গী' (১৩১৪) প্রবন্ধ লিখেছিলেন। গ্রন্থ মধ্যে সরকার মহাশয় নিজেই স্বীকার করেছেন, সম্পূর্ণ গ্রন্থটি গোলাম হোসেনের 'সিয়ার অফ মুতাক্ষরীন' অনুসরণে লিখিত হয়েছে। গ্রন্থটি রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকার মহাশয় জানিয়েছেন 'বঙ্গো বর্গী' গ্রন্থ প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য, বাঙ্গালা বীরের কৃতিত্ব প্রকাশ।'[১]

মহারাষ্ট্রীয় বর্গীরা যেভাবে অত্যাচার ও লুটপাট আরম্ভ করেছিল, সেখান থেকে বাংলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সাহসী বীর বাংলার নবাব আপ্রাণ চেষ্টা করে দেশবাসীকে রক্ষা করেছিল, সে কথাই গ্রন্থটিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

'বঙ্গে বর্গী' গ্রন্থটিতে যে তিনটি বিষয় প্রাধান্যলাভ করেছে, সেগুলি হল—প্রথমত, বর্গীর হাঙ্গামা ছিল নবাব আলিবর্দী কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এ কথা সর্বাংশে সত্য। কারণ আলিবর্দী আপন প্রতিপালক প্রভুকে যুদ্ধে নিহত করে সিংহাসন অধিকার করেছিল। নিহত প্রভুর অভিশাপ রাজ্য-শাসনকালে তাঁকে প্রতিনিয়তই ভোগ করতে হয়েছিল। বাহুবলে ও কূটকৌশলে সিংহাসন অধিকার করলেও তিনি এক দণ্ডের জন্য শান্তি পাননি, বরং আগুনের শিখাসম নবাবী মসনদে বসে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকে শরীর ও মনের কষ্ট ছাড়া কিছুই মেলেনি। প্রবন্ধের একস্থানে আলিবর্দীর পরিণাম বলতে গিয়ে বিহারীলাল সরকার বলেছেন, 'ভাস্কর মহাপাতকী। আলিবর্দীও কি কম? যে অন্নদাতা প্রভুকে হত্যা করিতে পারে, যে অভ্যাগত অতিথিকে হত্যা করিতে পারে, তাহার পাপের তুলনা হয় কি? আলিবর্দীর পরিণাম অপমৃত্যু না হউক, ইহজীবন তাঁহাকে অশান্তির তুষানলে পুড়িতে হইয়াছে।'[২] আসলেই নবাব আলিবর্দীর জীবনে সুখ হল 'ডুমুরের ফুল'। নবাবের মসনদে বসে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাননি তিনি।

দ্বিতীয়ত, বর্গীর হাঙ্গামার সময় নবাব থেকে শুরু করে স্থানীয় বড়ো বড়ো জমিদাররা নিজেদের বলবিক্রম দেখানোর সুযোগ পেয়েছিল। একথা সত্যি বঙ্গের নবাবী সিংহাসনে যতজন নবাব এসেছিল, তন্মধ্যে কূটনীতি, রণনীতিতে দক্ষ, প্রজাবাৎসল্যে আলিবর্দীর তুল্য শাসক বঙ্গের সিংহাসনে আসেনি। মারাঠারা বাংলাদেশকে অত্যাচারে জর্জরিত করলেও, ধন-সম্পদ লুঠ করলেও আলিবর্দীর রণনীতির কাছে বারবার পরাজিত হতে হয়েছে। এখানেই নবাব আলিবর্দীর নৈতিক জয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ আলিবর্দীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'নবাব আলিবর্দী খাঁর চরিত্রে রাজোচিত সদগুণের ভাগ সবিশেষ পরিস্ফুট। রাজ্যশাসন বা প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলার্থ শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, ভ্রান্ত শাসননীতির অনুসরণে তিনি যে দুই একটি নরহত্যা করিয়াছিলেন, তাহা ত্যাগ করিলে দেখা যায়, মনস্বিতার উৎকর্ষ ও চরিত্রগুণে তিনি ঐতিহাসিক যুগের সর্বদেশীয় প্রধান রাজগণের মধ্যে এক উচ্চতর আসন পাইবার উপযুক্ত।...বঙ্গদেশের সৌভাগ্য যে, এই মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবের দিনে সরফরাজের মতো দুর্বলচিত্ত লোকের হস্ত হইতে রাজদন্ড নবাব আলিবর্দী খাঁর মতো লোকের হস্তে পড়িয়াছিল। আলীবর্দী খাঁ না থাকিলে, বঙ্গের ভাগ্য কোন পথে, কিভাবে চালিত হইত, কে তাহা গণনা করিবে?'[৩]

নবাব আলীবর্দী খাঁর সৎ চরিত্রের কথা, মহৎ গুণের কথা বলতে গিয়ে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আলীবর্দি খাঁ নিজ স্বার্থসাধনের জন্য নীতিবিরোধী কৃতঘ্নতার আশ্রয় লইয়া বাংলার মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সানুচর ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করাইয়াছিলেন—তাহা ঠিক বটে। কিন্তু সুবায় সুশাসন স্থাপনের জন্য তিনি যেরূপ বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে মুর্শিদকুলি খাঁ অপেক্ষাও প্রশংসা করিতে হইবে। অতিশয় স্নেহপ্রবণ ও বিশুদ্ধ পারিবারিক জীবনে একনিষ্ঠ এই সুবাদার কখনও কুৎসিত আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হন নাই, সর্বদা সজ্জীবন-যাপন করিয়াছেন। উপরন্তু তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন ভেদ করেন নাই। অবশ্য বিদেশী বণিক ও জমিদারদের উপর মাঝে মাঝে উৎপীড়ন করিতেন বটে, কিন্তু তাহা নিজের জন্য নহে—বর্গীর আক্রমণ বাধা দিবার জন্যই তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের জন্য পীড়ন করিয়াছিলেন।'[৪] বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আরও বলেছেন

যে, আলিবর্দী চরিত্রের একটি মারাত্মক ত্রুটি ছিল, যা বঙ্গাদেশের সর্বনাশ করেছিল। কী সেই ত্রুটি তিনি বলেছেন, 'অন্ধ স্নেহবাৎসল্যের জন্য তিনি নয়নের মণিস্বরূপ দৌহিত্র সিরাজকে যথোচিত 'মানুষ' করিতে পারেন নাই, রাজোচিত কোন শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই—অত্যধিক আদরে এই কিশোরের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সিরাজের জন্মের পর আলীবর্দির অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। এইজন্যই তিনি অত্যধিক আদরে সিরাজকে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী করিয়া গড়িতে পারেন নাই। ফলে তরুণ সিরাজ নির্বুদ্ধিতার জন্য শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছিলেন এবং বাংলার শাসনভার বিদেশী বণিকের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। অবশ্য তখন সারা-ভারতের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সিরাজ বুদ্ধিমান হইলেও বাংলাকে অধিকারে রাখিতে পারিতেন না। তখন চারিদিকে শাঠ্য-ষড়যন্ত্র লোভক্ষোভের অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। ভবিতব্যের গতিকে, সিরাজ কেন—স্বয়ং ভবিতব্যই বাধা দিতে পারিত না।'[৫]

তৃতীয়ত, বঙ্গাদেশে বর্গী হাঙ্গামার ফলে বিদেশি ইংরেজ বণিকগণের বলবৃদ্ধি করার সুযোগ হয়েছিল কারণ বর্গীদের বিরুদ্ধে আলিবর্দী যে বলক্ষয় ও অর্থক্ষয় করেছিল, তাঁর পরবর্তীকালে যোগ্য সুশাসকের অভাবে বিদেশি বণিকগণ বঙ্গাদেশের সিংহাসন অধিকার করার সুযোগ পেয়েছিল। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, বাংলায় মহারাষ্ট্র-বিপ্লবে আলিবর্দী যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেছিল এবং বঙ্গের কৃষিকাজ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য যে পরিমাণ লোপ পেয়েছিল, বঙ্গের মসনদে আরোহণ করার পর নবাগত নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সে সবের ফলভোগ করতে হয়েছিল। বর্গী তাণ্ডবে বাংলার অর্থক্ষয় যেমন হয়েছিল, তেমনি সমানভাবে বলক্ষয়ও হয়েছিল। মসনদে বসে সিরাজদ্দৌলা অর্থসঞ্চয় ও বলার্জনে মনোনিবেশ করলেও আশানুরূপ সাফল্য পাননি। মৃত্যুর পূর্বে আলিবর্দী লক্ষ করেছেন ইংরেজরা ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে, কিন্তু বর্গী হাঙ্গামার ব্যস্ততায় তাদের প্রতি সেভাবে নজর দিতে পারেননি। আর যখন সময় সুযোগ হয়েছিল তখন তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন, ইংরেজদের শক্তি অপ্রতিরোধ্য। দুর্ধর্ষ মারাঠাদের ঠেকিয়ে রাখতে ইংরেজরা একদিকে খাল কেটে পরিত্রাণ যেমন পেতে চেয়েছিল, তেমনি ধীরে ধীরে কলকাতার অন্দরে নবদুর্গগঠনেও প্রবৃত্ত হয়েছিল। অর্থাৎ একদিকে বঙ্গাদেশ মহারাষ্ট্রীয়দের আক্রমণে বিধ্বস্ত, অন্যদিকে সেইসময় ইংরেজরা বাংলায় ভীত মজবুত করতে বদ্ধপরিকর। এককথায়, বিদেশি বেনিয়াদের মাহেন্দ্রযোগে বঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়দের হাঙ্গামা প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। মহারাষ্ট্রীয়দের কবল হতে উঠেই আলিবর্দী লক্ষ করলেন ইংরেজ বণিকরূপ বীজ বটবৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি কল্পনা করলেন, ইংরেজরূপ বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করতে না পারলে তা মহারাষ্ট্রীয়দের থেকেও ভয়ংকর হবে, হয়েছেও তাই। শেষ বয়সে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তিধারণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে তিনি সিরাজদ্দৌলাকে সাবধানতার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

একটি প্রবাদ আছে, 'সৎসঙ্গে স্বর্গ বাস'। 'বিদ্বজ্জনের সঙ্গে মেলামেশা করলে চিন্তাচেতনার ক্রমোন্নতি হয়, একথা সকলেই স্বীকার করে। বাংলার ভাবী নবাব কিশোর সিরাজদ্দৌলা মাতামহের সঙ্গে থাকতে থাকতে রাজনীতি-কূটনীতি-শাসননীতি-রণনীতি সবকিছুই আয়ত্ব করে নিয়েছিল। যুবক সিরাজদ্দৌলা সেদিন বুঝেছিল, বেনিয়া ইংরেজরা যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করছে, তাদের প্রথমেই রোধ না করলে বিষম বিপদ। তাই মসনদে বসেই তিনি ইংরেজদেরকে শায়েস্তা করতে কলকাতায় দুর্গগঠন বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু জেদি বেনিয়া ইংরেজরা নতুন নবাবের কথা গ্রাহ্য করেনি। স্বভাবতই নতুন নবাবের সঙ্গে বেনিয়াদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পরে। একদিকে নবাবের আত্মীয়স্বজনদের মসনদের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বেনিয়াদের স্বার্থনীতির যুগলবন্দীতে বাংলাদেশের শেষ স্বাধীনচেতা নবাবের অধঃপতন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়

বর্গীদের আক্রমণ সেই অধঃপতনের সূত্রপাত ঘটায়। মহারাষ্ট্রীয় বর্গীদের অকল্পিত আক্রমণে আলিবর্দী যদি বিপর্যস্ত না হতেন, তবে তিনি কঠোর বিধিব্যবস্থা দ্বারা বেনিয়াদের শাসনে রাখতেন এবং বেনিয়ারাও কলকাতায় দুর্গনির্মাণ থেকে ঘাঁটি গড়তে পারত না। সরকার মহাশয় তাই বলেছেন, 'বর্গী-বিপ্লবেই বঙ্গের বিপর্য্যয়।' আর সেজন্যই তিনি অনেকটা মজার ছলে প্রশ্ন করেছেন, 'বর্গীরা আলিবর্দীর সময় বাঙ্গালাকে যেরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, আর কিছু দিন পর পর্য্যন্ত যদি সেইরূপ করিত, তাহা হইলে ইংরেজের পরিণাম কি হইত, কে বলিতে পারে? মহারাষ্ট্রীয়েরা যদি গঙ্গার পূর্ব পারে আসিত, তাহা হইলে ইংরেজের দুর্গ-ভিত্তির নিদর্শন-অস্তিত্বও অসম্ভব হইয়া উঠিত, এরূপ অনুমান অস্বাভাবিক নহে। মহারাষ্ট্রীয়েরা গঙ্গার পূর্ব পারে যে আসে নাই, তাহাতে ইংরেজেরই সৌভাগ্যসূচনা। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে বর্গীর আবির্ভাব যেমন ভাগ্য-সূচনা, পূর্ব পারে না আসায় তেমনই ভাগ্যসূচনা। বর্গীরা পশ্চিম পারে আসিয়া, আলিবর্দীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাই ইংরেজ বলসঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছিলেন। বর্গীরা যদি পূর্বপারে আসিত, তাহা হইলে ইংরেজ যে বল সঞ্চয় করিতেছিল, তাহাতে নিশ্চিতই আঘাত লাগিত।' সেজন্যই সরকার মহাশয়ের স্থিরসিদ্ধান্ত যে, 'বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামায় ইংরেজের সৌভাগ্য-প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল।'[৬] একথা ঐতিহাসিক সত্য।

বলাবাহুল্য বিহারীলাল মহাশয়ের 'বঙ্গে বর্গী' গ্রন্থে তিনটি জায়গায় সালের ভুল উল্লেখ রয়েছে। বর্গী হাঙ্গামার ঘটনা সম্পূর্ণরূপে আঠারো শতকের, অর্থাৎ নবাব আলিবর্দীর সময়ে ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রি. পর্যন্ত। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধের এক জায়গায় লেখা হয়েছে, ১৮৪১ সালে বঙ্গদেশে বর্গীরা প্রথম আক্রমণ করে, দ্বিতীয়ত, ১৮৪৩ খ্রি. রঘুজী ও বালাজী উভয়ই বঙ্গদেশ আক্রমণ করে; তৃতীয়ত, ১৮৪৪ সালে রঘুজী পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। আসলে সরকার মহাশয় ১৭ খ্রিস্টাব্দের জায়গায় ভুলক্রমে ১৮ লিখে থাকবেন, কিংবা Typing mistake হলেও হতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধের এক জায়গায় সেটা হলে মেনে নেওয়া যেত, কিন্তু এই ধরনের ভুল সরকার মহাশয় করে থাকবেন বলে মনে হয় না। এছাড়া প্রবন্ধটিতে সাল তারিখের উল্লেখ না করে বাংলাদেশে বর্গী হাঙ্গামার বিষয়টি ক্রমান্বয়ে ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটিতে সরকার মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা ও বাক্যের সুললিত প্রয়োগ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। তদুপরি বিষয়ানুযায়ী গল্পচ্ছলে ঘটনা বর্ণনায় বিহারীলালের কৃতিত্ব প্রশংসার দাবি রাখে।

উৎসের সন্ধানে

১. বিহারীলাল সরকার : 'বঙ্গে বর্গী', বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, কারিগর, কলকাতা, ২০১৭, ভূমিকাংশ।
২. পূর্বোক্ত : পৃ. ৯১
৩. কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালার ইতিহাস নবাবী আমল', দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ১২৮
৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত', তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮-১৯, পৃ. ১৪
৫. পূর্বোক্ত : পৃ. ১৫
৬. বিহারীলাল সরকার : 'বঙ্গে বর্গী', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

শম্ভু মিত্রের প্রবন্ধ : ‘কয়েকটি অভিনয়ের জন্মকথা’

লিপিকা সরকার

একজন মহৎ নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্র একইসঙ্গে ছিলেন অভিনেতা, নাট্যনির্দেশক ও নাটককার। শম্ভু মিত্রের নাট্য জীবন শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। ‘রঙমহল’ থিয়েটারে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর অভিনয়ের সূত্রপাত। ‘রঙমহল’ হয়ে মিনার্ভা, নাট্যনিকেতন ও শ্রীরঙ্গম-এ এসেছিলেন তিনি। তারপর তাঁকে ডেকে নেওয়া হয় গণনাট্য সংঘে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি গণনাট্য সংঘে এসেছিলেন। বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকের সফল প্রযোজনা দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার জগৎ সমৃদ্ধ করেছিলেন। গণনাট্য সংঘের হয়ে ‘নবান্ন’ নাটকটি তাঁর প্রথম সার্থক প্রযোজনা। ‘নবান্ন’র প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে নবনাট্যের ভিত তাঁরা প্রস্তুত করেছিলেন। তবে সেখানে স্বাধীন শিল্পীসত্তার ওপর এক ধরনের বাধ্যবাধকতা চেপে বসায় শম্ভু মিত্রকে গণনাট্য সংঘ ছাড়তে হয়। নিজের সর্বস্ব দিয়ে যিনি দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে নাট্যাভিনয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেখানে আলাদা করে কোনো শর্ত তাঁরা মানতে পারেননি। গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি গঠন করেন ‘বহুরূপী’ নাট্যদল। ১৯৪৮ সালে একটি অপেশাদার নাট্যদল নবনাট্যের আদর্শ গ্রহণ করে, দেশের মানুষের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন ‘ভালো করে ভালো নাটক’ তাঁরা করে যাবেন। শম্ভু মিত্র আজীবনকাল ভালো নাটক করার সাধনায় মগ্ন থেকেছেন।

নাট্যক্ষেত্রে শম্ভু মিত্রের কৃতিত্ব ও ব্যক্তিত্ব আমরা সকলেই জানি। তাঁর নাট্যজীবনের নানা দিক, যথা—নাটক লেখা, নাটকে অভিনয় করা, নাট্যপ্রযোজনা ও নাট্যনির্দেশনা করা অর্থাৎ নাটক সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন এবং বিচক্ষণ ছিলেন। নাট্য-সংক্রান্ত যা যা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তিনি হয়েছেন, সেই সকল বিষয় নিয়ে অগণিত প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি

শুধু নাট্যব্যক্তিত্ব নন, তিনি বাংলাসাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। 'বহুরূপী' নাট্যদল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, সেখানে যেসব নাটক অভিনীত হয়েছে, সেই সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন আলোচ্য প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয়। ১৯৫৫ সালে লেখা প্রবন্ধটিতে 'বহুরূপী'র নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারবাহিকতা আমরা পেয়ে যাই। এই ধারাবাহিকতায় নিখাদ থাকতে শম্ভু মিত্রদের সততা বজায় রেখে যে পরিশ্রম করে যেতে হয়েছে, সে বিষয়টিও ধরা পড়বে বর্তমান আলোচনায়।

যে-কোনো নাট্যদলের অভিনয়ের জন্যে নাটক নির্বাচন করা কঠিন একটি বিষয়। কেননা যে দুই ধরনের নাটক নাট্যদলের হাতে আসে, তারমধ্যে যেটির গল্প ভালো সেটির চরিত্রগুলো অসঙ্গতিপূর্ণ। কখনো-বা চরিত্রগুলো খুবই স্পষ্ট কিন্তু গল্পটা অত্যন্ত দূর্বল। আবার কিছু আছে এমনই দুর্বল ধরনের নাটক, যার গল্প এবং চরিত্র কিছুই মন টানে না। বোঝাই যাচ্ছে, যে নাটকগুলোর চরিত্র, গল্প—'দুটোই মনোহারী' সেগুলোই উৎকৃস্ট নাটক। তবে এই নাটকের সংখ্যা খুব কম। শম্ভু মিত্র এই ধরনের নাটককে বলছেন 'মহানাটক'। এগুলো চট করে জোটে না, এর জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। যেমন, 'বহুরূপী'র 'পথিক' নাটক করার সময় যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেই তথ্য দিলেন শম্ভু মিত্র আলোচ্য প্রবন্ধে। প্রথম যখন নাটকটি লেখা হয় তখন কোলিয়ারির দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কোনো কথা ছিল না। সেখানে বাউড়িদের ভূমিকাটি ছোট্ট করে বলা হয়েছিল মাত্র। দলের মধ্যে নিজেরা আলোচনায় বসলেন, নাটকের গল্পে নতুন উপাদান সংযোজন করতে হবে যাতে কাহিনিতে চমৎকারিত্ব আসে। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলের তরফ থেকে নাট্যকার তুলসিবাবুর কাছে যাওয়া হলো। বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে অনুরোধ-পূর্বক জানানো হলো। লাহিড়ী মহাশয় তাঁদের অনুরোধ ও পরামর্শ দুটোই গ্রহন করলেন। দেখা গেল অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি একটা নতুন অঙ্ক লিখে আনলেন। তাঁর সেই নতুন করে লিখে আনা অঙ্কটাই হলো 'পথিক' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক। শম্ভু মিত্ররা ভেবেছিলেন—" 'ফরমায়েশ' করে ভালো লেখা সৃষ্টি হয় না।" কিন্তু নাট্যকার এই নতুন লেখায় সত্যিই নূতনত্ব আনতে সক্ষম হলেন। এই নতুন সংযোজনে উঠে এল রাসু ধরের মতো অসাধারণ চরিত্র। পরবর্তীতে চরিত্রটি মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিনয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছিল। এই সংযোজন ঘটানোর ফলে নাটকের শেষটাও বদলে গিয়েছিল। 'পথিক' নাটকের বর্তমান দ্বিতীয় অঙ্কটি হলো নতুন সংযোজন। 'পথিক' নাটকটি সেদিন থেকে নতুন রূপে সেজে উঠেছিল।

প্রথমদিকের তুচ্ছ বাউড়ি চরিত্রগুলিই নতুন সংযোজনে নায়ক হয়ে উঠল, সামগ্রিকভাবে নাটকের মহৎ কথা তাদের মুখ দিয়েই নাট্যকার বলিয়ে নিলেন। সবসময় যে এই সুবিধাগুলো হাতের মুঠোয় এসে যায়, তেমনটি নয়। তবে অভিনয়ের জন্য নাটক তো চাই, 'মহানাটক' না হলেও অন্তত কাজ চলার মতো নাটক লাগবে। এই প্রচেস্টা শম্ভু মিত্ররা নিয়ত চালিয়ে গেছেন। শম্ভু মিত্র মনে করেন আজকের এই প্রচেস্টার মধ্যে দিয়েই উন্মোচিত হবে ভবিষ্যতের মহানানাটকের পথ—

> আমাদের কাজ হল ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে সামান্য একটা আঁকাবাঁকা পথের ইঙ্গিত তৈরি করা;
> প্রতিভা যেদিন আসবে সেদিন এই পথের উপর দিয়ে রোলার চালিয়ে নতুন সড়ক তৈরি হবে।
> আমাদের কাজ হল সেই প্রতিভার জন্য পরিবেশ তৈরি করে যাওয়া।[১]

আর তা করতে গিয়ে যে দুর্বল গল্প, দুর্বল চরিত্র ও সংলাপের নাটক তাঁরা পাচ্ছেন, সেটাকে অভিনয়ের জন্য জীবন্ত করে তোলার কাজটি নিজেরাই করে নিচ্ছেন। নাটুকে দলের এটা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ, নাকটকে অভিনয়-উপযোগী করে তোলা।

আলোচনা প্রসঙ্গো শম্ভু মিত্র বার্নাড শ-এর লেখা একটি সমালোচনার কথা উল্লেখ করেছেন। বার্নাড শ Sudermann-এর লেখা 'Helmat' নাটকে Magda নামক একটি মেয়ের অভিনয় দেখেছিলেন। নাটকের গল্পটি এমন ছিল—বাবার সঙ্গো ঝগড়া করে Magda বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়। মাগদা গানের জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করে। এই সময় একটি ছেলের সঙ্গো তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে সন্তানবতী হলে প্রেমিক তাকে ছেড়ে চলে যায়। Magda নিজের চেষ্টায় সংগীতশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। তারপর এক সময় নিজের আগ্রহে বাবার সঙ্গো সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নেয়। আবার বাবার বাড়ি ফিরে আসে মাগদা। সেখানে ফেরার পর হঠাৎ একদিন Magda দেখতে পেল তার বাড়ির সঙ্গো ছেলেটির ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। বার্নাড শ তাঁর সমালোচনা মূলক লেখাটিতে এই জায়গাটার এক অসাধারণ বর্ণনা করেছেন। মাগদা ঝিয়ের হাত থেকে কার্ড নিল, কার্ড পড়ল, তারপর নিজেকে দৃঢ়ভাবে সংযত রাখার চেষ্টা করলো। লোকটি ফুল নিয়ে এসে উপহার দিয়ে দু-একটি কথা বলার পর মনে হচ্ছিল মাগদা নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে নিজেও ভাবলো নিজেকে সংযত করতে পেরেছে, এবার সহজ হতে পারে, এখন কথা বলতে পারে ওর সঙ্গো, তাকাতেও পারে ওর দিকে। 'ওর' চেহারার পরিবর্তনটাও দেখতে ইচ্ছে করল তার। বিপত্তিটা ঘটলো দেখতে গিয়ে। এবার মাগদা ফিল করল তার মুখ লাল হয়ে গেছে, সে মুখ আড়াল করার চেষ্টা করলো, অন্যদিকে মুখ ফেরালো, মুখ থেকে যেন রক্ত ঠিকরে বেরোতে চাইলো, হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিল মাগদা। নাটকে এই বিবরণ লেখা ছিল না কোথাও। অভিনয় দিয়ে এটাকে তৈরি করে নিতে হয়েছে। অসাধারণ একটি সাক্ষাৎকারের মুহূর্ত জীবন্ত শিল্পে পরিণত হলো অভিনয়ের গুণে। এই লেখা পড়তে পড়তে এবং অসম্ভব ভালো একটি শিল্প মুহূর্ত বুঝতে বুঝতে শম্ভু মিত্রের মনে হয়—

> আমাদের সততা ও প্রগাঢ়তা নিয়ে যদি আমরা চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি তাহলেই দেখা যাবে একে একে চরিত্রগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবং সেই যথার্থ চরিত্র নাটকের গতি বেগবতী রাখতে যা বলবে তাই-ই হবে সংলাপ।[২]

যে কোনো মানুষের পরিচয় ফুটে ওঠে তার সামাজিক ব্যবহারে। কার সঙ্গো আমরা কেমন আচরণ করি তা থেকেই বোঝা যায় তার পরিচয়। নাটকের মানুষগুলোর মধ্যে বিচিত্র সম্পর্কে যে অভিনয় ধরা পরে সেই অভিনয় তত বেশি মনের মতো হয়ে ওঠে। সেখানে নাটকের গতি বজায় রাখতে প্রয়োজনানুসারে অদল-বদল করে নিতে পারলে ভালো হয়। শম্ভু মিত্র মনে করেন, সেটা 'কোনো সৎ-মনা নাট্যকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না। তাতে তাঁরই লাভ।'[৩]

সংলাপের ক্ষেত্রেও তিনি একই কথা বলেছেন। অভিনীত-চরিত্রকে মনোগ্রাহী করতে নাটকের সংলাপের ভাষা বদলে নেওয়াই হবে অভিনেতার উপযুক্ত কাজ। কোনো নাট্যকারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অনুধাবন করে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই সেটা করা উচিত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর নাট্যদল সেই কাজটিই করে গেছে। এইভাবে নাটক তৈরি করে তাঁরা অভিনয় করেছেন। সামগ্রিক অভিনয় তথা দৃশ্যসজ্জা, আলোর ব্যবহার এবং অভিনয় শেষের প্রচ্ছেদ-প্রক্ষেপণ এর ক্ষেত্রেও তাঁরা এভাবেই ভেবেছেন। আর তাঁদের সেই ভাবনার কদর দর্শক-সাধারণ দিয়েছেও। তাই ঢাল-তলোয়ার হয়তো তাঁদের ছিল না কিন্তু তাঁদের—

> অভিনয়ে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের তুলনায় অনেক বেশি নিষ্ঠা, অনেক বেশি বুদ্ধি, অনেক বেশি রুচির প্রকাশ দেখতে আশা করে লোকে। এ কিন্তু আমাদের গৌরব। লোকে আমাদের সিরিয়াসলি দেখতে শুরু করেছে বলেই আমাদের নিয়ে এত আলোচনা করে।...এ আশার সম্মান রাখতে

> পারলে তবেই আমরা বাঁচব। অসুবিধার মধ্যে লড়াই করলে তবেই আমরা বাড়ব। কী হয়েছে---ঢাল নেই তো নেই-ই, তলোয়ার নেই তো নেই-ই, খামচি মারেঙ্গা সব নব-নাট্য আন্দোলনের নিধিরাম সর্দারেরা, তবু হঠেঙ্গা নেহি।[৪]

নবনাট্য আন্দোলনের পথিকরা যেন-তেন প্রকারে ভালো নাটক করার প্রয়াসী। নাটক ভালো করে করার জন্যে অপরিহার্য সূত্রগুলি মেনে চলতে হবে। প্রথমে নাটকটিকে বুঝে নিতে হবে। ভেবেচিন্তে নাটকটিকে ভালো করে সাজিয়ে নিতে হবে। এই ভাবনার জায়গাটিকে লেখক বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। ভাবনায় কোনো কৃপণতা বা ভিক্ষিরিপনা থাকবে না। তাই অনেক না থাকার মধ্যেও শম্ভু মিত্ররা ভাবতে পারেন, ভেলভেটের জায়গায় চট, দোতলায় উঠবার সিঁড়ি অন্তরালে রেখে তার দৃশ্য দেখানো, প্যাকিং বাক্সের উপর প্যাকিং বাক্স বসিয়ে শুধুমাত্র একটা কোনা দেখিয়ে তার আন্দাজ দেওয়া, কয়েকটি অশ্বত্থ ডাল বসিয়ে জঙ্গালের শোভা প্রদর্শন করিয়ে কীভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়, সেই সবদিকে তাঁদের সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি সব সময় ছিল।

প্রসঙ্গাক্রমে তিনি 'নবান্ন' নাটক অভিনয়ের কথা বলেছেন। মহর্ষির বাড়িতে নাটক-অভিনয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। দৃশ্যপট কেমন হবে, ঘরবাড়ি-বনজঙ্গাল ইত্যাদির বাহার থাকবে এমন ধরনের পর্দা ব্যবহার করতে হবে। দৃশ্যপট নিয়ে সকলেই যখন চিন্তিত তখন মহর্ষি হঠাৎ বললেন, পর্দা ব্যবহার করো।...অন্য লোকে যেখানে ভেলভেট লাগায়, পাইন কাঠ লাগায়, আমরা সেখানে চট লাগাবো। আর সেটা চাষার জীবনের নাটকে একটা ঠিক আবহাওয়াও তৈরি করবে। চট লাগাও, চট।'[৫] সেখান থেকে শুরু হলো চটের পর্দা ব্যবহার আর নতুন বাহারি চটের পর্দার উপর সেদিন প্রথম আলো পড়েছিল। সেই রঙিন চটের পর্দার মধ্যে কোনো গরিবিয়ানা ছিল না বরং সেটা মোহিত হওয়ার মতোই ব্যাপার ছিল। তবু পয়সার অভাবে নাটকে ব্যবহৃত হবে এমন অনেকগুলো পদ তাঁদের বাদ দিতে হয়েছে। তবু সেখানে চটের পর্দার উপর চমৎকার করে আঁকা থাকত নিকানো দাওয়া, খড়ের চাল, একদিকে মরাই, মরাইয়ের কাছে দু-চারটে লঙ্কার গাছ, কোনের দিকে লাঙল, মাটির গামলায় গরুর জাবনা, মাটির দেওয়ালে আম, জাম, আমড়া আরও কত বড়ো বড়ো গাছের মাথা ক্রমশ ছোটো হতে হতে দূরে চলে গেছে, সামনে ঐ বিস্তীর্ণ নীল আকাশ, আকাশের গায়ে থোপা থোপা নরম সাদা মেঘ, মেঘের বুকে চিল।'[৬]

প্রয়োজনীয় অর্থ, মঞ্চ-ব্যবস্থা, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, কোনো প্রকার সরকারি সাহায্য ইত্যাদির অভাব ছিল বলেই হয়তো ভাবনার বিস্তার ছিল অনেক বেশি। কী কী জিনিসের সমাহার ঘটালে পরিবেশ ক্ষুন্ন হবে না, সে সম্পর্কেও সঠিক ধারণা থাকা দরকার। শম্ভু মিত্ররা এ বিষয়েও সচেতন ছিলেন। কেননা অতিরিক্ত দেখানোর ব্যাপার থাকলে ঐ দেখাটুকুতেই দর্শক আটকে যাবে, নাটক সেখানে মার খাবে। তাই ভালো নাটকের জন্য যতখানি প্রয়োজন, ততটুকুই ঠিক আছে, তার বেশি হলে মুশকিল। তবে যেটুকু নিতান্ত প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করতে তাঁরা যে চটের ব্যবহার শুরু করলেন, সেখানেও কিছু অসুবিধার রয়েছে। অসুবিধাগুলো তিনি সূত্রাকারে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, সব মঞ্চের মাপ সমান হয় না বলে একটা নির্দিষ্ট মাপের পর্দা বানিয়ে নিলেই কাজ শেষ, এমনটি হবার উপায় নেই। কেননা তাঁদের নিজেদের একটা মঞ্চ নেই, বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চে অভিনয় করতে হয়। এটা একটা অসুবিধার দিক। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকবার অভিনয়ের সময় অঙ্কন শিল্পী, রঙ-তুলি ইত্যাদির খরচ বহন করে চলাও সম্ভব না। অন্তত বহুরূপীর পক্ষে তো একেবারেই নয়। তৃতীয়ত, জীবন্ত অভিনেতার আশে-পাশে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে মঞ্চের উপযোগী বাস্তব জিনিসের ব্যবহার আবশ্যক। যেমন—খানিকটা সিঁড়ি, কয়েকটা থাম,

কিছু গাছপালা ইত্যাদির মধ্যে দিয়েই অন্তরঙ্গ নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এই পরিবেশ সৃষ্ট হতে অবশ্যই সাহায্য করবে আলোকসম্পাত।

তাঁর মতে 'আঁকা পটও যেমন অবাস্তব, তেমনি...থাম বা সিড়িও অবাস্তব। কারণ সত্যকার পরিপ্রেক্ষিত তো কখনোই মঞ্চের ওপর সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তার চেয়ে, পটটাকে সজ্জা হিসাবে ব্যবহার করাই ভালো, নানাপ্রকার কারুকার্যময় আঁকার রীতিতে।'[৭] তবে সিনেমায় যে সুযোগ থাকে, মঞ্চ-নাটকের ক্ষেত্রে সেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তারমধ্যে দিয়েই যেটুকু পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়, সেইদিকটা দেখে-বুঝে নিতে হয়, তবে নাটকের প্রাণ যে নাটকীয়তা সেটা সবসময় ধ্যানে-জ্ঞানে-কার্যে মাথায় রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন প্রাবন্ধিক। এ প্রসঙ্গে তিনি 'পথিক' ও 'উলুখাগড়া' নাটক অভিনয়ের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। এই নাটক দুটির পটভূমিকা যেহেতু একই, তাই জিনিস আমদানি করা এক্ষেত্রে সহজ হয়েছিল। সেই জিনিসের তালিকায় যেমন রয়েছে চেয়ার, টেবিল, তক্তপোশ, স্ট্যান্ডিং লাইট, বই-আলমারি ইত্যাদি। এই সুবিধাটুকু থাকার জন্য মঞ্চটা সাজানো-গোছানো লাগল আর অভিনেতাদের অভিনয়ের ক্ষেত্রেও বেশ সুবিধা হল। তবে আসবাবপত্রকে যত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হল, দৃশ্যপট তত গুরুত্বহীন হতে লাগল। এইভাবে আস্তে আস্তে দৃশ্যপটের আকর্ষণ থেকে দর্শক-মন মুক্ত হয়ে অভিনয়ের প্রতি নিবদ্ধ হল। 'উলুখাগড়া'র অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাঁরা এইভাবে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছিলেন। 'ছেঁড়া তার' নাটকে রয়েছে অনেকগুলো দৃশ্য। দৃশ্যগুলো দ্রুত পরিবর্তনীয়। যেটা কোনোভাবেই অভিনয়ে দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু যথাসম্ভব সাজিয়ে-গুছিয়ে তাঁরা জোর দিলেন অভিনয়ের উপর। দেখা গেল 'ছেঁড়া তার' অভিনয়ের গুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। এইভাবে নাটকগুলি অভিনয় করার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তাঁরা অনুধাবন করলেন কতগুলো 'অনড় স্থূল দৃশ্যপট' সচল নাটকের জন্য ভারবাহী বোঝার মতো। আসল কথা নাটকের মুড দর্শকদের চিন্তা-স্রোতে বইয়ে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি আকৃষ্ট না থেকে যেমন মুক্ত প্রবাহের কথা ভেবেছিলেন, বহুরূপী সেই ভাবনাকে গ্রহণ করল। এইভাবে 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়া তার', 'দশচক্র'-এর অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে শম্ভু মিত্ররা হাতে নিলেন 'রক্তকরবী'। 'রক্তকরবী প্রসঙ্গে' নামক প্রবন্ধে আমরা লেখকের অভিজ্ঞতার বিস্তারিত 'অন্তরঙ্গ জ্ঞান'-এর পরিচয় পেয়েছি। 'রক্তকরবী'র সাফল্য সর্বজনবিদিত।

উৎসের সন্ধানে

১. শাঁওলী মিত্র সম্পাদিত : শম্ভু মিত্র 'রচনা সমগ্র' ২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃ.১০৫
২. তদেব : পৃ. ১০৬
৩. তদেব : পৃ. ১০৬
৪. তদেব : পৃ. ১০৬-১০৭
৫. তদেব : পৃ. ১০৭
৬. তদেব : পৃ. ১০৮
৭. তদেব : পৃ. ১০৯

সাহিত্য নিয়ে...........

মধ্যযুগের বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গ মঙ্গলকাব্য

সোহম চ্যাটার্জী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যগুলি এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি। দেশ ও সমাজের দুরাবস্থার কালে সাধারণ মানুষের বরাভয়দাতা রাজন্যশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফলে বহিঃশক্তির আক্রমণ ও নিপীড়ন থেকে সাধারন মানুষকে রক্ষা করার মতো আর কেউ ছিল না। এই পরিস্থিতিতেই দেব-বাদের আবির্ভাব। রাজণ্যশক্তি যখন হীন, রাজার কাছে যখন কাঙ্খিত নিরাপত্তা পাওয়া যায় না তখন অসহায় সাধারণ মানুষের দেবতার শরণ নেওয়া ছাড়া আর গতি থাকে না। এই পরিস্থিতিতেই মঙ্গালকাব্যগুলির সৃষ্টি। মঙ্গালকাব্যের দেব-দেবীরা মানুষকে নানান সামাজিক-রাজনৈতিক দুরাবস্থায় আশ্রয় দিয়েছেন, পরিবর্তে তাদের পূজা প্রার্থনা করেছেন তাঁরা। নিজ নিজ ধর্মের বিস্তারের জন্যই দেব-দেবীরা মর্ত্যে আবির্ভূত হলেও মঙ্গালকাব্যের এই সামাজিক দিকটি তাই অস্বীকার করা যায় না। অলৌকিক শক্তিতে মঙ্গালকাব্যের দেব-দেবীরা আদায় করে নিয়েছে ভক্তের কাছ থেকে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা। কৃপা কিংবা নিগ্রহ সবটাই যেন দেব-দেবীর অকারণ ইচ্ছার কারন মাত্র। মঙ্গালকাব্যের দেব-দেবীর এই স্বভাবের বর্ণনা দিয়েছেন কবি ভারতচন্দ্র—

> অনুগ্রহ করিতে বিস্তরক্ষণ নহে।
> নিগ্রহ করিতে পুনঃ বিলম্ব না সহে।।

বস্তুত মঙ্গালকাব্য পৌরাণিক দেবমণ্ডলে নতুন দেবতা অথবা দেবীর অন্তর্ভূক্তি ও প্রতিষ্ঠার কাহিনি। এই প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছে মর্ত্যে পূজা প্রতিষ্ঠার দ্বারা। মঙ্গাল দেব-দেবীরা এজন্যই ছল-বল-কৌশল সব কিছুই প্রয়োগ করে থাকেন মর্ত্য-মানবের কাছ থেকে পূজা আদায়ের জন্য। সেজন্য নিজ ভক্তকে যেমন তিনি অপরিমেয় করুণায় সম্পদ প্রতিপত্তি দান করেন ভক্তের প্রকৃত যোগ্যতা

বিচার না করেই তেমনি অপর দেবতার অনুগৃহীত ব্যক্তিকে নিগ্রহও করে থাকেন অকারণে। প্রায় সমস্ত মঙ্গালকাব্য সম্পর্কেই একথা সত্য। খ্রীস্টিয় চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালে বাংলা মঙ্গালকাব্যের সূচনা, সমৃদ্ধি ও পরিণতির কাল। এই পাঁচশো বছরের কালসীমায় বাংলার আর্থ-সামাজিক চিত্রটি তার যাবতীয় রূপান্তর সহ বাংলা মঙ্গালকাব্যে বিবৃত হয়ে রয়েছে। নরখণ্ড রচনার সুবাদে মঙ্গাল কবিদের কল্পনা মৃত্তিকালগ্ন হয়ে পড়ত এবং সেই সূত্রেই মঙ্গালকবিরা নিজেদের সামাজিক অভিজ্ঞতাকে কাব্যের ভাষায় ফুটিয়ে তুলতেন। তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক চিত্রের পাশাপাশি দ্রুত বদলে যাচ্ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। অর্থনীতি তখন নিয়ন্ত্রিত হতো মূলত দুটি ধারায়—১. কৃষি নির্ভর অর্থনীতি, ২. বাণিজ্য নির্ভর অর্থনীতি।

কৃষিনির্ভর অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায় সমকালীন চিনা পরিব্রাজক ওয়াং-তা-ইউয়ানের বিবরণী থেকে। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি বাংলাদেশে এসে তিনি লক্ষ করেন কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশ ক্রমশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের ভাটি অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়েছে। সেখানকার বন-জঙ্গাল পরিষ্কার করে তাকে কৃষি জমিতে পরিণত করেছে। পূর্ব-বঙ্গে ধানের ফলন চাহিদার তুলনায় বেশি থাকায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। জঙ্গাল কেটে বসতি তৈরির এই ছবি আমরা পরবর্তী কালে কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গালে কালকেতুরগুজরাট 'নগর পত্তন' অংশে দেখতে পাই।

কৃষি-অর্থনীতির পাশাপাশি সুলতানী আমলে বাংলার বাণিজ্য-অর্থনীতির যে চিত্র বাংলা মঙ্গালকাব্যে পাওয়া যায় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বহু প্রাচীন কাল থেকেই বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বাংলাদেশ বিশেষ পরিচিত ছিল। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর তার মহিমা হারালে পরবর্তী কালে তার স্থান নেয় দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের সপ্তগ্রাম বন্দর। পরিব্রাজক ইবনবতুতা সপ্তগ্রামকে বড়ো শহর বলে উল্লেখ করেছেন। খুলনার বিবাহের জন্য তার পিতা ঘটক দনাই পণ্ডিত-কে বলেন 'সপ্তগ্রাম বর্ধমান বর দেখ স্থানেস্থান।' আবার ধনপতি দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য যাত্রার সময় এই সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে জিনিস কিনে তার মধুকর ডিঙা সাজিয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকের কবি বিপ্রদাস পিপলাইয়ের বর্ণনাতেও সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধশালী রূপটি ধরা পড়ে।

সুলতানী আমলেই প্রথম বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ত্রি-স্তরীয় মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা এবং স্বল্প মূল্যের অর্থ হিসাবে কড়ি। বিজয় গুপ্তের কাব্যে ভাগ্য বিড়ম্বিত চাঁদ মাত্র চারটি কড়ি উপার্জনে সমর্থ হয়। মুঘল আমলে সম্পদের মূল উৎস ছিল কৃষি নির্ভর অর্থনীতি। মুঘল বাদশাহরা কৃষি ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধির দিকে মন দিয়েছিলেন। প্রথম যে বা যারা জঙ্গাল কেটে আবাদ করতো, সাধারণত জমিদারির অধিকার তাদেরই দেওয়া হতো। এরা 'বনকাটি জমিদার' নামে পরিচিত ছিল। সপ্তদশ শতকে লেখা 'সারদামঙ্গাল' কাব্যে এমন জমিদারের উল্লেখ পাওয়া যায়—

যাহার রাজা নেই অরাজত্ব জমি
সেই গ্রাম আমারেই ইজারা দেহ তুমি
বেরুন্যা কাটেন বন বসাইল প্রজা
রাজ্যের পালন যেন করেন রাম রাজা

এই জমিদাররা রাজা নামে পরিচিত ছিল। কালকেতু এভাবেই রাজা রূপে বিবেচিত হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্র বিস্তারের দায়িত্ব ছিল কৃষকের। এ ব্যাপারে তারা একবার জমির দখলস্বত্ব পেয়ে গেলে তাদের নিয়মিত ভাবে রাজস্ব দিতে হতো। জমিদারের এখানে ভূমিকা ছিল মিশ্র প্রকৃতির। একদিকে জমিদার অন্যদিকে মহাজন। জমির পাট্টা দেওয়ার পাশাপাশি এরা চাষির হাতে তুলে দিতেন অর্থঋণ, বীজধান, হাল, গোরু প্রভৃতি। জমিদার ছাড়াও কৃষি জগতে মোড়ল নামে একদল সম্পন্ন চাষির অস্তিত্ব ছিল। জমিদার ও মোড়লের মধ্যে এক প্রকার চুক্তি থাকত। এরা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। মুঘল আমলের আইনি ভাষায় এই সম্পন্ন মোড়ল সম্প্রদায়ের নাম ছিল 'খুদ-কশথ'। এদের সাধারণত উৎসাহিত করা হতো অকর্ষিত জমিতে চাষ করার জন্য। বাংলা মঙ্গালকাব্যের পাতায় এদের অস্তিত্ব ঘোষিত। কালকেতু আর বুলান মণ্ডলের কথা 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্যে পাওয়া যায়—

শুন ভাই বুলান মণ্ডল
আস্যগা আমার পুর সন্তাপ করিব দূর কানে দিব কনক-কুণ্ডল
আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ তিন সন বহি দিহ কর।

গ্রামের এই সম্পন্ন মণ্ডলেরা মজুর কৃষাণ লাগিয়ে পেট-ভাতায় চাষ করাত। এমনই উল্লেখ করেছেন বিজয় গুপ্ত তাঁর 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে। যেখানে বলা হয়েছে চাঁদ সওদাগর দৈব দুর্বিপাকে পড়ে মজুরের কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল—

এতেক ভাবিয়া মণ্ডল মনেমনে পাছি
ধান্য নিড়াইতে চান্দের হাতে দিল কাঁচি।।

মুঘল আমলের শেষ দিকে চাষির অবস্থা যে শোচনীয় হয়ে ওঠে তার পরিচয় পাওয়া যায় রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে—

শুনিতে সুন্দর চাষ শুনিতে সুন্দর।
সকল সম্পূর্ন যার তার নাই ডর।।
চাষ বলে ওরে চাষী তোরে আগে খাব।
মোরে খাবে পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব।।

'শিবায়ন' কাব্য মঙ্গালকাব্য ধারায় প্রথমাবধি জনপ্রিয় ছিল না। কারণ 'মনসামঙ্গাল', চাণ্ডীমঙ্গাল, এবং সমকালীন শিব মাহাত্য মূলক ব্রতকথায় শিব কাহিনির অভাব ছিলনা। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মনসা ও চণ্ডী কাহিনির ধারা যখন স্তিমিত হয়ে আসে তখন স্বাদ বদলের মতো মানুষ 'শিবায়ন' কাব্যকে চর্চার আসরে নিয়ে আসেন। এর কাহিনি কিছুটা পূর্ববর্তী মঙ্গালকাব্যের থেকে পৃথকও বটে। সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য রামেশ্বর সমকালীন অষ্টাদশকীয় বঙ্গাজীবনের বাস্তব বর্ণনায় সমাজলগ্নতার পরিচয় দিয়েছেন। রামেশ্বরের কাব্য একান্ত ভাবেই কৃষি কেন্দ্রিক কাব্য। অনেকে মনে করেন রামেশ্বরের কাব্য চাষার গান। শিষ্ট সাহিত্যে তার প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না রামেশ্বরের এই চাষার গানই চূড়ান্ত ভাবে বাস্তবনিষ্ট সাহিত্যিক নিদর্শন। কাব্যের বহু স্থানেই সংস্কৃত পুরাণ ও কালীদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের ভাবানুবাদ করেছেন। কিন্তু যেখানে কৃষি জীবনের বর্ণনায় সংস্কৃত পুরাণ আদর্শ পরিত্যাগ করে সহজ কবিত্বের পরিচয় রেখেছেন সেখানে তাঁর সৃষ্টি হয়ে উঠেছে অধিক প্রাণোজ্জ্বল। অষ্টাদশ শতকের ক্ষুৎপীড়িত বাঙালি জীবনের অনিবার্য অঙ্গা যে কৃষি তা রামেশ্বরের কাব্যে এক জলন্ত বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছে। তাঁর লেখনীতে অন্নাভাবগ্রস্থ শিবের সংসারের চিত্রটি যেন বাঙালি জীবনের আলেখ্য হয়ে উঠেছে—

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি।।
তিন জনে একুনে বদন হৈল বারো।
গুটিগুটি দুটি হাতে জত দিতে পারো।।

অন্নাভাবে শিব ভিখারিও হয়েছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের শিব যেমন অনুভব করেছিলেন কৃষি কাজ ছাড়া অন্নাভাব দূরীকরণের কেনো উপায় নেই; তেমনই তার ৫০ বছর আগেই রামেশ্বরের শিব একই অনুভবগ্রস্থ হয়েছিলেন। কৃষি কাজে নিপূণ অভিজ্ঞতা ও আকর্ষণ ছিল রামেশ্বরের। অষ্টাদশ শতকের বঙ্গ কৃষাণজীবন তাঁর কাব্যে প্রকট বাস্তবতায় ফুটে উঠেছে। তাঁর শিব দরিদ্র, নেশাখোর, লম্পট-চরিত্র বৃদ্ধ কৃষক। অপর দিকে পার্বতী সাধারন গ্রাম্য কৃষক রমণী। কোনো যুগেই মঙ্গলকাব্যগুলি সমকালীন জন চাহিদাকে অতিক্রম করে সৃষ্টি হয়নি। সে ক্ষেত্রে এ-কথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় অন্নাভাবগ্রস্থ বঙ্গজীবনে কৃষি কৃষি নির্ভর শিবায়ন কাব্য সৃজনের মূল উদ্দেশ্য। ঋতু অনুসারে শস্যাদির প্রভেদ, চাষের নানান প্রকরণ এবং কৃষিপল্লির খুটি-নাটি ছড়িয়ে আছে রামেশ্বরের সৃষ্টি পথের চারধারে।

ইতিহাসের সূত্রে আমরা জানতে পারি খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশ ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হলেও বাংলার সামাজিক চিত্র খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। তুর্কী-আফগান শাসন পেরিয়ে মুঘল আমলেও বাংলা ও বাঙালি তার সামাজিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ছিল। সমাজ কাঠামোয় জাতিভেদ প্রথা ছিল অক্ষুণ্ণ। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি সব বর্ণ-ই সংকর বা মিশ্র রূপে বিবেচিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহের মধ্য দিয়ে এই সংকর শ্রেণির বিন্যাস। উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিন স্তরের বিন্যাসে মোট ৩৬ টি উপবর্ণের কথা বলা হলেও বৃহদ্ধর্ম পুরাণের তালিকাতে ৪১টি উপবর্ণ বা জাতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ তাঁর চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তন ও বিভিন্ন জাতির আগমনকে অবলম্বন করে এই চতুর্বর্গীয় জাতি ভেদ প্রথার এক বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। এই চতুর্বর্ণের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য; দ্বিতীয় শ্রেণিতে কৃষিজীবী, কুমোর, কামার, তাঁতি, মালাকার, মাদক, গন্ধ বণিক, স্বর্ণকার প্রমুখ; তৃতীয় শ্রেণিতে জেলে, কাঠুরে, ধোপা, ছুতোর প্রমুখ আর চতুর্থ শ্রেণীর মানুষেরা ছিল ব্রাত্য। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্মমঙ্গালকাব্যে এসব জাতির পাশাপাশি যুদ্ধে বিভিন্ন বৃত্তিধারী যেমন—ধানুকী, বন্দুকী, ঢালি, রায়বেঁশে প্রমুখের একটি তালিকা দিয়েছেন। তৎকালীন বাংলাদেশে পারিবারিক কাঠামো ছিল একান্নবর্তী। পরিবারের কর্তা ছিলেন পিতা, পিতার অবর্তমানে বড়ো ভাই। কবিমুকুন্দ তাঁর চণ্ডীমঙ্গালে জানিয়েছেন ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে দেশ ছাড়া হওয়ার সময় তাঁর ছোটো ভাই রমানাথও সঙ্গে ছিলেন—

দামিন্যা ছাড়িয়া জাই সাঙ্গে রামানন্দী ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে।

কেতকাদাসও গৃহত্যাগের সময় দুঃসময়ের সঙ্গী রূপে পেয়েছিলেন ভাই অভিরামকে—"মনে করি সবিস্ময় : বেলা আছে দণ্ড ছয় : সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই।" রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্ম মঙ্গালকাব্যে দেখা যায় পিতার অবর্তমানে বড়ো ভাই পরিবারের কর্তা রূপে রূপরামকে পরিবার থেকে বহিষ্কার করেছিলেন।

মঙ্গালকাব্যে যে পারিবারিক চিত্র এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থার চিত্র কবিরা এঁকেছেন তাতে বর্ণাশ্রমী পরিবারের চিত্রই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে জন্মের আগে থেকে শুরু হয় সাধ ভক্ষণ, জন্মের পর হয় ষষ্ঠীপূজা, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন। এরপরের পর্যায়ে আসে বিবাহ। মধ্য যুগের বিবাহ মূলত বাল্য বিবাহ। সেই বিবাহ নির্ধারণে ঘটকের ভূমিকা ছিল অনেক। জীবনের শেষ পর্যায় আসে মৃত্যু। মৃত্যু পথযাত্রীকে তার পরিজনেরা গঙ্গার তীরে কুঁড়ে ঘর তৈরি করে সেখানে রেখে যেতেন। মৃত্যুর পর শবদাহের বর্ণনা আছে ধর্ম মঙ্গালকাব্যে—

কলসে কলসে তায় ঢেলে দিল ঘি
কর শঙ্খ ত্যজে তবে চারি রাজার ঝি।।

সমাজের একদিকে বহু বিবাহ অন্য দিকে সধবা নারীর সহমরণ প্রথা স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছিল অসাম্য। কৌলিন্য প্রথায় কুল রক্ষার নামে পুরুষের বহুবিবাহ সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করত। চণ্ডীমঙ্গালের ভাঁড়ুদত্ত, ধনপতি, শ্রীপতি, ধর্মমঙ্গালের লাউসেন এরা সকলেই একাধিক বিবাহ করেছেন। এমনকী মঙ্গালকাব্য গুলির পৌরাণিক অংশে শিব-পার্বতীর কলহের মূল কারণ সপত্নী গঙ্গা। যাকে শিব ভয়ে লুকিয়ে রাখেন জটায়।

এ হেন মধ্যযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পরিকাঠামোয় বহুগামী পুরুষ বারেবারেই নারীর সতীত্বের পরীক্ষা নিয়েছে। চণ্ডীমঙ্গালকাব্যে খুল্লনার ছাগল চরানো নিয়ে তার চরিত্রে সন্দেহ দেখা দিলে তাকেও দিতে হয় সতীত্বের পরীক্ষা। বিপরীতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য কতখানি হতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় কবিকঙ্কণ বর্ণিত লক্ষ-হীরার কাহিনিতে। যেখানে বর্ণিত আছে লক্ষ-হীরা স্বামীর গলিত কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত দেহটাকে কাঁধে করে পৌঁছে দিয়েছিলেন গণিকালয়ে শুধুমাত্র স্বামীর মর্যাদা রাখতে। অনুরূপ বিবরণ আমরা পাই বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গালকাব্যেও।

তথ্যের সন্ধানে

১. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', কলিকাতা বুক হাউস, ১৩৪৬
২. যোগিলাল হালদার সম্পাদিত : 'রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭
৩. সুকুমার সেন সম্পাদিত : 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গাল', সাহিত্য একাডেমি

বঙ্কিমের উপন্যাস ও বঙ্গদর্শন

সংহিতা মাল

পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ (১৭৬৫) এর মধ্যে দিয়ে এ দেশে শুরু হয়েছিল ইংরেজ শাসনকাল। এর ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন দেখা দেয়। যে সামাজিক কাঠামো তার পূর্বকাল পর্যন্ত চলে এসেছিল, ইংরেজ শাসন সেই কাঠামোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। বিনষ্ট হয় সামাজিক মূল্যবোধ ও পারস্পরিক প্রীতির বন্ধন। প্রাচীন ভাবধারা ও নতুন চিন্তাধারার সংঘাতের মধ্যে দিয়ে এই সামাজিক পরিবর্তনের অগ্রগতি ঘটে। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ইংরেজ-পৃষ্ঠপোষিত এই নতুন চিন্তাধারাকে বাংলা ও ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষ গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু তার থেকে মুক্তি পাওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাহ্য ভোগবিলাসিতার মোহে ধীরে ধীরে তারা যতই জড়িয়ে পড়েছে, ততই তারা নিজেদের অতীত ঐতিহ্য, সমাজবন্ধনের পবিত্রতা, প্রীতির ঐশ্বর্য ভুলে পরিণত হয়েছে আত্মবিস্মৃত অনুকরণপ্রিয়, ব্রিটিশ মানসিকতার চাটুকার মেরুদণ্ডহীন জাতিতে। তার ফলে মানুষ পরিণত হয়েছে 'সংকীর্ণ স্বার্থ চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভোগলালসা অর্থদাসে'। পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রয়োজনে ইংরেজদের সহযোগী হিসাবে নতুন বাঙালি মধ্যবিত্তের আবির্ভাব হয়। এদের বেশিরভাগ ছিল বাঙালি হিন্দু এবং এরা ইংরেজি শিক্ষা লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এদেশে মুদ্রণ যন্ত্র ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন খ্রিস্টান মিশনারীরা। মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের প্রকাশের ফলে এদেশে নবযুগের সূচনা হয়। ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকেই বাংলা গদ্য ধীরে ধীরে সাহিত্যের বাহন হয়ে উঠতে লাগল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্যচর্চা শুরু এবং এরপর একে একে আবির্ভূত হন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। বাংলায়

নবজাগরণের সূচনা ও বিকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে। উনিশ শতকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পরে ভারতে। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। ফলে ইউরোপের আধুনিক চিন্তাধারা, জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে বাঙালিদের এবং শিক্ষিত বাঙালিরা এই ভাবধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হন। মূলত রামমোহন রায়ের সময় থেকেই বাংলার নবজাগরণের শুরু। বহমান জীবনে পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের ফলে বাঙালির মধ্যে জাগ্রত হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাবোধ, মানবতাবোধ ও নতুন মূল্যবোধের। এই পরিবর্তন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় মধ্যবিত্তশ্রেণি ও তাদের অর্জিত শিক্ষা। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন প্রাচ্যবিদ্যাও গুরুত্ব পেতে থাকে। মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে জাগ্রত হয় নবচেতনা, নবজিজ্ঞাসা। নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তিরা মানবকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনাকে প্রাধান্য দিতে থাকেন এবং নতুন মূল্যবোধের নিরিখে জীবন ও সমাজকে দেখতে শেখান।

বাংলার নবজাগরণের একটি বড়ো অবদান হল বাঙালির মনে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সূচনা। দেখা দিতে থাকে বাঙালির ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার মানসিকতা। উনিশ শতকে ষাটের দশক থেকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ইউরোপ থেকে এসেছিল নতুন চিন্তা, শিক্ষা, মানবাধিকারের ধারণা ও রাজনৈতিক জ্ঞান। ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের ফলে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা থেকে সরে আসতে থাকে, আঞ্চলিকতার অচলায়তন ভেঙে পড়তে থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গসমাজে দৈব বিশ্বাস, শাস্ত্রীয় বিধিবিধান ও নানান সংস্কার ছিল অত্যন্ত প্রবল। নবজাগরণের ফলে নবজাগ্রত বাঙালি মানসে জায়গা করে নিল মানবতাবোধ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও নতুন মূল্যবোধ। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ফলে বাংলার সমাজজীবনে কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। তার মধ্যে একটি হল শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধান। উনিশ শতকের বাঙালি ইংরেজি শিক্ষার দিকে বেশি ঝোঁকার ফলে দেশীয় শিক্ষা অবহেলিত হয়। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ব্যবস্থা অবহেলিত হল।

শিক্ষিত বাঙালি তার নিজ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিল। তবে ইংরেজি শিক্ষার সুফল সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালি সচেতন ছিল। এই শিক্ষা বাঙালিকে সাহায্য করেছিল জড়ত্ব থেকে মুক্তি, স্বাধীন চিন্তা, ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যবোধ, মানবতাবোধ এবং বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী মন গঠনে। বাঙালির রেনেসাঁস তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মেলবন্ধনের ফল। আর বাংলার রেনেসাঁসের প্রভাব পড়েছিল সাহিত্যে। সমাজ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রেনেসাঁসের প্রভাব মানুষের মন ও মননের উপর পড়ে। সমাজ পরিবর্তনের পাশাপাশি আধুনিক বাঙালির চেতনাজগতও পরিবর্তন হয়। সাহিত্যে প্রকাশ পায় নতুন অনুভূতি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই নতুন অনুভূতির রূপকার। নবজাগরণ ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যের বিকাশলাভ দ্রুতগতিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই সাহিত্য পরিবেশে গড়ে ওঠা শিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে গদ্যসাহিত্যে সৃষ্টিধর্মী দিকের অস্তিত্ব একরকম অনুপস্থিত বললেই চলে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হল সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের যুগ। এই সময় সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৯ সালের শেষ দিকে কর্মসূত্রে বহরমপুরে বদলি হলেন। বহরমপুর তখন সাহিত্যচর্চার এক উল্লেখযোগ্য স্থান। আর এখানেই পরিচয় হয় ঐতিহাসিক রামদাস সেনের

সঙ্গো। একে একে পরিচিত হলেন আরও অনেক বিদ্বজ্জনের সঙ্গো। আর এই বহরমপুর থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গাদর্শনে'র পরিকল্পনা, ভাবনাচিন্তা ও পরিচালনা। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত মানুষরা বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহায্যের কথা বললেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র স্থানীয় আরও অনেকের সঙ্গো পত্রিকাটি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন এবং ঠিক হয় পত্রিকাটির নাম হবে 'বঙ্গাদর্শন'।

বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকার মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত নাগরিক এবং ইংরেজি অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগসাধন করতে। তাই তিনি জোর দিয়েছিলেন মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর। আসলে তিনি উচ্চশ্রেণি এবং নিম্নশ্রেণির ভেদটা ঘোচাতে চাইলেন মাতৃভাষার সাহায্যে। এই পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায় ছিল যে ইংরেজি ভাষা থেকে পাওয়া বিদ্যাকে যদি বাংলা ভাষায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যক্ত করে দেওয়া যায় তাহলে নতুন যুগ ও নতুন সংস্কৃতির বাণী জনসমাজে ছড়িয়ে পড়বে। সেই সময় উপযুক্ত সাময়িক পত্রের অভাববোধ বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্গাদর্শন প্রকাশে উৎসাহিত করেছিল। 'বঙ্গাদর্শন' এর পূর্বে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলি হল—'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১), 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮), 'রহস্যসন্দর্ভ' (১৮৬৩), ও 'অবোধবন্ধু'। (১৮৬৩) এই পত্রিকাগুলি তাদের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাগুলিতে সামগ্রিকভাবে সমাজ ও জাতির চিন্তা পরিলক্ষিত হয় না। বাংলার সার্বিক উন্নতি সাধন ও বাঙালি জাতির মঙ্গল সাধনের তাগিদ বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বিশেষভাবে। আর এই সামাজিক ও সাহিত্যিক তাগিদ থেকেই তিনি 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ২৯.০৩.১৮৭২ তারিখে প্রস্তাবিত পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় 'এডুকেশন গেজেট' ও 'সাপ্তাহিক বার্তাবহ' পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত তারিখ অনুযায়ী 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ পেল। প্রথম সংখ্যার 'পত্রসূচনা'য় সম্পাদক পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরলেন সকলের সামনে—

> আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙালির পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব, এইমাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।
>
> দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্তাবহের কতকদূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে যে কাহারো রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।
>
> আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থে যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদের উদ্দেশ্য।...
>
> তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব, বাসনা করি।[১]

বঙ্গভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রকে কেবলমাত্র একজন সাহিত্যিকের ভূমিকায় আটকে রাখতে পারেনি।

তাই বাঙালি জাতির সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে তিনি প্রকাশ করলেন ‘বঙ্গদর্শন’ নামে এই সাহিত্য পত্রিকা। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে যেমন বাংলা বিমুখ লেখকদের এক জায়গায় আনলেন তেমনি আপন লেখনীর দ্বারা বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন দিশার সন্ধান দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার প্রথম চার বছর (১২৭৯-১২৮২ বঙ্গাব্দ) সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই সময়ে ‘বঙ্গদর্শন’-এর প্রচার ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় লেখক হিসেবে তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় একেবারে এই পত্রিকার সূচনালগ্ন অর্থাৎ বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ থেকে আদিপর্যায়ের ‘বঙ্গদর্শন’-এর সমাপ্তিলগ্ন অর্থাৎ মাঘ ১২৯০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, কবিতাগ্রন্থ, সমালোচনা প্রভৃতি সাহিত্য শাখার বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রায় সবক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজস্ব মৌলিকতার ছাপ রেখে যান।

বঙ্গদর্শনে সাহিত্য ছাড়াও ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সংগীত, পুরাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, বাঙালির জীবনচর্চার বিষয় আলোচনা প্রকাশ পেত। ১২৮২ বঙ্গাব্দের পর এক বছর অর্থাৎ ১২৮৩ বঙ্গাব্দে ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশ বন্ধ থাকে। এক বছর পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকার পর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পুনরায় ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিতি পত্রিকায় পুরো মাত্রায় ছিল। তিনি ছিলেন পত্রিকার মূল কান্ডারী। লেখক ও লেখা নির্বাচনে তিনিই প্রধান ভূমিকা পালন করতেন। এর পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমতিক্রমে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তার নেতৃত্বে ‘বঙ্গদর্শন’-এর চারটি সংখ্যা বের হয় (কার্তিক, ১২৯০ বঙ্গাব্দ-মাঘ ১২৯০ বঙ্গাব্দ) ১২৯০ বঙ্গাব্দের পর বঙ্গদর্শনের আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি আর এর মধ্য দিয়েই বঙ্গদর্শনে আদিপর্যায়ে সমাপ্তি ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় এই পত্রিকাটি প্রথম ছাপা হয় কলকাতার ভবানীপুরের ১ নং পিপুলপাতি লেনে, ‘সাপ্তাহিক সংবাদপত্র’ যন্ত্রে। মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম ছিল ব্রজমাধব বসু। তিনি বৈশাখ থেকে মাঘ পর্যন্ত দশটি সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এরপর ফাল্গুন থেকে একক স্বত্বের অধিকারী হন বঙ্কিমচন্দ্র। দ্বিতীয় বছর নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় ‘সঞ্জীবনী প্রেস’ স্থাপন হলে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায় থেকেই ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন এবং বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বছর(১২৮০) থেকে কাঁঠালপাড়ার ‘বঙ্গদর্শন প্রেস’ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের একক স্বত্বে বিশিষ্ট এই পত্রিকাটি প্রকাশ পেতে থাকে। তৃতীয় পর্যায়ের ‘বঙ্গদর্শন’ ছাপা হতো ৯২ বহুবাজার স্ট্রিট ‘বরাট প্রেস’ থেকে। প্রকাশক ছিলেন অঘরনাথ বরাট।

‘বঙ্গদর্শন’-এ বঙ্কিমচন্দ্র সুশৃঙ্খল সম্পাদনায় সমকালীন বিশ্বের সাহিত্য-সমাজবিদ্যা-ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞানের যা কিছু সাংস্কৃতিক ফসল তা বাংলা ভাষায় বাঙালির বোধগম্য করে পরিবেশন করলেন। এই জন্যই দরকার ছিল একটি যোগ্য লেখকগোষ্ঠীর সহযোগিতা। কঠিন পরিশ্রমে তিনি তাঁর লেখকদের তৈরি করেন। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অনেক প্রতিষ্ঠাবান লেখককে পেয়েছিলেন তেমনি অনেক নবীন লেখকদেরও সাহিত্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করে তাঁর লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে শিল্পীসত্তার দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক হলেও তাঁদের চিন্তাসত্তার সাদৃশ্যতা বজায় ছিল। এই বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠী সবরকমে বঙ্কিমের কাছের মানুষ ছিলেন কিন্তু এই

সাহিত্যগোষ্ঠীর লেখকরা বঙ্কিমের সঙ্গে মাখামাখি সম্পর্কে যেতে সাহস পেতেন না। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন—

> সে একটা অনির্বাচনীয় আকর্ষণ, যে সে আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়াছে, সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, অন্যের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। সাহিত্য ভিন্ন অন্য চর্চা তাঁহার বাড়িতে, অন্তত দরবারে হইতে পারিত না। আর সে চর্চার মধ্যে তিনিই সর্বময় কর্তা। যাহা তিনি বলিতেন, মানিয়া লইতে হইত, অথচ তাহার মধ্যে মান অপমানের কিছু ছিল না।[২]

'বঙ্গদর্শন'-এর নিজস্ব লেখকগোষ্ঠীতে ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসু, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, লালমোহন বিদ্যানিধি, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রাণনাথ পন্ডিত, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, জগদীশচন্দ্র রায়, রামদাস সেন, শ্রীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, কৈলাস চন্দ্র সিংহ সহ আরও অনেক অজ্ঞাত লেখক। এই পত্রিকার লেখকরা অনেক সময় নিজেদের নাম ব্যবহার না করে সংক্ষিপ্ত বা ছদ্মনাম নাম ব্যবহার করতেন।

ঊনবিংশ শতকে ইংরেজি সংস্কৃতির স্পর্শে বাংলা সাহিত্য নতুন দিকের হদিশ পেল। এ সময়ে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতিভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। ফলে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল ধীরে ধীরে। বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাব লগ্নে সাহিত্যিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হানা ক্যাথরিণ ম্যালেন্স, প্যারীচাঁদ মিত্র, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখের লেখায় সমসাময়িক যুগের মূল্যবোধ, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু নরনারীর মানবিক সত্তা ও ব্যক্তিচরিত্রের যথোচিত বিকাশ ঘটেনি। এর ফলে তাঁদের রচনা উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। তবে এঁদের রচনায় উপন্যাসের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এর ফলে উপন্যাস রচনার একটি ক্ষেত্র তৈরি হতে থাকে। উনিশ শতকে পাশচাত্য জীবনাদর্শের প্রভাবে বাঙালির চেতনাবোধ ও জীবনবোধ ক্রমশ পরিবর্তিত ও যুক্তিনিষ্ঠ হয়েছে। আত্মসচেতন মধ্যবিত্ত সমাজ শিল্পের আয়নায় আত্মপ্রতিকৃতি দেখার প্রয়োজন অনুভব করল। এই পরিবর্তনের ফলে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্র গড়ে উঠতে থাকে। আর এই উপন্যাস রচনার অনুকূল সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্য জগতে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা উপন্যাসের পরিণতি লাভ হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ঘটেছে সমকালীন জীবন ও সংস্কৃতির তাগিদ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসকে ইংরেজি উপন্যাসের ধারায় প্রথম আধুনিক উপন্যাসের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

কিশোর বয়স থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রিকার প্রতি আকর্ষণ। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ পত্রিকার মধ্যে দিয়ে। তখন বঙ্কিমচন্দ্র কবিতা লিখতেন 'সংবাদ প্রভাকর'-এ। এছাড়াও তিনি লেখা পাঠাতেন 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' ও 'সমাচার দর্পণ'-এ। এরপর তিনি ধারাবাহিকভাবে গদ্য লিখতে থাকেন ও বিভিন্ন ইংরেজি পত্রিকাতেও লেখালেখি করেছেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'ইন্ডিয়ান ফিল্ডে' লিখতে আরম্ভ করেন 'রাজমোহনস ওয়াইফ' নামে একটি ইংরেজি উপন্যাস। এছাড়াও তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'স্টেটসম্যান' প্রভৃতি ইংরেজি পত্রিকাতেও লেখা পাঠাতেন। এরপর তিনি লিখলেন বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুন্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) এর মত উপন্যাস, যেগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তিনি লেখক

হিসেবে পরিচিতি পেলেও সেই সময়ে বাংলা সাহিত্যের ভাব ও ভাষার শ্রীহীন অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষিত বাঙালির কিছু অংশ বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছিল বাংলা ভাষাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষিত মানুষের প্রচলিত ধারণার বদল করতে হবে। আর তাই তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে চাইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা উপন্যাসের সংখ্যা ১৪টি। 'দুর্গেশনন্দিনী'(১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) এবং 'মৃণালিনী'(১৮৬৯) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। অপর সকল রচনা হয় সম্পূর্ণভাবে নয় অংশত 'বঙ্গদর্শন'এ কিংবা 'প্রচার'-এ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরিবর্ধিত 'রাধারানী', 'ইন্দিরা' এবং 'রাজসিংহ' একেবারে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। দেশের সর্বত্র তাঁর উপন্যাস সমাদৃত, যার অনেকগুলি নানা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে পাঠকদের আগ্রহের মূল বিষয় ছিল জগৎ সংসারে প্রতিদিনের চেনা অভিজ্ঞতার বাইরে যা ঘটে তা জানবার আগ্রহ। পাঠকদের এই জানার ইচ্ছা গড়ে উঠেছিল সেই সময়ের সংবাদপত্রগুলির মধ্যে দিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই সংবাদপত্রের প্রতি পাঠকদের আগ্রহ বাড়তে থাকে। সংবাদপত্রের এই পাঠকবর্গ ধীরে ধীরে বাংলা উপন্যাসের পাঠকমন্ডলীতে রূপান্তরিত হল। বঙ্গদর্শনের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের যে রচনাগুলি শুধুমাত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ হওয়ার জন্য সকলের কাছে পৌঁছাতে পারত না 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হওয়ার পর সেই বাধা কেটে গেল। মানুষের অন্তঃ পুরে স্থান পেল 'বঙ্গদর্শন'। এই 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল নতুন উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'। এই বিষয়টির কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে'ও উল্লেখ করেছেন। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—ঐতিহাসিক রোমান্টিক উপন্যাস- 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা'(১৮৬৬), 'মৃণালিনী'(১৮৬৯) ও 'চন্দ্রশেখর'(১৮৭৫)। এই উপন্যাসগুলিতে লেখক ইতিহাসের পটভূমিকায় রোমান্টিক প্রেমকে তুলে ধরেছেন। নরনারীর প্রেমের সংঘাতই প্রধান হয়ে উঠেছে। সামাজিক উপন্যাস— 'বিষবৃক্ষ'(১৮৭৩), 'ইন্দিরা'(১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়'(১৮৭৪) 'রাধারানী'(১৮৭৬),'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল'(১৮৭৮) এই উপন্যাসগুলিতে পারিবারিক সমস্যার সঙ্গে নায়ক নায়িকার প্রণয় ও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে উঠেছে। নীতিপ্রধান দেশাত্মক উপন্যাস—'আনন্দমঠ' (১৮৮৪), 'দেবী চৌধুরানী'(১৮৮৫), 'সীতারাম' (১৮৮৭)। এই উপন্যাসগুলির মুখ্য বিষয় স্বদেশপ্রেম ও লোকহিত। গীতার নিষ্কাম কর্মের উপদেশের আশ্রয়ে ব্যক্তি ও দেশের মুক্তি খোঁজা হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস—'রাজসিংহ' (১৮৮২)। এই উপন্যাস ইতিহাসের পটভূমিকায় ঐতিহাসিক বিষয় ও চরিত্রকে নিয়ে লেখা।

বঙ্কিমচন্দ্র শুরু করেছেন রোমান্স আখ্যাত রচনা দিয়ে, শেষ করেছেন 'আনন্দমঠ'-'দেবী চৌধুরানী'-'সীতারাম'—'রাজসিংহ' প্রমুখ ইতিহাসাশ্রিত বা ঐতিহাসিক রোমান্সধর্মী উপন্যাস দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলিকে বিশেষভাবে উপস্থাপিত করেছেন। যেনতেন প্রকারে উপন্যাসের গল্পকাহিনিটাকে বলে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়, পরিবর্তে তা যাতে সহৃদয় পাঠক অনুভব করতে পারেন তার জন্য গল্প কাহিনির চরিত্রগুলিকে সজীব করে তোলা। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র মানব মনের গভীরে যেতে চাইতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তার লক্ষ্য সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধন। প্রেমের সুন্দর বর্ণনাতেই তাঁর উপন্যাসের সৌন্দর্য এবং প্রধান চরিত্রগুলির সাংসারিক ও জাগতিক বন্ধন মুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেমাদর্শের বিকাশ লক্ষ্য করা যায় তাঁর সৌন্দর্য ভাবনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিচরিত্রের প্রেমে সৌন্দর্য সৃষ্টি কাজ শেষ হচ্ছে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে। এরপর ব্যক্তিচরিত্রের প্রেমের সৌন্দর্যের ধারণা উত্তীর্ণ হয় স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমের ধারণায়। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে ফুটে ওঠে স্বদেশপ্রেম এবং 'আনন্দমঠ'-এ ফুটে ওঠে স্বজাতিপ্রেম। এই প্রেম পরবর্তীতে উত্তীর্ণ হয় দুর্বল, দুর্দশাগ্রস্ত ও দরিদ্রের প্রতি, যা দেখতে পাওয়া যায় 'দেবী চৌধুরানী' ও 'সীতারাম'। পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে ওঠেন নীতি প্রচারক। তিনি ধর্ম প্রচার করতে থাকেন যা নামে হিন্দু ধর্ম হলেও আসলে সৌন্দর্য ধর্ম। তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত সমসাময়িক ঘটনাসমূহ গ্রামীণ বাংলার পটভূমিতে রচিত। তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে জীবিকা যন্ত্রণা শূন্য গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণি। বঙ্কিমচন্দ্র বিখ্যাত তাঁর নারী চরিত্রগুলির জন্য। তিনি নারী ব্যক্তিত্বকে সাহসিকতা সম্পন্নরূপে রূপায়িত করেছে তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে। 'বিমলা- আয়েশা', 'কপালকুণ্ডলা-মতিবিবি', 'মনোরোমা' প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নবযুগের নারী লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নারী সম্পর্কে এই যে নতুন দৃষ্টি তা নবজাগরণের এক অন্যতম প্রভাব। যেহেতু বঙ্কিম নিজেই একজন ঐতিহাসিক যুগসন্ধির প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা, তাই তাঁর প্রধান ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলিতে কালগত পটভূমিতে স্থান পেয়েছে হিন্দু- তুর্কি, মোগল- পাঠান, নবাব-ইংরেজ, মোগল-রাজপুত প্রমুখ যুগসন্ধি। তাঁর সমস্ত উপন্যাসের মূলে আছে পাপ চেতনা থেকে উদ্ভূত নায়ক বা নায়িকার অনুশোচনা বোধ। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের যন্ত্রণাকে বুঝতে চেয়েছেন পাপ চেতনা থেকে উদ্ভূত অনুশোচনার মধ্যে দিয়ে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়—"তিনি একাই বাংলা কথাসাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি ও সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি সাধন করেছেন।"[৩]

বঙ্গদর্শনের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীল প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছিল। শিক্ষিত বাঙালিকে জ্ঞানে-কর্মে, মননে উদ্বুদ্ধ করে বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে এবং লেখকদের জন্য সাহিত্যের প্রবেশ পথগুলি খুলে দিতে সাহায্য করেছিল এই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। 'বঙ্গদর্শনের' লেখকদের পরিচয় সূত্রে আমরা বুঝতে পারি যে এই পত্রিকা একদিকে যেমন বাঙালি লেখকদের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল তেমনি বাংলা সাহিত্যকে জড়তা থেকে মুক্তি দিতেও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ, সমাজের কল্যাণের জন্য ভাবনা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃষ্টিশীল মানসিকতা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্নের এই পত্রিকাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির আত্মদর্শনের মাধ্যম করে তুলেছিল। 'বঙ্গাদর্শন' উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্রের ধারায় অন্যতম এক স্বাতন্ত্র্যধর্মী পত্রিকা। পত্রিকা প্রকাশের প্রথম দিকে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রচুর সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। বঙ্গাদর্শনের সময় বাংলা সাহিত্যের পত্রপত্রিকা জগতে সাহিত্যমূলক পত্রিকা বিশেষ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে 'ভারতী' (১৮৭৭), 'সাহিত্য' (১৮৯০), 'সঞ্জীবনী' (১৮৮৩), 'হিতবাদী' (১৮৯১), 'নব্যভারত' (১৮৮৩) প্রভৃতি একাধিক সাহিত্যমূলক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার ফলে বঙ্গাদর্শনের মতো একক পত্রিকার প্রাধান্য কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। দীর্ঘদিন 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনা বন্ধ থাকার পর ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'নবপর্যায় বঙ্গাদর্শন' নাম নিয়ে আবার তা প্রকাশ হতে থাকে। পরবর্তীকালে মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের হাত ধরে প্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে সত্যজিৎ চৌধুরীর সম্পাদনায়

'বঙ্গাদর্শন' প্রকাশিত হচ্ছে। ঐতিহ্যের এই পরম্পরাই প্রমাণ করে যে আজও 'বঙ্গাদর্শন' তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। 'বঙ্গাদর্শন' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট আদর্শ স্থাপন করেছিল, যে আদর্শ আজও বাংলা সাহিত্যকে এক দিশা দেখিয়ে চলেছে। বঙ্গাদর্শনের বঙ্গাভাবনা শুধুমাত্র সেই সময় নয় আজও তার যৌক্তিকতা স্বীকার্য। নিরপেক্ষ ও নির্ভীক বক্তব্য প্রকাশের সৎ সাহস এই পত্রিকাটিকে নিঃসন্দেহে তুলনাহীন করে তুলেছে। সাহিত্য সমাজের পালাবদলের অতীত সাক্ষ্য থেকে আমরা আজও অনেক শিক্ষা নিতে পারি। জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন যে গভীর বন্ধন সেই বন্ধন রাজনৈতিক শৃঙ্খলের ঊর্ধ্বে আমরা পেতে পারি সংস্কৃতি ও ভাষার সম্বন্ধ সূত্রে, অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যের অনুষঙ্গে। 'বঙ্গাদর্শন' আমাদের সেই সন্ধানী মানসিকতার প্রত্যয় বোধকে সুদৃঢ় করে। তাই 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের প্রায় দেড়শো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও পত্রিকাটি গুরুত্ব আজও ম্লান হয়নি। তাই বলা যায়-"দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তাঁরই প্রতিভার প্রবল সামর্থ্যে রূপান্তরিত হল, উত্তীর্ণ হল আধুনিক পর্বে।"[৪]

<u>উৎসের সন্ধানে</u>

১. বাগাল যোগেশচন্দ্র (সম্পা), বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড) পৃঃ ২৮৩-২৮৪
২. চৌধুরী সত্যজিৎ (সম্পা), বঙ্কিম ১৭৫, পৃ. ২৬২
৩. দেবীপদ ভট্টাচার্য : 'উপন্যাসের কথা', পৃ. ১২৩
৪. সত্যজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত : 'বঙ্কিম ১৭৫, পৃ. ২৫৮

<u>তথ্যের সন্ধানে</u>

১. সত্যজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত : 'বঙ্কিম ১৭৫', সাহিত্য অকাডেমী, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫, ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি
২. ভবতোষ দত্ত : 'বঙ্গাদর্শন পরম্পরা', বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্র, কাঁটালপাড়া, নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগণা
৩. দিলীপ কুমার দত্ত : বঙ্কিম-মনন, বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা
৪. সন্দীপ দত্ত : 'বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিবৃত্ত' (১৮১৮-১৮৯৯), গাঙচিল, "মাটির বাড়ি", ওঙ্কার পার্ক, ঘোলাবাজার, কলকাতা
৫. বেলা দাস : 'বাংলা উপন্যাসের উন্মেষ পর্ব', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা
৬. অরবিন্দ পোদ্দার : 'বঙ্কিম মানস', পুস্তক বিপণি, কলকাতা
৭. যোগেশচন্দ্র বাগাল সম্পাদিত : 'বঙ্কিম রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা
৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৯. দেবীপদ ভট্টাচার্য : 'উপন্যাসের কথা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
১০. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় : 'বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা
১১. পঞ্চানন মালাকার : 'বঙ্কিম উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য', দেশ প্রকাশন, কলকাতা
১২. সত্যেন্দ্রনাথ রায় : 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
১৩. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', আনন্দ, কলকাতা

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ নজরুল

বুবাই পিরি

'মারো শালা যবনদের' 'মারো শালা কাফেরদের' আবার হিন্দু—মুসলমানি কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা—কাটাকাটি, তারপর মাথা—ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। হিন্দু—মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে—'বাবা গো, মা গো' দেখিলাম হত—আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদি চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।[১]

নবজাগরণের এই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নজরুলকে (কাজী নজরুল ইসলাম (২৪ মে ১৮৯৯—২৯ আগস্ট ১৯৭৬; ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬—১২ ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) তাই গোঁড়া মুসলমানরা 'শয়তান', 'ধর্মজ্ঞানশূন্য বুনো বর্বর' ইত্যাদি ভাষায় তীব্র আক্রমণ করেছে। এমন বহু আক্রমণ ধর্মধ্বজীরা সেদিন তাঁর বিরুদ্ধে করেছিল। এসব আক্রমণের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "মুসলমান সমাজ আমাকে আঘাতের পরে আঘাত দিয়েছে নির্মমভাবে। তবু আমি দুঃখ করিনি বা নিরাশ হইনি। তার কারণ, বাংলার অশিক্ষিত মুসলমানরা গোঁড়া আর শিক্ষিত মুসলমানরা ঈর্ষাপরায়ণ।" দেশের শোষিত মানুষের মুক্তির প্রশ্নে তিনি কখনোই আপোস করেননি। ধর্মের নামে উগ্রতা, সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রেও তাই তিনি ছিলেন নির্মম। এই নজরুলের চর্চার প্রসার দেশের শাসকরা কখনও ঘটাতে দেবে না। যেমন করে তুলে ধরার বদলে আটকানোর চেষ্টা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী চিন্তাকে।

কাজী নজরুল ইসলামকে তাঁর সমসাময়িকেরা আখ্যায়িত করেছেন 'যুগের কবি' বলে। এই অভিধা অযৌক্তিক ও অসংগত ছিল না। কিন্তু কাকে যুগের কবি বলা যায় যিনি যুগের দাবি পূরণ করেন, তিনিই যুগের কবি। তবে নজরুল সেই কবি যিনি তাঁর যুগের দাবিও পূরণ করেছেন, চিরকালের মানুষের জন্যও রেখে গেছেন তাঁর শাশ্বত বাণী। সুতরাং তিনি কালের কবি, একই সঙ্গে কালোত্তীর্ণ।

যেসব সমস্যা তাঁর কালে ছিল এবং যতদিন তা পৃথিবীতে থাকবে, ততদিন তিনি প্রাসঙ্গিক, ততদিন তাঁর প্রয়োজন ফুরোবে না।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে ধূমকেতুর মতো আকস্মিকভাবে নজরুলের আবির্ভাব। তিনি 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ' স্তব্ধ না হওয়া পর্যন্ত শান্ত না হওয়ার দৃঢ়প্রত্যয় ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেন উপনিবেশবাদীদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করলেই উপমহাদেশে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। আর তা না হওয়ার পথে প্রধান শত্রু সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ। এই শত্রুর শেকড় সমাজে সর্বত্র বিস্তারিত। তা যদি সমূলে নির্মূল করা না যায় উপমহাদেশের মানুষের মুক্তি সুদূর পরাহত এবং তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা যে অমূলক ছিল না, তা একশো বছর পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেকালে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের প্রকৃতি ছিল এক রকম, একালে তাতে যোগ হয়েছে নতুন উপাদান জঙ্গিবাদ।

সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা ছাড়া আর যে বিষয়টির নজরুল ছিলেন সাবলীল প্রবক্তা তা হলো নারীমুক্তি। সমাজের অর্ধেক মানুষ নারী। ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে নারীকে বন্দি করে রেখে সামাজিক অগ্রগতি অর্জন অসম্ভব। এই প্রত্যয়ে তিনি ছিলেন অবিচল। নারীমুক্তি প্রশ্নে তাঁর সময়ে নজরুলের চেয়ে বেশি আর কেউ কঠোর অবস্থান নেননি।

প্রায় একশ বছর আগে নজরুল যে ভাষায় সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদকে আঘাত করেছেন, আজ উপমহাদেশের পরিস্থিতির এতটাই অবনতি ঘটেছে যে সে ভাষায় কথা বলা সম্ভব হবে না আমাদের। সেদিনের চেয়ে ধর্মীয় উগ্রতা আজ বহুগুণ বেশি। সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ যারা সমাজে ছড়ায় এবং তা নিয়ে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে, তারা যে ধর্মাবলম্বীই হোক, তাদের নজরুল বলেছেন পশু এবং নিরীহ পশু নয়, সেই শ্রেণির হিংস্র দাঁত-নখ-শিংওয়ালা পশু যে অন্যকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে। নজরুল সমাজের পশুশক্তিকে আঘাত করেছেন সরাসরি সোজা ভাষায় এবং তাদের বোধগম্য ভাষায়।

বিশের দশকে যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তুঙ্গে, তখন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটি ছিল নজরুলের প্রধান উদ্বেগের বিষয়। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয় এবং তা যে হবেই সে প্রত্যয়ে নজরুলের ছিল পূর্ণ আস্থা, তারপর হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা থেকে গেলে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা বিঘ্নিত হবে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মতো সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতাও হয় নজরুলের প্রধান কাজ। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও আলোচনা করেন। তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু বিস্তারিত জানা না গেলেও তার সারমর্ম জানিয়েছেন নজরুল তাঁর এক লেখায়। তাঁর ভাষায়: একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন—দেখ, যে ন্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে?

হিন্দু-মুসলমানের কথা মনে উঠলে আমার বারে বারে গুরুদেবের ঐ কথাটাই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উদয় হয় মনে যে, এ ন্যাজ গজালো কি করে? এর আদি উদ্ভব কোথায়? ঐ সঙ্গে এটাও মনে হয়, ন্যাজ যাদেরই গজায় তা ভিতরেই হোক আর বাইরেই হোক তারাই হয়ে ওঠে পশু। যেসব ন্যাজওয়ালা পশুর হিংস্রতা সরল হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে শৃঙ্গারূপে, তাদের তত ভয়ের কারণ নেই, যত ভয় হয় সেই সব পশুদের দেখে যাদের হিংস্রতা ভিতরে, যাদের শিং মাথা

ফুটে বেরোয়নি। শিংওয়ালা গোরু-মহিষের চেয়ে শৃঙ্গাবিহীন ব্যাঘ্র-ভল্লুকজাতীয় পশুগুলো বেশি হিংস্রবেশী ভীষণ এ হিসেবে মানুষও পড়ে ঐ শৃঙ্গাহীন বাঘ-ভালুকের দলে। কিন্তু বাঘ-ভালুকের তবু ন্যাজটা বাইরে, তাই হয়তো রক্ষে। কেননা, ন্যাজ আর শিং দুইই ভিতরে থাকলে কীরকম হিংস্র হয়ে উঠতে হয়, তা হিন্দু-মুসলমানের ছোরা-মারা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। ('হিন্দু-মুসলমান')[২]

বিশের দশকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা যখন রক্তাক্ত দাঙ্গা পর্যন্ত গড়ায়, নজরুল তখন কবিতা ও গদ্য রচনায় তার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, 'হিন্দু মুসলমানী কাণ্ড' বেধে যাওয়ার পর দুই সম্প্রদায়ের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরস্পরের মার খেয়ে 'হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে, 'বাবাগো, মাগো' মাতৃপরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে।'[৩] 'মন্দির ও মসজিদ'-এ তিনি লিখেছেন, 'দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চির-কলঙ্কিত হইয়া রহিল।'

সাম্প্রদায়িক হানাহানিকারীদের নজরুল বলেছেন 'ধর্ম-মাতাল'। তাঁর ভাষায়, 'ইহারা ধর্ম-মাতাল। ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই, শাস্ত্রের এলকোহল পান করিয়াছে।' মাত্রার বেশি অ্যালকোহল বা মদ পান করলে যেমন মাতালের পরিণতি অবধারিত মৃত্যু, তেমনি ধর্ম নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে সেই সব 'ধর্ম-মাতাল'-এরও করুণ পরিণতির কথা বলেছেন নজরুল।

নজরুলের ভাষায়, 'অবতার-পয়গম্বর কেউ বলেননি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি খ্রীশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি আলোর মতো, সকলের জন্য।' ধর্মের ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে বিবাদের প্রসঙ্গে নজরুল বলেন, 'আলো নিয়ে কখনও ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে।'

নজরুল শুধু সমালোচনা নয়, পরিস্থিতির পরিবর্তন চেয়েছেন। জগতে পরিবর্তন আনে কারা নেতারা। তিনি সেই নেতাদের উদ্দেশে বলেছেন, তাঁরা কান্ডারি। তাঁর ভাষায়—

হিন্দু না ওরা মুসলিম
ওই জিজ্ঞাসে কোনজন
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ,
সন্তান মোর মা'র।[৪]

মুসলমান সমাজে নজরুলের চেয়ে বেশি হিতার্থী আর কেউ ছিলেন না, কিন্তু সেই মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা তাঁর সমালোচনাকে সহজভাবে গ্রহণ করেননি। আত্মসংশোধনের কথা না ভেবে তাঁরা বরং আক্রমণ করেছেন নজরুলকেই। এই প্রসঙ্গে মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর আনোয়ার হোসেন নামে এক কর্মীকে নজরুল লিখেছিলেন—মুসলমান সমাজ আমাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে নির্মমভাবে। তবুও আমি দুঃখ করিনি বা নিরাশ হইনি। তার কারণ বাংলার অশিক্ষিত মুসলমানরা গোঁড়া এবং শিক্ষিত মুসলমানরা ঈর্ষাপরায়ণ।

শুধু বিদেশি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে নয়, ধর্মীয় ও সামাজিক অন্যায়-অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধেও ছিল নজরুলের বিদ্রোহ। তাঁর ভাষায়, 'পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।' রক্ষণশীল

মুসলমান সমাজের নেতারা তাঁকে বুঝতে পারেননি। তাঁকে কাফের পর্যন্ত আখ্যা দিয়েছেন। তাতে তিনি কষ্ট পেয়েছেন। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁকে লিখেছিলেন—বাংলার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কি না জানিনে, কিন্তু মনে যে কাঙাল এবং অতি মাত্রায় কাঙাল, তা আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব করে আসছি বহুদিন হতে। আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোনদিন অভিযোগ করেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের-আখ্যায় বিভূষিত হবার মতো বড়ো তো আমি হইনি। অথচ হাফেজ-খৈয়াম-মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাথে কাফেরের পংক্তিতে উঠে গেলাম! নজরুলের ভাষায়, 'ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি; গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ। ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমি তো স্বীকার করিই, যাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন।' একশ্রেণির মুসলমান নেতা আশা করতেন তিনি ইসলাম ধর্ম নিয়ে আরও বেশি লিখবেন। কিন্তু ধর্ম নিয়ে কবিতা চর্চা করলে শিল্প থাকে না, তাই তিনি সেদিকে যাননি। ইব্রাহীম খাঁকে তিনি লিখেছিলেন—হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না; এ আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ-অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে। কিন্তু ইসলামের 'সভ্যতা-শাস্ত্র-ইতিহাস' এ-সমস্তকে কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার নয় কিসত্য সত্যই আমার লেখা দিয়ে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনার সঞ্চার হয়, তাহলে তার মঙ্গালের জন্য আমি আমার কাব্যের আদর্শকেও না হয় খাটো করতে রাজি আছি। কিন্তু আমার এ ভালোবাসার আঘাতকে এরা সহ্য করবে কি না সেটাই বড় প্রশ্ন। নারী সম্পর্কে নজরুলের বিশ্বাস ঘোষিত হয়েছে এ ভাষায়—

> বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি
> চির-কল্যাণকর
> অর্ধেক তার করিয়াছে নারী,
> অর্ধেক তার নর। (নারী)[৫]

বহু মেয়েকে তিনি বাইরে বেরিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে আসতে উৎসাহ দিয়েছেন। পরে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের একজন শামসুন্নাহার মাহমুদ। তাঁকে তিনি লিখেছিলেন—

> আমাদের দেশের মেয়েরা বড়ো হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবিতে। ঘরের প্রয়োজন তাদের বন্দিনী করে রেখেছে। এত বিপুল বাহির যাদের চায়, তাদের ঘিরে রেখেছে বারো হাত লম্বা আট হাত চওড়া দেওয়াল। বাহিরের আঘাত এ দেওয়ালে বারে বারে প্রতিহত হয়ে ফিরল। এর বুঝি ভাঙন নেই অন্তর হতে মার না খেলে। তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হতে বলি। তারা ভেতর হতে দ্বার চেপে ধরে বলছে আমরা বন্দিনী। দ্বার খোলার দুঃসাহসিকা আজ কোথায় তাকেই চাইছেন যুগদেবতা।

বাস্তব কারণেই বাংলা ভাষায় সব কবি-সাহিত্যিক তাঁদের নিজ নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, অন্য সম্প্রদায় নিয়ে সমালোচনামূলক কথা বলার ঝুঁকি নেননি কেউ। নজরুল নিজেকে মনে করেছেন দেশের সব মানুষের কবি। তিনি মুসলমানেরও কবি, হিন্দুরও কবি, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবারই কবি। তাই হিন্দু সম্প্রদায়কেও তিনি আঘাত করেছেন ততটাই কঠোরভাবে, যতটা কঠোরতায়

আঘাত করেছেন মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের। আজও উপমহাদেশের এমনই পরিবেশ সেটা কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায় নিয়ে তো নয়ই, নিজের ধর্মের উগ্রবাদীদের সম্পর্কেও সমালোচনা করা অসম্ভব। তিনি সাম্যের কবি তাই বলেছেন, 'আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।'[৬]

আজ আমাদের সমাজ, আমাদের রাষ্ট্র, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সন্ত্রাসবাদ দ্বারা আক্রান্ত। সন্ত্রাসবাদবিরোধী সংগ্রামে নজরুল হতে পারেন প্রধান সহায়ক। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও সন্ত্রাসবাদবিরোধী কর্মসূচি পালন করছে। নজরুলের রচনা তরুণ সমাজ যত বেশি চর্চা করবে, তত দ্রুত সমাজ থেকে দূর হবে অন্ধকার। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক দেশ প্রতিষ্ঠায় নজরুলচর্চার বিকল্প নেই।

উৎসের সন্ধানে

১. নজরুল-রচনাবলী ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা, 'রুদ্ধ মঙ্গল' ''মন্দির ও মসজিদ'' পৃ. ৪৩১-৪৩২
২. তদেব : পৃ. ৪৩৬
৩. তদেব : পৃ. ৪৩২
৪. তদেব : কাব্যগ্রন্থ ''সর্বহারা'', কবিতা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' পৃ. ১১১
৫. তদেব : কাব্যগ্রন্থ ''সাম্যবাদী'', কবিতা 'নারী', পৃ. ৮৯
৬. তদেব : পৃ. ৮৯

তথ্যের সন্ধানে

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
২. আজাহারউদ্দীন খান : 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল', ক্যালকাটা বুক ক্লাব লি.
৩. অরুণকুমার বসু : 'নজরুল জীবনী', আনন্দ পাবলিকেশন
৪. গনদাবী পত্রিকা, সাম্প্রতিক সংখ্যা ৭০ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ১ জুন ২০১৮

রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার

লোপামুদ্রা জানা

আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথে কোনো বাধা নেই—আর এইখানেই তিনি সবচেয়ে প্রতারক—তিনি সব সময় দু'হাত বাড়িয়ে কাছে টানেন, কখনো বলেন না 'সাবধান! তফাৎ যাও!'"[১] এখানে রবীন্দ্রনাথেরই বাক্যবন্ধ ধার করে বুদ্ধদেব বসুকে নির্মাণ করতে হয়েছে তাঁর বিবেচনা। বস্তুত রবীন্দ্রোত্তরকালে এমন কোনো বাংলাভাষী লেখক নেই, যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হননি। এই প্রভাব কখনো পড়েছে সাহিত্যের ভাবপরিমণ্ডল সৃজনের ক্ষেত্রে, কখনো সংগঠন নির্মাণে, কখনও আঙ্গিক নির্মিতিতে। কোনো কোনো সাহিত্যিক রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে কখনই মুক্তি পাননি, আবার কেউ রবীন্দ্রনাথের আশেপাশেই নির্মাণ করে নিয়েছেন নিজস্ব একটি ভুবন। দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে নানা বিষয়ে বিবিধ আঙ্গিকে সাহিত্যচর্চা করলেও, রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের কালে যাঁরা কবিতা লিখেছেন, যাঁরা পরিচিতি পেয়েছেন রবীন্দ্রানুসারী কবি হিসেবে, তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এবং একই সঙ্গে অসম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাঙালি কবির কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল উপদ্রবের মতো। তবে প্রলোভন দুর্দম হলেও রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ তাঁদের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য। ফলে তাঁর প্রবল দীপ্তির জোয়ারে অনেকেই হারিয়ে গেছেন, অনেকেই নির্মাণ করতে পারেননি নিজস্ব কোনো দ্বীপভূমি। প্রায় সকলেই এদিক-সেদিক ঘুরে-ফিরে শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা-উপনিবেশেই আশ্রয় নিয়েছেন, রাবীন্দ্রিক কবিতাকাশেই তাঁরা ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের সাধনার শ্রেষ্ঠ তারামালা। রবীন্দ্র-বলয়বন্দি এই কবিদের মধ্যে আছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল

রায় প্রমুখ। বলতে দ্বিধা নেই, কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকলেও এঁরা মূলত রবি-কাব্যশস্যেই লালিত-পালিত। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার কিংবা অতিক্রমের স্পর্ধিত কোনো প্রয়াস এঁদের ছিল না। উনিশ শতকের রাবীন্দ্রিক-রোমান্টিকতাই তাঁরা চর্চা করলেন বিশ শতকের প্রথমার্ধে এসে। 'বলাকা' পরবর্তী রবীন্দ্র-কবিতা আত্তীকরণেও তাঁরা রইলেন চরম ব্যর্থ। দেশকালের দ্বন্দ্ব, সভ্যতার সঙ্কট তাঁদের বিচলিত করেনি, তাই রাবীন্দ্রিক স্বদেশপ্রেম ও প্রকৃতিলোকে এঁরা নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করে নির্মাণ করেছেন কবিতার পর কবিতা। বস্তুত, তাঁদের এই পরিণাম ছিল ইতিহাস-নির্ধারিত। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় বুদ্ধদেব বসুর ভাষ্য—

> বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের প্রথম দুই দশক বড়ো সংকটের সময় গেছে। এই অধ্যায়ের কবিরা—যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান এবং আরো অনেকে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যাঁদের কুলপ্রদীপ, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে উদ্গত হয়ে নজরুল ইসলামের উত্থানের পরে ক্ষয়িত হলেন—তাঁদের রচনা যে এমন সমতলরকম সদৃশ, এমন আশুক্লান্ত, পাণ্ডুর, মৃদুল, কবিতে-কবিতে ভেদচিহ্ন যে এত স্পষ্ট, একমাত্র সত্যেন্দ্র দত্ত ছাড়া কাউকেই যে আলাদা করে চেনা যায় না—আর সত্যেন্দ্র দত্তও যে শেষপর্যন্ত শুধু 'ছন্দোরাজ'ই হয়ে থাকলেন—এর কারণ, আমি বলতে চাই, শুধুই ব্যক্তিগত নয়, বহুলাংশে ঐতিহাসিক।[২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ত্রিশোত্তর কবিদের রবীন্দ্র-বিরোধিতার কথা বহুল প্রচারিত। প্রবল প্রাণ তিরিশি কবিদের সচেতন রবীন্দ্র-বিরোধিতা কি পরোক্ষে রবীন্দ্র প্রভাবেরই নির্ভুল স্বাক্ষর নয়? প্রভাব না পড়লে, তাঁকে অতিক্রমণের বাসনা জাগ্রত হয় কীভাবে? লক্ষ করলেই দেখা যাবে, তিরিশের কবিরা যখন চল্লিশে পা রাখলেন, তখন রবীন্দ্র-বিরোধিতার পরিবর্তে তাঁদের কবিতায় এলো বহুমাত্রিক রবীন্দ্র-স্মরণ। কেউ কবিতা-সংকলনের নামকরণ করলেন 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ', কেউবা রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে ঋণ করে নির্বাচন করেছেন গ্রন্থনাম, কেউবা রবীন্দ্রনাথকে গ্রন্থ উৎসর্গ করে প্রকাশ করেছেন সার্বভৌম কবির প্রতি গভীর আনুগত্য। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় পিনাকেশ সরকারের এই অভিমত—চতুর্থ দশকের তরুণ এই কবিবৃন্দের প্রায় সকলেরই কাব্য প্রেরণা গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতাপাঠের দ্বারা। বিদেশী কবিতার নানা উপাদানকে সময় থেকে সময়ান্তরে ব্যবহার করলেও রবীন্দ্র প্রভাব তাঁরা কেউই প্রায় অস্বীকার করতে পারেননি তাঁদের প্রাথমিক কাব্য প্রয়াসে, আর সেটিই ছিল খুব স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। বুদ্ধদেব বসুর 'মর্মবাণী' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'তন্বী' কাব্যগ্রন্থ দ্বয়ে, অমিয় চক্রবর্তীর প্রাথমিক কাব্যচর্চায় রবীন্দ্রানুসরণ খুবই স্পষ্ট। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' কাব্যটিও রাবীন্দ্রিক মানবতাবাদেরই নতুন বিন্যাস। এমনকী জীবনানন্দের 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থের কোনো কোনো কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষণীয়। ত্রিশোত্তর কবিরা রবীন্দ্রনাথ দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত ছিলেন, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে তিনটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি। দেখা যাবে, তিনটি কবিতাংশেই রবীন্দ্রনাথ হাজির প্রবলভাবে—

> হে মোর জীবনদেবতা,/আমার পরাণে নিভৃত গোপনে/কি এনেছ তুমি বারতা/কি কথা কহিছ বুঝিতে না পারি/শুধু অনিমেষে তোমায় নেহারি/আমার পিয়াসী নয়ন ভরিয়া/জুড়াই নিবিড় ব্যথা,/হে মোর দেবতা বুঝিতে না পারি/কহিতেছ তুমি কি কথা।[৩](বুদ্ধদেব বসু, 'জীবনদেবতা')
>
> আজও চলে একা পথে অভিসারিকা,/দ্বিধাকম্পিত হাতে প্রদীপশিখা।/আকাশে বিজুলি হানে, /ত্রস্ত সলাজ প্রাণে/মুখে গুণ্ঠন টানে ভীরু বালিকা।/আজও চলে একা পথে অভিসারিকা।"৪ (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'পলাতকা')

> চুপে চুপে যে কথাটি/শিখাইছে মাটি/প্রতি নবাঙ্কুরে,/ইঙ্গিতে যে কথাটিরে গ্রহতারা বলে ঘুরে ঘুর /আলোকের অর্ধস্ফুট সুরে,/সৃষ্টির প্রথম প্রাতে বিধাতার মনে/যে কথাটি ছিল সঙ্গোপনে, /সে গোপন বারতাটি করিব প্রকাশ,/এল নারী, এল আজ জীবনের দখিনা-বাতাস।[৫] (প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'যৌবন-বারতা')

উপর্যুক্ত তিনটি কবিতাংশেই রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতার নিপুণ প্রকাশ ঘটেছে। তিরিশের কবিদের রূপনির্মাণে, কোথাও কোথাও ভাবপ্রসঙ্গে রবীন্দ্র-প্রেরণা খুবই স্পষ্ট। সুধীন্দ্রনাথ আর বুদ্ধদেবের দু'টি উদ্ধৃতির সাহায্যে আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। 'তন্বী' কাব্যের উৎসর্গ পত্রে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন— "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে/অর্ঘ্য/ঋণ শোধের জন্য নয় স্বীকারের জন্য"[৬] অতঃপর মুখবন্ধের পরম স্বীকারোক্তি—

> সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে, যদি কোনখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ বলে ধরে নেওয়া প্রায় নিরাপদ। তবু এই চুরির জন্য আমি লজ্জিত নই, কেননা শুধু সুন্দরের মোহ যে চোরকে পাপের পথে ডাকে, সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণ নয়, কিন্তু রূপজ্ঞ বটে।[৭]

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে যে সব প্রান্তে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় নিম্নবর্গের জীবনচিত্রায়ণ, আদিবাসী জীবনের প্রতি ভালোবাসা, রাজনীতি সচেতনতা, কবিভাষা, ছন্দ পরীক্ষা প্রভৃতি প্রবণতা। বর্তমান সময়ে বাংলা কবিতায় নিম্নবর্গ এবং আদিবাসী জীবন বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, আজ বহুপূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যে আদিবাসী জীবন নিয়ে কবিতা লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন নিম্নবর্গের জীবন নিয়ে। তাঁর রাজনীতি সচেতনতার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কবি রবীন্দ্রনাথের যে ভূমিকা, উত্তরকালে তা-ই বাংলা কবিতায় মহীরুহ হয়ে দেখা দিয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের '১৪০০ সাল' কবিতার প্রত্যুত্তরে যখন লেখেন '১৪০০ সাল' নামের কবিতা, তখনও তো ভিন্নমাত্রিক এক প্রভাবের কথা আমরা মনে করতে পারি। উত্তরকালীন বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন কবিভাষা দিয়ে। বাংলা কবিতায় এখনো রবীন্দ্র কবিভাষার বিপুল প্রভাব প্রবহমান। এখনো অনেক কবি রবীন্দ্রনাথের কবিভাষায় কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করছেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নানামাত্রিক ছন্দোপরীক্ষার কথাও আমরা উল্লেখ করতে পারি। 'বলাকা' কাব্যের মুক্তক ছন্দ, আর 'পুনশ্চ'-এর গদ্যছন্দই তো এখন বাঙালি কবির ভাবপ্রকাশের বিকল্পহীন অবলম্বন। কবিতায় চিত্রলতার যে প্রকাশ, যা ব্যাপকভাবে দেখা যায় জীবনানন্দ দাশের কবিতায়, সেখানেও আছে রবীন্দ্রনাথের অলঙ্ঘনীয় প্রভাব। কবিতায় আন্তর্জাতিক ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রাথমিক প্রতিশ্রুতিও আমরা রবীন্দ্র কবিতাতেই প্রথম লক্ষ করি। স্মরণ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতা রচনার পর তৈরি হয় বুদ্ধদেবের 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা'। 'লিপিকা' এবং 'পুনশ্চ' কাব্যে কবিতায় গল্প বলার যে ঢং, তা-ও আমাদের শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; উত্তরকালে যা ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়েছে। দেখা যায়, সর্বত্রই প্রবলভাবে উপস্থিত আছেন পরাক্রমশালী রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোগল্প বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। তাঁর আগে ছোটগল্প লেখা হলেও, যথার্থ ছোটোগল্প বলতে যা বুঝায়, তার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোটোগল্পের সংগঠন-শৈলী,

অন্তিম ব্যঞ্জনা, ভাষারীতি- যে কোনো দৃষ্টিকোণেই উত্তরকালীন লেখকদের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সমুদ্রপ্রতিম। একালে বাংলা ছোটোগল্পে নিম্নবর্গের জীবন চিত্রায়ণের যে প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়, তার প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছি রবীন্দ্র ছোটোগল্পে। এ প্রসঙ্গে 'শাস্তি', 'মুসলমানী গল্প', 'মাস্টারমশাই' এসব রচনার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। দুখিরাম-ছিদাম-রাধা-চন্দরাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'শাস্তি' নামের যে গল্প লিখেছেন, তা এখনো বাঙালি গল্পকারদের কাছে রীতিমতো ঈর্ষার বিষয়। এযুগের ছোটোগল্পে নারী ব্যক্তিত্বের উন্মোচনের যে প্রয়াস লক্ষ করা যায়, সেখানেও দেখি রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রভাব। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় তাঁর 'হৈমন্তী', 'বোস্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর', 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি গল্পের কথা। এসব গল্পে প্রকাশ পেয়েছে প্রথা ও সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ এবং সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ। 'রবিবার' কিংবা 'ল্যাবরেটরি' গল্পের বিজ্ঞানচেতনার কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। নারীকে প্রাকৃতিক-লৈঙ্গিক পরিচয়ের মধ্যে বৃত্তাবদ্ধ না রেখে, তাকে সামাজিক-লৈঙ্গিক দৃষ্টিকোণে পর্যবেক্ষণের সূত্রপাত ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে। রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের এসব বৈশিষ্ট্যই উত্তরকালীন বাংলা ছোটোগল্পে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক মানুষের বহুমাত্রিক বিচ্ছিন্নতা এবং নিঃসঙ্গতা যুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটোগল্পের একটি প্রধান অনুষঙ্গ। লক্ষ করলেই দেখা যাবে, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা উন্মোচনে রবীন্দ্র-ছোটোগল্পই বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রয়াস। যুগলের নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্র ছোটোগল্পের নর-নারীকে বিচিত্র জীবন-জটিলতার সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্র-ছোটোগল্পে অনেক সময়েই সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণের সূত্র ধরে উপস্থিত হয়। যুদ্ধোত্তর বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্নতাকে এক করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। তবু দাম্পত্য-পঙ্গুতার রূপায়ণের মধ্যে নিঃসঙ্গতাবোধের আধুনিক রুগ্নতার জায়মান বীজটিকে গল্পগুচ্ছে আমরা যেন অযাচিত ভাবেই পেয়ে যাই। নরনারীর বিযুক্তি ও বিয়োগ রবীন্দ্রনাথের বহু গল্পে আমরা লক্ষ করি—শারীরিক পঙ্গুতায় আসে দুরতিক্রম্য ব্যবধান ('দৃষ্টিদান'), শারীরিক সান্নিধ্য সত্ত্বেও তৃতীয় মানুষের অস্তিত্ব এসে যুগলের মাঝখানে নির্মাণ করে মেরুদূর মানসিক-বিচ্ছিন্নতা ('মধ্যবর্তিনী'), ব্যক্তিত্বের সংঘাতে দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে গভীর একাকীত্ব ও নৈরাশ্যময় নিঃসঙ্গতা ('স্ত্রীর-পত্র', হৈমন্ত্রী', 'পয়লা-নম্বর'), একজনের ঔদাসীন্য অপরের চিত্তে সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতা ('নস্টনীড়')। ছোটগল্পের ভাষা দিয়েই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন পরবর্তী লেখকদের উপর। বাংলা ছোটোগল্পের ভাষা তো রবীন্দ্রনাথের আপন হাতের সৃষ্টি। এই যে আপন সাধনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করলেন ছোটোগল্পের ভাষা, সামান্য ব্যতিক্রম বাদে, সে ভাষাতেই এখনও লেখা হচ্ছে বাংলা ছোটগল্প। বিষয়াংশ নির্বাচন, কিংবা দৃষ্টিকোণ, পরিচর্যা, প্রকরণ-প্রকৌশল- যেকোনো ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ অলক্ষ্যে এসে হাজির হন উত্তরকালীন বাঙালি গল্পকারদের কাছে।

উপন্যাসের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক উপন্যাসে মানব-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের যে ধারা, তার সূত্রপাত ঘটে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে। রাজনীতি সচেতনতা, প্রাগ্রসর প্রেমচেতনা, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট—বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক উপন্যাসের এসব চারিত্রিক উৎস হিসেবে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি উপন্যাস। মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি

দেশ ও সমাজ সম্পর্কে এসব উপন্যাসে যে চেতনা প্রকাশ পেয়েছে, পরবর্তী লেখকেরা তা থেকে পৌনঃপুনিক গ্রহণ করেছেন তাদের রচনার রসদ। উপন্যাসের বক্তব্যের পাশাপাশি আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যের প্রেক্ষাপটে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। এই উপন্যাসে চারজন মানুষের স্বতন্ত্র বয়ানকে যেভাবে একাত্ম করে নেওয়া হয়েছে, উত্তরকালীন ঔপন্যাসিকেরা মানব-প্রতিবেদন নির্মাণে, আখ্যান সৃষ্টিতে সেখান থেকে অবিরাম চয়ন করেছেন শিল্পরস। আধুনিক মানুষের অতলান্ত শূন্যতার শিল্প হিসেবে 'দুইবোন' উপন্যাসটি উত্তরকালে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহণ করেছে। ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের ভাষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সাগরের মতো বিশাল, আকাশের মতো সীমাহীন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতি অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের যে ভাষাবৈশিষ্ট্য নির্মাণ করলেন, শতাব্দীব্যাপী তা-ই অবলীলায় অনুসৃত হয়েছে। ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। তবে মৌল-প্রবণতার কথা মেনে নিলে উপর্যুক্ত অভিমত স্বীকার করতেই হয়। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ভাষা সাধু, কিন্তু সাধুরীতির অন্তরালে এখানে আছে কথ্যভাষার লঘুতা এবং প্রবহমানতা। রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্বের অধিকাংশ উপন্যাসই আত্মকথনমূলক। উত্তম-পুরুষ নিজের জবানীতে কোনো কিছু বর্ণনা করতে গেলে স্বভাবতই প্রাধান্য পায় কথ্যরীতি। উত্তরজীবনে চলিত ভাষাতে উপন্যাস রচনার বাহন করার পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ যেন সম্পন্ন করলেন 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। সাধুগদ্যের মাঝেই এখানে তিনি সঞ্চার করেছেন চলিতের দীপ্তি, ঝলকানি আর প্রবহমানতা। উপন্যাস যে বর্ণনামূলক ডিসকোর্স, 'চতুরঙ্গ'র ভাষা আর বর্ণনায় তা সম্যকরূপে উপলব্ধি-যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমত্ব এখানে যে, উত্তরকালীন ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন কীভাবে লিখতে হবে, সে কথাও তিনি যেন অলক্ষ্যে জানিয়ে দেন তাঁর পরবর্তীদের। এ প্রসঙ্গে 'শেষের কবিতা'র ভাষার কথাও বলতে হয়। বস্তুত, প্রেমের উপন্যাসের ভাষার আদর্শ রূপটাই যেন 'শেষের কবিতা'।

নাটকের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। 'বিসর্জন' নাটকের ধর্মবোধ, মুক্তধারার গতিশীলতা, 'রক্তকরবী'-র রাজনৈতিক সচেতনতা ও ধ্যান-ধারণা বাংলা নাটককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। একালের নাটকে যে প্রাগ্রসর সমাজ-সচেতনতা, তার সূত্রপাত ঘটেছে 'রক্তকরবী'তে একথা বললে কি কোনো অত্যুক্তি হবে ঔপনিবেশিক নাট্যফর্ম ভেঙে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে আশ্রয় করেছিলেন প্রাত্যহিক দেশীয় নাট্যরীতি। তাঁর নাটকে সঙ্গীত, নৃত্য এবং সংলাপের ত্রি-মাত্রিক ঐক্য বাংলার লোকনাট্যের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। একালে যে বর্ণনামূলক নাটকের কথা বলা হয়, তার প্রাথমিক প্রয়াস কি 'রক্তকরবী' নয় নাট্যসংলাপের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ আছেন সদাজাগ্রত। বিষয়াংশ এবং ভাষারীতি—উভয় দৃষ্টিকোণে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যও উত্তরকালীনদের কাছে বিস্তার করেছে মোহনীয় প্রভাব। একথা অস্বীকারের কোনো উপায় নেই, তিনিই বাংলা প্রবন্ধের জনয়িতা। তাঁর প্রবন্ধ তত্ত্বভারমুক্ত, পাঠকের সঙ্গে তাঁর সহজ আত্মীয়তার সম্পর্ক। মিলনের বাসনাই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্যের মৌল-বাণী। প্রবন্ধসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে গদ্য নির্মাণ করেছেন, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—উপযোগিতা ও যুক্তিবাদিতা। সন্দেহ নেই, এসব বৈশিষ্ট্য পরবর্তী লেখকদের কাজে সঞ্চার করেছে অনেকান্ত সহযোগ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজ থেকে প্রায় একশ তেষট্টি বছর আগে। তাঁর জীবনের অর্ধেকটা কেটেছে উনিশ শতকে, বাকি অর্ধেক বিশ শতকে। এখন আমাদের মাথার উপর দিয়ে বইছে একুশ শতকের তৃতীয় দশকের হাওয়া। পৃথিবীজুড়ে কত পরিবর্তনই না ঘটেছে বিগত শতাধিক বছরে।

তবু রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে হয়ে উঠেছেন নির্ভর এক আশ্রয়, অফুরান এক আশ্বাস। আজকে আমরা কেন্দ্র-প্রান্তের কথা বলি, কামনা করি প্রান্তের অভ্যুত্থান। শতবর্ষ পূর্বে শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসর জীবনে সেই কাজটাই করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা আন্তর্জাতিক চেতনার কথা বলি, বিসর্জন দিতে চাই জাতিক চেতনা। রবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছেন, জাতিক না হলে আন্তর্জাতিক হওয়া যায়না। লন্ডন থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ শিকড় সঞ্চার করেছেন শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসর-শ্রীনিকেতনের মৃত্তিকায়। একালে আমরা প্রান্তের শিকড় উৎপাটিত করে বাসা বাঁধতে চাই কেন্দ্রে। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে আমরা বৃদ্ধি করে চলেছি কংক্রিট-সভ্যতা। বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করছে গোটা পৃথিবী। অথচ বহুবছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক। তাঁর নাটকে আছে সঙ্গীত ও নৃত্যের খেলা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির বিশালতার সঙ্গো, সামগ্রিকতার সঙ্গো নিজের ক্ষুদ্র সত্তাকে মিলিয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন। প্রকৃতি, পরিবেশ এবং মানুষের প্রতি অপার ভালোবাসার ঐশ্বর্য্য হল শান্তিনিকেতন। তিনি চাইতেন সেখানকার শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে পাঠ নেবে প্রকৃতি-শিক্ষকের কাছে, সেইমতো গড়ে উঠুক তাদের ব্যক্তিত্ব। তারা একাত্ম হোক প্রকৃতির সঙ্গো। বর্তমানে আবহাওয়ার অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজুড়েই পরিবেশকে বাসযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা একটি প্রাগ্রসর ইস্যু। ২০১৫ সালে সারা বিশ্বের নেতারা প্যারিসে মিলেছিলেন 'জলবায়ু চুক্তি' করতে। শতবর্ষে আগেই রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর সুগভীর চিন্তা ও উদ্যোগের নানা চিহ্ন রেখে গেছেন বাংলা সাহিত্যে ও কর্মে। একালে আমরা বৃক্ষরোপণের কথা বলি, সেই 'বৃক্ষরোপণ' শব্দটাও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠা, জলসেচ ভাবনা, পল্লি-উন্নয়ন কার্যক্রম—কতভাবেই তো তিনি আমাদের প্রভাবিত করে চলেছেন অনবরত। রবীন্দ্রনাথের নামের মধ্যেই আছে সেই প্রভাবের সূত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় নক্ষত্রপুঞ্জ, বাংলা সাহিত্যের উত্তরকালীন লেখকেরা রবীন্দ্রনাথ নামক সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেই হয়ে উঠেছেন এক একজন নবীণ নক্ষত্র।

উৎসের সন্ধানে

১. বুদ্ধদেব বসু : 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ', নবার্ক প্রকাশনি, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯, পৃ. ৭২
২. তদেব, পৃ. ৭০
৩. বুদ্ধদেব বসু : 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা', নাভানা প্রকাশনি, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩, পৃ. ৩২৩
৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ', দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর, ১৯৬০, পৃ. ৩৩৯
৫. প্রেমেন্দ্র মিত্র : 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র কবিতা', গ্রন্থালয় প্রা. লি., প্রথম সংস্করণ ৮ মে, ১৯৮৯, পৃ. ৩১
৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ', দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর, ১৯৬০, পৃ. ৩২৫
৭. তদেব : মুখবন্ধ অংশ, পৃ. ৩২৭

বুদ্ধদেব বসুর আত্মজীবনী
আত্মআবিষ্কারের শিল্পরূপ
সুলগ্না ব্যানার্জী

দেবী সরস্বতীর আশিস চুম্বন ললাটে নিয়ে জন্মেছিলেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। প্রতিভা, মেধা, বিদ্যা ও আত্মবিশ্বাস তাঁর জীবনের অমূল্য সম্পদ। বাল্যকাল থেকেই তাঁর নেশা ছিল বইপড়া, কবিতা লেখা, পত্রিকা প্রকাশের ঝোঁক, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, বিদ্যার্জনের প্রতি সমুৎসুক দৃষ্টি, ভক্ত পাঠকের উত্তেজনা অনুভব। জীবনানুশীলনের সূত্রে ও আত্মবিশ্বাসের ব্যাপ্তিতে তিনি হয়ে উঠলেন কবি, সমালোচক, প্রাবন্ধিক ও বাংলা সাহিত্যের নানা শাখাকে সমৃদ্ধ করবার প্রজ্ঞাবান সাহিত্যিক। মূলত, তাঁর সাহিত্যকীর্তি অসংখ্য ধারায় প্রবাহিত। সেই বিচিত্র সৃষ্টির এক অনন্য সংযোজন তাঁর প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্য।

প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যের যে ধারা বঙ্কিমচন্দ্র সূত্রপাত করেছিলেন তা রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে যৌবনে বিকশিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু সেই ধারাকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। বিশেষ করে সাহিত্য সমালোচনার যে ধারা তিনি বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন তার দ্বারা বাংলা গদ্যসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। কারণ প্রাবন্ধিক অতন্ত্র শিল্পীসত্তা, সংস্কারমুক্ত মন; মানবিকবোধে উদ্দীপ্ত এক আধুনিক মানবিকতা ও শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যকে দিয়েছে স্বতন্ত্র মর্যাদা।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) বাংলা সাহিত্যের যথার্থই সব্যসাচী লেখক। সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর অবাধ বিচরণ। তিনি কল্লোল ও প্রগতি পত্রিকায় অন্যতম লেখক। তিনি রবীন্দ্র-উত্তর যুগের উল্লেখযোগ্য কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। কিশোর বয়স থেকে পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি যে দীর্ঘস্থায়ী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর তুলনা নেই বললেই চলে। সৃজনশীল গদ্য রচনার পাশাপাশি মননশীল প্রবন্ধ রচনার কাজে তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন—তাঁর বহুবিধ রচনার তুলনায় সে সবের সংখ্যাও খুব

নগণ্য নয়। তাঁর নিজস্ব ধরনের বাংলা গদ্যশৈলীর নির্মাণ, তার স্বাদুতা পাঠকমহলে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সেই গুণ সমসাময়িক কালে সমাদৃত হয়েছিল, আজও তা বিদ্যমান। ১৯৯৬ সালে বুদ্ধদেব বসুর 'প্রবন্ধ-সংকলন' প্রকাশিত হয়। বিষয় বিন্যাসের দিক থেকে এর দুটি ভাগ—'সমালোচনা ও রম্যরচনা ও ভ্রমণ'। পরবর্তীকালে তাঁর প্রবন্ধের আরেকটি অংশ সংযোজিত হয়, আত্মজীবনী। আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলি হল—'আমার ছেলেবেলা' (১৯৭৩), মরণোত্তর 'আমার যৌবন' (১৯৭৬) এবং মরণোত্তর অসমাপ্ত 'আমাদের কবিতাভবন' (২০০১)। তাঁর প্রতিটা লেখায় আছে প্রতিভার দীপ্তি, উপলব্ধির গভীরতা, যুক্তির শৃঙ্খলিত বিন্যাস, প্রার্থিত নৈর্ব্যক্তিকতা, কবির অন্তর্দৃষ্টি। অতন্দ্র-শিল্পীসত্তা, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি, আধুনিক মন, চিন্তার স্বচ্ছতা, গদ্যের সুঠাম সাবলীলতা ও সহজ সৌন্দর্য। 'জীবন', আত্মীজীবনী রচনায় প্রয়াসী হলে তা ব্যক্তিজীবন হিসাবে শুধু নয়, মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রেরণা হিসাবে কাজ করে। দেশ-কালের পটভূমিকায় সে জীবন সাহিত্য রচনার ধারায় অনিবার্যভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এই শ্রেণির রচনাধারায় রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। এই সৃষ্টি সাহিত্যরস সম্বলিত, কবি তাঁর জীবনকথা নিজমুখে বলে তাঁর সাহিত্য সাধনার একটা আভাস দিয়েছেন। এ যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। বুদ্ধদেব বসুর 'আত্মজীবনী'ও স্মরণীয় সৃষ্টি। তাঁর 'আত্মজীবনী' যথার্থ অর্থে মহৎ জীবনের কথা, একজন কবি-সাহিত্যিকের নিয়ত হয়ে ওঠার কথা। তার সঙ্গে আছে দেশ-কালের ইতিহাস ও সাহিত্য সৃষ্টির গতিপ্রকৃতি।

২

বুদ্ধদেব বসুর আত্মজীবনী গ্রন্থখানি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত—(ক)'আমার ছেলেবেলা', (খ)'আমার যৌবন' এবং (গ)'আমাদের কবিতাভবন'। তিন অধ্যায় জুড়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর সমগ্র সাহিত্য জীবন লিপিবদ্ধ করায়, তাঁর শৈশব থেকে যৌবন ও যৌবন অতিক্রান্ত জীবনের বাকি সময় মিলে একটি সমগ্র জীবনের আত্মকথাশ্রিত গ্রন্থ হয়েছে এই 'আত্মজীবনী'। আত্মোন্নতির সঙ্গে সমকালীন সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি তুলে ধরে বুদ্ধদেব নিজেই হয়ে উঠেছেন ঐতিহাসিক লেখক। 'আমার ছেলেবেলা' অংশের শুরুতে বুদ্ধদেব বসু যা বলেছেন তা একদিক থেকে তাঁর 'আত্মজীবন' গ্রন্থেরই ভূমিকা স্বরূপ—

> আমার ছেলেবেলার কথা আগে অনেকবার লিখেছি। 'সাড়া' উপন্যাসের প্রথম অংশে, 'আমার বন্ধু' ও 'অন্য কোনখানে' উপন্যাসে, 'পুরানো পল্টন', 'নোয়াখালি', 'চার্লস চ্যাপলিন' ও 'রামায়ণ' প্রবন্ধে, কোনো কোনো ছোটগল্পে ও কবিতায়, তাছাড়া কয়েকটা উপলক্ষমূলক ক্ষুদ্র রচনাতেও সেই ইতিবৃত্ত টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে। কল্পনায় বা অন্য বিষয়ে আশ্রিত হলেও সেই ভগ্নাংশগুলিতে আত্মজৈবনিক যথার্থ নেই বলা যায় না। তবু যাকে বলে 'নিছক তথ্য' তারও প্রয়োজন ঘটে মাঝে মাঝে, তথ্যান্বেষীর কৌতূহল থেকে কবিরাও আজকাল নিস্তার পান না, আর আমি যথাস্থানে তথ্যের মূল্য স্বীকার করে থাকি। সেইজন্যেই এই লেখাটার অবতারণা।[১]

'আমার ছেলেবেলা' অংশে ২৭টি পরিচ্ছেদ আছে। বুদ্ধদেব বসুর আত্মকথন ভঙ্গিতে বর্ণিত 'আমার ছেলেবেলা' অংশেও খুঁজে পাই তাঁর মনের জগত কেমন ভাবে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের অন্তর্গত 'কুমিল্লা'য় বুদ্ধদেবের জন্ম ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর। জন্মের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাতা বিনয়কুমারীকে হারালেন শিশু বুদ্ধদেব, আর পিতা ভুদেবচন্দ্র স্ত্রীকে হারিয়ে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। হতভাগ্য শিশু বুদ্ধদেবকে পালিত হতে হল মাতামহ-মাতামহীর কাছে।

মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ পেশায় ছিলেন শিক্ষানুরাগী, ছিলেন মাতৃহারা শিশু বুদ্ধদেবের প্রতি অত্যধিক যত্ন-পরায়ণ। কর্তব্য কর্মটুকু সেরে বাকি সময়টাই বুদ্ধদেবের মানস গঠনে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ইংরেজি ব্যাকরণের ধারে কাছে না গিয়ে ক্ল্যাসিক ইংরেজি রচনার সাহিত্যরসের সন্ধান দেওয়া, আবার সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের প্রতিও আগ্রহ সৃষ্টি করানো- এসবই ছিল শিশু বুদ্ধদেবের প্রতি দাদামশায়ের নিরন্তর প্রয়াস। ইংরেজি, কি সংস্কৃত ভাষার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসার বীজ বপন করেন মাতামহ। তিনি নিজেই বলেছেন—"সেজন্যে আমার স্বাভাবিক উন্মুখতা যতটা দায়ী দাদামশায়ের প্রাণবন্ত শিক্ষকতাও ততটাই।"[২] এরই সঙ্গো শিশু বয়স থেকেই আপন গরজে বুদ্ধদেব জীবনের ভাষা বাংলা আয়ত্ত করেছিলেন। সে পাঠ তিনি নিয়েছেন যোগীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। তাঁর শিশুমনের অপার কৌতূহল, বিস্ময়দৃষ্টি, কল্পনাপ্রবণতা, বাড়িতে থাকা গ্রামোফোনকে কেন্দ্র করেও বর্ধিত হয়েছিল। সেইসঙ্গো ছেলেবেলায় পড়েছিলেন অনেক রূপকথা।

বুদ্ধদেব আপন স্বভাবেই ছিলেন বিনম্র, কুণ্ঠিত, লাজুক পরায়ণ ও নিরিবিলি প্রিয়। যৌথ পরিবারের জটিলতার মধ্যে, মজাসৃষ্টির পরিবেশে তিনি ছিলেন অনভ্যস্ত। প্রধানত দাদামশাই, দিদিমা আর দাদামশাইয়ের মাসিমা, সেই বৃদ্ধ বিধবা রমণী যাঁর ছত্রছায়াতেই তাঁর বাল্যজীবন কেটেছে। নোয়াখালি অঞ্চলে থাকাকালীন বিধবা রমণী বামাসুন্দরীর স্বভাব নম্রতা, সরল জীবনযাপনে, কর্মনিষ্ঠায় প্রীত হন বালক বুদ্ধদেব। 'মৃদু ও স্নিগ্ধ স্বভাব'—বিশিষ্টা প্রসন্নময়ী এই বৃদ্ধা রমণীর ব্রতপাঠ থেকেই জীবনের পাঠ নিয়েছেন বুদ্ধদেব—"নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ যে ক্লান্ত ও জীর্ণ ও নির্জীব করে দেয় মানুষকে, আমাদের জীবনে দুঃখও যে জরুরী একটি উপাদান-আমার মনে হয়েছে এই কথাটাই এর বার্তা।"[৩]

'ডেলনি-হাউস' নামে কলোনিয়াল স্টাইলের বাড়িতে বুদ্ধদেবের প্রথম কবিতা রচনা। নদী এগিয়ে আসায়, সেখানে আর থাকা সম্ভব হয়নি। এই বেদনা থেকেই তিনি ইংরেজিতে ছয়-সাত স্ট্যানজার কবিতা লিখলেন, যা তাঁর কাছে ছিল 'বিশুদ্ধ দৈব ঘটনা'। তারপর বাংলা কবিতা লেখার প্রতি তাঁর ঝোঁক বাড়ল। তখনো রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গো পরিচিতি ঘটেনি। 'নদী', 'সন্ধ্যা', 'সূর্যাস্ত'-এর মত নৈসর্গিক বিষয় নিয়েই মিল দিয়ে পদ্য কবিতা রচনা করছেন বুদ্ধদেব। কবিতার ভাবনা গাঢ় না হলেও এই ছেলেমানুষি চেষ্টাই তাঁকে পৌঁছে দিল আরও বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করতে। তাঁর কথায়—

> কিন্তু ক্রমশ এই ছেলেমানুষি চেষ্টা আমাকে সুখ দিতে লাগলো। আমার কলম হয়ে উঠলো দ্রুত-সচল, ডেলনি-হাউস ছেড়ে যাবার আগেই আমি পয়ার-ত্রিপদীতে একটি সপ্তকাণ্ড রামায়ণও লিখে ফেলেছিলেন।[৪]

সুতীব্র কৌতূহল, জ্ঞান পিপাসা আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে বুদ্ধদেব আত্মবিকাশের পথ খুঁজেছেন। সুকুমার রায় সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকা, আবার 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ'-র মতো পত্রিকাতেও নিজস্ব জায়গা করেছেন। 'মৌচাক'-এ লেখা ছাপাবার জন্য ব্যস্ত। ঢাকা থেকে প্রকাশিত শিশু পত্রিকা 'তোষিণী'-তে তাঁর লেখা বেরিয়েছে। কিন্তু এরকম ছোটো সাফল্যে বালক বুদ্ধদেব তৃপ্ত হতে পারেননি। নোয়াখালি বাসের শেষ পর্যায়ে বালক বুদ্ধদেবের হাতে এলো চারুচন্দ্র সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গো পরিচয় বুদ্ধদেবের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এলো। রবি কবির কবিতার ধ্বনি ঝংকার, ভাষা, ছন্দ তাঁর মনে নতুন ও অদ্ভুত স্বাদ ছড়িয়ে দিলো।

রবীন্দ্রনাথের টানে তখন 'প্রবাসী' পত্রিকাই তাঁকে বেশি আনন্দ দিত। এছাড়া 'ডাকঘর', 'ছিন্নপত্র' রচনাদুটিতে বুদ্ধদেব খুঁজে পেয়েছিলেন নিজের সুদূর প্রসারী, প্রকৃতি প্রিয় মনকে। 'ছিন্নপত্র' তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল পরম সম্পদ, যেন বিক্ষত মনে স্নিগ্ধতার প্রলেপ। তাই বিদেশ ভ্রমণকালেও এই বইটিই ছিল তাঁর পরম সঙ্গী। পনেরো বছর বয়সী বুদ্ধদেব তখন এইভাবেই মানস পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পেয়েছেন আপন শিল্পী সত্তার স্বরূপকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলন- এসব বালক বুদ্ধদেবকে স্থির থাকতে দেয়নি। নিয়মিত পড়েছেন 'ইয়ং ইন্ডিয়া', 'বাংলার বাণী' আর লিখেছেন নবযুগের বন্দনা। পল্লী জীবনের প্রশস্তি করে লিখছেন গল্প। রাজনৈতিক এই অস্থিরতার মধ্যেই বালক বুদ্ধদেব দাদামশাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন ঢাকায়। শক্তিশালী লেখক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন, তা তিনি নিজেই বলেছেন—"আমি তখন আমি হয়ে উঠেছি, আবিষ্কার করছি নিজেকে। আস্তে আস্তে বা দ্রুতবেগে আমার শরীর-মনের এনভেলাপে পোরা অস্তিত্বটাকে বদলে দিচ্ছিলেন প্রকৃতিদেবী।"[৫] এর নেপথ্যে ছিলেন 'সৌভাগ্যলব্ধ বন্ধুরা'। একজন প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা, যাকে বালক বুদ্ধদেব বুদ্ধুদা বলেই ডাকতেন। বুদ্ধুদার সাহিত্যচর্চা, আড্ডা জমাবার ক্ষমতা, রসরসিকতা, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধদেবকে সেই বয়সে অনেক বেশি প্রসারতা এনে দিয়েছে। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পাঠকালীন বুদ্ধদেব প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহজ সান্নিধ্যে আসেন, পরে 'কল্লোল' পত্রিকার সুবাদে একেবারে কাছের বন্ধু হয়ে যান। প্রাক্‌যৌবনে বুদ্ধদেব হয়েছেন পরিণত, চিন্তায়-বিদ্যা-বুদ্ধিতে আত্মবিশ্বাসী। 'প্রগতি' পত্রিকা সমৃদ্ধ করতে কঠিন সংগ্রাম আর রাত করে বাড়ি ফেরা, রাতেও শুয়ে শুয়ে উপন্যাস পড়া—এই ছিল তখন বুদ্ধদেবের সাহিত্যিক মানসিকতা গড়ে তোলার দীর্ঘ প্রয়াস। তবু যেন অতৃপ্ত থেকে যায় বুদ্ধদেবের মন, মনন ও চেতনাজগৎ। তিনি বলেছেন—"মনে হয় এত পড়েও, এত ঘোরাঘুরি মেলামেশা করেও আমি যা চাই তা পাচ্ছি না এখনো, আমার ইচ্ছেগুলো আমার চাইতে বড়ো।"[৬]

'আমার ছেলেবেলা' অংশে আমরা পাই প্রচণ্ড আবেগতাড়িত, ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন, আত্মবিকাশের পথে উজ্জ্বল বুদ্ধদেবকে। মা-বাবা হারা বুদ্ধদেব দাদামশাই ও দিদিমাকে পেয়ে বারবার ঠিকানা বদল করে ঢাকায় এসে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত মজবুত করলেন কীভাবে, তারই রোমাঞ্চকর কাহিনি 'আমার ছেলেবেলা'। তিনি বলেছেন—"যেন আমি বড্ড বেশি খুলে যাচ্ছি, যেন আমার ভিতর-মহলে অনেকের জন্য জায়গা থাকলেও আমার নিজেরই কোনো আশ্রয় নেই।"[৭] এই মানসিক আশ্রয়হীনতা যা শিল্পীর চির অতৃপ্তি থেকেই জন্ম নেয়। সৃষ্টিজনিত অতৃপ্তিই বুদ্ধদেবকে তৃপ্তির সন্ধান দিয়েছে নতুন নতুন রচনাকর্মে। 'আমার ছেলেবেলা' অংশে জীবন বিকাশের কথার পাশাপাশি রয়েছে আত্মজীবনের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ। লেখক তাঁর অন্তরের স্বভাবের দিক উন্মুক্ত করার সাথে সাথে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ একটি কালকেও চিত্রিত করেছেন। নিয়ত লেখালেখি, বই পড়ার মধ্যে দিয়ে যে আনন্দ সঞ্চার করেছেন, মনকে প্রসারিত করেছেন, তাও ব্যক্ত করেছেন অকপটে—

> এই যে আমি বেঁচে আছি বইয়ে এবং বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হয়ে, ভালোবাসা দিয়ে এবং পেয়ে; রৌদ্র এবং নক্ষত্রের আলোয় ঘুরে-ঘুরে কোনো কোনো মুহূর্তে আমার মনে হয় এই জীবন বড়ো সুন্দর, বড়ো আশ্চর্য, যেন ভেবে পাইনা মানুষের মনে কেন থাকে মালিন্য, ঈর্ষা, বিদ্বেষ।[৮]

এইভাবেই সংকীর্ণ, অন্ধকারময় জগৎ থেকে সরে এসে বুদ্ধদেব বসু ছেলেবেলাতেই গড়ে তুললেন ভবিষ্যৎ জীবনের আলোকময় সম্ভাবনার দিক।

৩

বুদ্ধদেব বসুর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় অংশ 'আমার যৌবন'। এখানে বুদ্ধদেব বসুর সৃষ্টিশীলতা অনেক পরিণত। এইসময় তিনি নিজেকে সাহিত্যের সেরা ছাত্র হিসেবে যেমন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন, তেমনি নিজের আন্তরিক চেষ্টায়-উৎসাহে 'প্রগতি' পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নেওয়ার সূত্রে মানসিক ক্ষুধার তীব্রতায় বহু বিদগ্ধ মানুষের সংস্পর্শে আসছেন এই সময়। তাছাড়া ব্যক্তিগত সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি সমকালীন সাহিত্য আন্দোলনের প্রমাণযোগ্য দলিল যেন 'আমার যৌবন'।

অজিত কুমার দত্তের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে বুদ্ধদেব বসু প্রকাশ করলেন 'প্রগতি' পত্রিকা। এক বিশাল কর্মকাণ্ড মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত পত্রিকায় (প্রথম সংখ্যা) ছিল অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের আঠারো পদ সম্বলিত কবিতা, বুদ্ধুদার প্রবন্ধ, কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা। পাশাপাশি পত্রিকার জন্য পাঠানো যাবতীয় লেখার সম্পাদনা, আবার অনবরত নিজের লেখা।

বুদ্ধদেব বসুর নিরলস কর্মোদ্যগে কিছুদিনেই 'প্রগতি' পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়ে উঠল সাহিত্যের নানা প্রতিভাবান লেখকদের নিয়ে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম, 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে মনীশ ঘটক, 'শ্যামল রায়' নামে বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ প্রমুখের লেখায় 'প্রগতি'র তখন যৌবন অবস্থা। এই পত্রিকাতেই সাহিত্যিক বাদানুবাদ জাতীয় রচনা বুদ্ধদেব নিজেই লিখতে শুরু করলেন। পত্রিকা যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

বাংলা কাব্যে বিশ-ত্রিশের দশকে রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্তির চেষ্টা করছিল বাঙালি সাহিত্যিকেরা, আর 'প্রগতি' পত্রিকা যেন সেই মুক্তি যুদ্ধের প্রধান হোতা হয়েছিল। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার বলিষ্ঠ দুই কবিকে নিয়ে রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্রস্তুতি পর্ব রচনা করলেন তিনি। সাহিত্যপ্রেমী বুদ্ধদেব বছরে দু-তিনবার আসতেন ঢাকা থেকে কলকাতা। ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ, কখনো থিয়েটার দেখে নাট্য প্রতিভা সমৃদ্ধ করেছেন। 'কল্লোল' অফিসে দীনেশরঞ্জন দাশ, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত—সকলকে নিয়ে আড্ডা দিয়েছেন। এই গোষ্ঠীসুখ তাঁকে আত্মতুষ্টি দিয়েছে, পরিশীলিত করেছে। একদিকে 'কল্লোল' পত্রিকায় ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশ, একার প্রচেষ্টায় 'প্রগতি'র গতি ধরে রাখা; অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগে নিজেকে সেরা ছাত্র হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস। তিনি বলেন—"আমার কলম প্রায় সারাক্ষণ চলে, ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি মনে পড়ে যায়; পরীক্ষা মণ্ডপের স্তব্ধ গম্ভীর আবহাওয়ায় আমি যেন এক ধরণের উদ্দীপনা অনুভব করি।"[৯]

এমনকি এমএ-তে ভিক্টোরীয় কবিতা বিশেষ পত্র হিসাবে নিয়ে এবং তা আত্মস্থ করে নিজের কবি মানসটিকে রীতিমতন গড়াপেটা করে নিচ্ছেন। টেনিসন, ব্রাউনিং, সুইনবার্ণের কবিতার রসবস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে সাহিত্যপাঠ, সাহিত্যচর্চা তখন বুদ্ধদেবের কাছে অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল। আর এই অস্তিত্বের তাড়নায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুশোভন সরকারের সান্নিধ্যও তাঁর কাছে পাথেয় হয়ে উঠল। এরই মধ্যে গান্ধীজীর ডান্ডি অভিযান, ঢাকায় বারংবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে যে অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হল, তাতে বুদ্ধদেবের সাহিত্যচর্চাও একরকম বাধাপ্রাপ্ত হল। সালটা ১৯৩১, তীব্র অস্থিরতায় এলেন কলকাতা। যদিও এর মধ্যে 'সাড়া' উপন্যাস, 'বন্দীর বন্দনা' কাব্য, 'এরা আর ওরা' গল্প বেরিয়ে গেছে।

কপর্দক শূন্য হয়ে কলকাতায় এসে অনিল ভট্টাচার্যের বদান্যতায় ভাড়া বাড়ির ব্যবস্থা হল চক্রবেড় রোডে, আবার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সাহায্যে ছেলে পড়ানো জুটিয়ে নিলেন। এখানে এসে দারিদ্রতার সাথে যুদ্ধ করতে করতে সৃষ্টির নেশায় বই পাড়াতে সময়ও কাটিয়েছেন। নানা সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে থাকাতেই চক্রবেড় থেকে রমেশ মিত্র পাড়ায় আড়াই কামরার ফ্ল্যাট নিয়ে উঠে এলেন বুদ্ধদেব। এসময় 'পরিচয়' (১৯৩১) পত্রিকা-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। 'পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যায় বেরোল বুদ্ধদেবের কবিতা, দ্বিতীয় সংখ্যায় 'বন্দীর বন্দনা', 'অভিনয়, অভিনয় নয়'—গ্রন্থ দুটির সহৃদয় আলোচনা। ক্রমশ নাটক রচনাতেও হাত পাকালেন বুদ্ধদেব বসু। লিখলেন 'একটি মেয়ের জন্য' নাটক। প্রবোধচন্দ্রের প্রেরণায় লিখলেন 'রাবণ' নাটক, যদিও তা কোনোদিন মঞ্চায়িত হয়নি।

ত্রিশের দশকের বাংলা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক সমস্ত দিক থেকে চরম দুঃসময়ের শিকার হয়েছিল। বিশ্বজুড়ে ব্যবসা মন্দা, গান্ধীজীর অনশন, সমগ্র বাংলায় সন্ত্রাসবাদ, বেকারত্বের বৃদ্ধি—এককথায় অর্থ সংকটে জেরবার তখন বাংলা। আর বুদ্ধদেবও তখন জীবিকা সংকটের মুখোমুখি। নাট্যকার হওয়ার স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যায়, কবিতা লেখাও বন্ধ, শুধু নগদ মূল্যে উপন্যাস-ছোটোগল্প আর ছোটোদের জন্য গল্প লিখে যাচ্ছেন।

পঁচিশ বছরের যুবক বুদ্ধদেব, বিবাহ করলেন বিখ্যাত গায়িকা প্রতিভা বসুকে। রিপন কলেজে চাকরি, টালিগঞ্জের রসা রোডে নতুন বাসা-জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হল। চরম দারিদ্রতা কাবু করতে পারেনি, সৃষ্টির তাড়নাকে অর্থাভাব দমিয়ে দিতে পারেনি। এই দুরবস্থাতে দেখা হয় দেবদূতের মতো হুমায়ুন কবির-এর সাথে। তিনি কবিকে ছ'মাসের জন্য ইউনেস্কোর একটি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং বুদ্ধদেবের প্রথম বিদেশ যাত্রা তাঁরই পরামর্শে ও উদ্যোগে ঘটেছিল। এরপর কলকাতায় বুদ্ধদেবের আবার বাসা বদল। নিশ্চিত ঠিকানা শেষ পর্যন্ত ২০২ রাসবিহারী এ্যাভিমন্যু, বালিগঞ্জ প্লেসে। বাড়ির নাম 'কবিতাভবন'।

যুবক বুদ্ধদেব সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে স্বনামধন্য লেখক। নিজে ক্রমাগত সাহিত্য সৃষ্টিতে মগ্ন থাকার পাশাপাশি রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় ত্রিশ-চল্লিশ দশকে আধুনিক কাব্য-কবিতার ধারা বদলে দিচ্ছেন। তাঁর 'প্রগতি' যেমন কাব্যান্দোলনের ইতিহাস গড়ল, তেমনি পরবর্তীতে 'কবিতা' পত্রিকা চালিয়ে যাওয়া তাঁর প্রধান কর্মসূচী হয়ে উঠল। তাঁর যোগ্য সম্পাদনায় এই পত্রিকাও তখন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তাঁর 'আত্মজীবনী'র 'আমাদের কবিতাভবন' শিরোনামাঙ্কিত তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা জেনে যাই অনেক না জানা তথ্য, সুখ-দুঃখ বিজড়িত নানা ঘটনা।

বাংলা কাব্য জগতে 'কবিতা' (১৯৩৫) পত্রিকার আত্মপ্রকাশ বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণ করত। বুদ্ধদেব তাঁর সমকালে দেখেছেন বাংলায় প্রকাশিত মাসিক পত্রগুলিতে কবিতার জায়গা হয়েছে অত্যন্ত কৃপণভাবে। কবিতা যে মাসিক পত্রিকায় সামান্য স্থান পায় তা প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের। 'কল্লোল' অবশ্য 'পাদপূরণকারী অবজ্ঞা' থেকে কবিতাকে যোগ্য সম্মান দিয়েছিল। 'পরিচয়' মূলত প্রবন্ধ-প্রধান পত্রিকা। শুধু 'কবিতা' প্রধান করে তোলার জন্যই বুদ্ধদেবের 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ পেল। সে সময় এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। মুখ্যত গদ্যকবিতা সম্বলিত এই 'কবিতা' (১ ম) পত্রিকা পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন একটি দীর্ঘ প্রশস্তিমূলক পত্র। সেই পত্রে সমকালীন বিশিষ্ট কবিদের কবিমানস নিঁখুতভাবে তুলে ধরেছিলেন। সঙ্গে স্বরচিত গদ্য কবিতা 'ছুটি' পাঠিয়ে দেন। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী—ত্রিশের এই

বিশিষ্ট কবি চতুষ্টয় 'কবিতা'য় ক্রমাগত কবিতা পাঠাচ্ছেন। এই পত্রিকা বুদ্ধদেবকে যথেষ্ট জনপ্রিয় করে। সাহিত্যিকদের সংখ্যাও বাড়তে থাকল, পাশাপাশি বাড়ল গ্রাহক সংখ্যা। শুধু 'কবিতা' পত্রিকা নয়, বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতী', জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', অমিয় চক্রবর্তীর 'অভিজ্ঞান বসন্ত', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' বেরোল কবিতা ভবন' থেকেই।

৪

'কবিতা ভবন' অধ্যায়টি শুধু লেখক বুদ্ধদেবের 'আত্মজীবনী' নয়; এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে নানা ঘটনা, নানা ইতিহাস, বিশেষ সব সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের জীবনী সংক্ষেপ। অজিত কুমার চক্রবর্তীর বিষপানে আত্মহত্যার করুণ দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে বুদ্ধদেবের অসাধারণ বর্ণনা নৈপুণ্যে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দৃশ্যও সংক্ষেপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেই সময়ের দেশ-সমকালীন পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। এখানে আত্মজীবন কথার পাশাপাশি দেশ-কাল ও সাহিত্যের অবস্থার ইতিহাসও বিবৃত। বুদ্ধদেব বসুর 'আত্মজীবনী' বিভিন্ন দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হয়ে আছে।

প্রথমত, এক সৃজনশীল কবি শিল্পীর সারস্বত জীবনের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনি। দারিদ্র্যের সঙ্গে নিয়ত লড়াই, জীবনযাপনে বিলাস বিমুখ, মননচর্চায় ঋদ্ধ এক মহতী জীবনের আত্মকথা হয়েছে এই আত্মজীবনী।

দ্বিতীয়ত, তিনি সমকালীন সাহিত্যিকদের নিয়ে এক সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। তাঁর 'আত্মজীবনী' পাঠে আমরা পাই 'প্রগতি', 'কল্লোল', 'কবিতা' পত্রিকার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতির ধারাবাহিক ইতিহাস।

তৃতীয়ত, চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও বুদ্ধদেব নিজের সাহিত্যচর্চা শিথিল না করেও কত লেখক, লেখিকাকে সৃষ্টি চেতনায় প্রাণিত করেছেন, তাঁদেরকে প্রচারের আলোয় আনবার জন্য একান্ত চেস্টা তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন—

> প্রগতি'র সময়েই টের পেয়েছিলাম আমার মধ্যে একটি অংশ আছে প্রচারকের; সাহিত্য আমাকে যা আনন্দ দেয়, তাতে অন্যেরাও আনন্দিত হোকএই ইচ্ছার বেগ আমি সামলাতে পারি না; তার তাড়নায় এমন অনেক কাজ করে থাকি যাকে চলিত বাংলায় বলে বনের 'মোষ তাড়ানো'। আমার এই বৃত্তিটি নির্বাধে ছাড়া পেলো 'কবিতা বেরোবার পর, কেননা তখনি একের পর এক দেখা দিচ্ছেন নানা বয়সের নতুন ধরনের কবিরা, দেখা দিচ্ছেন না প্রাপ্ত হচ্ছেন পরিণত- বাংলা ভাষায় কবিতা লেখা কাগজটি লয়ে উঠেছে শুধু ব্যক্তিগত উচ্ছাশা পূরণের উপায় নয়, রীতিমত একটি 'আন্দোলন', সার মুখপত্র রূপে চিহ্নিত হয়েছে 'কবিতা' পত্রিকা।[১০]

চতুর্থত, বুদ্ধদেব বসুর 'আত্মজীবনী' হয়ে উঠেছে একটি সময়ের প্রতিচ্ছবি। দেশের রাজনৈতিক জটিলতা, অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্বের জ্বালা, উদ্বাস্তু সমস্যা সবই একরকম সংক্ষেপাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

পঞ্চমত, 'আত্মজীবনী' গ্রন্থের গদ্যভাষাও হয়ে উঠেছে অনবদ্য। লেখকের বর্ণনা নৈপুণ্যে, কবিমানসিকতায়, আন্তরিকতায় সর্বত্র অনুভব করা যায় এক যথার্থ ভাষা শিল্পীকে। যেমন—

> সেই শব্দহীন সবুজে ঘেরা বারান্দায়, দুটি মৃদুভাষিণী প্রাচীনার সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ কাটিয়ে, আমি যেন অনুভব করেছিলাম—কী, তা তখন বুঝি নি, কিন্তু এখন মনে হয় সেটা কোনো লুপ্ত যুগের সূর্যাস্তরেখা, প্রাচীনতার একটি নম্র সূক্ষ্ম সৌরভ, কোনো ধীর শান্ত শৃঙ্খলাজাত সৌন্দর্য, আমরা নতুন পল্টন যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি।[১১]

এখানে ভাষার মধ্যে এসেছে প্রত্যক্ষতা, চিত্রধর্মিতা, বুনন কৌশল।

৫

বুদ্ধদেব বসু নিরন্তর যে সৃষ্টির যন্ত্রণায় ছারখার হয়েছেন, নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েও তার সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত 'আত্মজীবনী' গ্রন্থটি হয়ে উঠতে পারেনি। যে মানুষটি প্রতি মুহূর্তে সারস্বত সাধনায় কেবলই উন্মোচিত হচ্ছেন, খ্যাতির তোয়াক্কা না করে কেবল সৃষ্টির আনন্দেই বিভোর তাঁকে সেই ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। আর যায় না বলেই সেই ব্যক্তিত্বকে কল্পনা দিয়ে, বুকের রস ও রক্ত দিয়ে বুঝে নিতে হয়। বুদ্ধদেব বসুর 'আত্মজীবনী' পাঠে আমাদের এই উপলব্ধিই হয়। কোনোরকম অতিরঞ্জন না করে, আত্মপ্রশংসায় বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে বুদ্ধদেব বসু নিজের সাহিত্যিক জীবনটিকে নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরেছেন। আর যে পরিশীলিত, শিল্পিত, সংস্কৃত ব্যক্তিজীবন তাঁর এতখানি সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বকে গড়ে দিল, তা এই 'আত্মজীবনী' পাঠেই আমাদের ধারণাকে সুদৃঢ় করে।

উৎসের সন্ধানে

১. বুদ্ধদেব বসু : 'আমার ছেলেবেলা', প্রারম্ভ অংশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি প্রকাশিত 'বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র', ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০ মে ২০০৫, পৃ. ৫
২. তদেব : পৃ. ৯
৩. বুদ্ধদেব বসু : 'আমার যৌবন', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি প্রকাশিত 'বুদ্ধদেব বসুর প্রথম সমগ্র', ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০ মে ২০০৫, পৃ. ১৬
৪. তদেব : পৃ. ২২
৫. তদেব : পৃ. ৪৩
৬. তদেব : পৃ. ৬১
৭. তদেব : পৃ. ৬১
৮. তদেব : পৃ. ৬২
৯. তদেব : পৃ. ৯২
১০. বুদ্ধদেব বসু : 'আমাদের কবিতাভবন', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি প্রকাশিত 'বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র', ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০ মে ২০০৫, পৃ. ১৩৮
১১. বুদ্ধদেব বসু : 'আমার যৌবন', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি প্রকাশিত 'বুদ্ধদেব বসুর প্রথম সমগ্র', ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ২০ মে ২০০৫, পৃ. ৯০

বাংলা গানের রূপ ও রূপান্তরে সুরস্রষ্টা নজরুল

সুলগ্না চক্রবর্তী

বাণীর অর্থকে সুরের বিস্তারের মধ্য দিয়ে অধিকতর ব্যঞ্জনাময় করে তোলাই হচ্ছে কাব্যসংগীতের লক্ষ্য। কথাপ্রধান সংগীত সর্বদেশে প্রচারিত থাকলেও বাণীর অর্থকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে ভাবপ্রবণ বাঙালিজাতি তার কাব্যসংগীতে আপন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রকাশ করেছে। কবিতা এবং সুর একই স্রষ্টার শিল্পরচনার নিদর্শন হয়ে একটি সমগ্র শিল্প হয়ে ওঠা বাঙালির কৃতিত্বের একটি লক্ষণীয় দিক। বাঙালির এই কাব্যসংগীত ধারার শেষ প্রতিভাধর কবি তথা গীতিকার নজরুল। গানের কথার সঙ্গে সুরের সার্থক মিলন ঘটিয়ে সংগীত জগতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা গীতিজগতে চিরবরনীয় ও স্মরণীয়। তাঁর সংগীত একদিকে যেমন সুরৈশ্বর্যে দ্যুতিময়, অন্যদিকে ভাবসম্পদ ও আবেগপ্রাবল্যে প্রাণবন্ত।

গানের বাণীতে তিনি আবেগময় ও অর্থবহ শব্দচয়নে সংগীতকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। তাঁর প্রেম-প্রকৃতি তথা কাব্যধর্মী গানের বাণী বাংলা গানের জগতে নতুন অধ্যায়নের সূচনা করেছে। আবেগ থেকেই স্বরের সৃষ্টি হয়। আর স্বরের উঁচুনীচু গতি দ্বারা সংগীত সাতস্বরের সহযোগে ভাবের তথা আবেগের ভাষা হয়ে ওঠে। এভাবে বিচিত্র সুরের দ্বারা সংগীত নির্মিত হয়। নজরুলসংগীতের সুর তথা স্বর ও আবেগের তাড়নায় ভাবের ভিন্নতায় স্ব স্ব রূপে বিকশিত হয়েছে। তাঁর সুরের কাঠামো শাস্ত্রীয় রাগসংগীতের (বিশেষত খেয়ালের) প্রবর্তনায় গঠিত। তিনি রাগসংগীতের শৃঙ্খলার মধ্যেই বাংলা কাব্যসংগীতের মুক্তি খুঁজেছেন। নজরুল জোর দিয়েছেন সুরের সামঞ্জস্যের ওপর, রাগের প্রকাশের ওপর নয়। বহু রাগও রাগমিশ্রণের মাধ্যমেই গঠিত হয়েছে, যেগুলিকে সংগীতশাস্ত্র অনুযায়ী 'ছায়ালগ ও সঙ্কীর্ণ' শ্রেণির রাগ বলা হয়ে থাকে। দুই রাগের মিশ্রণে 'ছায়ালগ' ও দুয়ের অধিক রাগের মিশ্রণে সংকীর্ণ জাতীয় রাগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। শারঙ্গদেব তাঁর 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে এক রাগের একটি স্থায়ীর সঙ্গে অপর এক বা

একাধিক রাগের স্থায়ীর মিশ্রণের রীতি উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া বৈচিত্র্য সাধনের জন্য ক্রিয়াত্মক রাগসংগীতে মূল রাগের কিছুক্ষণের জন্য তিরোভাব ঘটিয়ে অন্য রাগের প্রকাশ ঘটানো হয় এবং তারপরেই আবার মূল রাগের আবির্ভাব ঘটানো হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে ভাবির্ভাব ও তিরোভাব বলা হয়। নজরুল আধুনিক গানের সুরসৃষ্টির প্রধান উপায় হিসেবে বিভিন্ন রাগের সার্থক মিশ্রণকে মেনে নিয়েছেন এবং এই মিশ্রণ সার্থক হলে তবেই সাধিত হবে গানের মধ্যে সুরের সামঞ্জস্য। তিনি তার সুরসৃষ্টিতে সুরের কাঠামো নির্মাণে তিনটি প্রধান উপায় অবলম্বন করেছিলেন—রাগ মিশ্রণ, একটি নির্দিষ্ট রাগের রূপ গ্রহণ এবং নবরাগ সৃজন।

রাগমিশ্রণে নজরুলের দক্ষতা ছিল সহজাত। ১৯২০ সালের এপ্রিলে রচিত তাঁর গান 'বাজাও প্রভু বাজাও'-বসন্ত-সোহিনী মিশ্র রাগে রচিত। প্রকরণগত দিক থেকে রাগমিশ্রণে কয়েকটি প্রথাসিদ্ধ শাস্ত্রীয় রীতি গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে একটি হল, যেসব রাগ সমশ্রেণির বা স্বরবিন্যাসে কাছাকাছি তাদের মিশ্রণ। 'বসন্ত' রাগের নানা প্রকারভেদ রয়েছে যেহেতু মারবা মেলের তীব্র ধৈবত যুক্ত 'বসন্ত' স্বরবিন্যাসে 'সোহিনীর' কাছাকাছি, সেজন্য গানটিতে নজরুল এই প্রকার 'বসন্ত' নির্বাচন করেছেন। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে রচিত 'কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায়' গানটি বেহাগ, তিলককামোদ ও খাম্বাজ রাগের মিশ্রণে রচিত। গানটির স্বকৃত বিন্দুমাত্র স্বরলিপি প্রকাশ করেন প্রখ্যাত সংগীত সমালোচক দিলীপকুমার রায়, ভারতবর্ষ পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৩৫ সংখ্যায়। স্বরলিপির পাদটীকায় তিনি গানটির একটি সুরগত বিশ্লেষণ করেছেন, যা ঐতিহাসিক বিচারে নজরুলগীতির প্রথম বিশ্লেষণ। তিনি প্রথম লাইনে বলেছেন তিলককামোদের ছায়া মনোরম, দ্বিতীয় লাইনে তৎসঙ্গো বেহাগ বড় সুন্দর মিশিয়াছে, তারপর 'সে থাকে... ঘুরে মরে' অংশে একটি উর্দু গজলের সুরের আমেজ এসেছে বাংলা গানে এরূপ গজলের সৌরভের আমদানীর জন্য সত্য সংগীতানুরাগীরা কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবেন; 'কাজল করি...অশ্রু সাথে' অংশে পুনরায় বেহাগ এসে যে বৈচিত্র্য এনেছে এবং ঠিক তৎপরেই 'বুকে তার...সে চুরি' অংশে বিশুদ্ধ খাম্বাজের মিশ্রণে মধুরতা আরো হৃদয়স্পর্শী হয়েছে।[১]

নজরুলের 'রাগপ্রধান' গানগুলি মিশ্র প্রকৃতির রচনা। বাণী অংশে কাব্যধর্মিতার ছাপ স্পষ্ট, সুরাংশে রাগ-রাগিণীর পোষকতা। ইংরেজিতে এই গানকে Classico modern songs বলা হয়। ক্লাসিকের বুনিয়াদের উপর আধুনিকতা-ঘেঁষা রোমান্টিকের যে-সৌধ নির্মাণ তারই অন্য নাম-'রাগপ্রধান'। নজরুলের রাগপ্রধান গানগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, প্রচলিত রাগ-রাগিণীর ভিত্তিতে রচিত রাগপ্রধান। দ্বিতীয়, যেসব রাগ-রাগিণী প্রায় লুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে সেগুলির ভিত্তিতে রচিত রাগপ্রধান গান। নজরুল এগুলির নামকরণ করেছিলেন 'হারামণি'। তৃতীয়, নজরুলের নিজেরই উদ্ভাবিত নতুন রাগের ভিত্তিতে রচিত বাংলা গান।

● **প্রচলিত রাগের ভিত্তিতে গড়া রাগপ্রধান :** 'নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে' (বেহাগ), 'কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া' (খাম্বাজ), 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে' (কৌশিকী-কানাড়ামালকোষ ও ভীমপলশ্রীর সহযোগে রচিত মিশ্র রাগ), 'কেন মেঘের ছায়া আজি চাঁদের চোখে' (দরবারী কানাড়া) ইত্যাদি।

● **'হারামণি' পর্যায়ের রাগপ্রধান:** 'গুঞ্জামালা গলে কুঞ্জে এসো হে কালা' (মালগুঞ্জরাগেশ্রীর স্বগোত্র রাগ), 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' (হিজাজ ভৈরবী), 'কাবেরী নদী জলে কে গো বালিকা' (কর্নাটী সামন্তদক্ষিণী রাগ, হে পার্থসারথি, বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ (শিবরঞ্জনীদক্ষিণী

রাগ), 'পরদেশী মেঘ যাওরে ফিরে' (সিংহেন্দ্র মধ্যমাদক্ষিণী রাগ), 'বসন্ত মুখর আজি' (বসন্ত মুখারী), 'অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী' (আহীর ভৈরব) ইত্যাদি।

● **স্বরচিত রাগের ছায়ায় রচিত রাগপ্রধান :** 'চপল আঁখির ভাষায়, হে মীনাক্ষি করে যাও' (মীনাক্ষি), 'জগো অরুণ-ভৈরব জাগো হে শিবধ্যানী' (অরুণ ভৈরব), 'দোলন-চাঁপা বনে দোলে দোলন চাঁপা', 'হাসে আকাশে শুকতারা হাসে অরুণ-রঞ্জান ঊষার পাশে' (অরুণ-রঞ্জানী), 'সতীহারা উদাসী ভৈরব কাঁদে' (উদাসী ভৈরব), 'মত্তময়ূর ছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে' (মত্তময়ূর), 'বেণুকা ও কে বাজায় মহুয়া বনে' (বেণুকা), 'বনকুসুম-তনু তুমি কি মধুমতী' (মধুমতী), 'মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ আছে শুধু প্রাণ' (আশা-ভৈরবী), 'শান্ত হও শিব-বিরহ-বিহ্বল' (যোগিনী), 'শোন ও সন্ধ্যামালতী বালিকা তপতী' (সন্ধ্যামালতী) ইত্যাদি।

নজরুল তাঁর সংগীত জীবনের শেষ পর্বে সতেরোটি নতুন রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। প্রচলিত রাগের প্রভাব এড়াতে নজরুলকে গভীর অনুশীলন করতে হয়েছিল। যেমন তাঁর সৃষ্ট বেণুকা রাগে বাঁধা 'বেণুকা ও কে বাজায় মহুয়া বনে' গানটিতে সেনী ঘরনার 'গ' ও 'নি' বর্জিত পাহাড়ির সঙ্গে তিলককামোদ মিশ্রিত হয়েছে অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে। নজরুলসৃষ্ট 'সন্ধ্যামালতী' রাগে 'শোনো ও সন্ধ্যামালতী বালিকা তপতী' গানটিতে মধুমন্তী, মূলতানি, খাম্বাজ ইত্যাদি রাগের আভাস পাওয়া যায় অথচ একটি মৌলিক ছাঁদ এখানে গড়ে উঠেছে। সুরের সন্ধানে নজরুল এভাবে নব নব মৌলিক সুরসৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

নজরুলের প্রেমের গান মানবিক উষ্ণতায় ভরপুর, তবু বলি, সে উষ্ণতায় কোনো কাঙালপনা নেই, আছে শুধু প্রেমিক প্রেমিকার পারস্পরিক মুগ্ধতা, সৌন্দর্যমগ্নতা। জীবনকে মানবিক আবেগের মধ্য দিয়ে স্পর্শ করার চেষ্টা আছে। এসব গানে, নেই কোনো স্থূলতা। নজরুল যখন লেখেন—

> তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়
> সেকি মোর অপরাধ।[২]

তখন সুন্দরকে দু-চোখ ভরে দেখার জন্য প্রেমিকার আকুলতা নিঃশেষে ঝরে পড়ে। প্রিয়তমা তার প্রিয়তমের প্রতি আকর্ষণকে কখনোও চাঁদ-চকোরিনী, কখনও সূর্য-সূর্যমুখীর উপমায় রঞ্জিত করে। প্রতিটি উপমার মধ্যেই সুন্দরকে দেখার নিষ্পাপ দৃষ্টিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নজরুল সংগীতের স্থায়ীভাব হল প্রেম। কবি দৈহিক প্রেমে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু প্রেমের সৌন্দর্যটুকুই সেখানে মুখ্য। নারীর এই প্রেম রোমান্টিক কবির জীবনে বারবার এসেছিল। কিন্তু সেই প্রেম মিলনে সার্থক না হয়ে বারবারই কবির মনে দিয়েছে বিরহের বেদনা। এই বিরহই কবি নজরুলের রোমান্টিকতার মূল সুর বা বৈশিষ্ট্য। কবির কণ্ঠে শোনা গেছে বিরহের গভীর রাগিণীযে বিরহের আর্তি মর্মরিত হতে শোনা গেছে তাঁর অগণিত প্রেমসংগীতে। দেহকে নিয়েই তাঁর দেহাতীতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা তাঁর কাব্য ও সংগীতের সুরে ধ্বনিত হতে শোনা গেছে বিভিন্ন সময়। কবি নজরুলের প্রেমের কবিতা ও গান যৌবনের অনন্ত প্রেমতৃষ্ণা মেটাবার সাধনা। এই নারীর প্রেম নিয়ে কবির মনে এসেছে কখন সংশয়—কখন দ্বিধা আবার কখন নিদারুণ অভিমান। প্রত্যাখ্যানের নিবিড় বিরহ বেদনা জড়িত সুর বারবার বেজেছে তাঁর প্রেমসংগীতে—"নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে।" এই রাগাশ্রয়ী প্রেম সংগীতটিতে প্রিয় বিচ্ছেদের করুণ একটি চিত্র রচিত হয়েছে। প্রিয়ার মনের চাঞ্চল্য বেহাগ রাগের চলনে অভিনব ভাবে ফুটে উঠেছে এই গানটিতে। বিশুদ্ধ রাগরূপ গানটির সুরের চলনে সঠিকভাবে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে

তিনি তার সাংগীতিক চেতনারই পরিচয় প্রদান করেছেন এবং গানের ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে সুরপ্রণয়ন করেছেন। কবি নজরুলের কীর্তন বিষয়ক গানে কবির প্রেমিক হৃদয়ের উন্মেষ হয়েছে যা রূপের সৌন্দর্যে এবং রসের অনুভূতিতে মাধুর্যমণ্ডিত। কবি তাই সার্থক বৈষ্ণবের মতো গাইতে পারলেন: 'এস হৃদি রাস মন্দিরে এস হে রাসবিহারী কালা'কবির হৃদয়ের এই বৈষ্ণব প্রেমভাব ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হল নানা কীর্তন বিষয়ক গানের মাধ্যমে। যখন নজরুল তাঁর কীর্তন প্রকৃতির গান সংগঠন করতে আরম্ভ করেন তখন কলকাতার সম্ভ্রান্তদের মধ্যে পদাবলী-কীর্তনের প্রচলন ছিল। কিন্তু সমাজের বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যময় এই সংস্কৃতির প্রবাহ প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। প্রেমিক-কবি এই বৃহত্তর জনসাধারণের কথা ভেবেই সহজ-সরল কীর্তন সংগঠন করার কথা ভাবলেন যাতে সর্বসাধারণের মধ্যে বাংলার হারিয়ে যাওয়া নিজস্ব স্বকীয় সংগীতধারা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। নজরুল একদিকে যেমন কিছু কীর্তন গান সংগঠন করেছেন, তেমনি আবার পদাবলী-কীর্তনের ভাবাশ্রিত কীর্তন গানও সংগঠন করেন বেশ কিছু। এ ছাড়াও কীর্তন ভাঙা সুরও তিনি তাঁর অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের গানে ব্যবহার করেছেন।

প্রেমের এক রূপ 'পূজা'। এই রূপের মাধুর্য তাঁর ভক্তিরচনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর ভক্তিগীতিগুলিতে একদিকে যেমন আল্লার প্রভাব লক্ষ করা যায় অন্যদিকে তেমনি ঈশ্বরের প্রভাবও লক্ষণীয়। ইসলামি সংগীতগুলিতে যেমন 'আল্লা'র আহ্বানবাণী প্রকাশিত তেমনি অপরদিকে অন্য ভক্তিগীতিগুলিতে 'কালী', 'কৃষ্ণ', 'শিব', 'উমা' আরাধনার মূল বিষয় রূপে চিহ্নিত। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি সংগীতের কথা বলা যায়-'সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ','কালো মেয়ের পায়ের তলায়', 'মম মধুর মিনতি শোন ঘনশ্যাম', 'আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে'।

বিশ শতকের (১৯২৫-২৬) মাঝামাঝি সময় থেকে কবি নজরুল গজল রচনা শুরু করেন। গজল গানের মূল ভাব মূলত শৃঙ্গার রসভিত্তিক—

> গজল রীতির গীতগুলির মূল বৈশিষ্ট্য হলো শ্যের" বা 'শেয়র'-অংশ। গীতগুলির এই 'শেয়র' অংশটি তাল ছাড়া ভঙ্গিমায় শুধুমাত্র সুরসহযোগে বলা হয় এবং তালবিহীন ছন্দে গাওয়ার পর পুনরায় তালযুক্ত অংশে ফিরে যাওয়া হয় পরবর্তী স্তবকের মাধ্যমে। এই 'শেয়র' কথাটি সম্ভবত উর্দু শব্দ 'শায়র' (কবি) বা শায়রী (কবিতা) থেকে উৎপন্ন শব্দবিশেষ।[৩]

তিনি বাংলা গজলে যথার্থ সৌন্দর্য সৃজন করতে পেরেছিলেন তাঁর আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে। হাফিজের কাব্যের মর্ম তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এ ছাড়াও হিন্দুস্থানী (উর্দু) বহু গজল তিনি বিভিন্ন সময় সংগ্রহ করেছিলেন। যখন তিনি সক্রিয়ভাবে সংগীত জগতে প্রবেশ করেন তখন আমরা জানি অনুসন্ধিৎসু কবি ব্যক্তিগতভাবে নানা জনের কাছ থেকে এবং ওস্তাদগণের কাছ থেকে উর্দু গজলের সংগ্রহ কার্য এবং তালিম অব্যাহত রেখেছিলেন। যে উর্দু গজলের বিকাশ ও অগ্রগতি পারসিক গজলের ভাবকে অবলম্বন এবং রাগসংগীতের সুরকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। উপরিউক্ত উভয় ধারার গজলের আদর্শে ও ঐতিহ্যেই নজরুল তাঁর সৃজনী বৈশিষ্ট্যে গজল গানের ধারাটিকে নির্মাণ করে নেন যার সুর ও কাব্য বৈশিষ্ট্য একান্তভাবেই বাংলা কাব্যগীতির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে বলা যায়।

নজরুলের গজলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে রচিত পারস্য গজলের অনুবাদ সম্বলিত গানগুলি এবং পারসিক গজলের বিষয় ও অনুষঙ্গাশ্রিত গানগুলির কথা আসে। আর দ্বিতীয় ভাগে কবির গজলগুলি হল 'রূপ-রস'-এর দিকদিয়ে সম্পূর্ণভাবে বাংলা গজল।

প্রথম ভাগের প্রথম পর্যায়ের কয়েকটি গজলের উদাহরণ—

১. তরুণ প্রেমিক প্রণয় বেদন... (ভৈরবী-কাওয়ালী)।

২. তোমার আঁখির কসম সাকী.. (পিলু—মিশ্র কার্ফা)

দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে নজরুলের যে গজলগুলি রয়েছে সেগুলির সংখ্যাই বেশি। রূপে, রসে, অনুষঙ্গে এবং বর্ণনায় যেগুলোকে সম্পূর্ণ এক নতুন স্বাদ ও রুচির বাংলা গজল গান বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ—'এ আঁখি জল মোছ পিয়া, ভোল ভোল আমারে' (ভৈরবী-কাওয়ালী); 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে' (ইমন-মিশ্র-কার্ফা); 'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর' (ভৈরবী-দাদরা)। গজলের মধ্যে নজরুল নানাপ্রকার রাগ-রাগিণীর অবতারণা করেছেন, মূল কাঠামো ও রাগ-রাগিণীকে বজায় রেখে তিনি ঠুংরী ও দাদরা আঙ্গিকেও অনেক গজল রচনা করেছেন। যেমন—'উচাটন মন ঘরে রয়না', 'চেয়োনা সুনয়না', 'না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়', 'আধো আধো বোল লাজে বাধ বাধ বোল' ইত্যাদি গানগুলির সুরমাধুর্য সহজেই হৃদয়-মনকে দোলা দেয়। ভারতীয় সংগীতের অন্তর্গত পরবর্তী বিষয়টিই হল 'খেয়াল' যা নজরুলগীতিকে প্রভাবিত করেছে অনেকাংশে। 'বাংলা খেয়াল' পর্যায়ের নজরুলগীতির উদাহরণ—'মেঘ মেদুর বরষায় কোথা তুমি' (রাগ-জয়জয়ন্তী) গানটি জয়জয়ন্তীর মূল বন্দিশের সুরে রচিত এবং খেয়ালের দুটি স্তবক (স্থায়ী ও অন্তরা) এর ন্যায় গানটিতেও দুটি স্তবক রয়েছে।

মূল বন্দিশ

স্থায়ী : মোরে মন্দির আবলো নহী আয়ে,
কা এ্যায়সী ভুল ভয়ি মোসে আলি।।

অন্তরা : প্রেম পিয়াকো অঁখিয়া তরস গয়িকিন সোতন বিরমায়ি।।

মূল বন্দিশ 'মোরে মন্দির আবলো নেহী আয়ে' এর সুরাশ্রিত সৃষ্টি 'মেঘ মেদুর বর্ষায়' নজরুলগীতিটি। তাই নজরুলের সৃষ্টি হলেও একে বাংলা খেয়াল বলা যেতে পারে। কবি তাঁর আপন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জনগণের সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্র রচনায় বদ্ধপরিকর ছিলেন বলেই জীবনহারা সব অসুন্দরকে দূর করে নতুন সৃজন ছন্দের গতিশীল স্বীয় শৈল্পিক সাধনাকে নিমগ্ন রেখেছিলেন। যে শিল্পকর্মের সৎ প্রচেষ্টায় ভয়ঙ্করের বেশে কবির মানস সুন্দরের প্রকাশ হয়েছে নানা রূপে ও রসে। অভয় মন্ত্র উচ্চারণ করে কবি তাই তাঁর দেশপ্রেমের গানে নির্ভয়াবেগ কণ্ঠে গাইতে পেরেছেন প্রাণমাতানো গান, যে গান দিয়ে তিনি জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত সবকিছুকে যেমন সংহার করেছেন তেমনি যা কিছু প্রাণবন্ততাকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন—

ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির সুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।[৪]

দেশপ্রেমিক নজরুলের কাছে জন্মভূমি তাঁর মাতৃসমা। স্বদেশ প্রেমের গানে কবি তাঁর পূর্বসূরীদের মতো দেশবাসীকে কখন দেশের পূর্ব গৌরব ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কর্মে অনুপ্রাণিত করার জন্য, কখনও বাংলার নিসর্গ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ভূ-প্রকৃতির তাৎপর্য বিধৃত করেছেন, কখনও কোনো গানে বাংলার খাঁটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের প্রতি মমত্ব প্রকাশ করেছেন, কখনো কোনো গানে অকৃত্রিমভাবে চিত্রিত হয়েছে মাতৃভূমির প্রতি কবির আন্তরিক ভালোবাসা ও আনুগত্য। গীতিকার অনেকেই থাকেন, গান রচনা করার শক্তিও অনেকের আছে, কিন্তু নজরুলের মতো সৃজনীশক্তি অপর কারোর মধ্যে দেখা যায় না। আধুনিক বাংলা গানের

বৈশিষ্ট্য হল, কথার প্রাধান্য, মিশ্র রাগ, সাধারণের উপযোগী সুর ও তালের উপযোগী কথা নজরুলের হাতেই এগুলি প্রথম সার্থকতা লাভ করে। তিনিই প্রথম নানা রাগরাগিণীর মিশ্রণে যুগের উপযোগী করে নতুন নতুন সুরে গান রচনা করেন। নজরুলের কৃতিত্ব হচ্ছে রাগমিশ্রণে আর রাগের ভাঙা-গড়ার ব্যাপারে। একটি গানকে একটি রাগে না বেঁধে একটি শুদ্ধরাগের কাঠামোর মধ্যে অন্য রাগের সুরকে স্থান দিয়েছেন তিনি। যেমন—ধ্রুপদের মধ্যে মালকোষ রাগে 'গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু', তোড়ি রাগে 'আমি ছন্দভুল চির-সুন্দরের নাটনৃত্যে গো' প্রভৃতি; খেয়ালের মধ্যে দরবারি কানাড়ায় 'আজি ঘুম নহে, নিশি জাগরণ, ইমন কল্যাণে 'পথের দেখা এ নহে বন্ধু' ইত্যাদি। এই রাগরাগিনীর সংমিশ্রণে যে কেবল সুরের অপূর্বতা প্রকাশ পেয়েছে বা নজরুল গীতির প্রাণ-শক্তি উপচিত হয়েছে তা নয়, এর উদ্ভাবনী শক্তি প্রতিপন্ন করেছে নজরুলের অপরিমেয় বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব। সুরের সন্ধানে নজরুল এভাবে নব নব মৌলিক সুর সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বাংলা গানের জগতে তাঁর অবদান তাই আজ নতুন করে ভাবতে হবে। ১৯৩৮ সালে জনসাহিত্য সংসদের ভাষণে তিনি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, "সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই তবে এইটুকু মনে আছে, সংগীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি। সংগীতে যা দিয়েছি সে সম্বন্ধে আজ কোনও আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে তখন আমার কথা সবাই মনে করবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।"[৬]

উৎসের সন্ধানে

১. অমিতাভ চৌধুরী সম্পাদিত : 'সেকালের অগ্নিবীণা : একালের কণ্ঠস্বর', নবীন সংজ্ঞায় নব নজরুল, দেশ, ১২জুন ১৯৯৯, পৃ. ৬৫
২. কল্পতরু সেনগুপ্ত সম্পাদিত : 'নজরুলগীতি সহায়িকা', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৭, পৃ. ২৩৫
৩. সুমনা রায় : 'দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল সুরস্রষ্টা হিসেবে তুলনামূলক পর্যালোচনা', পূর্ব সিথি নাট্যসৃজনী, কলকাতা, সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১৯
৪. কাজী নজরুল ইসলাম : 'প্রলয়োল্লাস', "অগ্নিবীণা", আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, কার্তিক ১৩২৯
৫. উৎস-১, পৃ. ৬৭
৬. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : 'সঙ্গীতে সাহিত্য', রসভাবনা ও সুন্দর, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৯

তথ্যের সন্ধানে

১. অরুণকুমার বসু : 'নজরুল জীবনী', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০
২. উৎপলা গোস্বামী : 'বাংলা গানের বিবর্তন', দীপায়ন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০০২
৩. ইন্দুভুষণ রায় : 'নজরুলগীতি পরিচয়', আদি নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১১ কার্তিক ১৩৯৬
৪. শফি চাকলাদার : 'সঙ্গীতে নজরুল সঙ্গীত', বইপত্র, বাংলাবাজার ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২

সুকুমার রায়ের ‘আবোল তাবোল’
শতবার্ষিকীর আলোয় ফিরে দেখা
শ্রেয়সী দাস

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সুযোগ্য পুত্র সুকুমার রায়ের জন্ম ১৮৮৭ সালে। মা বিধুমুখীদেবী ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। সুকুমার রায় নামটির সঙ্গে আমাদের ছোটোবেলা জড়িয়ে আছে। ‘আবোল তাবোল’, ‘খাই খাই’, ‘পাগলা দাশু’, ‘হ য ব র ল’ প্রভৃতি হাস্য কৌতুকবহ লঘু চালের লেখা শুধু ছোটোদের মনকেই ভরিয়ে তুলেছে এমন নয় পরিণত মনকেও আনন্দে রেখেছে। মুদ্রণশিল্পের ব্যবহার শেখার জন্য তিনি বিলেত যাত্রা করেন। শিখে আসেন হাফ্‌টোন পদ্ধতি।

১৯১৩ সালের মে মাসে উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায় ‘সন্দেশ’ পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এখানেই সুকুমার রায়ের আঁকা ও লেখার প্রতিভার স্ফুরণ হয়। সুকুমার রায়ের কৌতুকপ্রিয় মজলিশি মেজাজের কথা তাঁর পুত্র সত্যজিৎ-এর লেখা থেকে জানা যায়। ১৯১৪-তে ‘আবোল তাবোল’ শ্রেণির প্রথম ছড়া ‘খিচুড়ি’ প্রকাশিত হয় ‘সন্দেশ’ পত্রিকার পাতায়। ভাষার কারিকুরিতে উদ্ভটদর্শন প্রাণীর আবির্ভাব হল সাহিত্যে। লেখক লিখছেন—

হাঁস ছিল সজারু (ব্যাকরণ মানি না)
হয়ে গেল হাঁসজারু, কেমনে তা জানি না![১]

শুধু উদ্ভট প্রাণীর বর্ণনাই নয় সুকুমার এঁকে দেখিয়ে দিলেন তাদের অদ্ভুত চেহারাও।

‘আবোল তাবোল’ প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩। এই অর্থে ২০২৩ সাল এই গ্রন্থের শতবর্ষ। কিন্তু এই বই তিনি দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর ন’দিন পরে প্রকাশ পায় বইটি। আসলেই সুকুমার রায় নিজের লেখা কোনো বই দেখে যেতে পারেননি। ‘আবোল তাবোল’ তাঁর প্রথম বই। যার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তাঁর নিজেরই করা। ‘আবোল তাবোল’-এর তিন রঙা মলাট, তার

অঙ্গসজ্জা থেকে শুরু করে সমস্তটাই তিনি নিজেই করে গিয়েছিলেন। এই গ্রন্থে ৪৫ টি কবিতা রয়েছে। এই বইটির মধ্যে প্রথম এবং শেষ কবিতার নাম 'আবোল তাবোল'। এ থেকেই বোঝা যায় শুধু নামেই নয়, ভাবেও বইটি আবোল তাবোল। সত্যজিৎ রায় 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র' বই-এর ভূমিকা অংশে লিখে গেছেন সুকুমার রায়ের কলেজ ছাড়ার কিছুদিনের মধ্যেই ননসেন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠার কথা। এই নামের মধ্যে দিয়েই সুকুমার সাহিত্যের মূল ধারাটি কোন্ দিকে প্রবাহিত হবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুকুমার নিজেও লিখেছিলেন—"যাহা আজগুবি যাহা উদ্ভট যাহা অসম্ভব তাহাদের লইয়াই এ পুস্তকের কারবার।" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই বই জনপ্রিয়তা পায়। এক আশ্চর্য জগতকে ছবির মাধ্যমে পরিবেশন কল্পনার ভূমি পার করে বাস্তবের কথাও বলেছে কখনও। শুধু লেখাতেই নয়, অলংকরণও অদ্ভুতভাবে করে গিয়েছেন তিনি। 'আবোল তাবোল'-এর নাম অঙ্কনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় অভিনবত্ব। মই নিয়ে আবোল তাবোল লেখা সাইনবোর্ডটি উঁচু করে লাগানোর প্রাণান্তিক চেষ্টা দৃশ্য আমরা পরিলক্ষিত করতে পারি।

ইউরোপীয় সভ্যতায় যন্ত্রসভ্যতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই 'নন্সেন্স সাহিত্য'র উপযোগিতা তৈরি হয়। 'নন্সেন্স'-এর অর্থ অসংলগ্ন প্রলাপ। নন্সেন্সধর্মী লেখায় বুদ্ধি আর যুক্তির বিন্যাসকে ভেঙে ফেলা হয়। যেখানে অসংগতি এক বিশেষ জগৎ, খুলে দেয় হাসির দরজা। আমাদের মনে রাখতে হবে দুর্বোধ্য বা রূপক ব্যঙ্গাত্মক কবিতা কিন্তু নন্সেন্স কবিতার পর্যায়ে পড়ে না। ইংরাজি সাহিত্যে এডওয়ার্ড লিয়ার এবং বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায় এই ধরনের লেখায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। চেস্টারটন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ—A Defence of Nonsense'-এ অর্থহীনতাকে সাহিত্যের নতুন অর্থ বলে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। নন্সেন্স শুধু খেয়াল খুশি হয়েই থেকে যায়নি, তার মধ্যে রয়েছে বাস্তবতার কিছু সুনির্দিষ্ট বক্তব্য। 'আবোল তাবোল'-কে শুধুমাত্র শিশু সাহিত্য হিসেবে অভিহিত করলে তার অসীমত্বকে খানিকটা ক্ষুণ্ণ করা হয়। কারণ এতে বহুল পরিমাণে শিশুতোষ উপাদান থাকলেও যে ব্যঙ্গ রয়েছে তা অনেকাংশেই বয়স্কদের ও পাঠক গোষ্ঠীকে তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে।

'খিচুড়ি' কবিতায় যেমন আছে অপূর্ব মনোমুগ্ধকর ছন্দ তেমনি আছে জোড় কলম শব্দ। ছড়ায় উদ্ভট ও অর্থহীন শব্দের ব্যবহারে সুকুমার রায়ের জুড়ি নেই। 'গোঁফ চুরি'-র মতো কবিতায় পাঠকের মনে হঠাৎ হাসির উদ্রেক হয় 'গোঁফ গিয়েছে চুরি' শুনলে। সত্যিই তো গোঁফ কি কখনও হারিয়ে যেতে পারে! সে তো নিজস্ব। আয়নার সামনে নিজেকে দেখে তার নিজের গোঁফ পছন্দ হয় না তার কথায় "নোংরা ছাঁটা খ্যাংড়া ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা/এমন গোঁফ রাখতো জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।" বড়োবাবুর রাগের হদিশ কেউ পায় না। গোঁফ যে একজনের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে পারে সে কথাই হয়তো বলতে চেয়ে কবি লিখেছেন—"গোঁফের আমি গোঁফের তুমি তাই দিয়ে যায় চেনা।" এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় বনফুলের লেখা 'আত্মহত্যা' গল্পটির কথা। গল্পটি চন্দ্রমাধবের গল্প। তার গোঁফ ও ছিল তার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু তার পছন্দের মানুষটির বিয়ে হয়ে যাওয়াতে সে এই গোঁফ কেটে দেয়। 'সৎপাত্র' কবিতায় মূল্যায়ন করে ব্যঙ্গের প্রকাশ করেছেন। পাত্র গঙ্গারামকে দেখতে তেমন নয়, উপরন্তু শিক্ষা-দীক্ষা নেই, অসুস্থ শরীর, পরিবারের বাকি মানুষদের অকর্মণ্যতা, দারিদ্র্য সবকিছু থাকা সত্ত্বেও সে উচ্চবংশের বলে তাকে পাত্র করা চলে, সমাজের এই নীতিকে সুকুমার এই কবিতায় ব্যঙ্গ করেছেন।

'ভাল রে ভাল' কবিতায় যে সব কিছুকেই ভালোর দৃষ্টিতে দেখছেন কবি তা জানাতে চান। কিন্তু 'সবার চাইতে ভালো পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়' এই শব্দবন্ধের আক্ষরিক কোনো মানে নেই 'আবোল তাবোল' লেখার মধ্যে এটিও একটি উদাহরণ। 'কুমড়ো পটাশ' কবিতা সম্পূর্ণভাবে হাসির, মজার। কিন্তু এখানে কুমড়ো পটাশের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তা এমনভাবে পাঠকের মনে বসে গেছে যে 'কুমড়ো পটাশ' নাম শুনলেই এই ছবিটি পাঠকের মনে উঠে আসে। 'কিম্ভূত' কবিতায় বা 'ট্যাঁসগরু' কবিতায় অদ্ভুত দর্শন প্রাণীর কথা বলেছেন; বোঝা যায় এই সবই কল্পনা প্রসূত। 'নেড়া বেল তলায় যায় ক'বার'-এ রাজা ইঁটের পাঁজায় বসে ভাবেন নেড়া বেল তলায় যায় ক'বার। কিন্তু তার ইঁটের পাঁজায় বসা, গায়ে গরম জামা, হাঁড়িপানা মুখ সবই হাসির উদ্রেক করে।

'গানের গুঁতো' কবিতায় ভীষ্মলোচনের গান করার নামে চেঁচানোর কথা উল্লেখ করেছেন। তাতে মানুষের প্রাণ যাচ্ছে, মাথা বনবন করছে, জন্তুগুলি চার পা তুলে মূর্ছা যাচ্ছে, গাছের বংশ ধ্বংস হচ্ছে, জলের প্রাণী গভীর জলে চলে যাচ্ছে, পাখি খাচ্ছে ডিগবাজি। অর্থাৎ গায়কের গান শ্রোতার কাছে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। অবশেষে এক পাগলা ছাগলের গুঁতোয় ভীষ্মলোচনের গান থামে। ঠাট্টার ছলে বেসুরো গায়কের গান গাওয়া উচিত নয় একথা বলেছেন।

'শব্দ কল্প দ্রুম' এ শব্দ ও অর্থের ব্যবহারে অসংগতি হাসির উদ্রেক করে। 'বোম্বাগড়ের রাজা' তে অনেক অদ্ভূত বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে—'ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা', 'সর্দি হলে ডিগবাজি খায় লোকে', 'বিছানা পাতে শিরীষ কাগজ দিয়ে', 'কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসী' ইত্যাদি। যার কোনো সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। 'বাবুরাম সাপুড়ে' কবিতায় তৎকালীন রাজনীতির কথা ব্যঙ্গের আকারে বলে গেছেন। তৎকালীন রাজনীতিবিদ্‌দের প্রতি সুকুমার রায়ের যে বিতৃষ্ণা তা কবিতার শেষ লাইনে প্রতিভাত 'তেরে মেরে ডান্ডা করে দিই ঠান্ডা'।

১৯১৯ এর কুখ্যাত রাউলাট আইনের পটভূমিতে 'আহ্লাদী' কবিতায় লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পালের ছায়া খুঁজে পাই। সুকুমার জানান তিনি নরমপন্থার প্রতি খুশি নন তাই সুকুমার চান জাতীয়তাবাদের ভারতজোড়া প্রচার আর তার জন্যই এই তিন নেতার প্রয়োজন। আবার 'একুশে আইন' অবশ্যই প্রতিমুহূর্তে নিষেধের গণ্ডি টেনে চলা আইনকে বিদ্রুপ করেছে। ব্রিটিশ ভারতে ভারতীয় নাগরিকদের যে-কোনো কাজের জন্যই রোষের মুখে যে পড়তে হতো তা স্পস্ট বোঝা যায়। যে সব লোকে পদ্য লেখে/তাদের ধরে খাঁচায় রেখে,/কানের কাছে নানান সুরে/নামতা শোনায় একশো উড়ে,/সামনে রেখে মুদির খাতা—/হিসেব কষায় একুশ পাতা।।[২] এখানে মূলত ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে বিদ্রুপ করেছেন সুকুমার রায়।

'কাঠবুড়ো' কবিতার ব্যাখায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উঠে আসে। কবিতাটি লেখা ১৯১৪ শেষের দিকে। খুব সম্ভব ১৯১৪ বিশ্বযুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ কলোনি থেকে যে সৈন্য সংগ্রহ চলেছিল তাতে বাঙালিরা ভীতু বলে তাদের নেওয়া হয়নি। এই বিভাজন নীতিকে ব্যঙ্গ করেছেন। 'কোন কাঠ টিমটিমে কোনটা বা জ্যান্ত' এই শ্লেষ প্রযুক্ত হয়েছে ব্রিটিশদের প্রতি।

শুধু হাসি মজা ব্যঙ্গই নয়, 'আবোল তাবোল'র কবিতায় পাওয়া যায় বিজ্ঞান চেতনাও। 'হাতুড়ে' কবিতার ডাক্তার 'কাটা ছেঁড়া ভাঙা চেরা' সবকিছুর নিরাময় জানেন। কান কটকট, সর্দি, দাঁতের ব্যথা সব রোগই হাতুড়ের কেরামতিতে কুপোকাত। 'ছায়াবাজি' কবিতাতেও ওষুধের কেরামতি। সুকুমারের মন আসলে সর্বদাই কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে সজাগ। আর তাই খেয়াল খুশির দুনিয়া হলেও 'আবোল তাবোল'-এর জগত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায়ও পুষ্ট হয়েছে।

'গন্ধবিচার' কবিতায় লক্ষ করা যায় এক রাজার অদ্ভুত খেয়ালের চিত্র। রাজসভায় মন্ত্রী তার জামায় এক প্রকার গন্ধ লাগিয়ে এসেছেন সেটি রাজা বুঝতে পেরেও তার গন্ধ বিচারে বড়োই আগ্রহ। কিন্তু যে গুণে তিনি রাজসভার রাজা হয়েছেন তার সেই গুণ মন্ত্রীর জামার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গন্ধের ভালো-মন্দ বিচারে অক্ষম, তাই নিজের কৌতূহল মেটানোর জন্য বদ্যি-পাত্র-মিত্র-কোটাল-পালোয়ান এমনকি নিজের আত্মীয়কেও ডেকে পাঠান। কিন্তু তাতে সকলেই মিথ্যা অজুহাতে এড়িয়ে যায়। কাজ না হওয়ায় নব্বই বছরের বৃদ্ধ নাজিরকেও ছাড়েন না। সে অবশেষে গন্ধবিচারে রাজি হয়। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য হলে লেখকের সমাজের প্রতি কিছু দায় রয়ে যায়। তাই সুকুমার রায়ও সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। 'গন্ধবিচার' কবিতার মজার আড়ালে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন শাসকের প্রতি সাধারণ মানুষের ভয় যা প্রতিবাদের কণ্ঠকে চেপে ধরে। সাধারণ মানুষ ভয় পায় শাসকের সামনে সত্যি কথা তুলে ধরতে। যাতে আগামী প্রজন্ম এই ভয় না পায় সেই কারণেই কবি এখানে হাস্যচ্ছলে অনেক বড়ো শিক্ষা দিয়েছেন। যদিও এই মানে বোঝা শিশুদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়; আর এখানেই 'আবোল তাবোল' আর শুধু শিশুদের জন্য থাকে না। বয়সের বেড়াজাল টপকে হয়ে ওঠে সর্বজনের সব বয়সের।

এবার আসা যাক নাম কবিতা 'আবোল তাবোল' কবিতায়। 'আবোল তাবোল' নামের মোট তিনটি কবিতা পাওয়া যায়। তার মধ্যে দুটি 'আবোল তাবোল' গ্রন্থের প্রথম ও শেষ কবিতা। প্রথম কবিতায় কবি 'আবোল তাবোল' গ্রন্থের মূল সুরটি বেঁধে দিয়েছেন। শিশুদের জন্য যে গ্রন্থটি রচনা করছেন সে কথাটাও জানিয়ে দিয়েছেন। এক শিশুর আবোল তাবোলের যেমন মানে হয় না একজন শিশু যেভাবে হাসতে পারে সেভাবে হয়তো আর কোনো মানুষ হাসতে পারে না। এই কথা মাথায় রেখেই তিনি লিখেছিলেন—আরে ভোলা খেয়াল-খোলা /স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়, /আয় রে পাগল আবোল তাবোল/মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।[৩]

নিজেকে তিনি ক্ষ্যাপা, পাগল, বেয়াড়া, সৃষ্টিছাড়া বলে উল্লেখ করেছেন এই কবিতায়। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন ক্ষ্যাপার মন বাঁধন খুলে নিয়মহীন হিসাবহীন হয়ে বেঠিক বেতাল হয়ে চলেছে। ছন্দের অনুরণন প্রত্যেক পাঠক মনকে ছুঁয়ে গেছে।

শেষ কবিতা রচনার সময় সুকুমার রায় রোগশয্যায়। মৃত্যুর দিন গুণছেন। তাও শরীর মনে তখনও তিনি মজায় রঙ্গে মাতোয়ারা। তিনি তার আসন্ন মৃত্যুর কথা লিখে গেছেন আপন রসিকতার ঢঙে—আদিম কালের চাঁদিম হিম/তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম/ ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর/গানের পালা সাঙ্গ মোর।[৪] ঘোড়ার ডিম বলে তো কিছু হয় না তবু নিজের জীবনকে কল্পনার হাতে সঁপে দিয়েও বলে গেছেন দিন ঘনিয়ে আসার কথা। এই রসিকতা সুকুমার রায় ছাড়া আর কেউ করতে পারতেন না। এটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

বুদ্ধদেব বসু 'কবি সুকুমার রায়' প্রবন্ধে 'আবোল তাবোল' এর ছড়াগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণিতে রেখেছেন human experience exaggerated ছড়া—'কাতুকুতু বুড়ো', 'গানের গুঁতো', 'চোর ধরা', 'কাঠবুড়ো', 'সাবধান', 'বুঝিয়ে বলা', 'ডানপিটে', 'কাঁদুনে' ইত্যাদি ছড়া। দ্বিতীয় শ্রেণিতে রেখেছেন আজগুবি শ্রেণির ছড়া 'খিচুড়ি', 'কুমড়োপটাশ', 'ট্যাঁশগরু', 'ভয় পেয়ো না' প্রভৃতি ছড়া। আর তৃতীয় শ্রেণিতে রেখেছেন ব্যঙ্গাত্মক ছড়া 'সৎপাত্র', 'রামগরুরের ছানা', 'নারদ নারদ', 'একুশে আইন', 'হাতুড়ে' প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'ঘরের পড়া' প্রবন্ধে বলেছিলেন—"ছেলেরা যে-বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না,

এইরূপ বিধান থাকা চাই।"[৫] শিশু-সাহিত্য শিশু মনের কল্পনার পরিধিকে বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' এই কাজ সফল ভাবে করেছে, খেয়াল খুশির পৃথিবীতে উড়তে দিয়েছে ছোট্ট শিশুমনকে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এত বছর পরেও আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে এই গ্রন্থের গুরুত্ব কতখানি? এই প্রশ্ন মাথায় আসে বারবার। গোটা দুনিয়া দুটি বছর ধরে মহামারীকালে অনেকে হারিয়েছে অনেককিছু। বর্তমান যে তার প্রভাব মুক্ত একথা বলা যায় না। এক একটা পরিবার সেঁধিয়ে গিয়েছিল চার দেওয়ালের মধ্যে। এর ফলে নিউক্লিয়ার পরিবারের ক্ষেত্রে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ছোটো ছোটো শিশুরা। শুধু তাই নয় আজকের দিনে মোবাইলের গেম খেলার পরিমাণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। একটি বাচ্চাকে বসিয়ে রাখতে হচ্ছে হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে। চারপাশের মানুষজন থেকে সে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। শিশু হারাচ্ছে তার অমূল্য শৈশব শিশুমনটা নষ্ট হওয়ার কারণে। একটা শিশুর বড়ো হওয়ার পিছনে সবথেকে যেটা বেশি প্রয়োজন। একটা বাচ্চার মনকে শিশুসুলভ করতে সক্ষমতা রাখে বই। আবোল তাবোল ভাবনা, বিস্ময়বোধ, প্রশ্নের সঙ্গে মনের মধ্যে মজার খোরাক যোগাতে পারে এই বই। তাই বিশেষভাবে মোবাইল, ইলেকট্রনিক গেজেটের পরিবর্তে এই বইগুলির গুরুত্ব বেশি বলে মনে করি।

উৎসের সন্ধানে

১. সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু সম্পাদিত : 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র' জন্মশতবার্ষিকী সংকলন, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, জুলাই ২০১৬, পৃ. ২
২. তদেব : পৃ. ২১
৩. তদেব : পৃ. ১
৪. তদেব : পৃ. ৪০
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: 'জীবনস্মৃতি', বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২১, পৃ. ৭০

তথ্যের সন্ধানে

১. সুশীল সাহা সম্পাদিত : 'শিশু কিশোর সাহিত্য', বিবস্বান দত্ত লিখিত "একটি 'আবোল তাবোল' পাঠ", দিয়া পাবলিকেশন, ডিসেম্বর, ২০২১
২. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : 'সাহিত্য সমালোচনার রূপ-রীতি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২১
৩. শান্তনু চক্রবর্তী সম্পাদিত : বৈতালিক' পত্রিকা, কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী লিখিত "সুকুমারের আবোল তাবোল", চুঁচুড়া, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২

সুকুমার রায়ের সাহিত্য : খেয়ালী কল্পনা ও ব্যঙ্গচিত্রের খতিয়ান

সোনালি গোস্বামী

সুকুমার রায়ের প্রতিভার কথা স্মরণ করতে গেলে বারবার একটা তুলনাই মনে আসে। তাঁর প্রতিভা হল বিদ্যুতের তীব্র আলোক ছটার মতো, অতি অল্প সময়ের জন্য প্রতিভাত হলেও যার জ্যোতিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায় সবার। হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে চিত্ত ঝলমল করে ওঠে। ক্ষণজন্মা এই অনতিক্রম্য প্রতিভার মানুষটি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের নয় কেবল, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। তাঁর সাহিত্য, জীবনের চাপে ও তাপে 'হোঁৎকা' হয়ে ওঠা আপামর বাঙালির হৃদয়ের আলোকিত বারান্দা। আর রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, প্রচার ও প্রতিযোগিতার চাপে হাঁসফাঁস করা ছোটোদের কাছে তিনি যেন এক চিলতে উন্মুক্ত সবুজ মাঠ, যেন সাক্ষাৎ মুক্তিদূত।

বাংলা প্রাইমারের গণ্ডি অতিক্রম করে নীতিশিক্ষাধর্মী বাংলা শিশুসাহিত্য আপন গরিমা লাভ করল উনিশ শতকের শেষার্ধে। যে সকল মনীষীর নিরলস সাধনায় বাংলা শিশুসাহিত্য শ্রী ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণরূপ লাভ করল তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপেন্দ্রকিশোরকে বাংলা শিশুসাহিত্যের আদিপুরুষ তথা 'শিশুসাহিত্যের ভগীরথ' বলেছেন। বাংলা শিশুসাহিত্যকে উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দান করলেন অপূর্ব এক স্বকীয়তা আর বৈচিত্র্য। সুকুমার রায় তাকে দিলেন ঐশ্বর্যরূপ। বাংলা শিশুসাহিত্যের ধ্রুবতারা সুকুমার রায়। তাঁকে কেন্দ্র করেই শিশুসাহিত্যের যুগ বিভাজনও চলতে পারে। প্রাকসুকুমার পর্ব, সুকুমার সমসাময়িক পর্যায় ও সুকুমার উত্তর পর্যায়—এইভাবে। বাংলা শিশুসাহিত্য তাঁর হাতেই প্রথম সাবালকত্ব অর্জন করল। সুকুমার রায় শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাসের অংশমাত্র নন বরং বলা ভালো তিনি নিজেই ছিলেন এক উজ্জ্বল স্বতন্ত্র ইতিহাস।

উপেন্দ্রকিশোর ও বিধুমুখীর পুত্র সুকুমার, পিতার সাধনাকে বাস্তবায়িত করতে, শিশুসাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। বাংলা শিশুসাহিত্য তাঁর হাতেই চিরায়ত রূপকথা, উপকথার রহস্য-রোমাঞ্চকে অতিক্রম করে পেয়ে যায় স্বতন্ত্র এক আজব-জগৎ। যেখানে অসম্ভব সব কাজের মধ্যেও দেখা যায় আশ্চর্য সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত। হাসি, মজা আর কৌতুকের অপূর্ব পরিবেশনে তিনি মাতিয়ে তুলেছিলেন বাংলার শৈশব-কৈশোর।

শিশু সাহিত্যে রায়চৌধুরী পরিবারের অবদান ও উত্তরাধিকারের দাবিকে স্বীকার করে নিতে বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা'য় উল্লিখিত 'কৌষীতকি' বা 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ'-এর 'পিতাপুত্রীয় সম্প্রত্তি' ধারণার প্রকাশিত তথ্যটি উল্লেখের দাবি রাখে। এই 'পিতাপুত্রীয় সম্প্রত্তি'র (তথা মৃত্যুর প্রাকলগ্নে পিতৃপ্রদত্ত বাক, চক্ষু, শ্রুতি,...পর্যায়ক্রমে মান, কাম, কর্ম, দুঃখ, অন্ন, প্রজ্ঞা পর্যন্ত পুত্র কর্তৃক ধারণ) সর্বোত্তম প্রকাশ আমরা পাই ১০০ নম্বর গড়পার রোডের রায়চৌধুরী তথা রায়বাড়িতে। যেখানে উপেন্দ্রকিশোরের রিকথ বহন করেছেন সুকুমার। আর ততোধিক সুকুমারের 'বাক, 'মান', 'প্রান' বহন করেছেন তাঁর পুত্র সত্যজিৎ। যদিও মাত্র আড়াই বছর বয়সে সত্যজিৎ তথা মানিক, হারিয়েছিলেন তাঁর বাবাকে। তিনি পিতাকে অনুভব করেছিলেন পিতার মৃত্যু পরবর্তী সাহিত্য দিয়েই—

> আমার বাবার যখন মৃত্যু হয়, তখন আমার বয়স আড়াই বছর। সুতরাং আত্মীয়তাসূত্রে একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের যে-পরিচয় হয় আমার সঙ্গে আমার বাবার সেরকম পরিচয় হবার কোনো সুযোগ হয়নি। আমি তাকে চিনেছি তাঁর লেখা ও আঁকার মধ্য দিয়ে।[১]

শিশু সাহিত্যে সুকুমারের কৃতিত্ব 'ননসেন্স সাহিত্য' বা উদ্ভট সাহিত্যের অবতারণায়। এক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্য বরাবর তুলনীয় এডওয়ার্ড লিয়রের লিমেরিক গুচ্ছ এবং লুইস ক্যারলের 'অ্যালিসে'র স্বপ্নালোকিত অদ্ভুত, অবৈধ, অসামাজিক উল্টো নিয়মের সঙ্গে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, কী এই 'নসেন্স'! আসল কথা হল এই যে, ননসেন্স মানেই তা যেমন 'নেতি' নয়, তেমনি তা একেবারেই নির্থক বা অর্থহীনও নয়। শিশুর অর্থহীন প্রলাপ আর নন্‌সেন্স ছড়াকে কি আমরা এক বলতে পারি! যদিও ইংরেজি ডিকশনারী ননসেন্সকে, অ্যাবসার্ড বা অর্থহীনের সমার্থক করেছে, তবুও সদর্থক রূপে দেখলে বোঝা যায় এর সব থেকে দরকারি অঙ্গ হল এর নিখাদ ভাবটি। ননসেন্স মানেই যে তা কেবল শিশুপাঠ্য নয়, একথা পণ্ডিতমহলে স্বীকৃতি পেয়েছে বহু আগেই। এটি হল আপাত অর্থহীনতার অন্তরালে এক বৃহত্তর অর্থের দ্যোতনা। এলিয়টের মতে, অর্থের শূন্যতা নয়, অর্থের প্যারডি হল ননসেন্স। মোটকথা ননসেন্স হল, সরলদৃষ্ট একটি জটিল শিল্পকলা। আসলে ননসেন্স ছিল আধুনিক সমীকরণের বিরুদ্ধে তির্যক বিদ্রোহ ঘোষণা। সুকুমারের সাহিত্যের মূলমন্ত্রও তাই। তাঁর ব্যাঙ্গের তীর ছিল তথাকথিত সামাজিক প্রেক্ষিত ও ব্যক্তি মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা। কিন্তু ব্যাঙ্গের তীক্ষ্ণ জ্বালাটি সহজে চাক্ষুষ হয় না, কারণ প্রকাশটি তার হাস্য—পরিহাসের ছলে। ক্যারল ও লিয়রের মতোই সুকুমারের ছিল, 'লজিক নিষ্ঠ মনের সঙ্গে খামখেয়ালী মেজাজ'। প্রাথমিকভাবে যা অর্থহীন, যা যুক্তিগ্রাহ্য অর্থ বহন করে না তাই হল 'ননসেন্স, বা সুকুমার কথিত 'খেয়ালরস'। ভিক্টোরিয় যুগে এই ননসেন্স সাহিত্যের অনেক নিন্দে শোনা গেল। অথচ ওই যুগে বসেই 'ননসেন্স' সাহিত্যের মরালগীত গিয়েছিলেন চেস্টার্টন। বুদ্ধদেব বসু চেস্টার্টনের সঙ্গেই সুকুমারকে একাসনে বসানোর পক্ষপাতী। তাঁর মতে—"তিনি ছিলেন অনেকটা চেস্টর্টনের মতো একাধারে ঠাট্টায় আর আজগুবিত্বে স্বভাবসিদ্ধ, ক্যারলের মতো, লিয়রের মতো বিশুদ্ধভাবে

অদ্ভুতরসের পূজারী ছিলেন না।"[২] কারণ তাঁর লেখায় কেবলমাত্র উদ্ভট ভাবনার প্রকাশ নেই, তার সঙ্গো আছে ব্যাঙ্গোর তীক্ষ্ণ কষাঘাতও। যার সাহায্যে তিনি বাঙালিদের নিজেদের বেদনাদায়ক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছেন। আসলে তাঁর খেয়ালরসের লক্ষ্য গোপনে লক্ষ্যভেদেই। অন্যদিকে স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া ব্যঙ্গ রচনা হয় না। তবে তাঁর 'সৎপাত্র', 'নারদ-নারদ', 'গোঁফচুরি' প্রভৃতি রচনায় যেমন ব্যঙ্গোর লক্ষ্যটি ছিল সুস্পষ্ট, তেমনি অন্যপর্যায়ে আছে তাঁর খেয়ালি কল্পনার সুনিপুণ প্রয়োগ। 'ট্যাঁশগরু', 'খিচুড়ি', 'কুমড়োপটাশ', 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা' প্রভৃতিতে তার সার্থক প্রকাশ। সুকুমারের সাহিত্যের প্রকাশ বহুবর্ণের বিচ্ছুরণে। শুধু সাহিত্যে নয় তিনি তাঁর পিতার মতোই ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞানী ও লেখক। জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রই জানেন ছবির রাজ্যে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার কথা। সাহিত্যে ছবির সংযোজনে আগ্রহ ও আকর্ষণ তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল পিতৃসূত্রেই। বৃহত্তর সাহিত্যক্ষেত্রে আগে লিপি না আগে চিত্র এ নিয়ে সংশয় বা বিরোধের স্থান থাকলেও শিশুর মনে যে বর্ণের আগে চিত্রের প্রাধান্য এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শিশুকুলের কাছে বর্ণবোধের বহু পূর্বেই তার মধ্যে প্রাধান্য পায় ছবি। একটা শিশু যখন 'বর্ণপরিচয়ে'র পাঠ নিচ্ছে তখন বর্ণ পরিচয়ের প্রাক্কালে সে বর্ণবোধের সঙ্গো সেভাবে পরিচিত নয়। সে প্রথম পরিচিত হচ্ছে বর্ণবোধক ছবির সাথে। ছবি দেখেই শিশু শেখে। বর্ণ শেখার সময়ও বর্ণের সঙ্গো ছবি নয়, ছবির সঙ্গো বর্ণকে মেলাতে থাকে। অর্থাৎ ছবি সেখানে হয়ে ওঠে বর্ণের আধার। অর্থাৎ বর্ণ বা শব্দ ছবিকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হচ্ছে। উল্টোদিকে শিশুমনে শব্দের প্রতি একটা কৌতূহল জাগিয়ে দেয় ছবি। ছোটোদের সাহিত্যে গল্প-কবিতার পাশাপাশি ছবির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছোটোবেলা থেকেই এই বোধ সঞ্চারিত হয়েছিল রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। লীলা মজুমদারও ছোটোবেলায় ভাই বোনেদের গল্প বলতেন উপযুক্ত ছবি এঁকে। আর সুকুমারের বোন পুণ্যলতা চক্রবর্তীও বড়োদা সুকুমারের গল্প বলার প্রসঙ্গো তাঁর 'ছেলেবেলার দিনগুলি'তে বলেছেন—

> বইয়ের গল্প ছাড়াও নিজের মনগড়া কত অদ্ভুত জীবের গল্প-মোটা 'ভবন্দোলা' কেমন দুলে দুলে থপথপিয়ে চলে, 'মন্তুপাইন' তার সরু সরু লম্বা গলাটা কেমন পেঁচিয়ে গিঁট পাকিয়ে রাখে, গোলমুখো ড্যাবাচোখো 'কোম্পু' অন্ধকার বারান্দার কোণে, দেয়ালের পেরেকে বাদুরের মতো ঝুলে থাকে। এখন যেমন তোমরা 'কুমড়োপটাশ', 'রামগরুড়', 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা'-এদের গল্প শুনে আমোদ পাও আমরাও তখন ওইসব অদ্ভুত জীবের গল্প শুনে আমোদ পেতাম।[৩]

এইসব অদ্ভুত জীবের বিচরণ স্থল তাঁর সাহিত্য আঙিনা। যে আঙিনা জুড়ে 'হাঁসজারু', 'হাতিমি', 'গিরগিটিয়া, হুঁকোমুখো হ্যাংলা' দের স্বাধীন চলাফেরা। সাহিত্যক্ষেত্রে সুকুমারের বড়ো অবদান কৌতুককে সাহিত্যের আসরে মর্যাদা দান করায়। সাহিত্যে রসের আসরে কৌতুক যেন একটু ব্রাত্য। সুকুমার তাঁর উদ্ভট খেয়ালরসের দুনিয়ায় মাধ্যম বানালেন কৌতুককেই। ছড়ার দুনিয়া মূলত 'ননসেন্সের দুনিয়া'। ননসেন্সের সুর পাওয়া গিয়েছিল লৌকিক ছড়ার মধ্যেও। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই সকল ছড়ার মধ্যে হইতে সত্য অন্বেষণ করিতে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইবে।"[৪] আবার অন্যদিকে—

> লোক ছড়ার এই অসংগতি ও অবাস্তব কল্পনার সঙ্গো কৌতুকরসের মিশ্রণে পাওয়া গেল আধুনিক বাংলা ছড়া। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া', 'হিং টিং ছট', সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'কে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।...'আবোল তাবোল'-এ যখন দেখা যায় 'আকাশের গায়ে নাকি টকটক

> গন্ধ'-তখন বোঝা যায় এই 'টকটক গন্ধ' আবিষ্কার করার জন্য যে কুইয়্যার (উদ্ভট,অস্বাভাবিক) বোধের দরকার, তা সুকুমার সাহিত্যে সর্বোৎকৃষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।[৫]

এই উদ্ভট বা অস্বাভাবিক বোধ সুকুমারের ছড়ায় নয় কেবল, তাঁর সব শ্রেণির সাহিত্যের মূলসূরই এই উদ্ভট খেয়ালরসের জগত। আর লেখার এই খেয়ালরস পূর্ণতা পেল তাঁর আঁকার জগতে। তাঁর 'আবোল-তাবোল'-এর দ্বিতীয় কবিতা 'খিচুড়ি'তে প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল 'হাঁসজারু', 'বকচ্ছপ', 'হাতিমি', 'সিংহরিণ', 'গিরগিটিয়া', 'মোরগোরু', 'জিরাফড়িং', 'বিছাগল' প্রভৃতি ষোলটি প্রাণীর সংমিশ্রণে ব্যাকরণ না মেনে প্রস্তুত হল আটটি অদ্ভুত জীবজন্তুর—

> হাঁসছিল সজারু, (ব্যাকরণ মানি না)/হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না।/বক কহে কচ্ছপে বাহবা কি ফুর্তি/অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি।[৬]

এই সকল অদ্ভুত প্রাণীর ছবি তিনি রেখাচিত্রে আঁকছেন। ছবিটা স্পষ্ট করছেন বর্ণনার সাথেই। যদিও এই ধরনের কবিতার মাধ্যমে তিনি তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন আসলে ইংরেজদের অনুকরণপ্রিয় ইঙ্গবঙ্গাদের। তবুও স্পষ্ট করতে চাইছেন ইমেজটি পাঠকের দরবারে। কারণ বাংলা শব্দ যেটা তিনি ব্যবহার করছেন, তার ব্যাকরণগত কোনো অর্থ আমরা পাচ্ছি না। তবে তা আমাদের কাছে একটা বোধ তৈরি করে দিচ্ছে। 'হাঁসজারু' বা 'হাতিমি' যখন বলছেন তখন সেটার সংযোগ সাধন করবেন কি করে Nonsense Varse রচনা করতে গিয়ে তিনি যে ইমেজগুলো ব্যবহার করেছেন তা ধরা নেই পাঠকের বোধির জগতে, তার চৈতন্যে। তাই তিনি তা ধরিয়ে দিলেন ছবি এঁকে, বর্ণনার সারাৎসারের সঙ্গে পাঠকদের মধ্যে সংযোগসূত্র তৈরি করে দিলেন। এটা তিনি নিছক মজা করে করেছেন, না এই ক্রাইসিস থেকে উত্তরণের জন্য করেছেন সেটাও বিচার্য। শুধু 'খিঁচুড়ি' কবিতার আটটি বিশেষ প্রাণীর সম্পর্কে এ কথা খাটে তা নয়। 'কিম্ভূত', 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা', 'কুমড়োপটাশ' সহ যত ছবি তিনি এঁকেছেন সর্বত্রই এই বিশেষ দিকটি আলোচনাযোগ্য।

'আবোল-তাবোল' সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছিলেন, 'ইহা খেয়ালরসের বই'। কিন্তু শৈল্পিক আচরণে ঢাকা সে খেয়ালের অভ্যন্তরে ধরা দেয় অর্থদ্যোতনার এক গভীর প্রচ্ছদ। গ্রন্থটির প্রারম্ভেই ব্যাকরণ না মেনে খেয়ালরসের পাত্রে রাঁধা হল 'খিচুড়ি'। পাঠককে নাজেহাল করেও চেতনার গভীর তলে ধরা পড়ে এর অর্থময় পূর্ণরূপ। নকলনবিশদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ ঝরে পড়েছে কবিতাটির মধ্যে। যদিও শিশুপাঠক এর ছন্দময়তা ও আজগবিত্বেই থাকে মগ্ন। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, কবি রজনীকান্ত সেনের 'হিংসার ফল' কবিতার কয়েকটি চরণ। কবি যখন বলেন—

> পাখিরা আকাশে উড়িয়ে দেখিয়া হিংসায়,/পিপীলিকা বিধাতার কাছে পাখাচায়।/বিধাতা দিলেন পাখা দেখো তার ফল,/আগুনে পুড়িয়া মরে পিপীলিকা দল।

অথবা, মানবের গীত শুনি হিংসা উপজিল/মশক বিধির কাছে সুকণ্ঠ মাগিল।/সুকণ্ঠ দিলেন বিধি দেখো তার ফল,/নরকরাঘাতে মরে মশক সকল।

তখন এক লজিক কাজ করে। আর পঙ্‌ক্তিগুলি হয়ে যায় দর্শন নির্ভর। এক্ষেত্রেও অনুকরণ প্রিয় ও ঈর্ষাকাতরদের কথাই বলা হয়েছে কিন্তু স্পষ্ট বিধান দিয়ে রাখলেন কবি। আর সে বিধান বাইরে থেকে চরিত্রের উপর ক্রিয়াশীল। কবি যেন বলতে চাইলেন নিজের সীমা লঙ্ঘন করে অন্যের মতো হতে চাইলে তার ফল হবে ভয়ংকর। সেই ফলের আশঙ্কা কিন্তু পিপীলিকা বা মশকের মধ্যে জাগছে না। তারা তা উপলব্ধি করছে না। কিন্তু সুকুমার রায় তাঁর কবিতাতে শিশুদের অগ্রাধিকার দিয়ে এহেন কোনও বিধানের বা ফলাফলের জটিলতার মধ্যে গেলেন না।তাঁর কবিতায়

প্রানীরাই উপলব্ধি করল তাদের সমস্যা। অর্থাৎ তিনি সংশোধনের পথ খোলা রাখলেন। আর তা প্রকাশিত হলো নমনীয়তার সঙ্গে। যখন তিনি জানান, 'টিয়ামুখো গিরগিটি মনে ভাবি শঙ্কা/ পোকা ছেড়ে শেষে কি গো খাবে কাঁচা লঙ্কা!' অথবা 'হাতিমির দশা দেখো- তিমি ভাবে জলে যাই/ হাতি বলে 'এই বেলা জঙ্গালে চলো ভাই'।' তখন নিজেদের মধ্যে এই বৈপরীত্যের অস্বস্তিই তাদের সমস্যা জর্জর হতাশাকে ব্যক্ত করে সহজেই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় সচেতন আলোচনার দাবিদার। সুকুমার যে সকল উদ্ভট প্রাণীকুলের সৃষ্টি করলেন এবং রেখায় স্পষ্ট করলেন তাদের অবয়ব, তারা প্রত্যেকেই কি লেখকের নিছক খেয়াল রাজ্যের অধিবাসী! বাস্তবের মাটিতে কি তাদের কোনো ভিত্তি নেই! অনুসন্ধানী উত্তর জানান দেয় তাদের বাস্তব ভিত্তি। চরিত্রগুলি নিছকই খিঁচুড়ির মত নানা প্রকার প্রাণীর সংমিশ্রন নয়। বিজ্ঞানের 'Xenotransplanatation' শাখার কাজই হল অন্যপ্রাণীর অঙ্গ মানব অঙ্গে প্রতিস্থাপন করা। তাছাড়া বিজ্ঞান প্রমান দেয় যে, যখন কোনো দুটি প্রাণী থেকে অন্য প্রাণী সৃষ্টি হয় তখন তাদের দুটি প্রাণীর বৈশিষ্ট্যযুক্ত Missing link নামক মধ্যবর্তী প্রাণীর সন্ধান মেলে। বিজ্ঞানের কথা যদি বাদও দিই এ হেন মিশ্রপ্রাণীর সন্ধান মেলে আমাদের প্রাচীন লোককথা ও পুরাণেও। 'বিষ্ণুপুরাণ' জানাচ্ছে আমাদের সর্বাধিক পুজিত দেবতা বিষ্ণুর দশাবতারের প্রথম চারটি অবতারের মধ্যেই রয়েছে এজাতীয় দ্বৈতরূপ। মৎস (মাছ + মানুষ), কূর্ম (মানুষ + কচ্ছপ), বরাহ (মানুষ + শূকর) এবং নরসিংহ (মানুষ + সিংহ) ইত্যাদি।

শুধু 'বিষ্ণুপুরাণ' নয় হিন্দুপুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্যেও এরূপ উদাহরণের প্রাচুর্য চোখে পড়ে। সবের উল্লেখ সম্ভব না হলেও বেশ কিছু উদাহরণ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেওয়া যায়। আমাদের সবার পূজিত গণেশ ঠাকুর (মাথা কাটা যাবার পর হাতির মাথা ও দেহ মানুষ), রামায়ণের হনুমান (বাঁদর ও মানুষ), জাম্বুমান (ভালুক ও মানুষ), কিন্নর (মানুষ্পাখি), গন্ধর্ব (ঘোড়ামুখী মানুষ) গরুড় (ঈগলের ন্যায় মুখ ও ডানাবিশিষ্ট মানুষের দেহধারী বিষ্ণুর বাহন), উচ্চৈঃশ্রবা (সাত মাথাওয়ালা ডানাযুক্ত ইন্দ্রের ঘোড়া), কামধেনু (মাথা মানবীর, শরীর গরুর এবং লেজ ময়ূরের), কেতু (চার হাত যুক্ত নিম্নাঙ্গ সাপের ন্যায়এক অসুর), দক্ষরাজা (প্রানদানের পর মানুষের শরীরে ছাগলের মাথা বসানো হয়েছিল)—প্রভৃতি সবই ছিল সংমিশ্রিত রূপ। শুধু হিন্দুপুরাণ কেন, গ্রিক সাহিত্য, মিশরীয় পুরান, রাশিয়ান লোকগাথা, ফিলিপিনীয় লোকগাথা, পার্সিয়ান সাহিত্য প্রভৃতিতেও এ ধরনের মিশ্র প্রাণীকুলের কথা উল্লেখ রয়েছে।

সুতরাং এ থেকে কি বলা যায় না, যে তিনি শিশুর মনে পুরান পাঠের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখছেন। আজ যেসব প্রাণীদের সুকুমারের সাহিত্যে দেখে ও যাদের ক্রিয়া-কলাপ পড়ে শিশুরা যুগপৎ বিস্মিত ও আহ্লাদিত হচ্ছে, সেই সব প্রাণীকুলই শিশুর অজান্তেই তার বোধির জগতে গড়ে নিচ্ছে স্থায়ী আশ্রয়। ফলত বড়ো হয়ে পুরান কথিত প্রাণী ও মানুষের মিশ্ররূপ আর তাকে বিস্মিত করবে না। শিশুরা অনায়াসেই তখন তাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে পারবে এই সব ঐশ্বরিক তথা মহামানবিক মিশ্র চরিত্রদের। 'খিচুড়ি'র মতো আরো কতকগুলি কবিতা আছে যেখানে আজগুবি, কাল্পনিক প্রাণীর পরিচয় পাওয়া যায় যেমন—'ট্যাঁশগরু', 'রামগরুড়ের ছানা', 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা', 'কুমড়োপটাশ', 'কিম্ভূত' প্রভৃতি। এরূপ উদ্ভট প্রাণীর হদিস মেলে 'হ য ব র ল', 'হেশোরাম হুঁশিয়ারির ডায়েরি'তেও। এমন চরিত্রের প্রথম আবির্ভাব 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা'র মধ্যে। এর ভাবখানা মানুষের, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জান্তব জগা খিচুড়ি—"ইনি ছেলেভুলানো ছড়ার

হাট্টিমা টিম টিম বা একানড়েদের সমগোত্রীয় নন। একানড়ে এক ধরনের জু জু, আর হাট্টিমা টিম টিম হলেন শৃঙ্গবিশিষ্ট পক্ষীবিশেষ। প্রাকসুকুমার সাহিত্যে এই দুটি ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না।"[৭] 'ট্যাঁশগরু' কবিতায় দেখা গেল 'ট্যাঁশগরু গরু নয়, আসলেতে পাখি সে।' তাকে দেখতে পাওয়া যায় 'হারুদের অফিসে'। তার চেহারাটি মজাদার, 'চোখ দুটি ঢুলুঢুলু, মুখখানা মস্ত/ ফিটফাট কালোচুলে টেরিকাটা চোস্ত।' সমাজের মূর্তিমান বাবু সম্প্রদায়কে সুকুমার এখানে ব্যঙ্গের খোঁচায় বিদ্ধ করেছেন। 'আবোল-তাবোল'-এর এক উল্লেখযোগ্য কবিতা 'কুমড়োপটাশ'। এই কবিতাতে দেখা যায় ননসেন্সের সার্থকতম প্রয়োগ। এই কিম্ভূতাকার জীবের আস্তাবল আছে। কিন্তু কেমন দেখতে প্রাণী, যার ভয়ে সবাই অতীষ্ঠ! তার হাসি-কান্না-নৃত্য ও ছোটায় সবাই সন্ত্রস্ত। কিন্তু কারণ অজানা। কবি দিলেন বাঁচার বিধান। তার রূপ পাঠক ধরতে পারে না বর্ণনায়। কবি তার রূপ দিলেন চিত্ররেখায়। সুকুমার বর্ণিত 'কুমড়োপটাশ' এর সঙ্গে এডওয়ার্ড লিয়রের 'Nonsense Botany'-তে বর্ণিত 'Many Peeplia Upsidownar' এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

'রামগরুড়ের ছানা'র যে চিত্র সুকুমার অঙ্কন করেছেন সে কোন্ শ্রেণির প্রাণী, আর হাসি তার চরিত্রগত কিনা তা অতি সংশয়ের বিষয়। এই রামগরুড়ের ছানা আসলে সমাজসমস্যার প্রতি উদাসীন বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদীদেরই প্রতীক। সবার থেকে পৃথক হতে চেয়ে এদের 'সোয়াস্তি নেই মনে'। যাকে চিত্রলিপিতে সুন্দর করে চিত্রিত করেছেন কবি। 'কিম্ভূত' কবিতাটি 'খিচুড়ি' কবিতার সংবদ্ধ রূপ। যেখানে কবি নির্বোধ নকলনবিশদের কিম্ভূত বানিয়ে ছেড়েছেন। তাই শেষে আত্মগ্লানিতে সে বলে, "নই ঘোড়া নই ছাতা নই সাপ বিচ্ছু/ মৌমাছি প্রজাপতি নই আমি কিচ্ছু।/মাছ ব্যাঙ গাছপাতা জল মাটি ঢেউ নই,/নই জুতা নই ছাতা আমি তবে কেউ নই।" (কিম্ভূত) তখনই সব ভাব স্পষ্ট হয় পাঠকের কাছে। তবে এদের প্রত্যেকেরই সৃষ্টি হয়েছিল সুকুমারের খেয়ালরসের আজব দুনিয়ায়।

কেবলমাত্র 'আবোল-তাবোল'-এর নয়, তার পাশাপাশি এরূপ বিচিত্র প্রাণীকুলের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে তাঁর গদ্যগ্রন্থেও। বিশ শতকের প্রথম দশকে আর্থার কোনান ডয়েলের 'The Lost Word'-এর অনুপ্রেরণায় লেখা সুকুমারের 'হেশোরাম হুঁশিয়ারির ডায়েরি'তে দেখা মেলে একদল আজব প্রাণীর। ডয়েলের Prof. Challenger সুকুমারের হাতে হল অধ্যাপক হেশোরাম। আর আফ্রিকার আমাজন সুকুমারের কল্পনায় কারাকোরামের বান্দাকুশ পাহাড়। এখানেই হেশোরাম আর তার দলবলের দেখা পায় 'হ্যাংলাথেরিয়াম', 'গোমড়াথেরিয়াম', 'ল্যাগব্যাগার্নিস', 'ল্যাংড়াথেরিয়াম', 'চিল্লানোসোরাস' প্রভৃতির জীবের। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বাংলা ও ল্যাটিন শব্দের মিশ্রণে তিনি যে নামকরণ করেছেন তাতে কৌতুকরস আরও ঘনীভূত হয়েছে। গদ্য রচনা হলেও তা ক্লান্তিকর নয়।

সুকুমার রায় বিচিত্রদর্শন প্রাণীকুলের কথা বলে একদিকে যেমন ব্যঙ্গ করেছেন খামখেয়ালী, অনুকরণপ্রিয়, তোষামুদে মানুষদের, অন্যদিকে বাতিকগ্রস্ত একদল মানুষের চরিত্র অঙ্কন করে সামাজিক ভ্রান্ত সংস্কার ও ধারণাগুলিকে, চরিত্রের নানা ত্রুটি বিচ্যুতিকে তীব্র ব্যঙ্গের খোঁচায় বিদ্ধ করেছেন তাঁর কবিতায়। আর প্রত্যেকটি বর্ণনা প্রাণ পেয়ে যায় তাঁর রেখার টানে। তাঁর সাহিত্যের আঙিনায় একে একে হাজির হয়েছেন হেড অফিসের বড়বাবু (গোঁফচুরি), গায়ক বিশ্বালোচন (গানের গুঁতো), চণ্ডীদাস দাসের খুড়ো (খুড়োর কল), লড়াই ক্ষ্যাপা পাগলা জগাই (লড়াই ক্ষ্যাপা), ষাঁড়ের তাড়ায় ভীত কেতাব সর্বস্ব পন্ডিত প্রমুখ। এসব চরিত্র ঘিরে আবর্তিত হয় হালকা চালের সমালোচনা বা সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে কৌতুক। কেবল বুড়োদের নয়, ব্যঙ্গ আছে শিশুকুলেও।

'আহ্লাদী', 'ডানপিটে' অথবা 'কাঁদুনে' সে নজির গড়ে দেয়। স্বদেশী যুগের বিজ্ঞান শিক্ষার বাড়াবাড়িকে ঠাট্টা করে লিখলেন 'হাতুড়ে' আর 'বিজ্ঞান শিক্ষা'। 'ছায়াবাজি' বা 'কাঠবুড়ো' কবিতাতেও নিশানা সেই বাতিকগ্রস্ত মানুষরাই। যাদের একজন ছায়ার সঙ্গে কুস্তি ক'রে চলে তো অন্যজন ভেজা কাঠ সেদ্ধ করে খায় চেটে খায়। কিন্তু এমন সব কৌতুকের ফাঁকেই মুক্ত হয়ে ওঠে বস্তুলোকের দৃশ্য জগৎ। আর প্রত্যেকটি বর্ণনাই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে তাঁর অসামান্য ও অননুকরণীয় চিত্রমালায়।

নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করে শিশু মনোহরণে সুকুমার ছিলেন অজেয়। অজিত দত্ত তাঁর 'বাংলা হাস্যরসের ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, সুকুমার তাঁর রচনায় হাসিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তিন শ্রেণির চরিত্রের স্বভাব বর্ণনা করেছিলেন। প্রথমত যারা অকারনে হাসে — 'হাসছি কেন কেউ জানে না পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই।' (আহ্লাদী), দ্বিতীয়ত, এমন ব্যক্তি যারা নিজেরা হাসুক বা না হাসুক অন্যকে হাসাবেই, ক্ষেত্রবিশেষে তা অত্যাচার হয়ে গেলেও। যেমন 'কাতুকুতু বুড়ো'। তৃতীয়ত, কিছু ব্যক্তি আছে যারা তাদের জীবন থেকে হাসিকে ত্যাগ করেছেন। এরা সব সময় ভয়ে থাকে পাশে তারা হেসে ফেলে অর্থাৎ হাসি তাদের মজ্জাগত তাই তাকে এড়াতে এত প্রয়াস—"যায় না বনের কাছে কিংবা গাছে গাছে/দখিন হাওয়ায় সুড়সুড়িতে/হাসিয়ে ফেলে পাছে।" ('রামগরুড়ের ছানা') এই 'দক্ষিণ হাওয়া'র ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে কবিতাটিকে অনন্য সাধারণ করে তুললেন কবি।

লীলা মজুমদার তাঁর বড়দা সুকুমারের প্রতিভায় বিস্মিত হয়ে এবং সেই প্রতিভার যোগ্য সম্মান না পাওয়ায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন—"বাঁচলে কোথায় দাঁড়াত কে জানে রবীন্দ্রনাথেরও ৩৬ বছর বয়সের আগে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার বেশিরভাগই অলিখিত ছিল।"[৮]

সুকুমার রায় জীবিত ছিলেন মাত্র ৩৬ বছর। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনেই তিনি বাংলা সাহিত্যকে অপার সুষমা দান করে গেছেন। গল্পে, কবিতায়, নাটকে আপাত অসংলগ্ন সৃষ্টিছাড়া বিষয় নিয়ে তিনি যে কল্পনার ইন্দ্রজাল রচনা করেছিলেন তা বাংলার শৈশব মাতিয়ে রাখে। অসম্ভবের রাজ্য প্রস্তুত করতে গিয়ে খেয়ালরসকে সঙ্গী করে কৌতুকের সাহায্যে তিনি তাঁর পাঠকদের সত্যের রূপদর্শন করিয়েছেন। আর রেখায় ধরে রেখেছেন তাঁর খেয়ালী রাজ্যকে।

সুকুমার রায়, লেখায় ও আঁকায় মানুষের যেসব ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছেন তা বাংলা কার্টুনের প্রাথমিক নিদর্শন হিসেবে ধরা যেতে পারে। রাধারানী দেব এ প্রসঙ্গে বলেছেন— "সুকুমার রায়ের কার্টুন তো আমি রেখায় প্রথমে দেখতে পাই না, দেখতে পাই অক্ষরমালায়।"[৯] আবার লীলা মজুমদার বলেছেন—

> তাঁর আঁকা ছিল লেখার পরিপূরক; অবশ্য তাই বলে তাঁর ছবিকে ছেড়ে দিলে অন্যায় হবে, কারণ তাঁর ছবিরও নিজস্ব ভাষা আছে বলে মনে হয়। আজ পর্যন্ত কোনো বিদেশি যদি বা লেখাগুলোর মাথা মুণ্ডু কিছুই না বোঝে, ছবিগুলি দেখলেই ব্যাপারটাকে তৎক্ষণাৎ আঁচ করে নিতে পারবে। কারণ প্রথম শ্রেণির কার্টুনিস্টের সব গুণ তাঁর মধ্যে ছিল। এ জিনিস কাউকে শেখানো যায় না, তাই নিয়ে জন্মাতে হয়।[১০]

শুধু কার্টুন নয় বাংলা কমিক্স এরও ইঙ্গিত মেলে সুকুমারের সাহিত্যে। তিনি যখন বলেন, 'ছবির টানে গল্প লিখি, নেইকো এতে ফাঁকি/যেমন ধারা কথায় শুনি হুবহু তাই আঁকি।'— বলেই তিনি পরীক্ষায় গোল্লা পাওয়া ছেলের বিবরণ দেন ছবিতে ও লেখায় কমিক্সের আঙ্গিকেই। অর্থাৎ একেকটি ছবি ও তার উপযোগী ছোট ছোট কথা। যেখানে লেখার জন্য ছবি না ছবির জন্য লেখা

বোঝা দুরূহ হয়ে ওঠে। তাঁর 'ও বাবা', 'বুঝবার ভুল' প্রভৃতি এজাতীয় কমিক্সধর্মী রচনার উদাহরণ। যেখানে ছবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

সুকুমার একদিকে যেমন সৃষ্টি করতে পারেন হাঁসজারু, হাতিমি, হ্যাংলা থেরিয়ামদের তেমনি আবার ইঁটের পাঁজায় রাজাকে বসিয়ে বাদাম ভাজাও খাওয়াতে পারেন। যেমন গানের তোড়ে জগত সংসার তছনছ করে ফেলতে পারেন, তেমনি আবার ভিজে কাঠ সেদ্ধ খাইয়ে বলতে পারেন পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই। এসব অনাবিল কৌতুক আর খামখেয়ালি কল্পনা, উদ্ভট অদেখা জগৎ, নিপাট মৌখিক শব্দের কলধ্বনি ও ছন্দের অসামান্যতা, নিখাদ মজা আর হুল্লোড়ে মেতে থাকে শিশু-কিশোর মন। কিন্তু এসব আপাত অসংলগ্নতার অন্তরালে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে তাঁর সমাজ সচেতনতা। সুকুমার রায়ের সাহিত্য ও চিত্র আপাত ননসেন্স হলেও তার অভ্যন্তরে থাকে লক্ষ্যময় শ্লেষ। তাঁর সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে লীলা মজুমদার যথার্থই বলেছেন—

> তাঁর নির্মল হাস্যরসের রচনার তুলনা হয় না। সেগুলি নিছক ঠাট্টা তামাশা নয়; সেগুলি হল গোটা একটা জীবনদর্শন; দুনিয়াকে দেখবার জন্য পক্ষপাতিত্ব শূন্য দুটি মজার চোখ না থাকলে এমন লেখা যায় না। এ লেখা দুঃখ কষ্টের তলায় তলায় এমনই আনন্দের সন্ধান দেয় যে সুকুমার-সাহিত্য আজ পর্যন্ত অসাধারণ হয়ে আছে।[১১]

রচনায় ও চিত্রকলায় সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর সৃষ্ট অননুকরণীয় সাহিত্য ও চিত্রগুলি বাঙালি জাতিকে সর্বজাতীয় স্তরে সাফল্যের শিরোপা দান করে।

উৎসের সন্ধানে

১. সত্যজিৎ রায় : ভূমিকা, 'সুকুমার সাহিত্যসমগ্র', জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, সম্পা, সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ
২. বুদ্ধদেব বসু : 'শিশুসাহিত্য', প্রবন্ধ সংকলন, পৃ. ১৩৫
৩. পুণ্যলতা চক্রবর্তী : 'ছেলেবেলার দিনগুলি', মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ১৫৯
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'লোকসাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ. ১৯
৫. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী : 'বাংলা সাহিত্যে ননসেন্স ও সুকুমার রায়', পৃ. ১৭১
৬. সুকুমার রায় : 'সুকুমার রচনা সংগ্রহ', সাহিত্যম, পৃ. ১০
৭. সত্যজিৎ রায় : প্রাগুক্ত
৮. লীলা মজুমদার : 'সুকুমার রায়', পশ্চিমবঙ্গ বাঙলা আকাদেমী ২০০১, পৃ. ৮৫-৮৬
৯. রাধারানী দেব : 'সুকুমার রায়ের কার্টুন আজও এ দেশে সর্বোত্তম', কার্টুন সংখ্যা, কিঞ্জল নির্বাচিত সমগ্র (১৯৭৮-২০০৩) পৃ. ৪১
১০. লীলা মজুমদার : প্রাগুক্ত
১১. লীলা মজুমদার : ছোটদের জন্য বই 'লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র', লালমাটি প্রকাশন, দশম খণ্ড, পৃ. ৩৯১

শরদিন্দুর গল্প-উপন্যাসে বিধবার প্রেমের জটিলতা ও সামাজিক প্রেক্ষিত

সুনেত্রা ব্যানার্জী

বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথার যন্ত্রণাময় পরিণতি দীর্ঘদিন ধরে বাংলার মেয়েদের বহন করতে হয়েছে। এই প্রথার অমোঘ ফলস্বরূপ হয়ে এসেছে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রথা। এই অন্ধ সংস্কার ও কুপ্রথার পাবক শিখায় দগ্ধ মেয়েদের উদ্ধারের জন্য উনিশ শতকে ব্রতী হয়েছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু ব্রতী হওয়া নয়, পথে নেমে রীতিমতো আন্দোলন করে বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এই বাল্যবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহকে। অন্যদিকে কৌলিন্য প্রথার জন্য অষ্টমবর্ষের মধ্যেই কুলীন মেয়েদের বিয়ে দিতে হত। উপযুক্ত কুলীন পাত্রের অভাবে বৃদ্ধ বয়সেও পুরুষেরা অতি অল্পবয়সী মেয়েদের বিয়ে করত। মেয়ের অভিভাবকরা একপ্রকার সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করতে না পেরে বিবাহের নামে মেয়েদের বলি দিতে বাধ্য হত। বয়সের দীর্ঘ পার্থক্য হওয়ার জন্য যৌবনে পৌঁছানোর আগেই অনেকে বিধবা হত। বিদ্যাসাগর সেইসব বিধবা মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে দেখিয়েছিলেন যে কীভাবে জীবনের রস আস্বাদনের আগেই হতভাগীরা বঞ্চিত হয়ে এক দুঃসহ যন্ত্রণায় জীবন অতিবাহিত করে। একদিকে সমাজের অনুশাসন আর অন্যদিকে পরিবারের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকার গ্লানিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ছিল বিপন্ন ও দিশেহারা। কখনো কখনো তাদের এই অবস্থার সুযোগ নিত সুযোগসন্ধানী পুরুষ। নতুন জীবনের মোহে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেইসব পুরুষের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে অসহায় বিধবা মেয়েরা প্রতারিত হত। অনাচারী পুরুষকে সমাজ ক্ষমা করলেও মেয়েটির ওপর নেমে আসত শাস্তির বিধান।

সমাজের প্রতিচ্ছবি সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে বলেই বিধবার বেঁচে থাকার অধিকার সেখানেও বার বারই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তো বিধবা রোহিণী ('কৃষ্ণকান্তের উইল', ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) ও কুন্দনন্দিনীকে ('বিষবৃক্ষ', ১৮৭৩

খ্রিস্টাব্দ) নতুন করে ঘর বাঁধার অপরাধে মৃত্যুর বিধান দিয়েছিলেন। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক মন্ত্রশিষ্য রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) তাঁর সংসার উপন্যাসে বিধবাবিবাহ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিপ্রতীপ অবস্থানই ব্যক্ত করেছিলেন। আবার অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী ('চোখের বালি' ১৯০৩) নিজ ব্যক্তিত্বে মহিমান্বিত। বিনোদিনীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকলেও শেষপর্যন্ত সামাজিক চাপে রবীন্দ্রনাথও বাধ্য হয়েছিলেন বিনোদিনীকে কাশীবাসিনী করতে। এর জন্য তাঁর মর্মপীড়ার শেষ ছিল না। বিনোদিনীর ক্ষেত্রে না পারলেও পরবর্তীকালে 'চতুরঙ্গ'-র (১৯১৬) বিধবা দামিনীর মধ্যে একভাবে রবীন্দ্রনাথ যেন প্রত্যাশা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। বিধবা হয়ে দামিনীকে লীলানন্দ স্বামীর পদ সেবা করে জীবন কাটাতে হয়নি। শচীশকে না পেলেও দামিনীর জীবন ব্যর্থ হয়নি। দাবিহীন, সপ্রতিভ, নিঃস্বার্থ শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর বিয়ে তার জীবনকে কানায় কানায় পূর্ণ করে দেয়।

শরৎচন্দ্র বিধবা নারীর যন্ত্রণায় সহমর্মী হলেও সামাজিক প্রতিবিধানের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত হতে পারেননি বলেই রমার ('পল্লীসমাজ', ১৯১৬) প্রেমের মুকুল কখনও পরিপূর্ণতা পায় না। তবে 'চরিত্রহীন' (১৯১৭) উপন্যাসের কিরণময়ী নির্ভীক বলেই নিজের অধিকারের কথা সোচ্চার কণ্ঠে বলতে পারে। প্রচলিত সংস্কারের ঊর্ধ্বে রাখতে চাইলেও শরৎচন্দ্র শেষ রক্ষা করতে পারেননি। কিরণময়ীর পরিণতিও তাই বড়ো বেদনাদায়ক। এঁদের উত্তরসূরী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক গল্পে যেমন এসেছে বিধবার প্রেমের সমস্যা তেমনই বাদ যায়নি তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিতেও। যেমন শরদিন্দুর 'পতিতার পত্র' গল্পে বিধবার প্রেম শুধু জটিলতা সৃষ্টি করেছে বললে কম বলা হয়, এই গল্পে বিধবা সুলোচনার ওপর নেমে এসেছে এমন শাস্তি, যা আমাদের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দেয়। সুলোচনা যখন নতুন জীবনের স্বপ্নে ঘর ছেড়েছিল, তখন সে ভাবতেও পারেনি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে কাশীর বারাঙ্গনা পল্লি। যাকে সুলোচনা বিশ্বাস করেছিল সে-ই তাকে বিক্রি করে দেয় পতিতালয়ে। এত বড়ো অপরাধ করেও তার কোনো শাস্তি হয় না। বরং সে হয়ে ওঠে স্বাধীন ভারতের গণ্যমান্য নেতা। অথচ সুলোচনা আর সমাজের মূলস্রোতে ফিরতে পারে না।

পুরুষের কাপুরুষতা, বিধবা নারীর কপালে কলঙ্কের টীকা এঁকে দেয়। নতুন করে বাঁচার স্বপ্নে অল্পবয়স্কা বিধবা মেয়েরা অনেক সময়েই কামনা-বাসনা দমন করতে পারে না। তারা ভুল লোককে বিশ্বাস করে ঠকে। কারণ পরিবার থেকে সমাজ সকল ক্ষেত্রেই তারা অপাঙ্‌ক্তেয়। এতটুকু স্নেহের পরশ থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের সৎ পরামর্শ দেওয়ার মতো কেউ থাকে না। তাই তারা সহজেই বিশ্বাস করে প্রতারণার শিকার হয়। অন্যদিকে সামাজিক রীতি-নীতির নামে বিধবা নারীকে অবহেলা করা হয়। কোনো শুভ কাজে সংস্কারের দোহাই দিয়ে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। শরদিন্দুর 'পতিতার পত্র' গল্পে সুলোচনা বিধবাদের ওপর সামাজিক প্রতিবিধানের বিরোধিতা করে বলেছিল—"বিধবা তো কী আমার রূপ, আমার যৌবন, আমার ভালবাসা, কিছুই মূল্য নেই এসবের আমি কি কাগজের ফুল, চিনের মাটির পুতুল না, আমি চিনেমাটির পুতুল হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। আমি ভালবাসা চাই, শ্রদ্ধা চাই সম্ভ্রম চাই।"[১] স্বামী মারা গেলেই জীবন শেষ হয়ে যায় এ কথা মেনে নিতে পারেনি সুলোচনা। সে ভাগ্যের পরিহাসে বঞ্চিত হয়েও ভেঙে না পড়ে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চেয়েছিল। এর জন্য সে তার প্রেমিককে বিশ্বাস করেছিল। এই গল্পে তার প্রেমিকের

কোনো নাম নেই। তাদের মতো সুবিধাবাদী স্বার্থপর মানুষ সমাজের এক শ্রেণি, যাদের নামের কোনো প্রয়োজন থাকে না। গল্পের কথক সুলোচনা বিধবা হয়ে বাবার কাছে ফিরে আসার পর স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করতে চেয়েছিল। তার বাবাও ছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত প্রাণ। দেশের কাজের সূত্রেই সুলোচনার সঙ্গে আলাপ হয় দুই যুবকের। যাদের কোনো নাম না থাকলেও সুলোচনা তাদের রাম, লক্ষ্মন নামে সম্বোধন করে। ঘটনাচক্রে দুজনের সঙ্গেই তার সখ্য গড়ে ওঠে। তাদের বীরত্ব, বক্তৃতা, দেশপ্রেমের প্রতি মুগ্ধ ছিল সুলোচনা। তাদের মধ্যেই একজন বিয়ে করার নামে সুলোচনাকে তার সঙ্গে ঘর ছাড়তে বলে। কিন্তু সে বিয়ে করার পরিবর্তে যা করে তা অপরাধের নামান্তর। এত কিছুর পরে সে কিন্তু ভদ্র সমাজে উচ্চ আসনে বিরাজ করে। দেশ স্বাধীন হলে তার প্রতিপত্তি আরও বাড়ে। সে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র দেশের মন্ত্রী হয়। স্ত্রীলোকের ইজ্জতের সওদা করে যে, সে তো মানুষ হিসেবেই নিকৃষ্ট। সমাজের কাছে সে প্রগতিশীল হলেও সে প্রকৃতপক্ষে মেয়ে পাচারের মতো অপরাধ করেছে। দেশপ্রেমে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছিল সুলোচনা—এই অজুহাতে এত বড়ো অপরাধ করা কোনো যুক্তি হতে পারে না। যার জন্য সুলোচনা অন্ধ গলিতে হারিয়ে যায়। সমাজে কুসংস্কারের মূল এত গভীরে প্রথিত যে বিধবা মেয়েদের বিয়ে করে সম্মান দিতে চায় না বেশিরভাগ পুরুষ। তাই তো শরীরী খেলা মিটে গেলে মেয়েদের ত্যাগ করে তারা। কুলত্যাগিনী মেয়েদের সমাজের মূল স্রোতে ঠাঁই হয় না। তাদের বারাঙ্গনা বৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় এমন গল্প অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু ‘পতিতার পত্র’ গল্পে শান্ত, সৌম্য, ভদ্রলোকের মুখোশের অন্তরালে সুলোচনার প্রেমিক যা করেছে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

অন্যদিকে শরদিন্দুর ‘শুক্লা একাদশী’ গল্পে দেখা যায় বিনতার সৌন্দর্যের মোহে বিনয় আচ্ছন্ন হলেও তার কাছে বিনতার অবিবাহিতা হওয়া গুরুত্ব পেয়েছে। তাই বিনতার রূপের বর্ণনা দেওয়ার সময় তার মেধা বা গানের সুর সম্পর্কে প্রজ্ঞার থেকে ঘন চুলের মাঝে সিঁথির সূক্ষ্ম রেখার নিষ্কলঙ্কতা বিনয়কে যেন বেশি আকর্ষণ করে। সে যখন রোমান্টিক ভাবালুতায় হারিয়ে বিনতাকে প্রেম নিবেদনের কথা ভেবেছে, তখনও বলেছে—

> আজ শুক্লা একাদশী বিনতাকে ভালোবাসি—
> সিঁথির সরু রেখায় নেই সিঁদুরের চিহ্ন
> ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি।[২]

বিনয়ের মুগ্ধতা, প্রেমের সম্ভাষণের মধ্যেও বিনতার সিঁথির নিষ্কলঙ্কতা অর্থাৎ অবিবাহিতা হওয়াই গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও গান ও সেই বিষয়ক আলোচনাকে কেন্দ্র করেই তাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল। তার সঙ্গে বিনয়কে আকৃষ্ট করেছিল বিনতার সৌন্দর্য। বিনতা বিধবা তা অবশ্য বিনয় জানত না। বিনতার বৈধব্য জীবনের কথা জানলে বিনয় কী করছে তা গল্পে জানা যায় না। কিন্তু বিনতার মেধা, শিল্পী চেতনাকে ছাড়িয়ে তার সিঁথির নিষ্কলুষতায় মুগ্ধ বিনয়ের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের ভাবায়। কারণ সিঁথির নিষ্কলুষতা আসলে বিনতার কৌমার্যের প্রতীক। বিধবা নারী যা দাবি করতে পারে না। বিনয়ের কাছে শারীরিক কৌমার্য যদি ভালোবাসার অন্যতম মানদণ্ড হয়, তাহলে বিনতাকে গ্রহণ করতে সে পারবে না বলাই বাহুল্য।

শরদিন্দুর এই দুই গল্প ব্যতীত অপর একটি সামাজিক উপন্যাসের কথা না বললে আমাদের এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটি হল ‘বিষের ধোঁয়া’[৩]। এই উপন্যাসে অবশ্য বিধবা

বিমলার কোনো গোপন সম্পর্কজনিত সংকট তৈরি হয়নি। স্বামী তীর্থঙ্কর মৃত্যুর সময় বন্ধু কিশোরের কাছে বিমলার দায়িত্ব দিয়ে যায়। কিশোর সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই সমাজের রোষানলে পড়ে। বিমলা একে বিধবা তার ওপর অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিশ্বরী, অন্যদিকে যুবক কিশোর পরিবারের থেকে দূরে কর্মসূত্রে শহরে একা থাকত। তাই কুৎসা রটতে সময় লাগে না। এই রটনা শুনে কিশোরের বাড়ির লোকেরাও কিশোরকে অবিশ্বাস করে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক যে শারীরিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে গিয়েও কিছু হতে পারে তা সমাজ ভাবতেই পারে না। এমনকি কিশোর-বিমলার পবিত্র সম্পর্ক কিশোরের বাগদত্তা সুহাসিনীও বুঝতে পারে না বলে বিয়ে ভেঙে যায়। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও কিশোর তার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারে না। শরদিন্দুর এই উপন্যাসে বিধবা নারীর জীবনের এক অন্য সংকট দেখা যায়। কিশোরের মতো মানুষেরা বিরল। কিশোরের জায়গায় অন্য পুরুষ থাকলে হয়তো বিমলার রূপে আকৃষ্ট হত বা বিমলার অবস্থার সুযোগ নিতে পারত। বিমলার সঙ্গে কিশোরের রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও তাদের সম্পর্ক ভাই-বোনের মতো পবিত্র। সমাজ তাদের ব্রাত্য করলেও তারা পারস্পরিক সম্পর্কের সীমারেখা কখনো লঙ্ঘন করেনি। বিমলা কিশোরকে মাতৃ-স্নেহে আগলে রেখেছে। এই ন্যায়-অন্যায়ের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয় হয় সত্যের। তাই সুহাসিনী নিজের ভুল বুঝতে পেরে কিশোরের কাছে ফিরে আসে। বিমলার অভিভাবত্বে কিশোর-সুহাসিনীর সুখের নীড় গড়ে ওঠে।

২

বিধবা নারীর প্রেম শরদিন্দুর সামাজিক গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি ব্যোমকেশের কাহিনির মধ্যেও গুরুত্ব পেয়েছে। কথা সাহিত্যের মূল ধারার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের কাহিনিতেও সলতে পাকানোর সময় থেকেই বিধবার সম্পর্ক জটিলতা সৃষ্টি করেছে। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে ভারতে পুলিশি ব্যবস্থা তৈরি হয়। এই শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনি লেখা শুরু হয়েছে বলে গবেষক সুকুমার সেন মনে করেন।[৪] উনিশ শতকের শেষের দিকে 'দারোগার দপ্তর'-এর মতো জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনির সিরিজেও বিধবার প্রেমকে কেন্দ্র করে রহস্যের গ্রন্থি পাকিয়েছে। যেমন 'গিরিজাসুন্দরী'[৫] গল্পে দেখা যায়, অভিজাত পরিবারের বিধবা গিরিজার সমাজ বহির্ভূত সম্পর্ক ও তার সংকেত কুঞ্জে গমন তার মৃত্যুর কারণ হয়েছে। পারিবারিক আভিজাত্য রক্ষার অজুহাতে নিজের ভাই নৃশংসভাবে হত্যা করেছে গিরিজাকে। এর থেকে বোঝা যায় বিধবা নারীকে কেন্দ্র করে গোপন সম্পর্ক ও অপরাধ মোটেই বিরল ছিল না। এই গল্পের বহু বছর পর বিশ শতকে লেখা শরদিন্দুর অপরাধের কাহিনিতেও দেখা যায় বিধবার প্রেম কীভাবে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ সময়ের পরিবর্তন হলেও বিধবার সম্পর্ক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

শরদিন্দুর ব্যোমকেশের গল্প অপরাধের আখ্যান হলেও সেখানে সামাজিক জীবনের ছবি বিস্তার লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে শরদিন্দু স্বয়ং পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—"কখনও কখনও সামাজিক সমস্যাও এর মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'চোরাবালি' গল্পে আছে বিধবার পদস্খলন। একটি কথা, জীবনকে এড়িয়ে কোনদিন গোয়েন্দা গল্প লেখার চেষ্টা করিনি।"[৬] ব্যোমকেশের গল্পের অন্তর্গত 'চোরাবালি' এবং 'চিত্রচোর' দুটি কাহিনিতেই বিধবা নারীর সম্পর্ক মূল কাহিনির সমান্তরালে সাবপ্লট হিসেবে এসেছে। মূল অপরাধের সঙ্গে গ্রন্থি পাকিয়ে গিয়ে বিষয়টি হয়ে উঠেছে জটিলতর। ব্যোমকেশকে অতি সাবধানে সেই জট ছাড়াতে হয়েছে।

'চোরাবালি' গল্পে কালীগতির অপরাধের সমান্তরালে বিধবা রাধার পদস্খলন সাব প্লট। এই গল্পে জমিদার হিমাংশু রায়ের বাজার সরকারের মেয়ে বিধবা রাধা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। রাধার সন্তানের পিতৃ-পরিচয় জানা যায় না। সে মৃতসন্তান প্রসব করে। সময়ের পরিবর্তন হলেও এমন রাধাদের প্রতারিত হওয়ার কাহিনি একই থেকে যায়। রাধার অবস্থান সম্পর্কে 'চোরাবালি' গল্পে ব্যোমকেশ বলছেন—ব্যাপারটা আমাদের সমাজের একটা চিরন্তন ট্রাজেডি —বিধবার পদস্খলন...।"[৭] বিধবার সম্পর্ক নিয়ে উনিশ-বিশ শতকীয় সমাজ আলোড়িত হয় যেখানে, সেখানে তার মাতৃত্ব যে সমাজের কাছে কত অবাঞ্ছিত তা বোঝা কঠিন নয়। সেই সন্তানকে ভ্রূণ অবস্থায় হত্যার জন্য সমাজ ছিল বদ্ধপরিকর। এই সম্পর্কে নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর বাঙালি জীবনের রমণী গ্রন্থে লিখেছিলেন—

> সমাজের মধ্যে এই ধরনের অনাচার বেশি হইত অল্পবয়স্কা বিধবার সম্পর্কে। তাহাদের পদস্খলন যখন হইত, তাহা যে নিকট-আত্মীয়ের দ্বারা হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে সমস্ত বাঙালি সমাজ জুড়িয়া একটা বিরাট ভণ্ডামি ছিল। ব্যাপকভাবে ভ্রূণহত্যা চলিলেও এই সামাজিক পাপ সম্বন্ধে সম্ভব হইলে সকলেই চুপ করিয়া থাকিত।[৮]

ভ্রূণহত্যা যে সামাজিক অপরাধ সেটা সমাজপতিরা কেউ বোঝে না। 'চোরাবালি' গল্পে রাধার বাচ্চাটি জন্মের পরই মারা গেছে বলে জানা যায়। এই তথ্য রাধার বাবা অনাদিবাবু জানালেও আমাদের মনে সংশয়ের বীজ দানা বেঁধে ওঠে। কারণ বিধবা মেয়ের সন্তান জন্ম নিলে পরিবারও যে মেনে নিতে পারে না তার উদাহরণ অনেক আছে। এমনই এক হতভাগ্য মেয়ের জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে, সে স্বামীর মৃত্যুর পর পিতৃ গৃহে ভয়ানক একাকিত্বের মধ্যে দিন যাপন করেছিল। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তাকে ধর্মের আচার-আচরণে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। মেয়েটি তার গুরু পুত্রের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে কেউ তার প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ের কথা ভাবেনি। বরং তার গর্ভস্থ সন্তানকে ভ্রূণ অবস্থায় হত্যার প্রচেষ্টা করেছে।[৯] এমনকী ভ্রূণ হত্যা করতে গিয়ে মেয়ের জীবন হানি ঘটে গেলেও কারুর কোনো অপরাধবোধ থাকে না। পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য কোনো অপরাধেই যে তারা বিচিলিত হয় না তা এক অসহায় বিধবার জবানবন্দি থেকে আমরা অনুমান করতে পারি। মেয়েটি জানায়—"আমি একজন পল্লীবাসিনী বাল বিধবা। কোনও এক পড়শির সহিত ঘনিষ্ঠতা করার কারণে আমি সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়ি। বিষয়টি জানাজানি হয়ে পড়ায় আমার পিতা আমাকে বিষ পানে হত্যা করতে চেয়েছিলেন।"[১০] এই পারিবারিক হিংস্রতা কোন স্তরে পৌঁছলে কোনো বাবা তার মেয়েকে হত্যা করার ঘৃণ্য চক্রান্ত করতে পারে। সামাজিক প্রতিবিধানের মূল এতই গভীরে প্রথিত যে নিজের সন্তানের প্রতিও মানবিক আচরণ করতে পারে না অনেকে।

১৮৫৬ সালে 'বিধবা বিবাহ আইন' সিদ্ধ হলেও সনাতন সংস্কারের বশবর্তী হয়েই বিধবার দ্বিতীয় বিয়ে মেনে নিতে এত সমস্যা হয়। বিদ্যাসাগর উনিশ শতকেই চেয়েছিলেন বিধবা মেয়েদের বিয়ে দিয়ে তাদের রিক্ত জীবনকে নতুন রঙে ভরিয়ে দিয়ে পূর্ণতা দিতে। কিন্তু বাস্তব সমাজে তা যে সহজ নয় তা বলাই বাহুল্য। মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে শারীরিক কৌমার্য সমাজে গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। তাই স্বামীহীনা নারীর সঙ্গে অতি সহজে পুরুষ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলেও বিয়ে করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে যায়। বিয়ে যেহেতু সামাজিক প্রতিষ্ঠান, তাই বিয়ের সময়ে মেয়েদের

শারীরিক কৌমার্য এক গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। তাই বিধবা নারীকে বিয়ে করে যোগ্য সম্মান দিতে অনেক পুরুষের বড়ো অনীহা। আবার প্রতারিত মেয়েটি পরিবারেও অপাঙ্‌ক্তেয়। তাই আত্মহনন বা বারাঙ্গনাপল্লির অন্ধকার গলি তার ভবিতব্য হয়ে ওঠে। যদিও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোরাবালি' গল্পে রাধার এমন কোনো নির্মম পরিণতি হয় না। রাধা ও তার পরিবারকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন জমিদার হিমাংশু রায়। প্রজা ভক্ষকের পরিবর্তে প্রজাবৎসল জমিদার নিজের কর্মচারীর মান বাঁচাতে রাধাকে কাশীতে তার মাসির বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। নিশ্চিত আত্মহননের পথ থেকে বাঁচিয়ে হিমাংশু রাধাকে নবজীবন দিয়েছিলেন। সে তার বাবা মায়ের কাছে সুস্থ জীবন যে পাবে না তা হিমাংশু বুঝেছিলেন। ব্যোমকেশ, হিমাংশুর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু হিমাংশুর মহত্ব তার স্ত্রী বুঝে উঠতে পারে না। রাধাকে কেন্দ্র করে হিমাংশুর সাংসারিক সমস্যা চরমে ওঠে। হিমাংশু সামন্ততান্ত্রিক ভাবনা ত্যাগ করতে পারলেও তার স্ত্রী পারে না। নারী হয়েও সে তাই রাধার অসহায়তা বুঝতে পারে না। গল্পে হিমাংশুর স্ত্রীর কোনো নাম নেই। কিন্তু সে নারী হলেও স্বার্থান্বেষী পুরুষতন্ত্রের অংশ যারা নারীকে সম্মানের বেঁচে থাকতে দেয় না। অসহায় নারীর পদস্খলন ক্ষমা করার মতো মহত্ব তার নেই। সে শুধু শাস্তি দিতে জানে, যা রাধার মতো মেয়েদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে না এনে অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে চায়।

অন্যদিকে শরদিন্দুর 'চিত্রচোর'[১১] গল্পে রজনী বিধবা হলেও রাধার মতো কখনই অসহায় নয়। রাধার সঙ্গে রজনীর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোনো মিল নেই। রাধা তার দরিদ্র বাবার সংসারে ছিল বোঝা-স্বরূপ। পরিবার ও সমাজের চোখ রাঙানিতে তার জীবন মরুভূমি হয়ে উঠেছিল। সামাজিক অবদমনে অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক কামনা-বাসনা গোপন অভিমুখ খোঁজে। এরজন্যই হয়তো রাধা গোপন সম্পর্কে জড়িয়ে ঠকেছিল। অন্যদিকে 'চিত্রচোর' গল্পের বিধবা রজনী ছিল ধনী মহীধরবাবুর একমাত্র মেয়ে। বিয়ের পরের দিন বিমান দুর্ঘটনায় রজনীর স্বামী মারা গেলেও মহীধরবাবু মেয়েকে অন্ধকারে ঠেলে দেননি। মাতৃ-হারা রজনী জীবনের রূপ-রস থেকে কখনও বঞ্চিত হয়নি। সে অবিবাহিতা মেয়ের মতোই জীবন-যাপন করেছে। তবে মহীধরবাবু মেয়ের দ্বিতীয়বার বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারেননি। ঘটনাচক্রে ডাক্তার অশ্বিনীকুমার ঘটকের সঙ্গে রজনীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অশ্বিনী রজনীকে বিবাহ করতে চেয়েছে। রজনীর শারীরিক সূচিতা নিয়ে মনে কোনো দ্বিধাও নেই। শিক্ষিত প্রগতিশীল অশ্বিনীর কাছে রজনীর বিধবা হওয়া কোনো সমস্যাই নয়। সে সম্মানের সঙ্গে রজনীকে গ্রহণ করতে চায়। প্রচলিত সংস্কারের স্রোতের বিপরীতে অশ্বিনী, রজনীকে স্বীকার করে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রজনীর মনেও এই সম্পর্ক নিয়ে কোনো দ্বিধা না থাকলেও বাবা মহীধরবাবুকে নিয়ে সে ভয় পেয়েছে। তাদের বিয়ে মহীধরবাবু মেনে নিতে পারবেন না ভেবেই তারা গোপনে দেখা করে। এমনকী বিয়ের পরেও তারা আলাদা থাকে। রজনীর আশঙ্কা মহীধরবাবু জানতে পারলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন। মহীধরবাবু সজ্জন, ভদ্র, প্রগতিশীল হলেও মেয়ের দ্বিতীয় বিয়ে মেনে নিতে পারতেন না। তিনি হয়তো খুব আঘাত পাবেন। এই আশঙ্কায় রজনীর সঙ্গে অশ্বিনীও সম্পর্কের কথা লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। একমাত্র সন্তান হিসেবে রজনীর তার বাবার প্রতি দায়বদ্ধতাকে অশ্বিনী শুধু মেনে নিয়েছে তাই নয়, বিয়ের পরও নিজের স্ত্রীর প্রতি কোনো অধিকার দাবি করেনি। একত্র থাকার জন্য স্ত্রীর ওপর জোর করেনি। তার এই আচরণ অত্যন্ত আধুনিক প্রগতিশীল হওয়ার সঙ্গে মানবিকও।

শরদিন্দুর গল্পে এমন পুরুষ আছে যারা বিধবা প্রেমিকাকে বারাঙ্গনা পল্লির অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে নিজে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতে পারে। আবার হিমাংশুর মতো সংবেদনশীল জমিদারও আছে যিনি নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে অসহায় নারীকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। অশ্বিনী ঘটকের মতো ডাক্তার যে সকল সামাজিকতার ঊর্ধ্বে গিয়ে বিধবা রজনীকে শুধু বিয়েই করে না, বরং যথার্থ বন্ধুর মতো স্ত্রীর কর্তব্যকে নিজ দায়িত্ব মনে করে। অশ্বিনী উচ্চশিক্ষিত বলেই আধুনিক মনোভাবাপন্ন এমন ভাবার কারণ নেই। কারণ একই গল্পে আমরা অধ্যাপক আদিনাথ সোমের মতো চরিত্রও দেখি, যে নিজের বিষাক্ত দাম্পত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সন্দেহপ্রবণ স্ত্রীর থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও রজনীকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাহস বা ক্ষমতা কোনোটাই তার ছিল না। সে ঘটনাচক্রে তার স্ত্রীর ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল ছিল। রজনী ও অশ্বিনীর সম্পর্কে সে বাধা দিতে চায়। এর জন্য সে বেনামে মহীধরবাবুকে চিঠি লিখে রজনীর সঙ্গে ডাক্তারের সম্পর্কের কথা জানায়। এই ধরনের আচরণ থেকে মনে হয় রজনীর সঙ্গে সে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে আবদ্ধ হতেই হয়তো বেশি আগ্রহী ছিল। না হলে এমন জটিলতা সৃষ্টি করতে সে চাইতো না। আবার কিশোরের মতো এমন চরিত্রও আছে যে নিজের দায়িত্ব পালন করতে সমাজের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করতে পারে। বিধবা বিমলা প্রেমিক হিসেবে নয়, বন্ধু তথা অভিভাবক হয়ে ওঠে কিশোরের। বিমলা যে আশ্রয় বা শান্তি পায় তা শরদিন্দুর সমকালে সত্যিই বিরল।

উৎসের সন্ধানে

১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : 'পতিতার পত্র', শরদিন্দু অমনিবাস, প্রথম সংস্করণের যোড়শ মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১০, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৯৮

২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : 'শুক্লা একাদশী', শরদিন্দু অমনিবাস, প্রাগুক্ত, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ১০১

৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিষের ধোঁয়া', শরদিন্দু অমনিবাস, প্রথম সংস্করণের উনবিংশ মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুলাই ২০১০, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩-১১৫

৪. সুকুমার সেন : 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ১৪৬

৫. প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় : 'গিরিজাসুন্দরী', দারোগার দপ্তর, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, প্রথম খণ্ড, বইমেলা ২০০৪, পৃ. ২১৮-২৩২,

৬. পার্থ চট্টোপাধ্যায় : 'ব্যোমকেশে সঙ্গে সাক্ষাতকার', প্রাপ্ত- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ সমগ্রের পরিশিষ্টঃ ২ অংশ, প্রথম সংস্করণের একাদশ মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, (আনন্দ প্রথম সংস্করণ মে ১৯৯৫) নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ১০০১

৭. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : 'চোরাবালি', ব্যোমকেশ সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১৬০

৮. নীরদচন্দ্র চৌধুরী : 'দেশাচার', বাঙালী জীবনে রমণী, প্রথম সংস্করণের যোড়শ মুদ্রণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৭

৯. পঞ্চানন ঘোষাল, অপরাধ বিজ্ঞান, নবকলেবরে প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, নিউবেঙ্গাল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, তৃতীয় খণ্ড, শ্রাবণ ১৩৯১, পৃ. ২১৮

১০. পঞ্চানন ঘোষাল : 'অপরাধ বিজ্ঞান', তদেব, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২২০

১১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : 'চিত্রচোর',ব্যোমকেশ সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭-২৮১

অনালোচিত কথাকার তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য ভাবনা

প্রসেনজিৎ মণ্ডল

লেখক সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নিবিড়। সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় জীবন থেকে নেওয়া। জীবনে ভাবের মাধুর্যে ও ভাষা সৌন্দর্যে ফুটিয়ে তোলেন তার লেখনীতে। ফলে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনে এক ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মানবহৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ মান-অভিমান ইত্যাদির সবকিছু সাহিত্যের দর্পণে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Martin Grey বলেছেন—

> A vague all inclusive term for poetry, novels, drama, short stories prose: anything written, in fact, with an artistic purpose rather than merely to communicate information an anything written and examined as if it had an artistic purpose.[১]

সাহিত্যের মধ্যে গদ্য, কাব্য-কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রভৃতি একত্রিত রূপ বলা যেতে পারে। ঠিক তেমনি সমাজজীবন প্রতিফলিত হবে ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তাভাবনা অনুভূতি সৌন্দর্য ও সাহিত্যিকের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মায় তাঁর পারিবারিক সূত্রে। বলা বাহুল্য তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের মহান সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের পুত্র। ফলস্বরূপ তারাদাসের সাহিত্যের সঙ্গে যোগ শৈশব থেকেই। তিনি ছিলেন একজন যথার্থ সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী একজন। সাহিত্যসেবী—এই শব্দচয়নকে নেহাৎ হালকাভাবে গ্রহণ করলে চলবে না। মনই যেহেতু লেখে, ফলে নানান মনের যত সাহিত্য বিষয়ক রচনা আমরা পড়তে পাই সেই সবই যথার্থ সাহিত্য সেবা কি-না এই প্রশ্ন অনেকসময় আমাদের মনে জাগে। এই কারণে যে, মন তো কেবলমাত্র একটি লেখা পড়ে না, বরং পড়তে চায় সেই লেখার ভিতর লুকিয়ে থাকা শিল্প-সুষমা,

ভাষা সৌন্দর্য, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সেই মনের বোধ এবং বোধাতীত যা প্রতিদিনের ব্যাপারগুলি জীবনযাপনের নতুন মাত্রা যুক্ত করতে সক্ষম। পাঠকের মন সবসময় সচেতনভাবে এই বিষয়গুলিকে খুঁজে বেড়ায় এমন নাও হতে পারে। হয়তো সেই রচনা নিজ গুণে পাঠক মনকে এমনই আবিষ্ট করেছে যে, তাকে আর ছাড়া যাচ্ছে না, ধীরে ধীরে সে গ্রাস করছে পাঠকের চেতনা এবং রোপণ করছে কোনও এক অনন্য বোধ। এমত কর্মে যে-মন পারঙ্গম তাকেই যথার্থ সাহিত্যসেবী বলতে হবে। এই শব্দদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা বুঝতে পারব তারাদাসের লেখার অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে শিল্প, ভাষাবোধ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সহানুভূতি যা প্রকাশিত। তারাদাস নিজ গৌরবে মহিমান্বিত ছিলেন। তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে দীর্ঘকালের যোগসূত্র ছিল। যা প্রাত্যহিক জীবনের এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। তারাদাস বন্দোপাধ্যায়ের ডাক নাম বাবলু। এই সম্পর্কে সুজিত দাশগুপ্ত বলেছেন—

> বাবলুদার সঙ্গে আমার যোগ নেহাৎ দু-দশ বছরের নয়। হিসেব করে দেখা গেল আমরা চল্লিশটা বছর সাহিত্য-এক ছাতার তলায় একসঙ্গে কাটিয়েছি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে, এই পরিচয় তাঁকে অবশ্যই আলোকিত করত। একথা অস্বীকার করা চলে না। বিশেষত আমাদের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধযুক্ত পরিচিত সমাজের এই পরিচয় অন্যতর পশু সমাজের চেয়ে একেবারেই আলাদা ধরনের এক অনন্যতার সূচনা করে।[২]

স্বাভাবিকভাবে তারাদাসের মধ্যে সাহিত্যের প্রথম বীজ বপন করেছিলেন মা রমা দেবী। পিতৃ প্রতিভার সহজাত ও উত্তরাধিকার তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। তিনি নিজেই স্বমহিমায় হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বসাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠক, জীবনদর্শনে তিনি ছিলেন জীবন রসিক। অলৌকিক রহস্য সন্ধানে মানবজীবন পর্যবেক্ষণের যথার্থ শিল্পী। অথচ কুণ্ঠাবোধ সঙ্গত আবেগ পিতৃ মর্যাদার পরিমন্ডলে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই যেন সীমা অতিক্রম না করার কোনো কঠিন সংকল্পে তারাদাস বর্ণময় আনন্দময় এক সদালাপী জীবনযাপন করে, পিতার দৃষ্টান্তেই অপেক্ষাকৃত দ্রুততায় ইহজীবনের চারপাশে একটি গন্ডিরেখা টেনে দিলেন। গত সত্তরের দশক থেকেই বাঙালি সমাজজীবনে ভাঙ্গা-গড়া দেখা দিয়েছে এবং মূল্যবোধের জায়গা পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি নিজেকে কখনও মূল্যবোধ গড়া থেকে সরিয়ে নেয়নি। সমাজের যে দিকগুলি কলুষিত সে দিক থেকে তারাদাস ছিলেন মুক্ত। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে যারা চিনেছিলেন মানুষ হিসাবে তারা তৃপ্ত লাভ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়নের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন বড়ো মর্মস্পর্শী।

আশৈশব পিতৃ গৌরব ও পারিবারিক সাহিত্য পরিসরে বড়ো হওয়ায় তারাদাসের সাহিত্যের প্রতি যে উৎসাহ তা প্রকাশিত। তারাদাসের সাহিত্যচর্চার প্রতি শৈশব থেকে অনুরাগ জন্মায়। তাঁর সাহিত্য ভাবনার বহিঃপ্রকাশ সপ্তম শ্রেণিতে ঘটে। তিনি 'ছোটগল্প'-এর ভূমিকায় বলেছেন—"লিখেছি অনেক দিন থেকে। ছাপার অক্ষরে প্রথম নিজের নাম দেখি ১৯৬১ সালে। তখন বোধহয় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি।"[৩] মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে অদ্রীশ বর্ধণ সম্পাদিত 'আশ্চর্য' পত্রিকায় তারাদাস সাহিত্যে পদার্পণ করেন গল্প লেখার মাধ্যমে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিতা'র পরবর্তী অংশ 'কাজল' নামে একটি উপন্যাস লেখেন তারাদাস। প্রাথমিক পর্যায়ে 'দেশ' পত্রিকায় এবং 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় বেশ কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়। উপন্যাস, শতাধিক ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এছাড়াও বিভূতিভূষণের আত্মজীবনী 'পিতা নোহসি' নামে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত

হয়েছে, তা শেষ পর্যন্ত তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। সামগ্রিকভাবে দেখলে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবাধভাবে বিচরণ করেছেন। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যে প্রথম আলোকপাত করেন উপন্যাসের মাধ্যমে। উপন্যাসগুলি হল—'কাজল' (আষাঢ় ১৩৯৪) 'সপ্তর্ষির আলো' (বৈশাখ ১৩৮১) 'কক্ষপথ' (পৌষ ১৩৮৬), 'বন্ধু রহো রহো' (চৈত্র ১৩৮১), 'কাল নিরবধি' (আষাঢ় ১৩৯১), 'তৃতীয় পুরুষ' (পৌষ ১৪০৪), 'অলাতচক্র' (মাঘ ১৪০৯)। 'অলাতচক্র' উপন্যাসটি তারানাথ তান্ত্রিকের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে কাহিনি নির্মাণ এছাড়াও 'তারানাথ তান্ত্রিক' নামে এক উপন্যাস রয়েছে আবার কেউ কেউ গল্প বলে অভিহিত করেছেন। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প শতাধিক। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্পগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ছোটোগল্পের বইটি ১৯৯৩ সালে 'ছোটগল্প' নামে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় ছোটগল্পের বইটি ২০০১ সালে 'বুধন ম্যান্ডেলা ও অন্যান্য' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছু প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর পছন্দের কবিতা ছিল দুটো শুভক্ষন (রাজার দুলাল যাবে আজি), ত্যাগ (রাজার দুলাল গেল চলি)। এছাড়া তিনি খুব ভালো আবৃত্তি করতেন। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'পিতা নোহসি' নামে বিভূতিভূষণের জীবনী ধারাবাহিক ভাবে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ২০০৮ সালে ডিসেম্বর থেকে ২০১০ আগষ্ট পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। 'পিতা নোহসি' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—

> উপদেশের কথা বলা এক, আর নিজের জীবনে নির্ভয়ে পালন করা আরেক। মাকে নিয়ে ইচ্ছামতী নদীতে গ্রীষ্মের সন্ধ্যার অবগাহন করতে গিয়ে পূর্বাকাশে সদ্যোদিত নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বাবা উচ্চারণ করতেন—"যো দেবো অগ্নৌ যে অপ্‌সু/যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।/য ওষধীষু যো বনস্পতিষু/তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥"[৪]

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবলম্বন ছিল সাহিত্য ও বিভূতিভূষণ এবং বাঙালির জীবন দর্শন—এই তিনটি দিক সমানভাবে অনুসরণ করে গেছেন সারা জীবন। তারাদাস সত্তরের দশকের গোড়ায় যখন লেখা শুরু করলেন তখন একটি প্ল্যাটফর্ম পেতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ই যাদের কাছে পেয়েছিলেন তাদের সঙ্গে সমানভাবে চলেছেন। সাহিত্যের এক ধরনের লেখক যাঁদের সারাবছর ধরে নানাভাবে সুযোগ দেওয়া হয় পাতা ভরানোর জন্য। কিন্তু উৎকৃষ্ট লেখক হিসেবে গণ্য হন না। তারাদাস পাতা ভরানোর দলে কখনও ছিলেন না। তিনি এই দিক থেকে স্বতন্ত্র। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে 'কাজল' উপন্যাসের মাধ্যমে। কাজলকে অতি বাল্যকালে নিশ্চিন্তিপুরে রেখে এসে অপু বেরিয়ে পড়েছিল বিশাল বিশ্বের রহস্যময় অজানার সন্ধানে। কাজলের উত্তর-জীবনী বিভূতিভূষণের লেখার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা ছিল বলেই তা খসড়া থেকে জানা যায় রমা দেবী তারাদাসের 'কাজল' গ্রন্থের মুখবন্ধে জানিয়েছেন—

> কাজল সম্বন্ধে উনি কী লিখবেন, তার কিছু কিছু আভাস 'অপরাজিত' বইতে পাওয়া যায়। ওতেই বীজাকারে কাজল সম্বন্ধে সকল কথাই প্রায়ই বলা আছে। তারপর যে তাঁর কল্পনার কাজলকে বাস্তবে রূপ দেবে, প্রতিমার কাঠামোর উপর খড়-বিচালি বেঁধে মাটি ধরিয়ে রং-তুলির স্পর্শে সে প্রতিমাকে সঞ্জীবিত করবে, সে দায়িত্ব তাঁর। গল্পকে টেনে নিয়ে যাবার, উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব লেখকের, বিভূতিভূষণের অসমাপ্ত রচনা যে সমাপ্ত করবে তার। তিনি জানতেন না ভবিষ্যতে এই কাজ করবে তার পুত্র।[৫]

রমা দেবীর এই কথা থেকে অনুমান করতে পারি 'পথের পাঁচালী' পরবর্তী অংশ 'কাজল' নামে

তারাদাস বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার সময়। 'কাজল' উপন্যাস লিখতে শুরু করেন তারাদাস। রমা দেবী লিখে গেছেন—

> বাবলুর তখন থেকে আগ্রহ ছিল 'কাজল' লিখবার।...তার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার পরে একেবারে একটানা অবসর, সেই অবসর কী করে কাটবে এই ভাবনায় যখন অস্থির হয়ে উঠেছিল, তখন নিজেই একদিন আমায় বলল—মা 'কাজল' লিখতে শুরু করি। তুমি কি বল—আমি সেদিন ওকে উৎসাহ দিয়েছিলাম, বলেছিলাম, লেখ, চেস্টা কর। চেস্টার অসাধ্য কি আছে।[৬]

'কাজল' উপন্যাসের গোড়াতে লেখক তারাদাসের অভিমতও তাঁর জননীরই পরিপূরক। সেই রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'র ভাষারই প্রতিধ্বনি। তারাদাস জানিয়েছেন—

> উপন্যাস লেখার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে মা যিনি আমার পিছনে মাভৈঃ বাণী নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই মা আমাকে সর্বক্ষণ উৎসাহ দিয়েছেন, পান্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছেন। আমার এবং তাঁর পরিশ্রম সমান সমান।[৭]

রমাদেবীর কথা থেকে স্পস্ট অনুমান করতে পারি, শৈশবে পিতৃহারা হয়েছিলেন তারাদাস। পিতার সান্নিধ্য পায়নি বললে চলে। শৈশব থেকে মায়ের কাছ থেকে তারাদাস পিতার জীবন কাহিনি এবং সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। বলাবাহুল্য সেদিন থেকে তাঁর হৃদয়ের অস্থিরতা শুরু হয়েছিল সাহিত্য রচনায়। যার অন্যতম উৎকৃস্ট ফসল 'কাজল'। এইভাবে তারাদাস পিতার আত্মিক সত্তাকে নিজের মধ্যে সাঙ্গীকৃত করেছিলেন। বিভূতিভূষণই তারাদাসের যাত্রাপথের আনন্দগান। 'যুগে যুগে অপরাজিত জীবন রহস্য কী অপূর্ব মহিমাতে আবার আত্মপ্রকাশ করে।' পাঁচালির পথ 'দেবযানে' শেষ হয়। 'দেবযান' থেকে আবার পথে নেমে আসে। 'কাজল' লেখার সাফল্য তারাদাসকে যেমন বিভূতিভূষণের উত্তর-সাধক হওয়ার অধিকার দান করল, তেমনই অপু-কাহিনি কেন্দ্র পুরুষ হওয়ার নিঃসংশয়িত যোগ্যতা দান করল।

একদা বাংলা সাহিত্যে কোনো খ্যাতনামা লেখকের রচনার পরবর্তী একটি কল্পিত অধ্যায় অন্য কোনো লেখকের হাতে ভিন্নতর রূপ পেয়েছে, এমন একটা সংকীর্ণ ধারার পত্তন হয়েছিল। সেকালে দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'-র পরবর্তী অধ্যায় লিখে পাঠক-মনস্তুষ্টির আয়োজন করেছিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' ধরেও টান দিয়েছিলেন তাঁর উত্তরখণ্ড লিখে। শিবনাথ শাস্ত্রী 'বিধবার ছেলে' উপন্যাসের সূত্র ধরে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখলেন 'শান্তিমঠ'। প্রমথনাথ বিশী একালে লিখেছিলেন 'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব'। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের সূত্র ধরে 'নৌকাডুবি'র পরে লেখেন হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এযুগের কটাক্ষবাদী সমালোচক এসব পরীক্ষার নাম দেবেন বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতের প্যারডি। হয়তো 'কাজল' তা নয়। তারাদাসকে কাজল লেখার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়েছিল। নিজস্ব সাধনায় ও তপস্যায় তিনি বিভূতিভূষণের বিভূতি অর্জন করেছিলেন। তারাদাসও তাঁর অপেক্ষাকৃত পরিনত মন ও অভিজ্ঞতার উপাদান দিয়ে অপুকে গড়ে তুলেছেন। 'কাজল'-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অপুর উপন্যাস লেখার বিবরণটি এভাবে তারাদাস বিবৃত করেছেন—"উপন্যাসটি অপু উজাড় করিয়া লিখিবে। অপরিণত বয়সের ভাবাবেগ আর নেই, এখন জীবন সত্য উপলব্ধি করিবার সময়।"[৮] 'কাজল' লেখার পরবর্তী 'তৃতীয় পুরুষ' উপন্যাস লিখেছিলেন। তিনি সেইসময় সাধনা ও সিদ্ধির সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'তৃতীয় পুরুষ' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ এইভাবে শুরু হয়েছে—

> হেমন্তের পড়ন্ত হলুদ রৌদ্র বেলা যাইবার সঙ্গো সঙ্গো অপূর্ব মায়াময় হইয়া উঠিলে চিরকালের

> অভ্যাস মতো কাজল একটা খাতা বা বই হাতে বাহির হইয়া পড়ে। জীবনে এমন কিছু শিক্ষা আছে যাহা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়রা দান করিতে পারেন না। অথচ যাহার উপর নির্ভর করিয়াই মানুষের জীবন আবর্তিত হয়। প্রকৃতির ঘনিষ্ট সান্নিধ্য হইতে কাজল সেই একান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিল।[৯]

কথাসাহিত্যিক কাজলকে অপুর জীবনের আশৈশব-লব্ধ প্রকৃতিনিষ্ঠতার প্রতিনিধি রূপে চিহ্নিত করে দিলেন। কিন্তু প্রায় সহজাত উত্তরাধিকার। পাঠক মহলে তবে এটুকু বলতে দ্বিধা নেই তারাদাস বন্দোপাধ্যায় নিজ প্রচেষ্টায় উত্তর বিভূতিভূষণের ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছিলেন। নুটুবিহারীকে এক চিঠিতে লিখেছেন—"বাবলু কাল একটা চমৎকার sentence বলেছে নদীর ধারে বসে নমোতদের ছায়া নদী জলে পড়েছে অর্থাৎ নক্ষত্রের ছায়া পড়ছে।"[১০] স্বভাবতই আমাদের মনে হয়, তারাদাস শৈশব থেকেই পিতার সান্নিধ্য লাভ করেছিল কখনও তিনি সুবর্ণরেখা নদী, কখনও ইচ্ছামতী নদী, ঘেঁটুবনে, শাল, মহুয়া জঙ্গালে ঘুরে বেড়িয়েছেন পিতার সঙ্গে। তারাদাস স্মৃতিচারণ করেছেন—"স্বপ্নের মতো মনে করতে পারি বাবার সঙ্গে আমার ঘেটু বনে বেড়ানো ইছামতীতে স্নান করতে যাওয়া, কাঁধে চড়ে শালবনে ভ্রমণ।"[১১]

বাল্যকাল থেকে প্রকৃতির সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল তারাদাসের। গাছপালা বন-বাদাড় আকাশের নক্ষত্র সংস্থান এবং মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন তাঁদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি দেখাতেন। গল্প বলার অসামান্য দক্ষতা ছিল তাঁর। এই সম্পর্কে সুজিত দাস বলেছেন—

> আমাদের সেই ছাত্র বয়সে বাবলুদার বলা গল্প শুনে বাড়ি ফিরেছি রাত এগারোটার ও পরে। বাড়িতে ঢোকার সময় দেখি মা বাইরে আমার অপেক্ষায় একা দাঁড়িয়ে আছেন না খেয়ে। কিন্তু সেই আড্ডায় কি অমোঘ আকর্ষণ ছিল পরে সন্ধ্যায় আবার গেছি নতুনতর গল্পের খোঁজে।[১২]

স্বাভাবিকভাবে আমরা অনুমান করতে পারি তারাদাস বন্দোপাধ্যায় একজন খাঁটি গল্প রসিক। এই আড্ডায় সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হত সেই সঙ্গে তিনি বাক্যের গঠন রূপক, উপমা প্রয়োগ কেমন হওয়া উচিত এই আড্ডায় বিশেষভাবে আলোচিত হতো।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র জীবনে যে কাজটিতে বেশি সময় দিয়েছিলেন তা হলো বই পড়া। শৈশব থেকেই গল্পের বইয়ের প্রতি আকর্ষণ ছিল তারাদাস বন্দোপাধ্যায়ের। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হওয়ার কারণে বিভিন্ন ইংরেজি সাহিত্যের লেখা তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর পুত্র তথাগত স্মৃতিচারণায় জানা যায়—

> একবার ক্লাসে ওঠার পরীক্ষায় ইংরেজিতে ফেলও করেছিল। শিক্ষকরা বলেছিল, তাঁরা বিভূতিভুষণের ছেলের কাছে এই জিনিস আশা করেনি। বাবার একটা জেদ চেপে গিয়েছিলো। কয়েক মাসের মধ্যে যেখানে যা ইংরেজি বই পেয়েছিল পড়ার চেষ্টা করেছিল।[১৩]

সম্ভবত তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাস নাইনের ছাত্র হিসেবে পরিচিত। The Taste of Fears এছাড়া ড্রাকুলা এবং রেবেকা The Wide world magazine প্রভৃতি আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছেন। ইংরেজি বই পড়ার পর বাইরে জগৎ সম্পর্কে তার ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি কখনো পপুলার সায়েন্স, থ্রিলার কিংবা Thor Heyerdahl এর অভিযান কাহিনি। সবচেয়ে প্রিয় ছিল কল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় ছিল তারাদাসের প্রিয়। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হওয়ার সুবাদে বাংলা সাহিত্যে সমানভাবে দক্ষ ছিলেন। তিনি তার পিতা বিভূতিভূষণের যেকোনো লেখা অনর্গল মুখস্থ

বলে যেতে পারতেন। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"বিভূতিভূষণ ও রবীন্দ্রনাথ আমার জীবনের দুই ধ্রুবতারা।"[১৪] তারাদাস বন্দোপাধ্যায় সবচেয়ে প্রিয় ছিল বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিতা' 'দেবযান', 'ইছামতী' ও 'চাঁদের পাহাড়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-এর 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'গুপ্তধন' ও 'ছিন্নপত্র' কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' পছন্দের লেখকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি চারণায় লিখেছেন—

> বাবাকে তো মাত্র তিন বছরেই হারিয়ে ছিলেন। কিন্তু অসম্ভব পিতৃভক্ত, পিতার কথা বলতে বলতে চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ত। তাঁর লেখা সমস্ত বই মাথার কাছে থাকত। না দেখে বাবার লেখা অনায়াসেই মুখস্থ বলে যেতেন। তা না হলে 'পথে পাঁচালী', 'অপরাজিতা'র পরে 'কাজল' ও 'তৃতীয় পুরুষ' লেখা অন্য কারো সাধ্যতে কুলোত না।[১৫]

তারদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যেও সমানভাবে দক্ষ ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে ছাত্র হওয়ার সুবাদে তিনি সেকসপিয়ার, শেলি, কিট্‌স, কোলরীজ, এইচ.জি.ওয়েলস, জন ডান, বাট্রার্ন রাসেল, জেমস্ জয়েস প্রভৃতি লেখকদের লেখা অধ্যয়ন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর ছোটোগল্পে প্রতিফলিত হয়েছে পরতে পরতে। তারাদাসের ছোটোগল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'ব্যাঙ্কোর চেয়ার' গল্পে 'ম্যাকবেথ' ও 'হ্যামলেট' নাটকের প্রসঙ্গ রয়েছে। 'খেলনা' গল্পে স্টার ওয়ারস্ সিনেমা, এইচ.জি.ওয়েলস-এর গল্প সংগ্রহ, পিকাসো, 'সায়েন্স ফিকশান' ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। 'নন্দিনী' গল্পে 'প্রমিথিউস আনবাউন্ড' কিংবা শেলির 'স্কাইলাক'-এর অনুষঙ্গ। এছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বি তরঙ্গিনী', কোলরীজের 'রাইম অফ দি অ্যানসেন্ট ম্যারিনার', 'মনুসংহিতা', 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' এইচ.জি.ওয়েলস-এর 'দি ডায়মন্ড মেকার' জন ডানের 'নো ম্যান ইজ অ্যান আইল্যান্ড' প্রভৃতি অনায়সে চলে এসেছে তাঁর গল্পে।

তারাদাসের ছোটোগল্পে ঐতিহাসিক চরিত্র লক্ষণীয়। 'আলেকজান্ডার ও গুরুদাস মল্লিক' গল্পে আলেকজান্ডার চরিত্র অন্যতম। বিভূতিভূষণের অনেক গল্পে এই ঐতিহাসিক চরিত্র লক্ষ করা যায়। এছাড়া তাঁর গল্পে লোহাগড়, টিকিপাহাড়, বনকাটি, ন্যাড়া পাহাড়ের কথা রয়েছে। বিহার-চক্রধরপুর, উড়িষ্যা, বিহার-মধ্যপ্রদেশ, দেহাতি শহর প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অরণ্য-পর্বত শাল, সেগুন, ঝাউবন, মরুভুমি, বাঁশঝাড়, দ্বীপ, সমুদ্র, জঙ্গাল, বনের অপরূপ সৌন্দর্য আস্বাদন করেছিলেন, যা তাঁর ছোটোগল্পে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর ছোটগল্পে পৌরানিক কাহিনি, পুরাণ, অলৌকিক কাহিনি, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, সপ্তর্ষি প্রভৃতি বিষয় লক্ষণীয়।

পারিবারিক সূত্রে গানের প্রতি ভালোবাসা তারাদাসের মধ্যে ছিল। কারণ বিভূতিভুষণের বাবা মহানন্দ বন্দোপাধ্যায় গানের গলা খুব দরাজ ও মিষ্টি ছিল। ব্যারাকপুর গ্রামে কে দেখেছেন এমন অতি বৃদ্ধ তাদের স্মৃতি থেকে জানা যায়—"মহানন্দ যখন সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতেন বড়ো রাস্তা ছেড়ে সিকি মাইল দূরে গ্রামের পথে নামলেই তাঁর উদাত্ত গলায় গান শোনা যেত। এতই জোর ছিল তার গলায়।"[১৬] তিনিই অজস্র গান লিখেছেন—বেশির ভাগই পিলু, ভৈরবী বা দেশিরসের সুর দেওয়া, একতাল বা আড় বৈতালে বাধা। তারাদাসের মা রমাদেবী গান গাইতেন। পরবর্তীকালে এই গান তুলে নিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। রমাদেবীর কণ্ঠে—"ওই মরণের সাগর পারে/চুপে চুপে এলে তুমি এলে/ভুবনমোহন স্বপন রূপে।"[১৭] এই রবীন্দ্রসংগীত তার মায়ের কণ্ঠে শুনেছিলেন তারাদাস। বলাবাহুল্য এই গানটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শিখিয়েছিলেন

রমাদেবীকে। তারাদাসের শৈশব থেকেই গানের সখ ছিল যৌবন বয়সের কথা স্মরণ করে দিনলিপিতে লিখেছেন—

> ছেলেবেলায় এমন দিনগুলোতে নদীতে স্নান করে গান গাইতে গাইতে ফিরতাম—'বানের জলে দেশ ভেসেছে রাখাল ছেলে তুই কোথায়' কথক পিতার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার দিনলিপিতে পাচ্ছি। (তৃণাঙ্কুর ঊর্মিমুখর উৎকর্ণ) কখনো কখনো নির্জনে বসে আপন মনে গান বানিয়ে তখনই সুর দিয়ে গাইতেন। যেমন—'অসীম অজানা রূপে এ জীবনে দেখা দিলে হে অনন্ত।'[১৮]

তারাদাস বন্দোপাধ্যায় যখন এম.এ ক্লাসে পড়ে তখন তার বিবাহের জন্য আয়োজন চলছে। এই সময় তিনি মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে গিয়ে মজার মজার কথা বলে সুন্দর গল্প জমিয়ে দিয়েছিলেন। তারাদাসবাবু মিত্রাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি যে রবীন্দ্রসংগীত গাও তার অর্থ বুঝে গাও নাকি, না বুঝেই গাও ! মিত্রা বন্দোপাধ্যায় উত্তর দিয়েছিলেন— হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বুঝেই গান করি। তখন উনি বললেন তাহলে একটা গানের অর্থ বল তো— 'প্রাণ চায় চক্ষু না, চায় নাকি (চোখ নাচিয়ে বললেন)—'প্রাণ চক্ষু নাচায়' এই ভাবে তারাদাসবাবু গানের মাধ্যমে হাসির খেলায় মেতে উঠতেন। এছাড়া তারাদাসের গল্পের মধ্যে গানের প্রতিফলন ঘটেছে। 'সাক্ষাৎকার' গল্পে হিমাংশুর কণ্ঠে গান শুনতে পাই জীবনমুখী—"চল নাতি জীব কলিকতাকু/বন্ধ্যা রাখিনু আ/কলিকাতা বড় শহর/ ঠাঁউ ঠাঁউ পকা/অফিস ঘর/ বসি বসি কঁড় করিব।"[১৯] এছাড়া রবীন্দ্রসংগীত গান পাওয়া যায় গল্পে—"দিনের বেলা বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে।"[২০] প্রেম ও পূজা পর্যায়ে আবেগঘন গান শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন তারাদাস বন্দোপাধ্যায়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি তারাদাস বন্দোপাধ্যায় সংগীতের প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসা ছিল তা স্পষ্ট। পরবর্তীকালে দুই সন্তানের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে।

তারাদাস এক অসম বয়সির প্রেম ও বাস্তব জীবনের কাহিনি রচনা করেছেন। দম্পতির নাম বিভূতিভূষণ ও কল্যাণী, সম্পর্কের দিক থেকে তার বাবা ও মা। ব্যক্তি তারাদাস একেবারেই গৃহগত প্রাণ, গন্ধভোজী, ভীরু মানুষ। তবে তাঁর পুত্র তথাগত ও তৃণাঙ্করকে দেখলে মনে হয় সুমন্ত রক্ত আবার পুনরায় জাগ্রত। তারা দুজনেই শ্রান্ত, গ্রন্থপ্রিয় এবং ছিমছাম। কিন্তু তারা দুজনেই বেরিয়ে পড়তে পারে দুর্গম পথের যাত্রায়, কিংবা জঙ্গলে বুনো হাতির যাতায়াতের তাঁবু খাটিয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিতে পারে। রক্ত কি তাহলে সত্যিই আবার তাদের মধ্যেই জেগে ওঠে হাউসম্যান বলেছেন—"Clay lies Steel but blood is a Rover."[২১]

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র জীবন বহু মানুষের কাছে গল্প করে কাটিয়ে দিয়েছেন। তারাদাস ছিলেন একজন হারিয়ে যাওয়া মানুষ, যে কোনোদিন আলোয় আলোকিত ছিলেন না। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে আকাশ-বাতাস ও শূন্য থেকে। গল্প এমন ভাবে এসেছে, যেখানে তিনি শ্রোতা, তিনি আবার পাঠক হিসাবে পরিগণিত। বিভূতিভূষণের ছেলে হওয়ার সুবাদে তারাদসের পক্ষে এটাই ছিল সবচেয়ে জটিল। প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়েছে পিতৃছায়ার সঙ্গো। আমরা পাঠক মাত্রই, যদি বিভূতিভূষণের গল্পগুলি অধ্যয়ন করি এবং তারাদাসের গল্পগুলি পড়লে তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে না দু'জনের সাহিত্যের ব্যবধান অনেক। অধ্যাপক অরুণ কুমার বসু বলেছেন—

> তারাদাসের এই উপলব্ধির ভাষা ঠিক বিভূতিভূষণের নয়—তারাদাসের নিজস্ব। তারাদাস যতই বিভূতিভূষণের রচিত কাহিনিরই ক্রমপরতা অনুসরণ করুন, সেই একই চরিত্র পরিবেশে স্থান-কাল অবিকৃত রাখুন, তবু তিনি অনুকারক নন।...তারাদাস জেনে ফেলেছেন, বিভূতিভূষণ তাঁর ভিতর

অপরিম্লান হয়ে থাকবে, থাকলেও তারাদাসকে দ্বিতীয় বিভূতিভূষণের ভাবমূর্তি হয়ে ওঠা চলবে না। তাঁকে উত্তর-বিভূতিভূষণ তারাদাস হয়ে উঠতে হবে।[২২]

স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে হয়, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের আখ্যান থেকে বেরোতেও চেয়েছিলেন। তাঁর লেখাতে কোথাও কোথাও সেই চিহ্ন বর্তমান। বঙ্গীয় রেনেসাঁ-র নাগরিক কেন্দ্রবিন্দুর বাইরে থাকা এক ছেলে, যে জ্ঞানতন্ত্রকে পাচ্ছে বইয়ের পাতায়, কিন্তু নিজস্ব গ্রামীণ মফস্সল দৈনন্দিনে নয়, যার মাথায় হিন্দু ধর্মের ইউরোপীয় পুনর্গঠন কিন্তু অভিজ্ঞতা বাংলার লৌকিক ধর্মাচার, তার আখ্যানে ভরকেন্দ্র তো হয়ে উঠবেই রোমান্টিকতা। এই রোমান্টিকতা ইউরোপীয় রোমান্টিকতার উত্তরাধিকার নয়। বরং একটু আগে একটু আগে বলা বিপরীতমুখী উপাদানগুলির মধ্যে এক সমন্বয়ের পরিত্রাণ পাওয়া রোমান্টিকতা। তারাদাসে রোমান্টিকতা এক উত্তর-ঔপনিবেশিক কালের রোমান্টিকতা। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং সাহিত্যের ভিতরে থাকা এক গভীর জীবনবোধকে যাচাই করে দেখার চেস্টা লক্ষণীয়। তাঁর গল্পের মধ্যে যেমন বিজ্ঞানচেতনা পাই, ঠিক তেমনি নিসর্গ প্রকৃতির চিত্র লক্ষ করা যায়। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে পুরাণ, পৌরাণিক, Scince Fiction, অলৌকিকতার নিবিড় ভাবনা কিংবা নগর মফস্সল ঔপনিবেশিক মূল্যবোধের প্রতিনিয়ত জন্ম আর মৃত্যু স্থল। তারাদাসের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গল্পগুলি যখন মুখে বলতেন তখন তিনি অনায়াসে গল্পের লিখিত অংশ বদলে ফেললেন।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প বলার দক্ষতা চমৎকার। তিনি এইভাবে সারাটা জীবন মানুষের কাছাকাছি এসে, মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়েছেন। বলাবাহুল্য তিনি একজন গল্প রসিক মানুষ। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রতিটি জায়গার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুকে গল্পের উপাদান করেছেন। ‘ছোটনাগপুরের জঙ্গলে’ নামে রচনায় সারেন্ডার গভীরে বন-বাংলোয় বসে নৈশ্য প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে বিভূতিভূষণ মোহিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—‘বাবলু যেন এ সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পায়’।[২৩]

তারাদাস বন্দোপাধ্যায়ের জীবনে গত ছেচল্লিশ বছর বিভূতিভূষণ নেই। তাঁর জীবনে যে ছেচল্লিশ বছর তিনি সক্রিয়ভাবে রয়েছেন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কে তাঁর চেয়ে বেশি করে জীবিত? কে বেশি সম-সাময়িক? এখনো তো তাঁর সঙ্গে আমার নিভৃত খেলার রচনার ভেতর দিয়ে রোজ দেখা? আমার ভ্রমণে তাঁর অসমাপ্ত ধারাবাহিকতা, আমার দর্শনে তার দৃষ্টিপাতের প্রসার।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবাধভাবে বিচরণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বলাবাহুল্য সাহিত্যের প্রতি তিনি একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী, একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। তারাদাস তার বলবার কথা যথাসম্ভব লিখে রেখে গেছেন। তাঁর মহান পিতার মহতী সৃষ্টির গৌরবে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। আরও অনেক লিখতে পারতেন নিজেকে কার্পণ্যে আবদ্ধ করে রাখলেন। এই জাতীয় ক্ষুদ্র সমালোচনার কুশাঙ্কুর তাকে বিদ্ধ করেনি। জীবন বড়ো সুন্দর বড়ো আনন্দের এই আনন্দ-পুণ্যোদকে স্পর্শ নিয়েই তারাদাস চলে গেছেন আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে, সত্যসুন্দরের সিংহাসনতলে।

উৎসের সন্ধানে

১. A Dictionary of Literature Terms. M. Gray, P. 115

২. সুজিত দাশগুপ্ত : বাবলুদা, সম্পাদক; সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য, তেহাই দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, উৎসব সংখ্যা ২০১০, পৃ. ৫২৩

৩. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : 'ছোটগল্প', ভূমিকা, ১০ই জানুয়ারি ১৯৯২, আরণ্যক, স্টেশন রোড, ব্যারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

৪. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : 'উপন্যাস সমগ্র', ভূমিকা; অধ্যাপক অরুণকুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ৩

৫. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : 'উপন্যাস সমগ্র', মুখবন্ধ; রমাদেবী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ২৮৩

৬. উৎস-৪, পৃ-২

৭. তদেব, পৃ-৩

৮. উৎস-৫, পৃ. ৩৩৩

৯. তদেব : পৃ-৩৯১

১০. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়', সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩, পৃ. ২৪

১১. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়', 'অনুষ্টুপ', কলকাতা, পৃ. ১০৭

১২. সুজিত দাশগুপ্ত : 'বাবলুদা', সম্পাদক; সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য, 'তেহাই' দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, উৎসব সংখ্যা ২০১০, পৃ. ৫২৬

১৩. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়', 'অনুষ্টুপ', কলকাতা, পৃ. ১৫১

১৪. তদেব : পৃ. ১৫৪

১৫. তদেব, পৃ. ১২৮

১৬. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অনুষ্টুপ', কলকাতা, পৃ. ২৮

১৭. তদেব, পৃ. ২৬

১৮. তদেব, পৃ. ২৭

১৯. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা পৃ. ২৭৫

২০. তদেব, পৃ. ২৭৭

২১. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অনুষ্টুপ', কলকাতা, পৃ. ২৫

২২. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র, ভূমিকা, অধ্যাপক অরুণকুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ৭

২৩. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অনুষ্টুপ', কলকাতা, পৃ. ১০৮

সুবোধ ঘোষের কিশোর গল্প
সময়ের ছায়া, সমাজের ছবি
শতাব্দী শিকদার

বাংলা ছোটোগল্প তার সমস্ত যৌবনদীপ্তি নিয়ে ফুটে ওঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কালে। তবে পরবর্তীতে বাংলা ছোটোগল্প রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে নানা মুখে নানা কালচেতনার হাত ধরে প্রবাহিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে মানুষের জীবন ও সমাজের নানা জটিলতার ছবি বিভিন্ন লেখকের ছোটোগল্পে উঠে আসতে থাকে।

চল্লিশের দশকে বাস্তববাদী লেখকদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ এমন এক মাইলস্টোন, যে তাকে বাদ রেখে কোনো আলোচনাই সম্পূর্ণ নয়। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মানুষের মন এক জটিল সংশয় আর অবিশ্বাসে পূর্ণ বাতাবরণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ পেতে থাকে। একদিকে সামাজিক-রাজনৈতিক ডামাডোল আর অন্যদিকে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বিপর্যয় সাধারণ মানুষ তথা সমাজকে এক চূড়ান্ত ভাঙনের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। আর এইসব সত্যই সাহিত্যের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সুবোধ ঘোষের নানা গল্প।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯০৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর বিহারের (অধুনা ঝাড়খণ্ড) হাজারিবাগে তাঁর জন্ম হয়। পড়াশোনায় মেধাবী ছাত্র ছিলেন সুবোধ ঘোষ। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে খুব কম বয়সেই চাকরিতে যোগ দেন। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন জীবিকা নির্বাহের জন্য। কখনো কুলি বস্তিতে মড়কের প্রতিষেধক তো কখনো বাস কনডাক্টরি। ছোটোনাগপুরের মালভূমির রাস্তা দিয়ে বাস চলাচল করত কিন্তু লেখক মনে মনে কুড়িয়ে নিতেন 'বিলি বাঘিনী', 'অযান্ত্রিক' ও আরও অনেক গল্পের রসদ। বহু চড়াই উতরাই শেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে তিনি 'আনন্দবাজার'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাংবাদিকতার কাজ করেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে থাকেন। তখন তাঁর আস্তানা হয় পাতিপুকুর এলাকার

'মাঙ্গালিক' নামের বাড়িতে। মুকুলরানি ও পুত্রকন্যাসহ পরবর্তীতে অবশ্য ভাড়াবাড়িতে উঠে যান। আদর্শবান বাঙালি হিসেবে সুবোধ ঘোষ ছিলেন অন্যতম। বিচক্ষণতা আর অকপটতা যেন তাঁর ব্যক্তিত্বকে, চিন্তাভাবনা ও গল্পের প্রকাশগুণকে আরও শৈল্পিক করে তুলেছিল।

সুবোধ ঘোষের গল্পকার জীবন মোটামুটিভাবে চল্লিশ বছরের পরিসরে সীমাবদ্ধ। জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতাকে তিনি সযত্নে গল্পে গেঁথে পরিবেশন করেছেন। তাঁর লেখা গল্পের সংখ্যা (প্রকাশিত) ২৩১টি। তবে এই পত্রে সুবোধ ঘোষের কিশোরদের জন্য লেখা নির্বাচিত কিছু গল্পই মাত্র আলোচিত হবে। লেখক পুত্র উত্তম ঘোষের সম্পাদনায় শিশু সাহিত্য সংসদ থেকে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে 'কিশোর গল্প সুবোধ ঘোষ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে ২১টি গল্পকে স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে তার মধ্যে একটি কিশোর উপন্যাসও আছে 'সেই অদ্ভুত অভ্রখনি' (১৯৭৭)। ২১টি গল্পের মধ্যে আবার ৭টি গল্প 'পুতুলের চিঠি' নামক সিরিজ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। পুতুল হল লেখকের প্রাণাধিক প্রিয় ভাইঝি। আর পাঁচটা শিশুর মতো সেও গল্প শুনতে ভালোবাসে আর তার গল্পের ফরমাস সেটাতেই লেখক তাকে লেখা প্রতিটি চিঠিতে একটি করে গল্প পাঠান। এই গল্পগুলি ১৯৬৪ সালে 'পুতুলের চিঠি' নামে প্রকাশিত হয়। তবে এ-প্রসঙ্গো বলে রাখা ভালো এযাবৎ বাংলার শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্য ছিল কল্পনাপ্রবণ সাতরঙের সমাবেশে গড়া সুন্দর এক মায়া রাজ্যের ন্যায়। সেখানে সুন্দরের আর সম্পূর্ণতার ছবিই ফুটে উঠেছে বারবার। কিন্তু সুবোধ ঘোষের কিশোরদের জন্য লেখা গল্পে তার ব্যতিক্রম ঘটল। তিনি এতটাই অকপট আর সাহসী লেখক ছিলেন যে, তিনি ছোটোদেরকেও বানিয়ে বানিয়ে সুখী মানুষের সুন্দর পৃথিবীর গল্প বলতে অরাজি ছিলেন। এপ্রসঙ্গো তাঁর কিছু কথা স্মরণ করা যায় পুতুল তাঁর কাছে রূপকথার গল্প শুনতে চাইলে তিনি বলেন—

> কিন্তু রূপকথা কাকে বলে আমি ঠিক বুঝতে পারি না, পুতুল। দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষের গল্প দেবী-দানবী-পরি-অপ্সরার গল্প সে সব শুক আর সারী, সাতভাই চম্পা আর পারুল দিদি, ব্যঙ্গামা আর ব্যঙ্গামী...তাদের আমি কোনদিন দেখতে পাইনি। তারা কোথাও থাকে না, তারা কোথাও নেই। তাই বোধহয় তাদের রূপ আর কথা দুই-ই এত সুন্দর। কিন্তু ওরকম শুধু কল্পনার রূপকথা নয়, আমি যাদের স্বচক্ষে দেখেছি তাদেরই রূপের কথা বলতে পারি। বানিয়ে একটা মিথ্যে রূপকথা আমি বলতে পারব না।[১]

সুতরাং লেখকের এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই তাঁর মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি আমাদের ভবিষ্যতের নাগরিকদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন চারপাশের প্রকৃত ছবি। কখনো তা দুঃখে পিঙ্গাল, কখনো শোকে কালো কখনো আবার হতাশায় ধূসর। কিন্তু আশা আর ভরসার সোনালী আভাও তিনি ছড়িয়ে দিতে কার্পণ্য করেননি তাঁর গল্পগুলিতে। আর সেই কারণেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই গল্পগুলি আরও বেশি সংগত ও মহৎ হয়ে উঠেছে। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে শিশুর বিকাশ ও বৃদ্ধির সঙ্গো গল্পগুলি প্রেরণাদায়ক অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছে। লেখক পুত্র উত্তম ঘোষের কথায়ও সেই কথাই প্রকাশ পেয়েছে—

> সুবোধ ঘোষের শিশু বা কিশোর-সাহিত্য কখনোই পুরোপুরিভাবে কল্পনা ও অবাস্তব বা অলৌকিকতা নিয়ে গড়ে ওঠেনি। তার শিশু বা কিশোর কাহিনির মধ্যে একটা প্রকৃত জীবনবোধ থাকবেই।... শিশু কিশোর মানসে একটা সঠিক সমুচিত এবং অবশ্যই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর বীজ বপন করা সঙ্গাত, কারণ ভবিষ্যতের মানুষ তৈরির জন্য শিশুসাহিত্যের একটা পরম কর্তব্য রয়েছে।[২]

এই সমাজ সচেতন বাস্তববাদী লেখকের প্রতিটি লেখাই বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। তবে, আমরা ছোটোদের গল্পে সময় বা কালের ছায়া আর সেই সঙ্গে সমাজের ছবি অন্বেষণ করছি, তাই গবেষণার স্বার্থে নির্বাচিত কিছু কিশোর গল্পের ব্যবচ্ছেদ ও বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে দিয়েই কার্যটি সম্পাদনের চেষ্টা করব।

● **অশোকের শিলালিপি কাঁদল :** 'পুতুলের চিঠি' সিরিজের প্রথম গল্প এটি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গল্পটি রচিত। সমকালের সমাজ রাজনীতি আর অর্থনীতির চরম দোলাচলতা আর মানুষের ভীষণ দুরাবস্থার ছবি এই গল্পে উঠে এসেছে। শিশুপাঠ্য হলেও গল্পটি আসলে উক্ত সময়ের এক জ্বলন্ত দলিল। লেখক সোজা সরল বর্ণনায় আর শানিত শব্দ চয়নে কিশোর পাঠকের স্বাদকোরককে ভিন্নতর স্বাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছেন। আলোচ্য গল্পের মধ্যে দুটি গল্পকে সুকৌশলে একসূত্রে গেঁথে ফেলা হয়েছে। একটি বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে আর অপরটি অদূর অতীত থেকে আহৃত। শুরুতে লেখক স্বয়ং বলেছেন—"শুধু মনে পড়ছে দুর্ভিক্ষের কথা, যুদ্ধের কথা। বৃথা মনের ভিতর কতগুলি টর্পেডো ফাটছে, আর বড়ো বড়ো জাহাজ ডুবছে।"[৩] বাংলা নববর্ষের সুন্দর সকালে এই গল্পের সূচনা তবে পুণ্য আর পূর্ণতার মধ্যেই 'ন্যাংটো-রোগা-রুক্ষ-রুগ্ন' টিনের মগ হাতে সাক্ষাৎ দুর্ভিক্ষের প্রতিভূ এসে দাঁড়ায় লেখকের দরজায় সে—

> পয়সা চায় না, পোশাক চায় না, মিষ্টি সন্দেশ-টন্দেশ কিচ্ছু চায় না সে। দুটি ভাত কিংবা ভাতের ফেন। খাই খাই খাই শুধু খেতে চায়। কোনো বড়লোকের বমি পেলেও চেটেপুটে খেয়ে ফেলবে।[৪]

এরপর লেখক জানিয়েছেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও দুর্ভিক্ষের কথা এবং বলেছেন ছেলেটি হয়তো দূরের কোনো গ্রামবাংলার বাসিন্দা দুটি খাবারের আশায় ভিখারি হয়ে শহরের পথে পথে ঘুরছে। হয়তো একদিন তার সুস্থির স্বচ্ছন্দ অতীত ছিল বাবামায়ের আদর, সুখীগৃহকোণ, ফসলে ভরা মাঠ ছিল। আজ পরিস্থিতির কাছে সে হার মেনেছে। কেবল হতাশা আর ভয়ের কালোছায়াই নয় গল্পে এইসব রিক্তপ্রাণের জন্য ভালোবাসার নরম প্রলেপ আর মানবিকতার পাঠক দিয়েছেন পাঠকদের—

> মগের ভেতর কিছু খাবার ভরে দিয়ে আবার ওর মাথার কাছে রেখে দিলাম।...পয়লা বৈশাখের ভোরের আলোতে দুঃখী মানুষের প্রাণ ঘুমিয়ে যাক। কোন এক দূর পাড়াগাঁর একটা কচি মানুষের প্রাণ পথ হারা হয়েছে।...ঘুমাক ঘুমাক।[৫]

এই ঘটনা বর্ণনার পাশাপাশি পুতুলকে যে গল্প তিনি লেখেন, তাও আসলে একটি অভিন্ন ঘটনা মাত্র। যা তৎকালীন ভারতের দুর্ভিক্ষ জর্জরিত অনাহার ক্লিষ্ট সর্বহারা মানুষের ছবি তুলে ধরেছে পাঠকের সামনে। পরীক্ষা শেষে লেখক পায়ে হেঁটে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। হাজারিবাগ এলাকায় ময়ূরের ঝাঁকের পিছনে চলতে চলতে শেষে খোলা আকাশের নীচে বিরাটাকার পাথরের ওপর রাত কাটাতে হয়। আর সেখানেই এই গল্পের সূচনা। মধ্যরাতে সদ্যজাতের কান্নার শব্দ তিনি শুনতে পান, তারপর ভোরের আলোয় দেখতে পান, ঐ পাথরের গুহার মধ্যে রুগ্ন এক ভিখারি শিশু জন্ম নিয়েছে। জ্যোৎস্নার আলোয় ভরা পৃথিবীর রূপ যেমন সত্য, ভিখারি শিশুর নিরবচ্ছিন্ন কান্নাও তেমনই সত্য। এপ্রসঙ্গে লেখক মহাপুরুষদের জন্মের কাহিনিও শুনিয়েছেনকীভাবে গৌতম বুদ্ধের জন্মের আগে তাঁর মা সাদা হাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, যিশুর জন্মের আগে জেরুজালেমের পথিকেরা সন্ধ্যার আকাশে নতুন নক্ষত্র দেখতে পেয়েছিলেন। পুরাণেও দেবদেবীর ঘরে সন্তান জন্মের সময় পুষ্পবৃষ্টি-বীণাবাদ্য বেজে ওঠার কথাও শোনা যায়। যে শিশুটি গত রাতে জন্ম

নিয়েছে পাথরের গুহায়, সেই গুহার দেয়ালে শিল্প লিপি লেখা আছে। অশোকের মতো মহান সম্রাটের বাণী—"মানুষ সুখী হবে, সুখী হবে।" অথচ এই পুণ্য পাথরের আশ্রয়ে যে শিশু জন্ম নিল সে কোনো মহাপুরুষ নয়, বরং খিদের রাজ্যে নতুন এক ভিখিরি। ভারতের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির নিরিখে লেখক এর থেকে বেশি কিছু আর ভাবতে পারেননি।

● **আকাশ থেকে মিষ্টি ঝরে পড়ল :** গল্পটি জুড়ে আছে কিশোর ছেলেদের দুষ্টু মিষ্টি স্কুল জীবনর কথা। শাসন, মজা আর আদর্শের পাঠের অদ্ভুত মিশ্রণে লেখা গল্পটিতে সময়ের ছায়াও লক্ষ করার মতো। লেখকের নস্‌টালজিক আবেদন বারবার ধরা পড়েছে এই গল্পে। গল্পের শুরুতেই এসেছে মহাত্মা গান্ধির প্রসঙ্গ। আর তাঁর সঙ্গেই সময়ের অনুষঙ্গ। কাল বা সময়কে এখানে সুন্দরভাবে গল্পের প্রেক্ষাপট রচনায় ব্যবহার করা হয়েছে।

> গান্ধি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন।...তিনি আমাদের নেতা। তিনি বলেছেন স্বরাজ হবে, আমরা স্বাধীন হব, সব মানুষ মুক্তি পাবে, পৃথিবী থেকে হিংসা দূর হবে। মহাত্মা গান্ধির কথা মনে পড়লেই আমাদের দেশের ইতিহাসের আর এক বিরাট পুরুষের নাম মনে পড়েমহারাজ অশোকের কথা।[৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইতিহাস থেকে মণি-মুক্তার মতা করে বিষয় ও ব্যক্তিকে নির্বাচন করে কিশোরদের পাঠ্য গল্পে স্থান দিয়েছেন যা তাদের চিন্তা ও মননকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে। যেমন মহারাজ অশোকের স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পৃথিবীকে সুন্দর সুখী করে তোলার যে প্রয়াস ছিল তার সঙ্গে লেখক তাঁর ছেলেবেলায় গান্ধিজির মিল খুঁজে পেয়েছেন। তবে এইসব গুরুগম্ভীর ঐতিহাসিক বিষয়ই শুধু নয়, গ্রামবাংলার অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রমুখর পরিবেশকেও নিপুণ হাতে এঁকেছেন। শিবু নামক কেরানিকে আমল না দেওয়া, হৈ হৈ করে ইঁদারা থেকে জল তোলা (প্রসঙ্গত, স্কুলে পানীয় জলের জন্য ইঁদারার উপস্থিতিও সময়ের চিহ্ন বহন করেছে) আঠাফল খাওয়া, পণ্ডিতমশাইকে আঠাফল ছুঁড়ে বিরক্ত করা ইত্যাদি। তবে কেবল দুষ্টুমিই নয়, এই প্রতিষ্ঠান ছিল লেখকের ছোটোবেলার জ্ঞানের জানালা যা দিয়ে গোটা বিশ্বের আলো এসে পৌঁছাত ছোটো ছোটো প্রাণগুলিতে—"সেই ছোট বাংলা স্কুল, কিন্তু আমাদের কাছে আকাশের চেয়েও বড়। এখানে এসেই আমরা সারা পৃথিবীর খবর শুনতাম।"[৭]

স্যার জগদীশ বসুর কথা, মোহনবাগানের ফুটবল প্রতিভার কথা, গোপিয়া ডাকাতের কথা, আরও নানা কথার উল্লেখ করেছেন তিনি। এখানেই তাঁরা শোনেন গান্ধিজি স্কুলের পাশে গয়া রোড দিয়ে গাড়ি করে চলে যাবেন, আর তাঁকে দেখার জন্য কাতারে কাতারে লোক রাস্তার দুপাশে ভিড় করেছে। রাষ্ট্রনেতার জেল ছুটির দিনে প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের পরাধীন করে রেখে ক্লাস নেন, ড্রিল করান অকারণে কটুকথাও বলেনসেই ঘটনার প্রতিশোধ নিত গান্ধির যাত্রাপথের দু'পাশে আকাশ থেকে এলাজ দানার মতো মিষ্টি ঝরে পড়ার কথা বলে গোটা স্কুলের ছাত্রদের উদ্বেল করে তোলে ও শেষপর্যন্ত কয়েকজন ছাত্র মিলে কেষ্ট স্যারকে নাস্তানাবুদ করে সাজা দেয়। এই অভিনব কৌশলের প্রতিশোধ পাঠককে আনন্দিত করে তোলে। তবে পুরোটা ঘটনা জুড়ে গান্ধিজির মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ও জনমানসে তার প্রভাব আসলে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯২২ সালে আগস্ট আন্দোলনের সময় ৪ ফেব্রুয়ারি গোরক্ষপুরের চৌরিচৌরায় বিক্ষুব্ধ জনতা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের থানা আক্রমণ করে এই ঘটনায় ২২ জন পুলিশ নিহত হন। এই ঘটনায় মানসিকভাবে আহত হন অহিংসার পথযাত্রী গান্ধিজি, ফলে তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার

করে নেন। এরপর ১৯২২-এর ১০ মার্চ তিনি কারারুদ্ধ হন। ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা কাটিয়ে ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে তিনি ছাড়া পান। হিসেব করে দেখলে তখন সুবোধ ঘোষ কিশোর। ১১ বছরের পুতুলকে গল্পের শুরুতেই বলেছিলেন, তিনি যখন বয়সে পুতুলের সমান ছিলেন তখন থেকেই তিনি মহাত্মা গান্ধির নাম শুনেছেন। ছেলেবেলা থেকেই গান্ধিজি ওনার মনের সাথি হয়েছিলেন। একথাও একপ্রকার সত্যই সাল তারিখের হিসেবে। এই গল্পের মধ্যে দিয়ে ১১ বছরের পুতুল বা কিশোর পাঠক পাঠিকার হৃদয়ে অহিংসা দেশপ্রেম আর ভালোবাসা নামক অনুভূতিগুলি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন আর চেয়েছেন নিজেদের ছোটোবেলার একটা টুকরো সময় যা, ইতিহাসের সোনালি আলোর স্পর্শ পেয়েছিল তাকে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে।

● **বলাসুরের হাড় খুঁজে পেলাম :** এই গল্পও শুরু করার আগে সুবোধ ঘোষ পুতুলকে সেই সময়ের পরিবেশ পরিস্থিতির কথা বলেছেন। ক্ষুদে পাঠকটিকে গল্পের রঙে রাঙিয়ে তোলার আগে চারপাশের সমাজ ও সমকাল সম্পর্কে জ্ঞাত করেছেন—“আষাঢ়ের কোন চিহ্ন নেই। এখনও আকাশে বৈশাখ মাসের রাগ জ্বলছে। বেশ গরম পড়েছে। লোকের মুখে শুধু শুনছি ধান পুড়ে গেল, ধান পুড়ে গেল। একেই বলে গঙ্গা শুকু শুকু, আকাশে ছাই।”[৮]

স্টিফেন সাহেব ও বাংলা স্কুল শব্দগুলি থেকেই তৎকালীন ভারতের চিত্র ফুটে উঠেছে। একেবারে গ্রামের পাঠশালার শ্রেণিকক্ষ থেকে ছাত্রদের জীবনের একটা অধ্যায় তুলে এনেছেন। মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড বা রত্নের উৎপত্তিকে কেন্দ্র করে বাংলা স্কুলের দুই শিক্ষকের মতাদর্শের দ্বন্দ্ব উঠে এসেছে এই গল্পে। প্রাচীনমনস্ক ধরণী পণ্ডিত পুরাণ অনুসারে ছাত্রদের মূল্যবান প্রস্তর বা রত্নের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করেন, অনেক যুগ আগে পৃথিবীতে বল নামে এক অসুর ছিল। এই বলাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্যন্ত হারিয়ে দিয়েছিল। দেবতাদের চক্রান্তে সেই বলাসুর নিজেকে পশুরূপে যজ্ঞে বলি দেন। তারপর তার হাড়ের খণ্ড পৃথিবীর নদী সমুদ্র পর্বত ও জঙ্গালের ওপর পড়তে লাগল। সেই বলাসুরের হাড়ই হল রত্ন।

অপরদিকে বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তদা যে কিনা ছাত্রদের প্রিয় মানুষ, তিনি এই একই বিষয়কে ব্যাখ্যা করলেন বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে বলেছেন জন্মলগ্নের পৃথিবীর গরম-নরম অবস্থার কথা, তাপ ও জলের তারতম্যের ফলে গঠিত প্রস্তরের কথা তাদের চেহারার পার্থক্যের কথা। এবং একথাও বললেন পাথরকে শনাক্ত করতে হয় আলট্রা ভায়লেট ল্যাম্প দিয়ে। আর এই ল্যাম্প বানাবার সহজ পদ্ধতিও বলেছেন সব মিলিয়ে এক দ্বন্দ্বমুখর স্কুলের ছবি ফুটে উঠেছে। তবে প্রত্যক্ষভাবে সময় বা ইতিহাসের উল্লেখ না থাকলেও গল্পের শরীর জুড়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের টুকরো টুকরো ছবির কোলাজ ধরা পড়েছে। মাস্টার মশাইয়ের কাছে পিস্তলের উপস্থিতি উত্তপ্ত রাজনৈতিক কালকেও চিহ্নিত করছে।

● **একদিন লাটসাহেব হয়েছিলাম :** ভাইঝি পুতুলকে বলা অপর একটি মিষ্টি গল্প এটি। শুরুতেই বর্তমানের আবহাওয়া ও পরিবেশের কথা বলেছেন তারপর সময়ের পথ ধরে অতীতের অধ্যায়ে যাত্রা করেছেন আর অঞ্জলি ভরে তুলে এনেছেন। একটি ব্যতিক্রমী গল্প। গল্পের ছত্রে ছত্রে ইতিহাসের তথা সময়ের পদচারণা লক্ষ করার মতো। গল্পের নামের মধ্যে ব্রিটিশ সভ্যতা ও ‘বড়লাটের’ উল্লেখ পাই আর গল্পে পাই ভারতবর্ষের এক অতি পুরাতন ত্রাসের কাহিনি ‘ঠগি’। ঠগিদের প্রসঙ্গে স্বয়ং লেখক বলেছেন—

> উত্তর ভারতে ঠগি নামে একটা খুনি মানুষের দল ছিল। পথে-ঘাটে ওরা ভালো মানুষের মতো ঘুরে বেড়াতো। ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রী, বরযাত্রী বা গেরস্থ, যে কোনো পথিকের সঙ্গে পথের মধ্যেই আলাপ জমিয়ে... সুযোগ বুঝে...আগে মেরে ফেলে তারপর পথিকের টাকাকড়ি নিয়ে সরে পড়ত।[৯]

লেখক এও বলেছেন ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ঠগি থাকত। আর তারা একই পদ্ধতিতে কাঁধের গামছায় ফাঁস দিয়ে পথিককে হত্যা করত। তারা ছিল ভবানী বা দেবী মাতার ভক্ত তাদের সাংকেতিক ভাষা থাকত, যা দিয়ে অপরিচিত ঠগিকেও তারা চিনে নিত। অনেক বড়ো বড়ো মানুষেরও ঠগি থাকত, এটা তাদের জন্য অর্থ উপার্জনের মাধ্যম ছিল মাত্র।

ঠগিরা পথিককে হত্যা করে লুঠ করার পর আগের থেকে খুঁড়ে রাখা গর্তে মৃতদেহ ফেলে দিত। এইসব গর্তকে বলা হত ঠগি গড়হা। লেখক একবার হাজারিবাগ শহর থেকে মাইল তিরিশেক দূরে বাসে করে গ্র্যান্ডট্যাঙ্ক রোডের ধারে ঠগি গড়হা দেখতে যান। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পেশা ও পেশার মানুষও লুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমানে এই জায়গার নাম রবার্টগঞ্জ। ব্রিটিশ শাসনের ও আধিপত্যের অদ্ভুত ও হাস্যকর সব ছবির কথা তুলে ধরা হয়েছে এই গল্পে।

এই অঞ্চলে রবার্ট সাহেব গালার একটি কুঠি খোলেন তাই এর নাম রবার্টগঞ্জ। প্রত্যন্ত গ্রামে গির্জার উপস্থিতি, চাষী ঘরের ছেলের ইংরাজি নাম, ভাতকে রাইস, ডালকে স্যুপ আর ভেন্ডির ঝোলকে স্টু বলার প্রবণতা তবে এইসব আদব কায়দাগত পর্দার আড়ালে চূড়ান্ত দরিদ্র তার অনাহার নিয়ে বাঁচার গল্পও আছে। লেখক জীবনের দুটি সত্যকেই পাশাপাশি স্থান দিয়েছেন তাঁর গল্পে ওই অনাহার ক্লিষ্ট সেবককেও লেখক কখনো ঠগিদের উত্তর পুরুষ বলে ভয় করেছেন, তবে শেষপর্যন্ত গল্পের মানুষগুলোর জন্য সহানুভূতি আর দীর্ঘনিশ্বাস জমে থাকে। যা পাঠক কিশোর কিশোরীদের আগামী দিনে উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তুলবে।

● **দানবী ও মানবী দেবী :** এই গল্পের শুরুতে সুবোধ ঘোষ পুতুলকে বলেছেন, তিনি কোনো বানানো গল্প তাকে বলতে পারবেন না, যা স্বচক্ষে দেখছেন সেই গল্পই বলবেন সে গল্প কল্পনার রঙে রঙিন নয়, নিটোল সুন্দর তার রূপ নয়, বরং বাস্তবের আলোছায়ায় সে মোহময়, খুঁত আর অপূর্ণতাই তাকে পূর্ণতা দেয় প্রকৃত অর্থে। যে-কোনো দৃশ্যের শুধুমাত্র আলোর দিকটা অর্ধসত্য তা লেখক বোঝাতে চেয়েছেন মাত্র। এই গল্প আসলে এক দুঃখী মায়ের। নাম শুনেই বোঝা যায় নারীর তিনটি রূপের কথা বলা হয়েছে এখানে। প্রথমে বর্ণিত হয়েছে তার দানবী রূপের ভয়াবহতা। হতভাগিনী মায়ের একমাত্র সন্তান ভিখুকে কোল থেকে বাঘে খেয়ে নেয়, তারপর থেকেই সকলে অলক্ষুণে, অপয়া, ডাইনি বলে সন্দেহ করতে থাকে। ক্রমে মাঠের মকাই শুকিয়ে যাওয়া ও তিনটি ছেলের বসন্তে মারা যাওয়ার কারণও তিনিই হয়ে ওঠেন। প্রসঙ্গত মহামারী ও খরার মতো দুটি ভয়াবহ অধ্যায়কে লেখক মাত্র দুটি লাইনের মধ্যে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন। হতভাগ্য এই নারীর চেহারার বাহ্যিক রূপও কোথাও মিলে যায় দানবী রূপের সঙ্গে—"পাকা চুলের শুকনো চামড়া, মুখের দু কষ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়া এবং এক চোখ কানা করা ভয়ংকর।"[১০]

দ্বিতীয়বার তাকে দেখা গেছে শহরে ভিড়ের মধ্যে কাঠ কুড়ুনিরূপে। নিজের অদৃষ্টের পরিহাস ও জীবনের যন্ত্রণা সে কেঁদে কেঁদে শুনিয়েছে মানবী রূপে। আর তৃতীয়বার তাকে বনদেবী রূপে তুলে ধরেছেন লেখক। এক রোমাঞ্চকর ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন এই অংশটি। ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে সাদা ফুলের মালায় সুসজ্জিতা নারী ধীর ছন্দে দুলে দুলে বনমধ্যে ভ্রমণ করেন আসল

ঘটনাটি হল—"জঙ্গল অফিসের গার্ডদের ভয়ে দিনে জঙ্গালে ঢুকতে পারে না বলে, রাত্রিবেলা লুকিয়ে জীবজন্তুর হাড় কুড়িয়ে রমজান মিঞার আড়তে বিক্রি করে..."[১১] গল্পে নারীর রূপের বদল ঘটেছে কিন্তু সমাজে সব কালেই নারীর অসহায়তা, আর্থিক সচ্ছলতা, ডাইনি অপবাদ, তার অসম্মানের চিত্র অপরিবর্তিত থেকে গেছে। তিন ক্ষেত্রেই সে সন্তানহারা, দরিদ্র, অসহায় সমাজের শাসনের ভয়ে ভীত। আসলে এসবের মধ্যে দিয়ে মানুষের প্রতি সহানুভূতির চেতনাই জাগ্রত করতে চেয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালেই লেখক হিসেবে সুবোধ ঘোষের আত্মপ্রকাশ ১৯৪০ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ফসিল' গল্পের মধ্যে দিয়ে। সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস তখনও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা অপর এক ভয়াবহ দোলাচলতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সূচনা করে। একদিকে আন্তর্দেশীয় রাজনীতিতে ফ্যাসিবাদের উপস্থিতি আর অপর দিকে দেশীয় রাজনীতির অন্তর্দন্দ্ব। সুবোধ ঘোষ অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মতামত খুব স্পষ্ট ও অকপট ভঙ্গিতে প্রকাশ পেতে থাকে তাঁর বিভিন্ন লেখায়। একসময় তিনি কংগ্রেস দলে নাম লেখান। পরবর্তীতে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থাকলেও, গান্ধিজির একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে যান। তাঁর বিভিন্ন গল্প 'আকাশ থেকে মিষ্টি ঝরে পড়ল'-তে গান্ধিজির প্রসঙ্গ দেখা গেছে।

এই সময় যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, আন্দোলন আর স্বাধীনতা ও দেশভাগ এইসব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে গতিময় হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধ আর রাজনীতির কৌশল মানুষকে ক্রমশ মূল্যবোধহীন করে তুলেছিল। সুবোধ ঘোষের কিশোর গল্পগুলিতে সময় ও জীবনের যে রূপ প্রতিফলিত হয়েছে তা সত্যের আলোয় উজ্জ্বল মানবিকতার স্পর্শে স্নিগ্ধ আর ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার আদর্শে পূর্ণ। বৃহত্তর জীবনের অভিজ্ঞতার গভীরতায়, উপলব্ধিতে ও প্রসারে গল্পগুলির অভিনবত্ব সত্যিই অনস্বীকার্য। এক হাতে এই সকল গল্পগুলি সমকালকে স্পর্শ করে আে আর অন্য হাতে উত্তর কাল।

উৎসের সন্ধানে

১. উত্তম ঘোষ সম্পাদিত : 'কিশোর গল্প সুবোধ ঘোষ' শিশু সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১০৩
২. উত্তম ঘোষ সম্পাদিত : 'কিশোর গল্প সুবোধ ঘোষ', শিশু সাহিত্যসংসদ, জানুয়ারি ১৯৯৯
৩. তদেব, পৃ ৬২
৪. তদেব, পৃ ৬১
৫. তদেব, পৃ ৬২
৬. তদেব, পৃ ৬৬
৭. তদেব, পৃ ৬৮
৮. তদেব, পৃ ৭৪
৯. তদেব, পৃ ৮৬
১০. তপন মণ্ডল : 'গল্পকার সুবোধ ঘোষ : জীবনদৃষ্টি ও নির্মাণ শিল্প', জ্ঞানবিচিত্রা, আগরতলা, জুলাই ২০০৭, পৃ ১২২
১১. তদেব, পৃ ১২২

বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকের নির্বাচিত বিদেশি লেখকগণ

নির্মল বিশ্বাস

বাংলা ভাষা ব্যবহারের নিরিখে বর্তমান বিশ্বে পঞ্চম। আর বাংলা সাহিত্যও বর্তমানে এক মহীরূহ সদৃশ। বাংলা ভাষা সাহিত্যের এই বিকাশে ও বিশ্ববিস্তারে একদিকে আছেন লোকশিল্পীগণ, আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো গগনচুম্বী প্রতিভাধর বিশ্বকবি সাহিত্যিকগণ, আর আছেন এমন কিছু সাহিত্যিক যাঁরা জন্ম পরিচয়ে বাঙালি কিংবা ভারতীয় নন, সম্পূর্ণ বিদেশি। বাংলা সাহিত্যের পাঠক রূপে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে এই সাহিত্যে লেখ্য গদ্যের প্রবর্তন ঘটেছিল মূলত বিদেশি পরিচয়ের কিছু লেখকের প্রচেষ্টায়। আর এটা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে উত্তরণে, আধুনিক ভাব ভার বহনে সাহিত্যে গদ্য ভাষার ব্যবহার ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাই বাংলা সাহিত্যে বিদেশি লেখকদের সাহিত্য চর্চা সামান্য, কিংবা প্রয়োজন চরিতার্থতার নামান্তর হলেও ইতিহাসের নিরিখে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম যুগের বিদেশি লেখকদের গদ্য চর্চা ছিল উপযোগবাদ সর্বস্ব; সাহিত্যে ফুল ফোটানোর উদ্দেশ্য তাঁদের বেশিরভাগজনেরই ছিল না। নবিশি গদ্য চর্চার নিদর্শন হলেও এঁদের কারো কারো গদ্য যুগের নিরিখে অবশ্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম কেরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাংলা সাহিত্যে প্রথম যুগের বিদেশি গদ্য লেখকদের সাহিত্যচর্চা যেখানে নবিশি অক্ষমতা কিংবা উপযোগবাদ সর্বস্ব ইত্যাদি বিশেষণে সমালোচিত হয়; সেখানে এদেরই উত্তরসূরী রূপে বিশ ও পরবর্তী শতকে যে সমস্ত লেখককে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে পাওয়া গেল, তাঁদের চর্চা বাংলা সাহিত্যকে দিল তার আঙিনা অতিক্রম করে বিশ্বসাহিত্যের বিস্তৃত ভুবনে আরও পরিচিতি, দিল নিজ আঁচলকে আরও বর্ণময় করে তোলার বর্ণচ্ছটা। বিশ শতকে যে সমস্ত লেখক বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন এই সাহিত্যাঙ্গানকে সুসজ্জিত করে

তুলতে তাঁদের সীমিত সাধ্য আর অপরিসীম উৎসাহ দিয়ে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফালোঁ, আঁতোয়ান, পল দ্যতিয়েন, মিংগো, কাজুও আজুমা, শিলিংস এঞ্জেলবার্ট, কেইকো আজুমা, কেইও আরাই, কিওকো নিওয়া, মার্টিন কেম্পচেন প্রমুখ। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকের এই পরিযায়ী লেখকদের সম্বন্ধে সাহিত্যের ইতিহাসে সেভাবে আলোচিত হয়নি। ফলত সাধারণ পাঠকদের অনেকেরই এঁদের কথা আজও অজানা। তাই এঁদের সাহিত্য চর্চা; কিংবা সে চর্চার ফলশ্রুতি বাংলা সাহিত্যকে কতটা উদ্বোধিতও সমৃদ্ধ করেছিল, সেকথা আলোচনার অবকাশ অবশ্যই থেকে গেছে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যে বিশ ও পরবর্তী শতকের বিদেশি লেখকগণের সাহিত্যচর্চার অভিমুখ অভিপ্রায় ফলশ্রুতি ইত্যাদি দিকগুলির সন্ধান নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকের বিদেশি লেখকগণের সাহিত্যচর্চা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এঁদের বাংলা সাহিত্যচর্চার অভিমুখ বিশেষভাবে কয়েকটি দিকে পরিচালিত। এঁদের বাংলা সাহিত্যচর্চা পূর্ববর্তী শতকের বিদেশি লেখকদের মতো অনুবাদ সাহিত্যের দিকে বিশেষ ভাবে অভিনিবিষ্ট হলেও এই চর্চায় গুণগত, মাত্রাগত উদ্দেশ্যগত ফারাক রয়েছে। এঁদের অনূদিত সাহিত্য পূর্ববর্তী শতকের লেখকদের মতো নবিশি অক্ষমতার নিদর্শন যেমন নয়, তেমনি বৈচিত্র্যে তা অনেক বর্ণময়; আর সাহিত্য গুণেও প্রথম শ্রেণির সমকক্ষ। পূর্বসূরীদের মতো প্রয়োজন চরিতার্থতার যূপকাষ্ঠে মাথা বিকিয়ে এঁরা বাংলা অনুবাদে অবতীর্ণ হননি; এঁদের বাংলা অনুবাদ সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্য সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান প্রদানে এই ক্ষেত্রদ্বয়কে আরও সমৃদ্ধ, আরও বৈচিত্র্যময় করে তোলা, আরও কাছাকাছি আনা। আর এই সাধু উদ্দেশ্যের ফলশ্রুতিতেই বিশ ও পরবর্তী শতকের বাংলা সাহিত্যের বিদেশি লেখকদের সাহিত্য চর্চা সমুজ্জ্বল। এঁদের সেই উজ্জ্বল সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার সন্ধান এখন নেওয়া হবে।

বিদেশি লেখক হিসাবে বাংলা সাহিত্যের পরিযায়ী লেখকগণের সঙ্গে তাঁদের স্ব-স্ব দেশের সাহিত্যের বিশেষ পরিচয় ছিল। আর তাঁদের সেই বিশেষ পরিচয়কে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের ভুবনে তুলে ধরে এই সাহিত্য ক্ষেত্রকে দিয়েছেন অনন্য বৈচিত্র্যময়তা। এ প্রসঙ্গে এখন আলোচনায় যাওয়া যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকের বিদেশি লেখকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন 'বেলজিয়ান ত্রয়ী' ফালোঁ, আঁতোয়ান ও দ্যতিয়েন। এঁদের মধ্যে ফাঁলো (১৯১২ ১৯৮৫) মূলত খ্রিষ্টীয় ধর্মসাহিত্য গ্রিক, লাতিন ও ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর সেসব অনূদিত রচনা অবশ্য বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতে তেমন কোনো জল সেচন করেনি। কিন্তু ফাঁলোর কিছু নিবন্ধ 'ভারতকোষ' গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলির মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনেক নতুন কথা বাঙালিদের কাছে ধরা পড়েছে। ফাঁলোর সেসব নিবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'আদম', 'ঈভ', 'গির্জা', 'খ্রিস্টধর্ম', 'জিভিয়ার সেন্ট', 'খ্রিস্টধর্ম ভারতে' প্রভৃতি। আপাত ভাবে এগুলিকে খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত রচনা বলে মনে হলেও এগুলির একেকটি ভাষাতত্ত্ব, স্থাপত্যবিদ্যা, মানবতাবাদ, নৃতত্ত্ববিদ্যা ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞানবিদ্যার তত্ত্বে ও তথ্যে সুসমৃদ্ধ। পাশাপাশি গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনামূলক হলেও রচনাগুলি কিন্তু বেশ সরস ও সাবলীল। এসব নিবন্ধগুলির মধ্যে দিয়ে বাঙালি পাশ্চাত্যের জ্ঞানতত্ত্বের বহু অজানা কথা জানতে পারেন। যেমন 'গির্জা' নিবন্ধে গির্জা শব্দের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে এই স্থাপত্যের নানান কারুকুরি দিকগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'ঈভ' প্রবন্ধটি শুধু মানবজাতির প্রথম নারীর পরিচয় দানের নিমিত্তই রচিত নয়। নারী জাতির প্রতি যুগ যুগ ধরে বঞ্চনা এবং অবদমনের যে করুণ ইতিহাস আজও বয়ে চলেছে,

তার আদি উৎসকে ধরতে চাওয়া হয়েছে এখানে। ফাঁলোর রচনা বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্যের তত্ত্ব ও তথ্যের আকরে করেছে সমৃদ্ধ।

বিশ শতকের অপর উল্লেখযোগ্য লেখক আঁতোয়ান (১৯১৪-১৯৮১) তাঁর অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্যের ক্লাসিক সাহিত্য তরীকে এনে ভিরিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের পোতাশ্রয়ে। আঁতোয়ানের লেখনী থেকেই বাঙালি প্রথম পেয়েছে ভার্জিলের লাতিন মহাকাব্য 'ঈনীড' এবং গ্রিক ট্র্যাজেডি 'থেবীয় নাট্যগুচ্ছ'র সরাসরি বাংলা অনুবাদ। আঁতোয়ান এই অনুবাদ কর্মে সঙ্গী রূপে পেয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হৃষীকেশ বসুকে। তাঁদের যৌথ প্রয়াসে উক্ত দুই ক্লাসিক সাহিত্য ফলবতী হয়ে বাংলায় ধরা দিয়েছিল। অনুবাদ কর্মে সাহিত্য রস অক্ষুণ্ণ রাখতে অনুবাদকদ্বয় ছিলেন বিশেষভাবে সচেতন। আপন কবিত্ব শক্তি জরিপ করে তাই তাঁরা 'ঈনীড'র অক্ষম পদ্যানুবাদ থেকে সরে এসে করেছিলেন গদ্যানুবাদ, যাতে এর সাহিত্যরস অনর্থক নষ্ট না হয়। আঁতোয়ানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যের এই ক্লাসিক সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সে যুগের সংস্কৃতির যে ছবি প্রতিফলিত হয়েছে, তা বাঙালিদের কাছে তুলে ধরা। এই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে তা যথেষ্ট সাহিত্য গুণান্বিত হয়েই উপস্থাপিত হয়েছে। আর এ প্রসঙ্গেই 'ঈনীড'-এর আইনেয়াসের সঙ্গে বাঙালির চির পরিচিত রামের তৌলন আলোচনা অনুবাদে গুরুত্ব দিয়ে আঁতোয়ান তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে ট্র্যাজেডির আঁতুরঘর গ্রিকের ক্লাসিক ট্র্যাজেডি এবং থেবীয় পুরাণের আকর্ষণীয় কাহিনির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটাতেই তাঁর 'থেবীয় নাট্যগুচ্ছ'র অনুবাদ। এটা অবশ্য মূলের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাব্যে অনুবাদ করেছেন। আঁতোয়ান গ্রিক এলিজি ছন্দকে বাংলায় প্রকাশ করার মতো আত্মশক্তি নিয়েই এই কাব্যানুবাদ করেছিলেন এবং একাজে তিনি যথেষ্টই সফল। সমালোচক ড. সুরঞ্জন মিদ্যে এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> এই নাট্য অনুবাদ গ্রন্থের দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা আর টীকা-টিপ্পনী, সঙ্গীত বহুল গ্রিক নাট্যসম্ভারকে অনায়াসে মুগ্ধ করায়। অনুবাদক আঁতোয়ান একই সঙ্গে গ্রিকসাহিত্য সমাজজীবন এবং বাংলাভাষার মূল সুরকে ধরতে পেরেছিলেন।[১]

এই দুই অনন্য সাধারণ অনুবাদের পাশাপাশি আঁতোয়ান বেশ কিছু প্রবন্ধের মধ্যে দিয়েও পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় হল 'আরিস্তোফেনাস', 'ফ্লবেয়ার গুস্তভ', 'তাস্সো', 'তেরেনতিয়ুস' প্রভৃতি নিবন্ধগুলি। 'ভারতকোষ' গ্রন্থে প্রকাশিত পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক ও সাহিত্য চরিত্র সম্পর্কিত উক্ত নিবন্ধগুলি বাঙালি পাঠককুলকে পাশ্চাত্যের ক্লাসিক সাহিত্য সম্পর্কে একদিকে যেমন অবহিত করে, তেমনি যুগপৎ উৎসাহিত করে উক্ত সাহিত্য চর্চাতেও।

বেলজিয়ান ত্রয়ীর কনিষ্ঠ দ্যতিয়েন (১৯২৪ ২০১৬) অনন্য রম্য রচনাকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর অসংখ্য রম্য রচনামূলক গ্রন্থ 'ডায়েরির ছেঁড়া পাতা' (১৯৭১), 'রোজনামচা' (১৯৭৩), 'আটপৌরে দিনপঞ্জি' (২০১৩), 'গদ্যসংগ্রহ' (২০১২), 'সাদাসিধে খসড়া' (২০১৭) প্রভৃতির অনেকগুলি রচনাতে তিনি পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকজন ভারত ভ্রমণকারীর অভিজ্ঞতা জরিপ করেছেন। রম্য রচনার রমণীয়তার মধ্যেও যে সমালোচনার মতো গুরগম্ভীর আলোচনা সম্ভব, তা দ্যতিয়েনের গদ্যসাহিত্য পাঠ করলে সহজে বোঝা যায়। 'বঙ্গাদেশের পত্রগুচ্ছ', 'এশিয়াতে বর্বর', 'এক সাংবাদিকার ভারত যাত্রা', 'এলিয়াদের ভারত', 'বিদেশির দৃষ্টিতে কলকাতা', 'ভারত আর এক গ্রহের নাম', 'ভারত ভ্রমণ জ্ঞানান্বেষণার্থে', 'আটপৌরে ভারত' প্রভৃতি রচনাগুলিতে

দ্যতিয়েন বিভিন্ন সময়ে ভারত তথা বাংলাদেশে আগত ফরাসি নাবিক, পর্যটক, সাংবাদিকদের এদেশ সম্পর্কে ধারণা, তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে এবং সেগুলির সম্যক আলোচনা করে দেখাতে চেয়েছেন তাঁদের ধারণা কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল। আর এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে ভারত ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিচয় পরস্পরের কাছে যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি এদেশ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা হয়েছে উন্মোচিত। 'বঙ্গদেশের পত্রগুচ্ছ' রচনায় দ্যতিয়েন ফরাসি কাপ্তেন এফ. দাভিল 'র এদেশ সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করে লিখেছেন—"বাঙালিরা কলহপরায়ণ। ঝগড়া করে, তবে মারে না। ওরা খোসামুদে, ঘুষখোর আর হিংসুটে।"[২]

কিন্তু এই একমুখী ভ্রান্ত ধারণাই যে সমস্ত পাশ্চাত্যবাসী পোষণ করেন এমন নয়; সে কথাই দ্যতিয়েন তুলে ধরেছেন আঁকেতিলের জবানিতে তাঁর 'ভারত সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক গবেষণাবলি' নামক গ্রন্থের সমালোচনামূলক 'ভারতভ্রমণজ্ঞানান্বেষণার্থে' রচনায়—"ভারত জ্ঞান ইউরোপীয় শিক্ষার যথার্থ পরিপূরক : ভারতীয়দের গ্রন্থরাজিও আমাদের পড়তে হবে, ঠিক যেমনভাবে আমরা গ্রিক লাতিন পড়ি। তাদের ভাল করে বোঝাটাই আদিকৃত্য।"[৩]

এরকম অনেকগুলি রচনায় পাশ্চাত্যের বিভিন্ন লেখকের ভারত সংক্রান্ত রচনার আলোচনার মধ্যে দিয়ে দ্যতিয়েন দুই ভিন্ন সংস্কৃতিকে আরো কাছাকাছি আনার সাহিত্য প্রয়াস নিয়েছেন। তাঁর এরকম প্রয়াসের আর একটি ফসল হল বিখ্যাত ফরাসি শিশু কিশোর সাহিত্যিক অঁতোয়ানদ্য সাঁতেকসুপেরির 'ল্য প্যতি প্র্যাস (১৯৪৩) নামক বিখ্যাত কিশোর সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ 'ছোট রাজকুমার' গ্রন্থটি। ফরাসি কিশোর সাহিত্যের এই উজ্জ্বল রত্নটি দ্যতিয়েনের কলমে মূলের রূপ রস সহ বাংলায় অনূদিত হয়েছে। জীবনের প্রাত্যহিকতায় কীভাবে মনের সরলতা, স্বাভাবিকতা হারিয়ে আমরা ধীরে ধীরে যান্ত্রিক, হিসাবি হয়ে পড়ছি; এবং তার থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ জীবনের প্রয়োজনীয়তার ঊর্ধ্বে উঠে শিশুর মতো আকাশচারী মনকে পুনরায় অর্জন করার সাহিত্যিক উপশম হল এ গ্রন্থটি। শিশু কিশোর সাহিত্যের এই অনন্য গ্রন্থটিকে দ্যতিয়েন বাংলায় অনুবাদ করে এই সাহিত্য ধারায় যোগ করেছেন এক নতুন মণি রত্ন। বিশ্ব সাহিত্যের মণি-মুক্তো সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যকে শ্রীময়ী করে তোলার যে শুভ কর্ম বিদেশি সাহিত্যিকগণ করেছেন, দ্যতিয়েন তাঁদের মধ্যে অনন্য সাধারণ। বিশ শতকের আরেক বিশিষ্ট বিদেশি লেখক মিংগো ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে অনূদিত 'মঙ্গলবার্তা বাইবেল' এ বাঙালিয়ানার যে প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা প্রমাণ করে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম প্রেমকে। এই প্রেমের দরুণই তিনি খ্রিস্ট সাহিত্যেও ঠাকুর, ভগবান, পূজা জাতীয় শব্দগুলি নিঃসংকোচে ব্যবহার করেছেন। অথচ এরকম শব্দগুলিই পৌত্তলিকতার প্রকাশক ভাবে প্রটেস্টান্ট মিশনারিগণ কিন্তু তাঁদের অনূদিত বাইবেলে সযত্নে পরিহার করেছিলেন।

বাংলা তথা ভারত ও বিশ্ব সাহিত্য সংস্কৃতির মেলবন্ধনের বিদেশি লেখকগণের কর্ম প্রচেষ্টায় আরেক উজ্জ্বল মিনার হলেন কাজুও আজুমা (১৯৩১-২০১১)। সাহিত্য ও জীবন চর্যার মধ্যে দিয়ে তিনি আজীবন এই মেলবন্ধনের প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। রবীন্দ্র প্রেমের অমোঘ টানে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছেড়ে তাঁর ভারতে আসা। কিন্তু ভারতে তিনি শুধু নিতেই আসেননি, বরং বহুগুণ ফিরিয়ে দিতে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ, সদা তৎপর। আজুমার মেলবন্ধনের এই কর্মপ্রয়াস সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক দ্বিমুখী প্রচেষ্টায় রূপায়ন সম্ভব হয়েছে। সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে তিনি অনন্য সাধারণ প্রয়াস চালিয়েছিলেন। মুখ্যত তাঁর প্রচেষ্টাতেও শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বহু

আকাঙ্ক্ষিত 'নিপ্পন ভবন' (১৯৯৪ খ্রিঃ)। আজুমার অগ্রণী ভূমিকাতেই পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হয়েছে ভারত জাপান সাংস্কৃতিকচর্চার কেন্দ্র 'ভারত জাপান সংস্কৃতি কেন্দ্র : রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন'। আবার জাপানেও রবীন্দ্রচর্চাকে বহু বিস্তৃত করতে সেখানে তিনি নিয়মিত রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন, রবীন্দ্র সংগীত নৃত্যের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করেছেন।

অন্যদিকে সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডেও তিনি ভারত জাপান সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কাছাকাছি আনতে আজীবন ছিলেন সদা উৎসাহী। তাই বাংলা ভাষা আয়ত্তের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নোবেলজয়ী জাপানি ঔপন্যাসিক কাওয়াবাতার 'নিজি' উপন্যাসটি 'ইন্দ্রধনু' (১৯৬৯ খ্রিঃ) নামে এ ভাষায় অনুবাদ করে বাঙালিদের উপহার দিয়েছিলেন। এই প্রথম জাপানি কোনো উপন্যাস সরাসরি বাংলা ভাষায় অনূদিত হল। জাপানি সংস্কৃতি, এদেশ সম্পর্কে ভারতভ্রমণকারী জাপানিদের ধারণা কীরূপ তার সন্ধান দিতে আজুমা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন 'ভারতভ্রমণ দিনপঞ্জি' এবং 'শিতোকু হোরির দিনপঞ্জি' নামক ডায়েরি দুটি। সেই সঙ্গে জাপানি সংস্কৃতির নানান দিককে তুলে ধরে তাঁর স্বরচিত বিভিন্ন নিবন্ধের সংকলন 'উজ্জ্বলসূর্য' গ্রন্থটিও উক্ত প্রয়াসেরই আরও একটি নিদর্শন। তবে বাংলা সাহিত্যের বিশ্ব বিস্তারে আজুমার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হল সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলির জাপানি অনুবাদ। তাঁর পৌরোহিত্যে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে 'দাইসান বুমবেই' প্রকাশনা থেকে ১২খণ্ডে সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলির জাপানি অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল। বিশ্ব সাহিত্যাকাশে বাংলা সাহিত্যের এই বিস্তৃত উদ্ভাসন বিরল। রবীন্দ্রচরণে নিবেদিত আজুমার এটাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। এভাবে আজীবন আজুমা তাঁর সমগ্র জীবন চর্যার মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে উদ্বোধনে কাজ করে গেছেন। আজুমার এই অনন্য প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ তাঁর সহধর্মিনী কেইকো আজুমাও আজীবন এই ধারাতেই জীবন তরী ভাসিয়েছেন। তাই স্বামীর সঙ্গে তিনি ভারতে এসেছেন, বাংলা ভাষা, রবীন্দ্র সংগীত শিখেছেন, জাপানি সংগীত এদেশিয়দের শিখিয়েছেন, জাপানে আগত ভারতীয় বাঙালিদের অকুণ্ঠ আতিথেয়তা প্রদান করেছেন; আবার জাপানে রবীন্দ্র সংগীত নৃত্য নিয়মিত পরিবেশন করে বাংলা সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যচর্চাতেও তিনি পিছিয়ে থাকেননি। 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বর্তমান জাপানে রবীন্দ্রচর্চা' (২০০১ খ্রি.) নামক নিবন্ধটি তাঁর বাংলা ভাষা সাহিত্য চর্চার বিশিষ্ট নিদর্শন। জাপানে রবীন্দ্রচর্চা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চার দিকগুলি তুলে ধরে তিনি এখানে দেখাতে ছেয়েছেন জাপানে রবীন্দ্র ও ভারত প্রীতির স্বরূপ। অন্যদিকে জাপানের লোকসংস্কৃতির সম্পর্কে বাঙালিদের ধারণা প্রদান করতে রবীন্দ্র গবেষক কিওকো নিওয়ার লেখা 'জাপানের লোকসংস্কৃতি' (২০০১ খ্রি.) নামক নিবন্ধটি সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনেরই আরও একটি উজ্জ্বল প্রয়াস। এখানে কিওকো জাপানের লোকসংস্কৃতি চর্চা, সংগ্রহের ইতিহাস, সাহিত্যে তার প্রভাব ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে ধরে ইতিহাসের দিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন; তেমনই জাপানি লোককথায় ভারত ও চিনের প্রভাব আলোচনা করে যুগে যুগে যে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ঘটে চলেছে, সেই দিকটিকে করেছেন আলোকিত।

বাংলা দেশ সাহিত্যের প্রতি প্রেমের বহিঃপ্রকাশে এই সাহিত্যের অনেক ফসল জার্মান, ফরাসি ভাষায় তুলে ধরতে এগিয়ে এসেছেন বিশ শতকের অনেক লেখক। এঁদের মধ্যে ফাঁলোর কলমে শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র উপন্যাস 'গোরা'র ফরাসি ভাষায় অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অন্যদিকে জার্মান সাহিত্যাকাশে বাংলা সাহিত্যের রংধনু ছড়িয়ে দিয়েছেন মার্টিন কেম্পচেন। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেছে কয়েকটি বাংলা রচনার জার্মান অনুবাদ এবং পল্লি বাংলার সংস্কৃতি ও জীবন নিয়ে জার্মান

ভাষায় রচিত একটি উপন্যাস ও দুটি ছোটোগল্প সংকলন। বাংলা থেকে অনূদিত জার্মান ভাষায় তাঁর অনুবাদকর্মগুলি হল 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত', রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটক এবং নির্বাচিত কবিতার তিনটি সংকলন। এছাড়া জার্মান ভাষায় তাঁর রচিত রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকের বিদেশি লেখকদের সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার এই যে স্বরূপ অলোচনার মধ্যে দিয়ে উঠে আসলো, তাতে এটা স্পষ্ট হয় এদেশে ভাষা সংস্কৃতির প্রতি এঁদের যে প্রেম তা ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের উজ্জ্বল পরকাষ্ঠা। এই প্রেমের দরুণই স্বদেশের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চিত জীবন ছেড়ে তাঁদের এদেশে আসা, কঠোর পরিশ্রমে বাংলা ভাষা শেখা, এমনকি বিদেশি হয়েও কারো কারো বাংলা সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করার দুঃসাহসিকতা দেখানো; আর সর্বোপরি এদেশের পঞ্চভূতে মিশে থাকতে চেয়ে অনেকের এদেশেই আজীবন থেকে যাওয়া। কেউ কেউ অবশ্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেও জীবনের শেষ দিন অবধি বাংলা সাহিত্যের রসসুধায় তাঁদের মন প্রাণ সিঞ্চিত করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে দ্যতিয়েনের ঐকান্তিক মনোবাসনা স্মরণ করা যেতে পারে—"ফাদারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এখন কী করছেন তিনি জানিয়েছিলেন—'এখন দেশে ফিরে যাব। মাতৃভাষা ফরাসিতে বঙ্গদেশের কথা লিখবো। সাহেব হঠাৎ অনুপ্রাণিত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি একটা স্বপ্ন দেখছি। বেলজিয়ামে একটি বাংলা চর্চা কেন্দ্রের স্বপ্ন বইপত্র, গানের ক্যাসেট সংগ্রহ করছি। বাংলাদেশ থেকে এজন্যে বই পেয়েছি, ক্যাসেট কিনেছি।"[৪] প্রেমের এরকম ঐকান্তিকতার দরুণই এঁরা একেক জন যে 'অবাঙালি বাঙালি' সেটা বললে বোধহয় কোনো অত্যুক্তি হয় না।

উৎসের সন্ধানে

১. সুরঞ্জন মিদ্দে : 'ভাষা যাজক অঁতোয়ান: গ্রিক ট্র্যাজেডির বাংলা অনুবাদ', অনিমেষ দত্ত বণিক, 'ফাদার আঁতোয়ান জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংকলন', 'ঋতপথ', ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪২১, কলকাতা, পৃ. ২১১

২. ফাদার পল দ্যতিয়েন : 'বঙ্গদেশের পত্রগুচ্ছ', 'আটপৌরে দিনপঞ্জি', আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৯৪

৩. ফাদার পল দ্যতিয়েন : 'ভারতভ্রমণজ্ঞানান্বেষণার্থে', 'আটপৌরে দিনপঞ্জি', আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ১৭৬

৪. খান সামসুজ্জামান : "ফাদার দ্যতিয়েন : বাংলা গদ্যের শক্তিমান লেখক", bdnews24.com, ২নভেম্বর ২০১৬

আনিসুজ্জামানের ‘আমার একাত্তর’ একটি পর্যালোচনা

কৃষ্ণপ্রসাদ চ্যাটার্জী

বাংলাদেশের একজন মননশীল গবেষক, ধীমান অধ্যাপক ও সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আনিসুজ্জামান। তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দীর্ঘ সময় অধ্যাপনা করেছেন। এবং অধ্যাপনার সূত্রে নানা স্থানে ভ্রমণ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি নানা সময়ের নানা ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ সময়ের নানা ঘটনা তিনি যত্নের সঙ্গে অবলোকন করেছেন এবং তা লিখেও রেখেছেন। আমরা সেই ঘটনাগুলির পরিচয় পাব তাঁর লেখা ‘আমার একাত্তর’ আত্মজীবনী পাঠ করলে, যাতে দেশ কাল সাহিত্যের নানা আলেখ্য অত্যন্ত বাস্তবভাবে ফুটে উঠেছে। তাই আনিসুজ্জামানের লেখা ‘আমার একাত্তর’ বই স্বতন্ত্র অভিনিবেশ দাবি করে।

আনিসুজ্জামানের একটি উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনী ‘আমার একাত্তর’। এই বইটির প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০৩ বঙ্গাব্দে। বইটির পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের ঢাকার সাহিত্য প্রকাশ প্রকাশনী থেকে। প্রকাশকাল মাঘ ১৪১৯। বইটি ‘ভোরের কাগজ’ সাময়িকীতেও প্রকাশিত হয়। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে ড. এ আর মল্লিককে (১৯৭১-এ যাঁর সহচর ছিলাম/মাত্র কদিন আগে যিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন)। বইটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অনবদ্য দলিল। এখানে বইটির বিষয় অনুযায়ী গুরুত্ব তুলে ধরা যাক।

একাত্তরের প্রধান ঘটনাধারার সঙ্গে আনিসুজ্জামানের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগ। সেই যোগের উজ্জ্বল চিত্র আলোচ্য বই। আলোচ্য বইটি মুক্তিসংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস-এর প্রামাণ্য দলিল। আলোচ্য বইয়ে আনিসুজ্জামান অসাধারণ গদ্যভাষায় অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে ব্যক্তিগত অবলোকনের যে ছবি তুলে ধরেছেন, তা নিছক স্মৃতিকথায় আর সীমিত থাকে না, হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক ইতিহাসের অনন্য আকর। এই দিক থেকে বইটির আলাদা এক গুরুত্ব আছে। আমরা বর্তমান আলোচনায় বইটির সেই গুরুত্ব অনুসন্ধান করতে প্রয়াসী হয়েছি।

আলোচ্য বইয়ের মুখবন্ধতে বইটি রচনার ইতিহাস জানা যায়। মুখবন্ধর প্রথমেই আনিসুজ্জামান লিখেছেন—

> ১৯৭১-এর স্মৃতি যার সঞ্চয়ে আছে, তারই কিছু বলবার মতো কথা আছে। আমি তাদেরই একজন। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে বন্ধুদের কেউ কেউ অনুরোধ করেছিলেন আমার অভিজ্ঞতার কথা লিখে ফেলতে।...স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী-উপলক্ষ্যে ভোরের কাগজের সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে লেখার অনুরোধ জানিয়ে পত্রিকা-সম্পাদক মতিউর রহমান এবং সাময়িকী-সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ সে-বাধা দূর করার সুযোগ করে দিলেন। নইলে হয়তো এ-বই লেখা হতো না। অনেক বলবেন, তাতে কারো কোনো ক্ষতি হতো না।[১]

আলোচ্য বইটি প্রসঙ্গো আনিসুজ্জামান আরো জানিয়েছেন, এই রচনা মূলত স্মৃতিনির্ভর। বইটি আসলে লেখকের স্মৃতিকথা। স্মৃতির ওপরেই নির্ভর করে লেখা।[২] আলোচ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ সময়কার উজ্জ্বল ছবি ধরা পড়েছে। এ প্রসঙ্গো আনিসুজ্জামান লিখেছেন—"আমি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটা খণ্ডচিত্র অঙ্কন করেছি। তাতে আমাদের গৌরবের কথা আছে, শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহায়তার কথা আছে, নিজেদের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও আছে। আমি কাউকে ছোট করতে চাই নি, আঘাত দিতে চাই নি।"[৩]

২

'আমার একাত্তর' বইয়ে ১,২ করে মোট ২৬টি পরিচ্ছেদ আছে। বইটিতে আনিসুজ্জামান নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও নিজের অনেক ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটি আরম্ভ হয়েছে এইভাবে—১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সকালের ফ্লাইটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে পৌঁছোলাম। সারা দেশে তখনো গণ-অভ্যুত্থান চলছে। শিক্ষকরাও তাতে যোগ দিয়েছেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডক্টর শামসুজ্জোহা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের হাতে কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত হলে পূর্ব পাকিস্তানের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাঁর ঘাতকদের বিচারের দাবিতে অবিরাম ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেন।[৪] আলোচ্য বইয়ে তৎকালীন সময়ের নানা উজ্জ্বল ছবি ধরা পড়েছে। এখানে একের পর এক উদাহরণ সহযোগে সেই ছবিগুলির পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। যেমন বইটির ১ নম্বর পরিচ্ছেদে ১৯৭০ এর ঘূর্ণিঝড়ের প্রসঙ্গ এসেছে—"১৯৭০-এর ১৪ নভেম্বর ঘটলো সেই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়। এর ভয়াবহতা আমাদের বিমূঢ় করে দিয়েছিল। উপদ্রুত অঞ্চল দেখে এসে জয়নুল আবেদিন তাঁর যে দীর্ঘ স্ক্রল অঙ্কন করেন, তাঁর উপস্থিতিতেই তার প্রদর্শনী হয় চট্টগ্রামে। সেখানে আমরা অনেকেই ছিলাম।"[৫] বইটির ২ নম্বর পরিচ্ছেদে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রসঙ্গ এসেছে। আনিসুজ্জামান লিখেছেন—

> ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে সংঘটিত দেশব্যাপী প্রথম সাধারণ নির্বাচন। আমিও জীবনে এই প্রথমবার ভোট দেওয়ার সুযোগ পাই। এ নির্বাচনে জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে অভূতপূর্ব জনসমর্থনের প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের পক্ষে লক্ষ্য সাধন করা সহজ ছিল না।[৬]

আলোচ্য বইয়ের ৩ নম্বর পরিচ্ছেদে বঙ্গাবন্ধুর ৭ মার্চের বক্তৃতার কথা এসেছে। এ প্রসঙ্গো আনিসুজ্জামান লিখেছেন—"৭ মার্চের বক্তৃতা তাই আমরা শুনতে পেলাম ৮ মার্চে। কী অসাধারণ ভাষণ! সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। বঙ্গাবন্ধু যখন বললেন,'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', তখনই মনে হলো, পৃথিবীর বুকে একটি নতুন জাতির জন্ম

হলো।"[৭] আলোচ্য বইয়ে মুক্তি যুদ্ধ সময়কার নানা প্রসঙ্গ এসেছে। বইটির ৪ নম্বর পরিচ্ছেদে আনিসুজ্জামান কারফিউ জারির কথা উল্লেখ করেছেন। ঢাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে, পথে পাকিস্তানি সেনারা নেমে পড়েছে এবং শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হয়েছেন।[৮] আবার ৪ নম্বর পরিচ্ছেদেই আনিসুজ্জামান স্বাধীনতা ঘোষণার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> ২৭ মার্চ জানা গেলো, স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্র থেকে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। আমি নিজে অবশ্য সে ঘোষণা শুনিনি, তবে ক্যাম্পাসে অনেকেই শুনেছিলেন। এ সংবাদে আমরা সবাই খুব উল্লসিত হলাম, প্রেরণা ও ভরসা লাভ করলাম।[৯]

৪ নম্বর পরিচ্ছেদেই পাকিস্তানিদের সাফল্য লাভ প্রসঙ্গে লিখেছেন—২৯ তারিখে পাকিস্তানিরা আরো সাফল্য লাভ করে, চট্টগ্রামের অনেকখানি তাদের দখলে চলে আসে। তখনই ক্যাম্পাসবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যায়। ক্যাম্পাসে ছাত্র প্রায় ছিলই না, দু-চারজন যাও ছিল, তারা এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছিল। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেশিরভাগই ছিলেন পরিবার নিয়ে। তাঁরা আমাকেই বারবার নিজেদের উৎকণ্ঠার কথা বলতে থাকলেন। অগ্রসরমান পাকিস্তানিদের রুখতে রাউজান ও নাজিরহাটের রাস্তায় প্রতিবন্ধক পড়বে বলেও নিশ্চিত জানা গেলো স্থানীয় রাজনৈতিক সূত্রে। ই পি আরের কয়েকজন আহত সৈন্য ছাড়া বাকিরাও যেন কোথায় চলে গেলেন আমাদের না বলে। সুতরাং ক্যাম্পাসে আর কেউ নিরাপদ বোধ করছিলেন না।[১০] ৪ নম্বর পরিচ্ছেদে বিমান-আক্রমণের ফলে বাংলা বেতারের প্রচার বন্ধ হওয়ার কথা আছে—৩০ মার্চ বিমান-আক্রমণের ফলে স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রচার বন্ধ হয়ে গেলো। বলা যায়, কালুরঘাটের পতন হলো। দিনভর চললো ক্যাম্পাস থেকে অপসারণের পালা। দু'জন ডাক্তার, কয়েকজন আহত সৈনিক ও চতুর্থ শ্রেণির কিছু কর্মচারী ছাড়া আর কেউ রইলেন না ক্যাম্পাসে।[১১] আলোচ্য বইয়ের ৫ নম্বর পরিচ্ছেদে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত অবস্থার কথা এসেছে—

> ২৫ মার্চ রাত থেকেই বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত অবস্থা জানতে চাইছিলাম, কিন্তু পাইনি। স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রথমেই বলা হয়েছিল যে, তিনি আত্মগোপন করে যুদ্ধ চালাচ্ছেন। কথাটা সত্য বলে ভাবতে ইচ্ছে হয়েছিল, তবু শেষ পর্যন্ত তা আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি।... ৩১ মার্চের মধ্যে আমাদের দৃঢ় ধারণা হলো যে, তিনি পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়েছেন।[১২]

আলোচ্য বইয়ের ৬ নম্বর পরিচ্ছেদে আকাশবাণীতে বাংলাদেশ সরকার গঠনের সংবাদ-এর কথা এসেছে—আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয় মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-গঠনের সংবাদ। সেই সঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্র থেকে ধারণকৃত শপথগ্রহণ-অনুষ্ঠানের বিবরণী এবং তাজউদ্দীনের বেতার বক্তৃতার অস্পষ্ট রেকর্ড।[১৩] আনিসুজ্জামান বইটির ৭ নম্বর পরিচ্ছেদে আগরতলায় পৌঁছানোর কথা লিখেছেন—"১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল, সোমবার, আগরতলায় এসে পৌঁছোলাম। এভাবে স্বদেশ ত্যাগ করতে যে কতো তীব্র যন্ত্রণাবোধ হয়, উদ্বাস্তু জীবনবরণে বাধ্যতার যে কী গ্লানি চিত্তকে আচ্ছন্ন করে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা যে কেমন পীড়ন করে, তা বুঝি কেবল নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই অনুভব করতে হয়।"[১৪] আলোচ্য বইয়ের ৮ নম্বর পরিচ্ছেদে গোলাম মুরশিদের রচনা প্রকাশ-এর কথা এসেছে। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান লিখেছেন—আনন্দবাজার পত্রিকায় আবার এই সময়ে হাসান মুরশিদ ছদ্মনামে গোলাম মুরশিদের ধারাবাহিক রচনা 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পটভূমি' বেশ গুরুত্বের সঙ্গে

প্রকাশিত হচ্ছিল।[১৫] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নতুন সংস্করণে দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব বর্তেছিল আনিসুজ্জামানের ওপরে।[১৬] আনিসুজ্জামান বইটির ৮ নম্বর পরিচ্ছেদেই আগরতলায় দুজন শুভাকাঙ্ক্ষী ও একজন হিতাকাঙ্ক্ষীর কথা জানিয়েছেন। তিনি কার্তিক লাহিড়ির কথা বলেছেন। যুগান্তর পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি অনিল ভট্টাচার্যের কথা এসেছে এই প্রসঙ্গে।[১৭] আলোচ্য বইয়ের ১০ নম্বর পরিচ্ছেদে আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের জন্য কিছু করা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> পশ্চিমবঙ্গের এককালীন গভর্নর, সরোজিনী নাইডুর কন্যা, পদ্মজা নাইডুর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ এইড কমিটি। মৈত্রেয়ী দেবী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—তাঁর সঙ্গে ছিলেন গৌরী আইয়ুব—সাম্প্রদায়িক মৈত্রী সমিতির এবং বাংলাদেশের দুস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি শিশুভবন। পশ্চিমবঙ্গের লেখক-শিল্পীরাও একটা সহায়ক সংস্থা গঠন করেন। তার সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এর দপ্তর ছিল লেনিন সরণিতে পরিচয়-অফিসে।[১৮]

আলোচ্য বইয়ের ১০ নম্বর পরিচ্ছেদেই আনিসুজ্জামান বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা গড়ে ওঠার কথা লিখেছেন।[১৯] ১২ নম্বর পরিচ্ছেদে লেখক মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে প্রচারের কথা বলেছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি পরামর্শ দিলেন ভারতীয় অ্যাকাডেমিক সমাজের কাছে এবং সেই সঙ্গে যতোটা সম্ভব রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মচারী ও নাগরিকদের কাছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে প্রচারাভিযান চালাতে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি দল গঠন করা যেতে পারে। প্রথমটি যাবে উত্তর ভারতে, তার পরেরটি মধ্যপ্রদেশে, তারপর একটি বোম্বাই অঞ্চলে।[২০] ১৩ নম্বর পরিচ্ছেদে আনিসুজ্জামান দিল্লিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে লিখেছেন কীভাবে সাহিত্য অকাদেমির পক্ষ থেকে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই সময় সভাপতি ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। শ্রোতার আসরে ছিলেন অম্লান দত্তের মতো বাঙালি বিদ্বজ্জন ব্যক্তি।[২১] ২০ নম্বর পরিচ্ছেদে লেখক বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠার কথা শোনান।[২২]

৩

আলোচ্য বইয়ের অনেক স্থানে আনিসুজ্জামান রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে নিজের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করেছেন। এই দিক থেকে বইটির অনেক স্থানে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে কয়েকটি উদাহরণে তা পৃথকভাবে দেখানো যেতে পারে। যেমন—আনিসুজ্জামান ৮ নম্বর পরিচ্ছেদেই রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হওয়া প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> আগরতলায় রবীন্দ্র-জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে সৈয়দ আলী আহসান ও আমি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। বক্তৃতা করতে গিয়ে দেখি আকাশবাণীর পক্ষ থেকে তা টেপে ধারণ করা হচ্ছে। তখন খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ভারতে আত্মপ্রকাশের ফলে যদি আব্বার কোনো ক্ষতি হয়, তাহলে নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারবো না। বক্তৃতা দিয়ে নেমে এসেছি মঞ্চ থেকে। এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, ঢাকায় আমাদের বাড়ির কাছেই তাঁর বাড়ি এবং জানতে চাইলেন, আব্বাদের কোনো খবর রাখি কিনা।[২৩]

১৬ নম্বর পরিচ্ছেদে আনিসুজ্জামান পুরোনো ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে যোগাযোগ ও রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে লিখেছেন—পুরোনো ঘনিষ্ঠদের মধ্যে লেখক যোগাযোগ করি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোপাল হালদারের সঙ্গে; আর লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক, বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ড. অনিমেষকান্তি পাল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে যান

লেলিন সরণির পরিচয়-অফিসে। এটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশ সহায়ক পরিষদের দপ্তর। সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখক আগে থেকেই জানতেন। অনেকদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। নতুন পরিচয় হয় কবি তরুণ সান্যালের সঙ্গে। সেদিন রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উপলক্ষে অনুষ্ঠান হচ্ছিল। লেখকের ডাক পড়লো, বক্তৃতা দেওয়ার বিষয়ও ওঁরা বেঁধে দিলেন—'বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা'। সভার শেষে পরিচয়ের জন্যে লেখার দাবি জানান দীপেন্দ্রনাথ ও তরুণ সান্যাল—উভয়েই।[২৪] লেখক যখন মুজফর আহমদের বাসায় গেলাম, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। পরিচয়পর্ব শেষ হতেই তিনি বিদায় নেন।[২৫] ১৭ নম্বর পরিচ্ছেদে আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নৈতিক সমর্থন প্রসঙ্গে দুজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। যাতে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক একটি বইয়ের প্রসঙ্গ এসেছে। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান লিখেছেন—প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক অরুণ দাশগুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী দর্শন ও মনস্তত্ত্ববিদমানসী দাশগুপ্ত (তাঁর রবীন্দ্রনাথ : এক অসমন্বিত দ্বন্দ্ব বইটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে) ছিলেন তাঁদের সহায়।[২৬]

রঘুবীর চক্রবর্তী ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। বোধহয় সোশালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের সঙ্গে তাঁর কিছু যোগাযোগ ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তিনি একটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করেন। তার জন্যে আমাকে ফরমাশ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও বাংলাদেশ নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়ে নিয়েছিলেন।[২৭] লেখক বারে বারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সময়কার কথা তুলে ধরেছেন। কখনো বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা কথাও উল্লেখ করেছেন। সবমিলিয়ে আত্মজীবনী হিসেবে আনিসুজ্জামানের আমার একাত্তর হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ সময়ের নানা তথ্য জানার অনবদ্য দলিল।

উৎসের সন্ধানে

১. দ্রষ্টব্য মুখবন্ধ, আমার একাত্তর, আনিসুজ্জামান, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০, পঞ্চম মুদ্রণ : মাঘ ১৪১৯, পৃ. ৭। (অতঃপর তথ্যপঞ্জিটি আমার একাত্তর বলে উল্লেখ করা হবে, পৃষ্ঠা সংখ্যা পৃথক হলে তা দেওয়া হবে)।
২. তদেব
৩. তদেব, পৃ.৮
৪. আমার একাত্তর, পৃ. ১১
৫. তদেব, পৃ. ১৪-১৫
৬. তদেব, পৃ. ১৭
৭. তদেব, পৃ. ২৪
৮. তদেব, পৃ. ৩৩
৯. তদেব, পৃ. ৩৭
১০. তদেব, পৃ. ৩৮-৩৯
১১. তদেব, পৃ. ৩৯
১২. তদেব, পৃ. ৪১
১৩. তদেব, পৃ. ৫০
১৪. তদেব, পৃ. ৫৩
১৫. তদেব, পৃ.৬১-৬২
১৬. তদেব, পৃ. ৬২
১৭. তদেব, পৃ. ৬২-৬৩
১৮. তদেব, পৃ. ৭৪
১৯. তদেব, পৃ. ৭৫
২০. তদেব, পৃ. ৯৯
২১. তদেব, পৃ. ১০৫
২২. তদেব, পৃ. ১৫২
২৩. তদেব, পৃ. ৬৪
২৪. তদেব, পৃ. ১২৭-১২৮
২৫. তদেব, পৃ. ১২৯
২৬. তদেব, পৃ. ১৩৬
২৭. তদেব, পৃ. ১৩৭

ভারতসন্ধানী লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পার্বতী দাস

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সম্পর্কে বলেছেন, বাংলা সাহিত্যে "সিরাজই সেই বিরল কথাশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম, যিনি তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন সেই শাশ্বত ভারতবর্ষকে, যে ভারতবর্ষ এদেশের গল্পে-উপন্যাসে-কবিতায়- নাটকে নিজের মুখটি দেখাবার জন্য বহুকাল ধরে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে।"[১] স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে জাগে সে ভারতবর্ষ কোন ভারতবর্ষ যাকে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ নিজের লেখনীর মধ্য দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। উপন্যাস এবং ছোটোগল্প বাংলা সাহিত্যের এই দুটি ধারা আমরা পাশ্চাত্য থেকে পেলেও আমাদের এই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষ, তার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস, লোকায়ত ঐতিহ্য, জীবনচর্চার ক্ষেত্রে চিরন্তন গ্রামীণতা—এইসবকিছু নিয়ে খুব শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পারে বাংলা সাহিত্য। কারণ ভারতবর্ষ শুধুমাত্র একটা দেশ বা ভূখণ্ড নয়, ভারতবর্ষ আসলে একটা বিশাল সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম। এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের সঙ্গে জমির, জমির সঙ্গে ফসলের, ফসলের সঙ্গে অর্থনীতির, অর্থনীতির সঙ্গে নারীর একটা জটিল সম্পর্ক থাকে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর রচনায় এই যোগসূত্রটিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে লেখকের 'বাদশা' গল্পের কথা। যেখানে পরপর দু'বছর ভালো ফসল হওয়ার পর বাদশা ভেবেছিল তার একটা বাড়তি মেয়েমানুষ থাকা দরকার।

এই সামন্ততান্ত্রিক মেজাজটি ছাড়াও ভারতবর্ষ দেশটি আচারে-বিচারে, মেজাজে-ঘরানায়, চিন্তায়-চেতনায়, জীবনচর্চায়-জীবনদর্শনে, লোকভাবনায়-লোকসংস্কৃতিতে আজও পুরোপুরি গ্রামীণ। শহর-নগরগুলোও সেই গ্রামেরই সম্প্রসারিত রূপ। শহরে-নগরে আমরা আপাত দৃশ্যমান নাগরিক জীবনচর্চা বলে যা দেখে থাকি তা আসলে আরোপিত। কারণ সেই আপাত দৃশ্যমান নাগরিক আধুনিকতার তলায় নিঃশব্দে বয়ে চলেছে হাজার হাজার বছরের পুরোনো

গ্রাম ভারতের স্রোত। তাই পঞ্চাশের দশকের কথাকাররা যখন মন্বন্তর, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশভাগ, পারিবারিক জীবনের অবক্ষয়, মূল্যবোধের সংকট ইত্যাদি নিয়ে লিখতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন মুস্তাফা সিরাজ সেই শাশ্বত ভারতবর্ষকেই অবলম্বন করে থেকেছেন যেখানে মানুষকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়। অস্তিত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজেদের টিকিয়ে রাখাটাই যাদের কাছে একমাত্র সত্য। ব্যর্থতা তাদের কাছে পরাজয়ের গ্লানি বহন করে আনে।

তবে আমরা তো এটা জানি যে, কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করলে বা সেই দেশে বাস করলেই দেশটাকে চেনা যায় না। দেশকে জানার জন্য অন্তর্দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। অন্নদাশঙ্কর রায়ও তাঁর 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে বলেছেন—"দেশে জন্মেছি বলে দেশ আমার নয়, দেশকে নিজের তনুমন দিয়ে সৃষ্টি করেছি বলে দেশ আমার।" সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ দেশকে নিজের তনুমন দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জীবন এককথায় পরিব্রাজকের জীবন। একজন পরিব্রাজকের মতোই তিনি বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন এবং ভারত-আত্মার মূল সুরটিকে তিনি চিনতে পেরেছেন। পারিবারিক দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের পুর্বপুরুষ ছিলেন পারস্যের খোরাসান-এর অধিবাসী। লেখকের প্রপিতামহ আহমদ আলীর জন্ম হয়েছিল পেশোয়ারে। প্রবল পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই ব্যক্তিটি মাত্র আঠাশ বছর বয়সেই ভারত ভ্রমণের সংকল্প নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ফলে ভারতবর্ষকে জানার যে আকুতি তা মুস্তাফা সিরাজ উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়ে যান। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের পিতা সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী আরবি-ফারসি শেখার পারিবারিক প্রথা ভেঙে নিজের চেষ্টায় ইংরেজি স্কুলে ঢোকেন। এরপর রাজনৈতিক প্রভাবে তিনি হয়ে ওঠেন আমূল ভারতীয়। ভারতীয় বলতে রামায়ণ-মহাভারত, বেদ-উপনিষদ, আর সুফিবাদ সমন্বিত এক বিরাট সংস্কৃতির কথাই এখানে বলা হয়েছে। বাবার পথ ধরেই ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে লেখকের নাড়ির বন্ধন গড়ে উঠেছিল।

নিষ্ঠাবান মৌলানার ছেলে ফেরদৌসী পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাটিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আধুনিক রুচির মানুষ। সপ্তম পুত্র জমিল সৈয়দ বলেছেন, তাঁর বাবা কোনোদিনই তথাকথিত ধার্মিক ছিলেন না। তাঁর চোখে তাঁর পিতা সেকুলার জীবনযাপনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও পিতার এই আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাইনে। মানুষ বুঝি। এই দেশের মানুষ। মানুষ আমার কাছে শুধু প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতিই শাশ্বত এবং ঈশ্বর।"[২] ছোটো থেকেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ছিলেন প্রকৃতিমুখী। পড়াশোনা অপেক্ষা রাখাল বালকদের সঙ্গে হিজলের বিলে, উলুখড়ের জঙ্গালে ঘুরে বেড়ানোয় তাঁর অধিক আগ্রহ ছিল। এই বোহেমিয়ান জীবনই তাঁকে একসময় লোকনাট্যদল আলকাপের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। আর তারই সূত্র ধরে লেখক বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুমকা প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং সেখানকার মানুষদের খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ পান। পরে চাকরি সূত্রে অর্জিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে বিপুল ও অগাধ জ্ঞান লেখককে ভারত সন্ধানী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার পল্লি প্রকৃতির মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। নিজের আত্মকথায় তিনি বলেছেন, "দুর্ধর্ষ আদিম জীবনকে আমি ভালোবাসতাম। তা পেতে চাইতাম এবং তা পেতে গিয়েই প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে পড়ি।"[৩] এই প্রকৃতি বিভূতিভূষণের শান্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতি নয়, এই প্রকৃতি ভয়ংকরী। জীবনের জন্য যেমন তার কোনো করুণা নেই, মৃত্যুর জন্য কোনো

শোকও নেই। তাই এই প্রকৃতি থেকে অপুর মতো নিষ্কলুষ হয়ে ফিরে আসা কঠিন। এই আদিম প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অন্তর্গত স্বাধীন সন্তানদের কথাই মুস্তাফা সিরাজ তাঁর রচনায় রূপ দিতে চেয়েছেন।

যে অঞ্চলে মুস্তাফা সিরাজ বড়ো হয়ে উঠেছিলেন সেখানে উদার প্রকৃতির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে বসতি। সেখানকার শ্রমজীবী মানুষের দল দারিদ্র্যের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। কিন্তু সেই শ্রমের কোনো সমাজ স্বীকৃত পারিশ্রমিক তারা পায় না। তথাকথিত সভ্য জগতের আলো থেকে তারা বঞ্চিত, বলা ভালো সভ্যতা সেখানে বন্যতা দ্বারা আক্রান্ত। সেখানকার মানুষ তাই ষড়রিপুর প্রবৃত্তিকে দমন করার অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারেনি। ফলে তারা নিজেদের ইচ্ছে মতো বাঁচে। প্রকৃতিসঞ্জাত এই স্বাধীনতার স্বাদে তারা কখনো প্রেমিক, কখনো দার্শনিক, কখনো আবার হত্যাকারীও হয়ে ওঠে। তারা তখন রাষ্ট্র ও অন্যের প্রভুত্ব অস্বীকার করে এবং নিজেকে এমন এক বিশ্বের বাসিন্দা করে যেখানে রাষ্ট্র নেই, আইন নেই, শাসন নেই, সমাজ নেই, তথাকথিত ধর্ম নেই। তার ঈশ্বর সে নিজে এবং প্রকৃতির সন্তান বলে তার কাছে শ্লীলতা-অশ্লীলতাও নেই।[৪] লেখকের 'তৃণভূমি', 'নিশিলতা', 'হিজলকন্যা' প্রভৃতি উপন্যাসে এবং 'সাক্ষীবট', 'লালীর জন্য', 'বসন্তের বিকেলে ঘুমঘুমির মাঠে' প্রভৃতির গল্পে এইসব স্বাধীনচেতা নরনারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যাদের উপর অনিবার্যভাবে প্রভাব বিস্তার করে প্রকৃতি।

এই মানুষগুলির জীবনাচরণের মধ্যে দিয়ে গ্রামভারতের সংস্কৃতিরও অনেক দিক উঠে আসে। ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সেই ধর্মনিরপেক্ষতার বশবর্তী হয়ে হিন্দু-মুসলিম একত্রে অবস্থান করে। হিন্দুদের উৎসবে মুসলিমরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, আবার মুসলমান পীরসাহেবের কাছে হিন্দুরাও তাবিজ কবচ নিতে আসে। তবে জাতপাতের একটা ভেদাভেদ চোখে পড়ে। 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে দেখি, হিন্দু ময়রার দোকানে মিষ্টি ও জল খাবার সময় ময়রা বারি মিঞা ও শফিকে সম্মান করলেও তাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলছিল। আবার শফি তার মায়ের কাছে 'রক্ত' শব্দ ব্যবহার করায় তার মা তাকে চোখ পাকিয়ে নিষেধ করে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করতে বলেছিলেন। কারণ হিন্দুরা রক্ত বলে।

এছাড়া গ্রামীণ মানুষগুলোর লোকায়ত বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে দিয়েও গ্রামভারতের ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রাম্য মানুষদের মুখের ভাষা ও সংলাপের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে অনেক ছড়া, ধাঁধা, গান, প্রবাদ-প্রবচন। এগুলোর মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্য একটা দিককে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। ফলে গ্রামভারতের আদিম প্রকৃতি এবং মনুষ্যসৃষ্ট সংস্কৃতি দুই-ই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের রচনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সুতরাং গ্রামজীবন মানেই যে চন্ডীমন্ডপ, এঁদো ডোবা কিংবা শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ বর্ণিত ব্যাপার নয় তা নিজের রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট করেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

অর্থাৎ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের মূল সুরই হল গ্রামবাংলার মানুষদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ। তিনি মনে করতেন আধুনিক হতে গেলে শহরের কথা লিখতে হবে এমনটা নয়, মনটাই আসল। তিনি আরও মনে করতেন, নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতা যাঁর আছে, শুধু অভিজ্ঞতা নয়, যিনি সেই জীবনকে মূল অবধি দেখতে পান তিনি নগরকেন্দ্রিক লেখা লিখবেন। যিনি তার বাইরের ব্যাপারগুলো জানেন, গ্রামে-গঞ্জে যাইহোক তাই নিয়ে লিখবেন। এতে কোনো শ্রেণিবিভাজন করা মূর্খতা। তবে তিনি যে লেখক এই সত্য ও সত্তাকে তিনি ভুলে থাকতে পারেননি। ফলে

কখনো কখনো তাঁর মনে হয়েছে নগরজীবন হয়ত তাঁর লেখায় উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। তাই তিনি নগরজীবন আশ্রয়ী কিছু রচনা করেন যার মধ্যে দিয়ে নগরভারতের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

'এখন অন্ধকার' উপন্যাসে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের দুধারে যে জীবন প্রবাহিত তাঁকে রূপদান করেছেন। 'সংশপ্তক', 'বাসস্থান' উপন্যাসেও বিভিন্ন বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ, আগ্নেয়াস্ত্রের হানাহানি, রাজনীতির কথা আছে। 'সংশপ্তক' উপন্যাসে বিপ্লবী ধ্রুব চেয়েছিল সমাজ বদলে দিতে। কিন্তু পরিবর্তে সে পেয়েছে খোঁড়া পা ও অকেজো ফুসফুস। তবে সে মনের সাহস হারায়নি। মাটির তলায় সে গুপ্ত রিভলবারের অনুসন্ধান করেছে—যে রিভলবার তার শক্তির উৎস, উঠে দাঁড়ানোর প্রেরণা। তবে এসব উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব কণ্ঠস্বর যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। 'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি' উপন্যাসেও শহরের কথা আছে। শহরজীবন হলেও মানুষের হাসি-কান্না তো বদলে যায় না। তাই লেখক মূলত মানুষের সমস্যাকে ধরতে চেয়েছেন। যে সমস্যা আসলে মানুষের বেঁচে থাকার এবং আদিম কামনার। শহরে ও গ্রামে যার কোনো সীমারেখা নেই। উভয় ক্ষেত্রে এই রূপটা একইরকম।

'হেমন্তের বর্ণমালা' উপন্যাসে লেখক শহর ও গ্রামের বিপরীত চিত্র তুলে ধরেছেন। শহর যখন বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আলোকিত, টি.ভি, সিনেমা, ভিডিওতে জমজমাট তখন অন্যদিকে বাংলার লক্ষ লক্ষ গ্রাম নিরাশার অন্ধকারে ডুবে আছে। তারা পড়তে জানে না, দুবেলা পেটপুরে খেতে পারে না। ডাক্তার হাসপাতালের অভাবে অসুখে মারা যায়। হেমন্তের পাতার মতো ঝরে পড়া সেইসব দুঃখী মানুষদের বর্ণমালাই 'হেমন্তের বর্ণমালা' উপন্যাসে মূর্ত হয়েছে। গ্রামজীবনের এই দুঃখী মানুষগুলোই লেখকের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে বেশি। তাই নগরজীবন অপেক্ষা নগরপ্রান্তিক মানুষদের বৃত্তান্ত রচনাতেই লেখক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। নগরজীবন যেন লেখকের স্বভূমি নয়। তবে নগর ভারত সম্পর্কে তিনি যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এই উপন্যাসগুলি তারই প্রমাণ দেয়। তবে শুধু গ্রাম বা শহর নয়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর অনেক রচনায় মুসলমান সমাজের অন্দরমহল ও অন্তরমহলের ছবি এঁকেছেন, যার মধ্যে দিয়ে এক ভিন্ন ভারতকে খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও প্রথাগত ধর্ম নিয়ে মুস্তাফা সিরাজ কোনোদিনই ভাবিত ছিলেন না। তিনি বলতেন মানুষ জন্মসূত্রে হিন্দু বা মুসলিম যাইহোক না কেন, মানুষ হিসাবে চারপাশ থেকে জীবনের মানে খোঁজার চেষ্টা করতে হবে। জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে হবে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষদের কথাই বলেছেন। ঘটনাচক্রে তারা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। তবে মুসলমান সমাজের অনেক রীতি-নীতি, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান অনেক পাঠকের কাছেই অজানা। মুস্তাফা সিরাজের বেশ কিছু উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে অবশ্যই বলতে হয় লেখকের 'অলীক মানুষ' উপন্যাসটির কথা। উনিশ-বিশ শতকের পটভূমিতে এক মুসলিম পীর পরিবারের কাহিনি এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। ফলে উপন্যাসটিতে দেখা গেছে শিয়া-সুন্নি বিভাজনের বাইরেও তৎকালীন হানাফি-ফরাজির অন্তঃকলহ, মোল্লাতন্ত্রের সঙ্গে মারফতি পন্থীদের বিতর্ক, আশরাফ-আতরাফ ভেদবাদ ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। সেইসঙ্গে আছে মুসলিমদের পর্দাপ্রথা, ফজর, জহর, আসর, মগরেব, এশা - এই পাঁচঅক্ত নামাজ, নিকা, তালাক, বহুবিবাহ ইত্যাদির প্রসঙ্গ। পর্দাপ্রথার মান্য ও অমান্য দুটি দিকই লেখক এই উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন।

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র বদিউজ্জামানের ভাবনা এবং বক্তব্য থেকেও ইসলাম সমাজের অনেক তথ্য উঠে আসে। তার মতে আল্লা এক এবং অদ্বিতীয়। তারা আল্লার নিরাকার সত্তায় বিশ্বাসী। মাজার, পির এসবেও তাদের বিশ্বাস নেই। সুফি এবং 'মজনুন' অর্থাৎ যারা ঈশ্বর প্রেমে উন্মাদ তাদের এরা ঘৃণা করে। সংগীত এদের কাছে হারাম। আবার মৃত্যুর জন্য শোক করাও হারাম। কারণ সেটা আল্লার ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। এই উপন্যাসের দেবনারায়ণ চরিত্রের মুখ দিয়ে লেখক বলেছেন, "মুসলমান ধর্মে যার জন্ম তার তিনটে মূল কালচার। ইসলামি কালচার, পারিপার্শ্বিকগত হিন্দু কালচার আর শিক্ষাসূত্রে লব্ধ পাশ্চাত্য আধুনিক কালচার।"[৫] উপন্যাসে আমরা লেখকের এরূপ ভাবনারও পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষ করে থাকি। 'জানমারি' উপন্যাসেও মুসলিম সমাজের অনেক ছবি পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে লেখক মোল্লা, মৌলবীদের চতুর, ভণ্ড, হৃদয়হীন রূপকে উন্মোচন করে দিয়েছেন। 'মসজিদে আওরত লোকের পা দেওয়া হারাম'—এই প্রচলিত ভ্রান্ত ধারনাকেও লেখক বিদ্রূপ করেছেন। এভাবে মুসলমান সমাজের বৈধ অবৈধ দুটি দিককেই লেখক উন্মোচিত করে দিয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর জন্মভূমিটিকে নিজের হাতের তালুর মতোই চিনতেন। ভারতীয় সাহিত্য এখন অনেকাংশেই ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণ। কিন্তু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মনেপ্রাণেই ভারতীয় লেখক। তিনি যেমন তাঁর রচনাকে ইউরোপীয় সাহিত্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন, তেমনি রচনার চরিত্রগুলিকেও কৃত্রিম আধুনিকতার মোড়কে আচ্ছন্ন করে রাখেননি। নগরজীবনের বৃত্তান্ত তাঁর রচনায় একেবারে অনুপস্থিত নয়। কিন্তু সভ্য শিক্ষিত মানুষের উপরেও তিনি আদিম জীবনকে আরোপ করে দেখতে চেয়েছেন কেমন মানায়। আসলে মুস্তাফা সিরাজ মানুষের অস্তিত্বের গল্প লিখতে চেয়েছেন, ঔচিত্যের গল্প নয়। সেইসঙ্গে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের মাঝেও ভারতবর্ষে যে মহান মিলনের আদর্শ তাকেও মুস্তাফা সিরাজ তাঁর রচনায় রূপ দিয়েছেন। এদেশের জল, হাওয়ার মধ্যেই পরিপুষ্ট হয়েছে তাঁর সাহিত্য। আর সেই সাহিত্যের শিরায় শিরায় তিনি ভারতআত্মার মূল সুরটিকেই প্রতিধ্বনিত করে দিয়েছেন।

উৎসের সন্ধানে

১. ভগীরথ মিশ্র : 'সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : বাংলা সাহিত্যের এক বিরলতম কথাশিল্পীর নাম', একান্তর ২০২০, পৃ. ১১৫
২. তরুণ মুখোপাধ্যায় : 'কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ', করুণা প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ১০৬
৩. ঐ, পৃ. ৮৭
৪. ঐ, পৃ. ৮৭
৫. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : 'অলীক মানুষ', দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃ. ১৮০

বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

বাপী মণ্ডল

উনিশ শতকে বাংলার মাটিকে যারা পূর্ণভূমি হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আমরা বিদ্যাসাগরের জন্মের দ্বিশত বর্ষ অতিক্রান্ত করেছি। তা সত্ত্বেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা বর্তমানেও সমাদৃত। তাঁকে নিয়ে লেখালেখি ও গবেষণার শেষ নেই, তবুও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার নিরিখে তাঁকে অনুভব করাতে এই লেখার প্রয়োজনীয়তা। বিদ্যাসাগরের জীবন ইতিহাস পর্যালোচনায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে বলেছেন—"তিনি যে বাঙালি বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'চারিত্রপূজা', বিদ্যাসাগর চরিত)

এই যথার্থ মানুষ প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার আলোয় উনিশ শতকে হিন্দু নারীদের দুঃখ দুর্দশা দূর করানোর অভিপ্রায়ে শাস্ত্রীয় বচনের পাশাপাশি, সরকারি সাহায্যে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর সমাজ সংস্কারের কার্যকলাপ কে, দুটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথম স্তর ১৮৪১-১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ এবং দ্বিতীয় স্তর ১৮৫৮ থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথম স্তরে আমরা দেখতে পাই বিধবা বিবাহ আন্দোলন বেশি মাত্রায় স্থান পায়। বিধবাদের জন্য বিশেষ করে বাল-বিধবাদের জন্য তাঁর হৃদয় বিচলিত। তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করে, বিধবাদের বিবাহের আইন পাস করান ১৮৫৬ সালের ১৬ জুলাই। এই আইন পাস করাতে তাঁকে নানাবিধ কর্মকাণ্ড করতে হয়েছিল। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিদের কাছে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বোঝাতে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ দুটিতে তিনি শাস্ত্রীয় বচনের নানা শ্লোক তুলে ধরে হিন্দু রক্ষণশীলদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে নানাভাবে

আক্রমণ করেন। কখনো লেখার মাধ্যমে বা কখনো কুৎসার মাধ্যমে। তিনি দমে না গিয়ে ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন করেন। অন্যান্য প্রগতিশীল মানুষদের আবেদন করার কথা বলেন। এক কথায় সংগঠক বিদ্যাসাগর হিসেবে তিনি অবতীর্ণ হন। এইভাবে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। বিধবা বিবাহ আইন পাস হওয়ার পর বিধবাদের বিবাহ শুরু হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে বিধবাদের বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বিধবাদের বিবাহ শুরু হলে সমস্যা দেখা দেয় অন্য একটি, তা হল অর্থের লোভে অনেকে বহুবিবাহ করতে থাকে। ফলে বহুবিবাহ সমাজে ক্রমশ বাড়তে থাকে। তবে বিধবাদের বিবাহ আইন পাস হবার পর বহুবিবাহ বেড়ে যায় তা নয়, বহুবিবাহের অন্যতম একটি কারণ হলো কৌলিন্য প্রথা যা উনিশ শতকে পুরো মাত্রায় বজায় ছিল।

বহুবিবাহের অন্যতম কারণ হিসাবে কৌলীন্য প্রথা যেমন দায়ী ছিল তেমনি বিধবার পুনর্বিবাহ, বহুবিবাহ ঘটার পিছনে অন্যতম কারণ ছিল। বহুবিবাহ প্রথা তৎকালীন সমাজে নারীদের জীবনে বিশেষ করে কুলীন মহিলাদের জীবনে চরম দুর্দশা নেমে আসে। কৌলীন্য প্রথার উদ্ভব ও বিস্তার নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর দুটি মূল্যবান গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই পুস্তক সম্পর্কে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে বলেছেন—

> যে পুস্তকগুলি কিন্তু নিছক প্রচারপুস্তক ন-আশু-প্রয়োজন মিটিয়েই যা লুপ্ত হয়ে যায়। আজ শতবর্ষ পরে সেই পুস্তক দু'খানি পড়তে বসলে এখনও পাঠক তার মধ্যে দুশ্ছেদ্য যুক্তিজালের সমারোহ দেখে বিস্মিত হবেন, সরস চিত্তের স্পর্শ পেয়ে প্রসন্ন হবেন, উদার হৃদয়ের আক্রমণে উল্লিসিত বোধ করবেন এবং নারীসমাজের পরিত্রাতা বলে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

এই গ্রন্থ দুটি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বহুবিবাহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক। বহুবিবাহ বৈদিক যুগ থেকে আমাদের সমাজে চলে আসছে। রামায়ণে দশরথের বহুবিবাহ লক্ষ্য করি। এছাড়াও বিভিন্ন স্মৃতি শাস্ত্রে বহুবিবাহের উল্লেখ আছে। পুরাণে বহুবিবাহের বিভিন্ন গল্প পাওয়া যায়। দেবতাদের একাধিক বিবাহের খবর আমরা পাই। সংস্কৃত সাহিত্যে বহুবিবাহের কথা জানতে পারি। সুতরাং বহুবিবাহ শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে আবহমান কাল থেকে একটি প্রচলিত প্রথা হিসেবে চলে আসছে। তবে এই প্রথার বিরুদ্ধে আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

বাংলায় রাজা বল্লাল সেনের আমল থেকে কৌলীন্য প্রথা সৃষ্টির সময় থেকে অধিবেদন প্রথার মাধ্যমে বহুবিবাহের প্রসার লাভ করে। বল্লাল সেন কৌলীন্য দান করেন ব্রাহ্মণদের নয়টি গুণ দেখে যথা আচার,বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান। মূলত ব্রাহ্মণদের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য এই নিয়ম। ফলে ব্রাহ্মণদের নানা শ্রেণির সৃষ্টি হয়। যথা—১. কুলীন, ২ শ্রোত্রিয়, ৩. বংশজ, ৪. গৌণ কুলীন, ৫. সপ্তশতী। কুল রক্ষা কন্যাগত ফলে কুলীন পরিবারে কন্যার বিবাহ পালনীয়। আন্যথা হলে কুলভ্রষ্ট হবে। এই কারণে একটি পাত্রের সঙ্গে অনেক পাত্রীর বিবাহ অনিবার্য হয়। এইভাবে বহুবিবাহ প্রথা বাংলায় ভিত্তি স্থাপন করে। বল্লাল সেনের পরবর্তী দেবীবর ঘটকের আবির্ভাব হয়। তিনি ব্রাহ্মণদের দোষ অনুসারে 'মেল' সৃষ্টি করে, বিবাহকে ব্যবসায় পরিণত করে বহুবিবাহ প্রথার ইমারত তৈরী করেন। অনেকে বহুবিবাহ প্রথার মূল হিসাবে দেবীবরকে দোষারোপ করে থাকেন। তবে শুধু ব্যক্তি মানুষের সৃষ্টি প্রথা নয়, অর্থনৈতিক কারণেও বহুবিবাহ প্রথার রমরমা ঘটে। বিবাহে কুলীন ব্রাহ্মণরা অনেক অর্থের বিনিময়ে বিবাহ করতেন।

এইভাবে উনিশ শতকে এই প্রথার দারুন শ্রীবৃদ্ধি হয়। মূলত বহুবিবাহকারী পুরুষেরা বিবাহের পর স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করা দূরে থাক, তার বা তাদের খোঁজ পর্যন্ত নিতেন না। ফলে তারা জীবনযাপনের জন্য বেশ্যা বৃত্তিগ্রহণ করতে বাধ্য হতো। এইরকম নানা রকম সামাজিক অসংগতি দেখা যায়। এই সমস্ত বিষয় বিদ্যাসাগরের নজরে আসতে তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে সর্বতোভাবে বন্ধের চেষ্টা করেন। তাঁর অসামান্য গ্রন্থ দুটি বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে লিখিত প্রচার পুস্তক। এছাড়াও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তাঁর সক্রিয় ভুমিকার কারণ হিসাবে বিদ্যাসাগরের ছোট শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'বিদ্যাসাগার জীবনচরিত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন বিদ্যাসাগরের বাল্যশিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম স্ত্রী ও কন্যা খাদ্যাভাবের কথা জানালে বিদ্যাসাগর এই কুপ্রথা নিবারণে তৎপরতা দেখাতে শুরু করেন। এই কুপ্রথা নিবারণে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তৎকালীন সময়ের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন ইংরেজ সরকারের কাছে এই প্রথা বন্ধের জন্য আবেদন করেছিলেন তেমনি অনান্য ব্যক্তিবর্গ এই প্রথা বন্ধের জন্য আবেদন করেন। যেমন—

১. বর্ধমানের রাজার আবেদন
২. নদীয়ার রাজার আবেদন
৩. কলকাতার অধিবাসীদের আবেদন
৪. দিনাজপুরের অধিবাসীদের আবেদন
৫. ঢাকার অধিবাসীদের আবেদন
৬. যশোরের অধিবাসীদের আবেদন
৭. রাজশাহির অধিবাসীদের আবেদন
৮. মুর্শিদাবাদের অধিবাসীদের আবেদন
৯. বাঁকুড়ার অধিবাসীদের আবেদন
১০. মেদিনীপুরের অধিবাসীদের দুটি আবেদন
১১. হুগলীর অধিবাসীদের আবেদন
১২. কৃষ্ণনগরের অধিবাসীদের আবেদন
১৩. শান্তিপুরের অধিবাসীদের আবেদন
১৪. ময়মনসিংহের অধিবাসীদের আবেদন
১৫. জানবাজারের রাসমণি দাসীর আবেদন
১৬. কাশিমবাজারের রানি স্বর্ণময়ীর আবেদন
১৭. বরানগরের হিন্দু অধিবাসীদের আবেদন

এই আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে এই কুপ্রথা বন্ধের চেষ্টা যেমন চলছিল তেমনি সংবাদ-সাময়িক পত্রপত্রিকায় এই প্রথার বিরুদ্ধে অক্ষয় কুমার দত্তের মতো মণীষীরা আওয়াজ তুলে ছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল দলও পিছিয়ে ছিল না। ইতিমধ্যে ১৮৭০ সালে 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' বহুবিবাহ বন্ধের জন্য তৎপর হলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সুযোগে তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' ১৮৭১ সালে প্রকাশ করে, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিচারকারীদের সাতটি মতকে খণ্ডন করে শাস্ত্রীয় মতামত হাজির করেন। এই গ্রন্থে তিনি সমাজ বিজ্ঞান গবেষকের ন্যায় মতামত খণ্ডন করে ক্ষান্ত হন নি, সেইসঙ্গে হুগলী জেলা ও জনাই গ্রামের কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের তালিকা সহ কুলীন মেয়েদের দুর্বিষহ জীবন যাপন বর্ণনা করেছেন। প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের আগে ও পরে কিছু সম্মানীয় ব্যক্তি বহুবিবাহ সমর্থন করে সংবাদ পত্রে লেখালিখি করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই লেখাগুলির সমালোচনা সহ প্রথম গ্রন্থের ক্রোড়পত্র লেখেন। প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার পর বহুবিবাহ সমর্থনকারী বিভিন্ন ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে মত দেন। এই বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে অন্যতম তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়। এই বিরুদ্ধবাদীদের মতামত খণ্ডন করার জন্য তিনি দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' ১৮৭৩ সালে লেখেন। এই গ্রন্থে তিনি মূলত বিরুদ্ধবাদীদের শাস্ত্রীয় মতামতকে খণ্ডন করে শাস্ত্রীয় মতামতের মাধ্যমে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়, প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। বিরোধী পক্ষের দিকে ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়, ক্ষেত্রপাল

স্মৃতিরত্ন, রাজকুমার ন্যায়রত্ন, গঙ্গাধর কবিরাজ, সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতি। এই পাঁচজন পাঁচটি গ্রন্থের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ এখানেই থেমে থাকেনি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শনে' বহুবিবাহ গ্রন্থের সমালোচনা করেন। এই সময় শিক্ষিত সমাজ দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। একদল আইন করে বহুবিবাহ বন্ধের পক্ষে, অপর দল সচেতনতার উপর ছেড়ে দেয়। বাংলা সাহিত্যে বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন নাটক, গল্প, প্রবন্ধ রচনা হয়। ফলে বাংলার সাহিত্যিকরা এই আন্দোলনে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা রাখে। মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকাও কম নয়। এই সামাজিক আন্দোলন বিদ্যাসাগরের সৎকর্ম বিধবা বিবাহের মতো আইনী সহায়তা পায় নি কিন্তু পরবর্তীতে বিবাহের আইনে যে গণতান্ত্রিক ভাবনা বিধিবন্ধ হয় তা এই আন্দোলনের ফল। হিন্দু বিবাহ আইন থেকে বিশেষ বিবাহ আইন পাস হওয়ার ফলে বিবাহে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু হয়। এখন আর বহুবিবাহ নেই এই কথা বলা মুশকিল। কিন্তু ধরণ পালটে গেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে আইনি সমর্থন না পেলেও কুলীন বহুবিবাহকারী ব্রাহ্মণদের ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আজীবন দেশাচারের বিরুদ্ধে একক মানুষ হিসাবে নারী স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন।

নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা বিদ্যাসাগরের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বহুবিবাহ নিষেধক প্রথম পুস্তিকার শেষে তাঁর আক্ষেপ এক লাঞ্ছিত কুলীন নারীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। উক্ত উক্তিটি হল—"সকলে বলে, এক স্ত্রীলোক আমাদের দেশের রাজা কিন্তু আমরা সে কথায় বিশ্বাস করি না; স্ত্রীলোকের রাজ্যে, স্ত্রীজাতির এত দুরবস্থা হইবেক কেন।" কথিত আছে এই কথাগুলি জানাবার জন্য বিদ্যাসাগর রানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি ঠিকই কিন্তু নারীদের সামাজিক ক্ষেত্রে মুক্তির পথ এই সময় থেকেই সূচিত হয়। নবজাগরণের এই প্রাণ পুরুষ পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলা তথা ভারতের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, আজ সেই মহান বাঙালী 'যথার্থ মানুষ' কে স্মরণই আমার পুস্পঞ্জলি।

তথ্যের সন্ধানে

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১
২. শ্রী চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিদ্যাসাগর', দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ
৩. স্বপন বসু : 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৭৫
৪. গোলাম মুরশিদ : 'সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক' ১৮৫৪-১৮৭৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪
৫. বিনয় ঘোষ : 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬৮
৬. সুবোধ চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'বিদ্যাসাগার রচনাবলী', কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ
৭. বিনয় ঘোষ : 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, কার্তিক ১৩৪৬
৮. নিখিল সুর : 'সামাজিক প্রথা ও বঙ্গনারী' উনিশ শতক, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১৮
৯. অতুল সুর : 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৮০
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩

বিজ্ঞানচেতনা ও রবীন্দ্রনাথ

অনিরুদ্ধ বারিক

ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত দার্শনিক ও সাহিত্য সমালোচক জি.কে চেস্টারটন তাঁর 'ডিফেন্স অফ ননসেন্স' প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন, নিছক কলাকৃতির উপর নির্ভরশীল সাহিত্য কালোত্তীর্ণ হতে পারে না। যে-কোনো চিরকালীন সাহিত্যের পিছনে থাকে স্রষ্টার এক গভীর জীবন দর্শন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। সীমা ছাড়িয়ে অসীমমুখী রবীন্দ্রমানস চিরকালই কালের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বসাহিত্যের মুক্তাঙ্গনে পাড়ি দিতে চেয়েছে। তাই উনিশ শতকের মনীষীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান—এই ত্রিবেণী সঙ্গমের এক আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে বলেছেন—

> রবীন্দ্রনাথের উত্তর পুরুষেরা এই বলে তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন যে,মানুষের যা চরম উত্তরাধিকার তাই তিনি দিয়ে গেলেন। সেটি হচ্ছে 'কিভাবে বাঁচব' এই জিজ্ঞাসার নিঃশব্দ উত্তর।[১]

কবিগুরুর এই যে কালোত্তীর্ণ হয়ে বাঁচবার অনন্য জীবনবোধ তা স্পষ্টভাবে ছাপ ফেলেছে তাঁর দার্শনিক মনন, সৃজনশীল শৈল্পিকসত্তা ও বিজ্ঞান মানসের মিলনভূমির আঙিনায়। তাঁর শৈল্পিক জীবন প্রবাহের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, একদিকে যেমন তিনি ছিলেন কবি, প্রেমিক, দার্শনিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, ছোটোগল্পকার ও সংগীতজ্ঞ, অন্যদিকে তেমনি তিনি ছিলেন বিজ্ঞানাশ্রয়ী সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে এক অন্যতম পথিকৃৎ। আজীবন সাহিত্যরসপিপাসু ও সাহিত্যচর্চায় অভিনিবেশিত রবীন্দ্রমানস সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে থাকলেও বিজ্ঞান চেতনা থেকে কখনোই বিমুখ ছিল না। তাই শৈশব থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তার বিস্ময়কর ঝোঁক তাঁকে আজীবন বিজ্ঞানের নির্যাস সংগ্রহে ব্যপৃত রেখেছে। তাঁর অমর সব সৃষ্টিকে একটু ভালোভাবেই নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে, সমাজ-রাজনীতির পাশাপাশি বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞানচেতনা সেখানে কী গুরুত্বপূর্ণ

স্থান পেয়েছে। সেজন্যই শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর কবি অন্য সব শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন বেশি করে। জীবন প্রবাহের একেবারে শেষ প্রান্তে তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাননির্ভর গ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়'-এ তিনি জানিয়েছেন—"শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।"[২]

আমাদের প্রচলিত ধ্যান ধারণা অনুযায়ী সাহিত্য ও বিজ্ঞান দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। সাহিত্যের বিষয় মনের এবং বিজ্ঞানের বিষয়ে প্রকৃতির। প্রকৃতি থেকে আহরিত উপকরণ মনের জারক রসে জারিত করে সর্বস্তরের পাঠকের সামনে তুলে ধরে সাহিত্য। তাতে থাকে আধা বাস্তব ও আধা কল্পনা। অপরদিকে বিজ্ঞানের কাজ চরম বাস্তবমুখী। অবয়ববাদী ভাষাবিজ্ঞানীদের মতো একটি অখণ্ড বিষয়কে ভেঙে টুকরো টুকরো করে তার ভিত্তি পর্যন্ত পৌঁছানো বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সেখানে কল্পনার অবকাশ নেই। সাহিত্যে থাকে শাশ্বতকালীন সত্য আর বিজ্ঞানে থাকে পরিবর্তনশীল সত্য। উভয়ের মধ্যে এই আপাত বৈপরীত্যগুলো বাদ দিলে এদের মধ্যে এক চরম সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তা হল—উভয়েরই কাজ সত্যানুসন্ধান। কাব্য ও সাহিত্যজগতের মানুষজন সমাজ সচেতন সত্তা নিয়ে জীবন ও জগতের অখণ্ড সত্যকে চেতনার রঙে রাঙিয়ে সৃষ্টি করেন অমর কাব্য। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা এই জড় জগতের চেতন ও অচেতন সমস্ত ধরনের বস্তুর আপাত এবং চূড়ান্ত উভয় প্রকার পরিবর্তনের সত্য অন্বেষণে রত হন। এভাবেই সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়ের মনই পরম সত্যের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। দু'জনের সত্য খোঁজার পথটা আলাদা কিন্তু উদ্দেশ্যটা এক। দুজনেই দার্শনিক এবং দু'জনের মানসিক গঠনটা ভিন্ন হলেও উভয়ে একই উৎস হতে উৎসারিত। তাই বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থে লিখেছেন—

> কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অপরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ ভাবনার বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে অনুরণিত হইতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, তবুও কবিত্ব সাধনার সঙ্গে তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায়, সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন। স্মৃতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায়, সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন।[৩]

কবিগুরুর পারিবারিক পরিমণ্ডল ছিল তাঁর বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষের উৎসস্থল। আশৈশব ঠাকুরবাড়ির হাওয়ায় পরিবর্ধিত রবীন্দ্রমানসে গভীরভাবে ধর্মবোধ ও উপনিষদের প্রভাব পড়েছিল। যে উপনিষদের ভিত্তি ছিল বিজ্ঞানচেতনা ও বিজ্ঞাননির্ভর শাণিত যুক্তি। আশৈশব উপনিষদে পুষ্ট রবীন্দ্রনাথের তাই পরবর্তী রচনাতে বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তি ও বিজ্ঞানচেতনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ মেলে 'জীবনস্মৃতি'র পাতা থেকে শুরু করে জীবনের একেবারে শেষবেলায় রচিত 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থেও। 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায় সপ্তাহে একদিন রবিবার সীতানাথ দত্ত মহাশয় এসে যন্ত্রতন্ত্রযোগে তাকে প্রকৃতিবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। যা তাঁর কাছে এক গভীর অনুসন্ধিৎসার বিষয় ছিল। 'নানা বিদ্যার আয়োজন' প্রবন্ধে তিনি নিজেই জানিয়েছেন—

> তাছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দিবার সময় তাপ সংযোগে পাত্রের

> জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারী জল নীচে নামিয়া থাকে, এবং এই জন্যই জল টগবগ করে—ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যেই যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে।[৪]

বালক রবীন্দ্রনাথের পাঠ্য তালিকায় বিশেষ স্থান পেয়েছিল অক্ষয় দত্তের 'চারুপাঠ' ও 'পদার্থবিদ্যা' এবং সাতকড়ি দত্তের 'প্রাণীবৃত্তান্ত'। মেডিকেল কলেজের কোনো এক ছাত্রের কাছে তিনি পাঠ নিতেন অস্থিবিদ্যার। আবার কখনো কখনো মানবদেহের বৈজ্ঞানিক পাঠ নেবার জন্য তাঁকে যেতে হতো মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র অঘোরবাবু তাঁদের ইংরেজি পড়াতেন। সেই অঘোরবাবুর দেখানো কাগজে মোড়া মানুষের এক কণ্ঠনালি কিংবা শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষে দেখানো কোনো এক মৃত বৃদ্ধার কাটা পা তাঁর ওই কিশোর অথচ কোমল হৃদয়ে এক সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী দাগ কেটেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জ্যোতির্বিজ্ঞানের সুপণ্ডিত ছিলেন, বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ মৌলিক গণিত চর্চা ও জ্যামিতি নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। এছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রাণীবিজ্ঞানের ব্যুৎপত্তি ছিল যথেষ্ট। ফলে বাড়ির এই বিজ্ঞানঋদ্ধ পরিবেশ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে বিজ্ঞান চেতনার এক উষর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। ভাবলে অবাক লাগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ওই ছোট্ট রবিকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয় যাবার সময় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনবৃত্তান্ত পড়াতেন। যিনি ছিলেন স্থির তড়িৎ সংক্রান্ত আধান সম্পর্কিত বিষয়ের অন্যতম পথিকৃৎ—

> পিতা আমাকে ইংরেজি পড়াবেন বলিয়া Peter Parley"s Tale পর্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন-এর জীবন বৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইলেন।[৫]

এর সঙ্গে সঙ্গে পিতার কাছ থেকে পেতেন জ্যোতির্বিদ্যার সহজ পাঠ যা তাকে ওই বয়সেই বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে বিশেষ উৎসাহিত করেছিল তাই মাত্র ১২ বছর বয়সে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হলো তাঁর সম্ভবত প্রথম গদ্য রচনা 'গ্রহগণ জীবের প্রথম আবাসভূমি"। সেই শুরু হল সাহিত্যের জগতে নতুন দিশার সন্ধানে পথ চলা। কবিতার আখরেও তিনি গেঁথেছেন বিজ্ঞান চেতনার বীজ। জল ও মাটি মিলেমিশে কীভাবে শুকনো বীজ থেকে অঙ্কুর গজায় এ কৌতুহল শিশু রবির সত্তা জুড়ে ছিল অনেকদিন। এই বিস্ময় যৌবনের দিন পর্যন্ত কবিকে আলোড়িত করেছে। "সোনার তরী" কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় তাই তিনি লিখেছেন—"সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি/সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি/তোমারও মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি/উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর।"[৬] গ্রহ নক্ষত্র সূর্য নিয়ে প্রাথমিক পাঠ কবি পেয়েছিলেন পিতার কাছে-এ কথা আগেই জানিয়েছি। তাই নভোবিজ্ঞানের গোপনতম গূঢ় যে রহস্য, যা তাকে বারবার করেছে বিস্মিত, কৌতুহলী করেছে কীভাবে নীহারিকার মধ্যে গ্যাস,ধূলি প্রতিনিয়ত উত্তপ্ত হয়। আকর্ষণ-বিকর্ষণে চক্র গতি লাভ করে। ঘনীভূত হয়ে বাষ্প তেজ সহ সূর্য তারকায় বিলীন হয়, তা তিনি ব্যক্ত করেন তাঁর কালজয়ী এক গানে—"আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ/তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।/বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।" বর্তমান পরমাণু বিজ্ঞানের সূচনা করেন দু-বারের নোবেলজয়ী বিশ্ববন্দিত বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরি। তাঁর আবিষ্কারের মধ্যে

সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি যেটি, তাহল রেডিয়ামের আবিষ্কার। এই মৌল আবিষ্কার বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর ব্যাখ্যাকে পরমাণু তত্ত্বের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। কবির কৌতুহল ও প্রজ্ঞা যে কত গভীর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'নৈবেদ্য', 'উৎসর্গ', 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় ও গানে। 'নৈবেদ্য'তে লেখেন—"এই স্তব্ধতায়/শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়;/মোর অঙ্গে রোমে রোমে লোক-লোকান্তরে/গ্রহ সূর্য তারকায় নিত্যকাল ধরে।"[৭] 'উৎসর্গ' কবিতায় উঠে এসেছে পরমাণু বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষিত ধারণার সারমর্মটুকু—

> আকাশ সিন্ধুর মাঝে এক ঠাঁই।/কিসের বাতাস লেগেছে/জগত ঘূর্ণি জেগেছে;/ঝলকি উঠেছে রবি শশাঙ্ক/ঝলকি উঠেছে তারা,/অযুত চক্র ঘুরিয়া উঠেছে/অবিরাম মাতোয়ারা।[৮]

একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় তিনি আজান্মকাল মহাকাশপ্রেমী ও উৎসাহী। গানের সাথে সাথে বহু কবিতায়ও তা প্রকাশিত হয়েছে নানা ভাবে। এর একটি অপূর্ব নিদর্শন মেলে তাঁর "বলাকা" কাব্যের 'ছবি' কবিতাটিতে। "তুমি কি কেবলই ছবি"—এই নিঃশব্দ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি জীবন ও জগতের চারপাশে পাড়ি না দিয়ে পাড়ি দিলেন রহস্যাবৃত মহাকাশের গভীর শূন্যতার পথে—"ওই যে সুদূর নীহারিকা/যারা করে আছে ভিড়/আকাশের নীড়,/ওই যারা দিন রাত্রি/আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী,/গ্রহ তারা রবি,/তুমি কি তাদের মত সত্য নও।"—এভাবে বহু কাব্য কবিতা ও গানে তিনি স্থান দিয়েছেন বিজ্ঞান নির্ভর শানিত যুক্তি ও চেতনাকে। আমাদের এই ছোট্ট প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত অবয়বে তাকে ধরা অসম্ভব। এ কেবল তার উপরিভাগকে ক্ষণকালের জন্য ছুঁয়ে যাওয়া মাত্র।

আর সবশেষে, তাঁর বিজ্ঞাননির্ভর রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়'-এর কয়েকটি অংশ সংক্ষেপে আলোচনা করে এ প্রবন্ধের ইতি টানবো। ১৯৩৭-এ প্রকাশিত 'বিশ্বপরিচয়' রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন পদার্থবিদ শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে। রবীন্দ্র রচনাবলীর মধ্যে এটি একমাত্র গ্রন্থ,যার প্রতিপাদ্য বিষয় কেবলই বিজ্ঞান। পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক,সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূ-লোক ও উপসংহার-এই ছ'টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই গ্রন্থে তাপ গতিবিদ্যার মূলসূত্র থেকে শুরু করে পরমাণুর গঠন, আলোর প্রতিসরণ-বিচ্ছুরণ-বর্ণালী তত্ত্ব, রেডিয়াম আবিষ্কারের ইতিহাস, স্থির তড়িৎ গবেষণার আধান থিওরি, নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র হয়ে আধুনিক কালের সবথেকে বেশি চর্চিত বিষয় কৃষ্ণগহ্বর তত্ত্ব পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের সুগভীর অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হয়েছে। তাপ পরিবহনের যে প্রধান তিনটি প্রক্রিয়া পরিচলন পরিবহন ও বিকিরণ এই তিনটি বিষয়কেই রবীন্দ্রনাথ প্রাত্যহিক জীবনের উপমা সহযোগে প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের জানিয়েছেন পরমাণুলোক অংশে। বিকিরণের উদাহরণ দিচ্ছেন তিনি এমন করে—"বড় যজ্ঞের রান্নাঘরে যে চুলি জ্বলছে তার কাছে বসা আরামের নয়,কিন্তু বেলা দশটার কাছাকাছি শহরের সমস্ত রান্নাঘরে যে আগুন জ্বলে বড়ো আকাশে তা ছড়িয়ে যায় বলেই শহরে বাস করতে পারি।"[৯] আবার পরিবহন প্রক্রিয়ার সহজ উদাহরণ দেন এমন করে যাতে আটের বালক থেকে আশির বৃদ্ধ সহজে তা বুঝতে পারে—

> আগুনে পোড়ালে লোহার পরমাণু কাঁপতে কাঁপতে এত বেশি অস্থির হয়ে ওঠে যে তার উত্তেজনা আর লুকানো থাকে না। তখন কাঁপনের ঢেউ আমাদের শরীরের স্পর্শনাড়ীকে ঘা মেরে তার মধ্য দিয়ে যে খবরটা চালিয়ে দেয় তাকে বলি গরম।[১০]

সাদা আলো যে সাত বর্ণের মিলন এবং তার বিচ্ছুরণে যে এদের দেখা মেলে তা তিনি বুঝিয়েছেন নিজের একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে—

> সাদা রঙে মিলিয়ে আছে সাতটা বিভিন্ন রঙের আলো। যেন সাত রঙের রশ্মির পেখম, গুটিয়ে ফেললে দেখায় সাদা, ছড়িয়ে ফেললে দেখায় সাতরঙা। সেকালে ছিল ঝাড়লণ্ঠন,বিজলি বাতির তাড়ায় হয়েছে দেশছাড়া। এই ঝাড়ের গায়ে দুলত তিনপিঠওয়ালা কাচের পরকলা। এইরকম তিন পিঠওয়ালা কাচের গুণ এই যে,ওর ভিতর দিয়ে রোদ্দুর এলে তার থেকে সাত রঙের আলো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে।[১১]

আলোর প্রতিফলন ও শোষণের জন্য জগতের কোনো বস্তুকে দেখি সাদা তো কোনো বস্তুকে দেখি কালো, কোনোটাকে লাল কিংবা কোনোটাকে কমলা। এমন নানান বর্ণচ্ছটার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বিজ্ঞান আমাদের জানিয়েছে প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বর্ণের চ্যুতি, বর্ণের প্রতিসরাঙ্কের মতো নানা জটিল গূঢ় তত্ত্ব। কিন্তু তিনি তা জানালেন কি অদ্ভুত ও সহজ উপায়ে—

> সব রঙ মিলে সূর্যের আলো সাদা,তবে কেন নানা জিনিসের নানা রঙ দেখি। তার কারণ সব জিনিস সব রঙ নিজের মধ্যে নেয় না, কোনো-কোনোটাকে বিনা ওজরে বাইরে বিদায় করে দেয়। সেই ফেরত দেওয়া রঙটাই আমাদের চোখের লাভ। চুনি-পাথর সূর্যকিরণের আর সবরকম ঢেউকেই মেনে নেয়,ফিরিয়ে দেয় লাল রঙকে। তারই ত্যাগের দানেই চুনির খ্যাতি। যা নিজে আত্মসাৎ করেছে তার কোন খ্যাতি নেই। লাল রঙটাই কেন যে ও নেয় না,আর নীল রংয়ের পরেই নীলাপাথরের কেন সম্পূর্ণ বৈরাগ্য এ প্রশ্নের জবাব ওদের পরমাণু-মহলেই লুকানো রইলো।[১২]

স্থির তড়িৎ গবেষণায় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আমাদের জানিয়েছিলেন দুই বিপরীতধর্মী আধানের পারস্পরিক আকর্ষণ বলই এ জাতীয় তড়িৎ সৃষ্টির জন্য দায়ী। তিনি তাদের নাম দিয়েছিলেন পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জ। রবীন্দ্রনাথ এদের নামকরণ করলেন হাঁ-ধর্মী ও না-ধর্মী। তাঁর নিজের কথায়—"এই বৈদ্যুৎ আছে দুই জাতের। বিজ্ঞানীরা এক জাতের নাম দিয়েছেন পজিটিভ আর এক জাতের নাম নেগেটিভ। তর্জমা করলে দাঁড়ায়,হাঁ-ধর্মী আর না-ধর্মী। এদের মেজাজ পরস্পরের উল্টো, এই বিপরীতকে মিলিয়ে হয়েছে সমস্ত যা-কিছু।"[১৩] এই যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রোটন কণার মোট হাঁ-ধর্মী আধান ও বাইরের ইলেকট্রন মহলের মোট না-ধর্মী আধানের জন্যই যে পরমাণুর সুস্থিতি ও অস্তিত্ব তা তিনি বুঝিয়ে দিলেন এই 'সমস্ত যা-কিছু'র মধ্যে দিয়ে। হাঁ-ধর্মী প্রোটন, না-ধর্মী ইলেকট্রন এবং আধানহীন নিউট্রনের বাইরেও যে পরমাণুর মধ্যে আরো এক ধরনের কণার অস্তিত্ব আছে যার নাম পজিট্রন, তাকে তিনি ব্যক্ত করলেন এভাবে—"মোটের উপর সব ইলেকট্রন না-ধর্মী বটে,কিন্তু এমন এক জাতের ইলেকট্রন ধরা পড়েছে যারা হাঁ-ধর্মী, অথচ ওজনে ইলেকট্রনেরই সমান এদের নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন।"[১৪] এছাড়াও রেডিয়ামের আবিষ্কার, তেজস্ক্রিয়তা, আলফা, বিটা, গামা কণা নিঃসরণের ঘটনা ও ব্যবহার প্রভৃতি যুগান্তকারী ঘটনাগুলি গ্রন্থটির পাতায় পাতায় বিধৃত হয়েছে। যার বিস্তারিত আলোচনা প্রবন্ধের ক্ষুদ্র শরীরে যে স্থান দেওয়া সম্ভব নয় তা আগেই বলেছি।

প্রবন্ধের একেবারে শেষাংশে আমরা একটু চিনে নেবার চেস্টা করব একাগ্র সর্বগ্রাসী বিজ্ঞান সাধনার সাধক রবীন্দ্রনাথকে। বিজ্ঞানকে ভাল করে জানার জন্য সর্বভুক পাঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ

হয়েছিলেন তিনি। তিনি আইনস্টাইন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক, মিলিকান প্রমুখ বিজ্ঞানীর রচনা মন দিয়ে পড়েছেন। এই সুগভীর পঠনের সুস্পষ্ট প্রতিফলন পড়েছে 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থেও। এডলার, ইয়াং প্রমুখ চিন্তাবিদদের লেখা তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। বংশানুক্রম ও আচরণতত্ত্ব সম্পর্কে প্যাভলভ, ওয়াটসন, মেন্ডেলের তত্ত্বসমূহ তিনি সচেতনভাবে আত্মস্থ করতে চেষ্টা করেছেন। এভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সত্যাসত্যকে সাহিত্যের আঙ্গিনায় আনবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। যদি তা একান্তভাবেই পরিপূর্ণরূপে সফলতা পেত তবে তা যে বিশ শতক তথা পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হতো, তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

উৎসের সন্ধানে

১. অন্নদাশঙ্কর রায় : 'প্রবন্ধ' ১ম খণ্ড, আশ্বিন ১৩৭১, পৃ. ৩৩০
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বিশ্বপরিচয়' ২৫ বৈশাখ ১৪১৭, পৃ. ৯
৩. জগদীশচন্দ্র বসু : 'অব্যক্ত' ১৩৯৮,পৃ.-১২৩।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'জীবনস্মৃতি', তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৬৬, পৃ. ২১
৫. তদেব : পৃ. ৫০
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'সোনার তরী', বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৪৮, পৃ. ১৮৭
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'নৈবেদ্য', বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৩৯৬, পৃ. ৩০
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'উৎসর্গ', বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৩৯৫,পৃ.-৩৫।
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বিশ্বপরিয়', ১ম জ্ঞান বিচিত্রা সং, ২৫শে বৈশাখ ১৪১৭,পৃ. ১৫
১০. তদেব : পৃ. ১৭
১১. তদেব : পৃ. ১৮
১২. তদেব : পৃ. ১৯
১৩. তদেব : পৃ. ২১
১৪. তদেব : পৃ. ২৩

‘বিশ্বপরিচয়’ গ্রন্থে বিজ্ঞান ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ

অর্পিতা বারিক

মাত্র ১২ বছর বয়সে ‘বালক’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ একটি অসাক্ষরিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধের শিরোনাম দেন—“গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি।” এটি কিন্তু এখন স্বীকৃত যে গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির লেখার আগে বাবার সাথে ডালহৌসি পাহাড়ে গিয়েছিলেন। সেখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রে আবাসন অবস্থান এবং তাদের সম্পর্কে অন্যান্য গল্প বলতেন। আর সেই গল্প শুনে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি লিখে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা থেকেই একটা বিজ্ঞান চর্চার আবহ ছিল। বিস্ময়ের কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশ পরিস্থিতি ধর্মবোধ তার উপনিষদীয় জীবনদৃষ্টির দ্বারা আচ্ছন্ন হলেও সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি কোনো বিরূপতা ছিল না, তা আমরা জীবনস্মৃতিতে যথেষ্ট লক্ষ করি। এই বিজ্ঞান শিক্ষা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্রকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-বৈজ্ঞানিক করার জন্য নয়। কিন্তু স্বয়ং তার পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বুঝেছিলেন যে বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি ও গতিশীলতা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যাই থাকুক না কেন, তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে এবং রবীন্দ্রনাথের মতো বালকের তা জানা দরকার। তাই তিনি ছেলেকে হিমালয় বেড়াতে নিয়ে গিয়ে পোক্টরের জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ থেকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি চিনিয়ে দিতেন। বাড়িতে পাঠবস্তুর মধ্যে ছিল অন্যান্য কিছুর সঙ্গো পদার্থবিদ্যা, জ্যামিতি, গণিত। ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা মেডিকেল কলেজে যেত শবচ্ছেদ দেখতে, তারা যাতে মানুষের শরীরতত্ত্ব ও দেহতত্ব সম্পর্কে জানতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে স্মৃতিচারণ করেছেন যে, ছোটোবেলায় সীতানাথ দত্ত আসতেন তাদের বাড়িতে যিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হাতে-কলমে করে দেখাতেন। মাঝে মাঝে এসে যন্ত্রতন্ত্র যোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন অক্ষয় কুমার দত্ত, সাতকড়ি দত্ত প্রমুখদের বিভিন্ন বিজ্ঞান নির্ভর বই পড়তেন

এবং তার ওপর দায়িত্ব ছিল যে সেই বইগুলি পড়ে লিখতে হবে ‘বালক’ পত্রিকায় । যাতে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা পড়তে পারে ও বুঝতে পারে এবং তিনি সেই কাজটি করতেন। একটু যখন বড়ো হলেন তিনি রবার্ট বল, নিউক্লোমোস এবং সমকালীন বিজ্ঞানীদের লেখা পড়তেন। তখনকার সমকালীন প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এদের সাথে রবীন্দ্রনাথের সখ্য ছিল। এও জানা যায় ত্রিপুরার মহারাজার সাথে সখ্যতাসূত্রে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে বেশ কিছু আর্থিক সাহায্য এনে দিয়েছিলেন। সুতরাং ভারতের বিজ্ঞান চর্চায় বা বাঙালি বিজ্ঞানচর্চায় রবীন্দ্রনাথের একটা অবদান তো আছেই। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশকে বলেছিলেন রাশি বিজ্ঞানের একটি স্কুল তৈরি করতে এবং তারই ফল আজকের আই.এস.আই বা ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেরিয়েছেন তখন পাশ্চাত্য বা ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উন্নতি প্রযুক্তির উন্নতি কিভাবে ধীরে ধীরে তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে এবং উল্টো দিকে তিনি দেখেছিলেন ভারতকে যেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতার বড্ড অভাব এই জন্য তিনি বলতেন নয় কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতকার্য করে রাখছে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপরিচয় বইটি সত্যি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান মানুষের কথা বললেই বিশ্বপরিচয়ের কথা এই আগে জাগ্রত হয় সবার মনে। এই বইটিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তার জ্ঞান ও চিন্তার বিমূর্ত বিকাশ ঘটেছে। সাহিত্য ও বিজ্ঞান দুটি একত্রে মিলেমিশে প্রথম শিক্ষার্থীর কাছে বিজ্ঞান পাঠ সুখকর হয়ে ওঠে। তা যেন শিক্ষার্থী ও জ্ঞানপিপাসুর কাছে আনন্দদায়ক হয়। তারই প্রচেষ্টা থেকে ৭৬বছর বয়সে লেখেন ‘বিশ্বপরিচয়’ বইটি।

আর আমাদের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রভাবনায় বিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদান কালে বিশ্ববিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে ছাত্রদের পাঠদান করতে গিয়ে তিনি দেখলেন আধুনিক বিজ্ঞান ব্যতীত শিক্ষা ও সার্বিক উন্নতি অসম্ভব। তাই তিনি নিজে পুত্রকে জাপানে পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করতে। তখনকার প্রথিতযশা সমস্ত বিজ্ঞানীদের সাথে তিনি বিজ্ঞান ও সার্বিক উন্নতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশ্বপরিচয়ে কবি তার বিজ্ঞান মানসিকতার কথা বলেছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গ পত্রে বলেছেন—

> আমি বিজ্ঞানের সাধক নয় সে কথা বলা বাহুল্য।
> কিন্তু বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। (বিশ্বপরিচয়)

কবিসাহিত্যিকের মননে আমাদের বোধশক্তি, মানুষের পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে উন্নত হওয়ার কথা থেকে গ্রহণ নক্ষত্র, আলোক বিজ্ঞান, বর্ণালী, আলোর গতিবেগ ও তাই দিয়ে অন্য গ্রহ নক্ষত্রের দূরত্ব প্রভৃতি আলোচনা করেছেন সাহিত্যের রস নিমজ্জিত করে। পড়তে কোনো ক্লান্তি লাগে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যতা গুলিকে কোথাও বিকৃত না করে এবং নির্ভুল সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে পরিবেশন করেছেন। তিনি পরমাণু বিজ্ঞানের সে সময়ের একেবারে সর্বশেষ আবিষ্কার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন তা বোঝা যায়—

> কসমিক রশ্মির সম্বন্ধে এখনও নানামতের আনাগোনা চলেইছে। পরমাণুর নতুন তত্ত্বের সূত্রপাত হওয়ার বিজ্ঞান মহলে মননের ও মতের তোলাপাড়ার তোলাপাড়ার অন্ত নেই, বিশ্বের মূল কারখানার ব্যবস্থার ধ্রুবত্বের পাকা সংকেত খুঁজে বের করা অসাধ্য হলো। নিত্য বলে যদি কিছু

> খ্যাতি পেতে পারে তবে সে কেবল এক আদিজ্যোতি যা রয়েছে সবকিছুর ভূমিকায়, যার প্রকাশের নানা অবস্থান্তরের নির্ভর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই বৈচিত্র্য।' (বিশ্বপরিচয়, পৃ. ৪৩)

এ কথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে মূলত আলোরশ্মিই অর্থাৎ প্রচন্ড শক্তিকনাই বিশ্ব সৃষ্টির মূলরহস্য। তাঁর কথায়, প্রকৃতি পৃথিবীর কাজ চালাবার জন্য সেই অনুযায়ী মানুষের চোখ কান তৈরি করেছেন। কিন্তু মানুষ যে বিজ্ঞানী হবে প্রকৃতি সে খেয়ালই করেননি। বোধের সীমা বাড়লে বা বোধের প্রকৃতি অন্যরকম হলে মানুষের জগৎটা অন্যরকম হতো। এরপর এসেছে, বিজ্ঞানের পরিভাষার কথা। নক্ষত্রলোক অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন নীহারিকা সম্বন্ধে, আলোকবর্ষ (দূরত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানে ব্যবহৃত সময়) আমাদের নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব, স্যার জেমস জীনের উপমা (নীহারিকার তারাদের দূরত্ব সম্পর্কে)। নীহারিকা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

> কিন্তু এই টানকে নমস্কার করি যখন জানি, পৃথিবী হঠাৎ যদি তার টান আলাদা করে তাহলে যে ভীষণ বেগে পৃথিবী পাক খাচ্ছে তাতে আমরা তার পিঠের উপর থেকে কোথায় ছিটকে পড়ি তার ঠিকানা থাকে না। বস্তুত পৃথিবীর টানটা এমন ঠিক মাপে হয়েছে যাতে আমরা চলতে পারি অথচ পৃথিবী ছাড়তে পারিনে। ('বিশ্বপরিচয়', পৃ. ৫৭)

এত সহজ সুন্দর করে মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের উপকারিতা বোঝানো হয়েছে অথচ এতে শুষ্ক বৈজ্ঞানিক গণিতের ভাষাও ব্যবহার করা হয়নি। গ্রহ নক্ষত্রের পরিক্রমা পারস্পারিক টানাপোড়েন নিয়ে তিনি নীহারিকা, সূর্য, নক্ষত্র, গ্রহতারার জন্মকথা তাদের দূরত্ব প্রভৃতি আলোচনা করেছেন। পরে এসেছে পৃথিবীর জল, পাহাড়, নদী ও সমুদ্রের কথা। পরে আদি জীব কণা থেকে মানুষ সৃষ্টি, প্রোটোপ্লাজমা, অ্যামিবা ইত্যাদির কথাও লিখেছেন। নীহারিকা থেকে সূর্য পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ চাঁদের উৎপত্তি প্রভৃতি আলোচনা করেছেন। সকলের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে ও কোনটির বিজ্ঞান বিচ্যুতি নাই। এগুলি পাঠ করলে বুঝতে পারি কি ঐকান্তিক তিনি বিজ্ঞানের এই শাখা গুলি অধ্যয়ন করেছেন ও সাহিত্যে-মননে তা প্রকাশ করেছেন। বিশ্বপরিচয়ে ভূলোক অধ্যায়ে দেখতে পাই ভাষা সাহিত্য যেন অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। অথচ কি সুন্দর কমনীয় ভাবে বৈজ্ঞানিক সত্য গুলি ব্যাখ্যত হয়েছে। অতিবেগুনিরশ্মি ও সূর্যকিরণ, উল্কাপাত সম্বন্ধে বোঝাতে তিনি লিখেছেন—

> সূর্যের আলো নয় কোটি মাইল পেরিয়ে আসে পৃথিবীতে। গ্রহ বেষ্টনকারী আকাশের শূন্যতা পার হয়ে আসতে তেজের বেশি ক্ষয় হবার কথা নয়। যে প্রচণ্ড তেজ নিয়ে এসে বায়ুমণ্ডলের প্রত্যন্ত দেশে পৌঁছায় তার আঘাতে সেখানকার হাওয়ার পরমাণু নিশ্চয়ই ভেঙে চুরে ছারখার হয়ে যায়—কেউ আস্ত থাকে না। বাতাসের সর্বোচ্চ ভাগে ভাঙা পরমানুর যে স্তরের সৃষ্টি হয় তাকে নাম দেয়া হয় এফ-২ (চ-২) সূর্যকিরণের বেগুনি পারের রশ্মি পরমাণুর ভাঙচুরের কাজে সবচেয়ে প্রধান উদ্যোগী। উচ্চস্তরে উপদ্রব শেষ করতে করতে বেগুনিপারের রশ্মি অনেকখানি নিঃস্ব হয়ে নিচের হাওয়ায় অল্প পৌঁছায়। সেটা আমাদের রক্ষে। বেশি হলে সইত না।' (বিশ্বপরিচয়, পৃ. ১০৮)

এইভাবে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে তিনি কত সহজ সুন্দর হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন, তা আমার মতো সামান্যের পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অথবা সৌরজগৎ অধ্যায় পাঠে সূর্যের তাপের যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিকৃত নাই। নিম্নলিখিত অংশটি পাঠ করলে বোঝা যায় কত গভীর মনোযোগ নিয়ে এগুলি তিনি অনুধাবন করেছেন ও সাহিত্যের ভাষায় কি নিপুণ ভাবে বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন—

সূর্যের উপরিতলের তাপমাত্রা প্রায় দশ হাজার ফারেনহাইট ডিগ্রী মাপে অবশেষে নিচে নামতে নামতে এমন স্তরে পৌঁছাবে যেখানে ঠাসা গ্যাসের আর স্বচ্ছতা নেই। এই জায়গা তাপমাত্রা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষডিগ্রির চেয়ে বেশি অবশেষে কেন্দ্রে গিয়ে পাওয়া যাবে প্রায় সাত কোটি কুড়ি লক্ষ ডিগ্রি তাপ। সেখানে সূর্যের দেহব কঠিন লোহা পাথরের চেয়ে অনেক বেশি ঘন অথবা গ্যাস ধর্মী। (বিশ্বপরিচয়, পৃ. ৭৫)

তার বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধ্যান ধারণার কথা তার উৎসর্গ পত্রে ও বিশ্বপরিচয়ের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে আছে তিনি লিখেছেন-এ কথা মনে রেখো এ সকল আন্দাজি মতকে নিশ্চিত প্রমাণের মধ্যে ধরে নেওয়া চলবে না।' বা উৎসর্গপত্রে—'জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার মূল্য আছে, ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস হতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে কেউ ফাঁকি দেওয়া হয়।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—যখন আমাদের মহাবিশ্ব মানুষের সাথে ঐক্যতানে বিরাজ করে তখন শাশ্বত, যাকে আমরা সত্য বলে জানি, হয়ে দাঁড়ায় সৌন্দর্য, আমাদের অনুভূতিতে। এছাড়াও অন্য কোনো ধারণা থাকতে পারে না এই জগত বস্তুত মানবীয় জগতের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও হল বিজ্ঞানী মানুষের দৃষ্টি। সুতরাং, আমাদের ছাড়া বিশ্বজগতের অস্তিত্ব নেই এটা হল আপেক্ষিক জগৎ, যার বাস্তবতা আমাদের চেতনার ওপর নির্ভরশীল।

পরিশেষে বলা যায় যে, তার বিজ্ঞান শিক্ষা বা বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস যাইহোক এক অভাবিত বিজ্ঞানবোধ তার মনন ও কল্পনা উভয়কে আচ্ছন্ন করেছিল। তার একটি উপাদান হল এই বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে তার ধারণা। খুব অল্পবয়সেই এই অস্তিত্বের বিশাল পরিসর সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান বুঝে উদ্ভাসিত হয়ে 'আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ' সম্বন্ধে তার একটি বোধ তৈরি হয়েছিল। এই বোধ তার কবিত্বকে সমৃদ্ধ করেছে, কারণ এর উৎস বিজ্ঞান হলেও এর জন্ম এর মধ্যে জন্ম দিয়েছে এমন এক বিস্ময়, যা তাকে দিয়ে বলিয়েছে—"বিস্ময়ে তাই জাগে আমার হৃদয়ে মানবের জয় বিজ্ঞানের জয় জয়াকার।" উপসংহারে বিনীতভাবে বলি—আমি অতি সামান্যা আমার এই প্রবন্ধে বিশ্বকবি ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার যে বিশ্লেষণ করার ধৃষ্টতা তা আশা করি সুধী পন্ডিতবর্গ ও পাঠকগন মার্জনা করবেন।

উৎসের সন্ধানে

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বিশ্বপরিচয়', প্রকাশক শ্রী পুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৪৪, পৃ. ৪৩
২. তদেব : পৃ. ৫৭
৩. তদেব : পৃ. ১০৮
৪. তদেব : পৃ. ৭৫

তথ্যের সন্ধানে

১. প্রকাশক শ্রী পুলিনবিহারী সেন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্বপরিচয়', বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-আশ্বিন ১৩৪৪
২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : 'জীবনস্মৃতি', বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪১৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা

রফিকুল ইসলাম খান

বাঙালির মানস-অস্তিত্ব নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। আমরা যখন যা কিছুই ভাবি তা যেন রবীন্দ্রনাথের মতো করেই ভাবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই আমাদের চিন্তা-চেতনার সাংস্কৃতিক পরিধি বিস্তারের প্রতিটি স্তরে একটু একটু করে এগিয়ে দিয়েছেন। বাঙালির মনের বিকাশকে এই এগিয়ে দেবার যে ভূমিকা সেটাই তাঁর শিক্ষাচিন্তার স্বরূপ রূপে বিবেচিত হতে পারে। আলাদা করে তাঁর শিক্ষা ভাবনার স্বরূপ খোঁজার কিছু নেই। এক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বিস্তৃত মহাসমুদ্ররূপ রচনাসমগ্র রেখে গেছেন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই হল বাঙালির মনন ও চৈতন্যের বিকাশের জন্য শিক্ষাচিন্তার স্মারক এবং বাহক।

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে যে বিষয়টির অভাব খুঁজে পেয়েছিলেন সেটি হল বিদ্যায়তনে শিশুকে একটি গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা হয় যেখানে আনন্দের উপকরণ খুবই নগন্য। আমরা এখন লক্ষ করি যে আমাদের শিশুদেরকে আমরা ছোটোবেলা থেকেই শিক্ষা গলাধকরণ করানোর জন্য উঠে পড়ে লাগি। ছোট্ট শিশুটিকে তার নির্দিস্ট সিলেবাসের মধ্যে আটকে রাখি। সিলেবাসের বাইরের বই পড়তে গেলে তাকে নিরুৎসাহিত করি। আমরা ভাবি এতে তার কোনো উপকার হবে না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ও এই একই চিত্র লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এখানে বই এর বাইরের জগৎ অর্থাৎ সার্বিক জ্ঞান অর্জনের কথা বলেছেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন—“আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ,কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না।” (শিক্ষা, পৃ. ৮)

বই মুখস্ত নয় বই এর ভেতর থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করাই হল আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম। প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখে শুনে সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চা হওয়াই স্বভাবের বিধান। রবীন্দ্রনাথ সেই বিধানকে মান্য করতে চান। আবরণের বাইরে এসে নিজ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের

মুক্তি দিতে চান তিনি। আর মুখস্ত করার এই ভয়ংকর প্রবণতাকে তিনি চৌর্যবৃত্তির সাথে তুলনা করেছেন। 'শিক্ষা' নামক গ্রন্থের 'শিক্ষার বাহন' এবং 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' নামক প্রবন্ধে পরীক্ষা পাসের জন্য শিক্ষার্থীদের মুখস্তনির্ভরতার প্রতি তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে তার সময়ে যে শিক্ষাব্যবস্থা দেশে চলেছিল, তাতে হতে পারত না চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ। তার কাছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় ছাত্রদের কেবলই কিছু তথ্য প্রদান করা নয়; তথ্য নিয়ে ভাবতে শেখানো। শিক্ষার লক্ষ্য হতে হবে বিভিন্ন ঘটনাবলির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা বাড়ানো। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার আরেকটি লক্ষ্য হল মানুষের ধ্যান-ধারণা ও রুচির উন্নতি করা। অর্থাৎ যিনি শিক্ষিত হবেন তিনি হবেন উন্নত ধ্যান-ধারণা ও রুচিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কিন্তু আমরা প্রায় ক্ষেত্রেই তার উল্টোটা দেখতে পাই।

রবীন্দ্র প্রত্যয়ে শিক্ষার মূল আদর্শ হল, সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করা ও বাইরে তার প্রকাশ ঘটানো। তাই সমস্ত রকমের গন্ডিবদ্ধতা তাঁর কাছে ছিল সেই পরম সত্য উপলব্ধির দুরপনেয় বাধাবিশেষ। কারণ, নিজেকে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বেঁধে জাতিপ্রেম Demon-এর অহমিকা থেকে সত্যের অন্বেষণ করলে তাকে কখনোই পাওয়া যায় না। আত্মশক্তিতে ভর করে, যাবতীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারলে তবেই সত্যের দোরগোড়ায় পৌঁছানো যেতে পারে। শিক্ষা হল সেই পথ বা মাধ্যম, যা ক্রমাগত আমাদের সেই অভীষ্টের দিকে নিয়ে চলে।

তিনি সেই সময়কার সমাজে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, কারণ সে শিক্ষা ছিল অনুকরন শিক্ষা। এই শিক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি অর্জন করা যায় কিন্তু পূর্ণ শিক্ষা অর্জন করা যায় না। এই শিক্ষার মধ্যে যোগ ছিল না ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও দরিদ্র মানুষের জীবন-যাপন এর কথা। তাই তিনি ছাত্রদের যথার্থ শিক্ষার জন্য এক নতুন শিক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, যা ছাত্রদের এক নতুন শিক্ষার আলো দেখাবে। যে আলো তাদের চিন্তা করতে শেখাবে, চর্চা করতে শেখাবে। তিনি বলেন—"এখানে নোটের নুড়ি কুড়িইয়া ডিগ্রির বস্তা বঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে।" (শিক্ষা, পৃ. ১২৭) প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি 'কেরানির' আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন এই শিক্ষা মানুষকে সৃজনশীল করে না। তিনি প্রবন্ধে বলেছেন—

> ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটা সময় ঘন্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও মুখ বন্ধ করেন। (শিক্ষা, পৃ. ৪৮)

তিনি এই গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে তীব্র আক্রমন করে বলেছেন, এই শিক্ষা জোর করে বাইরে থেকে চালিয়ে দেবার শিক্ষা, যার সঙ্গে জীবনের এবং শিক্ষার্থীর জীবনের কোনো যোগ নেই। তাঁর মতে শিক্ষা হল জীবনের সম্যক সামগ্রিক উপলব্ধি আর ভারতের সাধনা হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, জ্ঞনের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকেও আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে বলে তিনি মনে করেন। কারণ, কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় পাস

করাই শিক্ষা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা হল তপোবনে। প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা তা প্রবিত্র হয়। শিশুরা সবসময় মুক্ত পরিবেশ পছন্দ করে। শিক্ষা যাতে নীরস ও যান্ত্রিক না হয় সেজন্য তিনি ছাত্রদেরকে চার দেওয়ালের মধ্যে শিক্ষাদানের বিষয়কে গুরুত্ব দেননি। তিনি বলেছেন শিশুদেরকে প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষাদান করাতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। অর্থাৎ মুক্ত পরিবেশে অবাধ ঘুরে বেরিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছাত্ররা শিক্ষা লাভ করুক এটাই তিনি চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষানীতিতে শিক্ষাগ্রহণের আনন্দ সংযোজিত করতে চেয়েছেন। ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজি ভাষাশিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। এই ভাষা রপ্ত করতে গিয়ে ছাত্রদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হতো। ফলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্ররা যে-কোনো বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থকে সহজেই আত্মস্থ করতে পারে ও তার মৌলিক চিন্তা করতে পারে, যা বিদেশি ভাষায় সহজেই করতে পারে না। কারণ মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম, তার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু তিনি বিদেশি ভাষার বিরোধীতা করেননি। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহনের জন্য মাতৃভাষা এবং তারপর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্যে বিদেশি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের কথা তিনি বলেছেন।

আমরা অনেক সময় ইউরোপীয় বিদ্যালয়গুলিকে নকল করিয়া থাকি। 'শিক্ষাসমস্যা' নিবন্ধে তাই তিনি জাতীয় চরিত্র অনুযায়ী শিক্ষানীতির উদ্ভাবনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। এখানে তিনি বলেন, ইউরোপের মানুষ সমাজের ভিতরে থেকে মানুষ হয়, স্কুল তার কথঞ্চিৎ সাহায্য করে। সেখানে শিক্ষার্থী যে বিদ্যা লাভ করে সে বিদ্যা সেখানকার মানুষ ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা এই যে, শিক্ষার সঙ্গে জীবনের কোনো যোগ নেই। আমরা ইংরাজি স্কুলে পড়ি, তার সঙ্গে সমাজের কোনো যোগ নেই ফলে স্বাভাবিক ভাবেই দেশ ও মনের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। এখানেই আমাদের শিক্ষার গলদ। তাই তিনি ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব রাখেন। কারণ, মাতৃভাষার সঙ্গে সমাজের গভীর যোগসূত্র রয়েছে তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সহজেই ছাত্র-ছাত্রীদের চেতনা বিকাশের অংশ হয়ে উঠবে ফলে তারা খুব সহজেই তার পারবে প্রয়োগ ঘটাতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির কঠোর সমালোচনা করলেও তিনি ইংরেজি বা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। ইংরেজিকে বর্জন করার কথা তিনি কখনও চিন্তা করেননি, বরং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলতেন জ্ঞানের কোনো ভৌগলিক ও জাতিগত পরিচয় নেই। ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় যে পদ্ধতিতে পড়াশোনা হতো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে 'শিক্ষা হল, বাইরের প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন।'

তিনি শিক্ষাকে কোনোদিন জীবিকার বাহন হিসেবে দেখেননি। তিনি কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে মানুষের মনুষ্যত্ব ও চিত্তের বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেন। মনুষ্যত্ব বিকাশের অঙ্গ হিসেবে তিনি নৃত্যগীত ও কলাবিদ্যাচর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কৃষি, সমবায়প্রথা, পল্লি উন্নয়ন, কারুশিল্প, স্বনির্ভরতা প্রভৃতির মাধ্যমে মনের পরিপূর্ণ বিকাশ ছিল তাঁর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করার কথা বলেছিলেন। খাঁচায় আবদ্ধ করে তোতাপাখিকে শিক্ষাদান

করলে যে অবস্থা হয়, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রদেরও তাই হয়েছিল। আনন্দই শিক্ষাদর্শনের মূল কথা। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন, মানুষকে পুরা পরিমানে মানুষ করব একথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। মেয়েদের শিক্ষা দিলে ঝাঁটা, বঁটি শিলনোড়ার কাজটা কে করবে—এই যুক্তিতে মেয়েরা শিক্ষালাভ থেকে অনেকে বঞ্চিত হন। রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাবকে ধিক্কার দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, মেয়েরা যদি কান্ট, হেগেল পড়ে তবুও শিশুদের স্নেহ করবে, পুরুষদের দূর-ছাই করবে না। সুতরাং শিক্ষা থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করা উচিত নয়! একজন আদর্শ মায়ের কাছ থেকেই একজন আদর্শ সন্তানের জন্মলাভ সম্ভব, আর একজন আদর্শ সন্তানই হল আদর্শ নাগরিক। তাই স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়। এই সত্য মনে রেখে মেয়েদেরকে সুখে-দুঃখের পুরুষের সহচারী করে নেওয়া উচিৎ বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিক্ষানীতির বাস্তব রূপ দিতে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর সেখানে মাত্র চার-পাঁচজন ছাত্র নিয়ে গড়ে তুললেন তাঁর বিদ্যালয় বহ্মচর্যাশ্রম। বাবা দেবেন্দ্রনাথ এই দিন ব্রহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, বাবার স্মরণেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এই স্কুল। এখানে লেখাপড়ার সাথে উপাসনা, খেলাধুলা আর সংস্কৃতির চর্চা চলত সমান তালে। প্রকৃতির নিবিড় স্পর্শে, খোলা আকাশের নিচে, সবুজ সতেজ গাছগাছালির ছায়ায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের নিয়ে বসতেন। বর্ষবরণ, বসন্তোৎসব, পৌষ মেলা, বর্ষামঙ্গল প্রভৃতি নানা অসাম্প্রদায়িক উৎসব-অনুষ্ঠানে ভরে থাকতো শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণ। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকলেই মানুষ প্রকৃতিকে ভালোবাসতে জানবে, আর প্রকৃতিকে ভালোবাসাই মানুষের মনুষ্যত্ব উন্মেষের প্রথম ধাপ। তাই প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি প্রকৃতির সাথে মানুষের সংযোগ করে দেখিয়েছেন শিক্ষাব্যবস্থা আসলে কেমনটা হওয়া উচিৎ। নিঃসন্দেহে সেই যুগে পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়ে এমন চিন্তাধারা বিরল ছিল।

প্রচলিত বৃত্তিমুখী অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষার পরিবর্তে ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পূর্ণাঙ্গ মনোবিকাশের সুযোগ দেওয়াই ছিল এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথা হল প্রাকৃতিক পরিবেশে আনন্দের মধ্যে শিশুদের বড়ো করে তোলা। তপোবন শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ না করে বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অতীতের আশ্রম শিক্ষার চিরন্তন আদর্শের ভিত্তিতে এই বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। তিনি দুঃখের সহিত বলেছিলেন—

> প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন, তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন, তাঁহারা গুরু ছিলেন...শিক্ষক পাওয়া যায়, গুরু সহজে পাওয়া যায় না...আশ্রমের কেন্দ্রস্থলে যিনি আছেন তিনি গুরু। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ।' (শিক্ষা, পৃ. ২৪৫)

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের আশ্রমিক শিক্ষার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই তিনি শিক্ষার্থীদের শান্তিনিকেতনে রেখে শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি বলেন, শিক্ষক শ্রদ্ধার সঙ্গে জ্ঞান বিতরণ করবে আর শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তা গ্রহণ করবে। তাই তিনি গুরু ও শিষ্যের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি অন্ধ অনুকরণ না করে বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অতীতের আশ্রম শিক্ষার চিরন্তন আদর্শের ভিত্তিতে এই বিদ্যালয় পরিচালনা করেন, যা শিশুদের সার্বিক বিকাশে সাহায্য করবে। তিনি বলেছেন— “আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার শিক্ষা।” (শিক্ষা, পৃ. ২৪৮)

পরিশেষে বলা যায়, কালের যাত্রায় আমরা এগিয়েছি বহুদূর। শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছি কিন্তু এখনও সঠিক শিক্ষা পদ্ধতি বেছে নিতে পারিনি। তিনি তাঁর আশি বছরের জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাই তাঁর শিক্ষাচিন্তা একদিকে ভাববাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত, অপরদিকে প্রয়োগের সময় প্রকৃতিবাদী আদর্শে গড়া। তিনি তাঁর লেখায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষা বিবর্জিত মানুষদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন এবং নবশিক্ষার্থীদের সমাজের প্রয়োজনে এগিয়ে আসার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—"চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" (শিক্ষা, পৃ. ৩৬)

উপসংহারে বিনীতভাবে বলি—আমি একজন সামান্য শিক্ষার্থী মাত্র। তথাপি আমার এই প্রবন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা সম্বন্ধে ও প্রয়োগ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনায় দোষ ত্রুটি থেকে থাকলে এবং বাক্যের মধ্যে ধৃষ্টতা থাকলে সুধী পন্ডিতবর্গ ও পাঠকবৃন্দ আমাকে মার্জনা করবেন।

উৎসের সন্ধানে

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র রচনাবলী', শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, পৃ. ১২
২. তদেব : পৃ. ১১০
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'শিক্ষা', প্রকাশক কুমকুম ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ. ৮
৪. তদেব : পৃ. ১২৭
৫. তদেব : পৃ. ৪৮
৬. তদেব : পৃ. ২৪৫
৭. তদেব : পৃ. ২৪৮
৮. তদেব : পৃ. ৩৬

উৎসের সন্ধানে

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'শিক্ষা', প্রকাশক কুমকুম ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪১৭
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'জীবনস্মৃতি', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪১৭
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র রচনাবলী' দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৌষ ১৪১৭
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রকাশক পুলিন সেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৪৮
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র রচনাবলী', শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা

সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে...........

সাহিত্যের আলোকে সমাজ-সংস্কার : প্রসঙ্গ রাজা রামমোহন রায়ের ‘সতীদাহ-প্রথা’র উচ্ছেদ

রাজেশ্বর পাল

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) উনিশ শতকের সুবিশাল কর্ম-কুরুক্ষেত্রের প্রথম ও প্রধান সৈনিক। এককথায় তিনি ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তিনি ‘ভারতপথিক’। তাঁর ব্রত ছিল প্রতিদিনের স্থবির জীবনকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়ে মুক্তির পথের অনুসন্ধান দেওয়া। অনুসন্ধানের নিমিত্তে তাঁকে নামতে হয়েছিল সংস্কার আন্দোলনে। এই যুগচিন্তা নায়কের আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল ধর্মসংস্কারের মাধ্যমে সমাজসংস্কার। তাই ঋষিসুলভ সূক্ষ্ম দৃষ্টির দ্বারা তিনি বর্জন করেছেন রক্ষণশীল মনোভাব—গ্রহণ করেছেন প্রগতিশীল যুক্তিবাদ। আর সারা জীবনব্যাপী নিরলস সাহিত্য-সাধনার বলে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন মানবতাবাদ।

রামমোহনের সাহিত্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক হিতসাধন। আসলে জরাগ্রস্ত সমাজব্যবস্থাকে নির্মল প্রজ্ঞাসাগরে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করতে প্রয়াসী ছিলেন তিনি। প্রথম থেকেই তিনি হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র হিসেবে তুলে নিয়েছিলেন কলম। প্রাচীন হিন্দুধর্মের সারকথা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের অন্তর্জগতের নতুন দরজা উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ‘বেদান্ত গ্রন্থ’ (১৮১৫)-এ তিনি সুদৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—“আমাদিগ্যের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।”[১]

এই প্রবন্ধের শুরুতে সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, প্রথা হল হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিধবা নারীদের মৃত স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জ্বলন্ত চিতায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মাহুতি দেওয়ার সংস্কৃত ‘সতী’ শব্দটি আক্ষরিক অর্থে এমন সতীসাধ্বী রমণীকে বোঝায়, যিনি তাঁর প্রিয় স্বামী এবং নিকটস্থ আত্মীয়-

স্বজনদের প্রতি চূড়ান্ত সততা প্রদর্শন করেন। আর এই সদ্যবিধবা 'সতী' রমণীটিকে যখন স্বামীর চিতায় 'দাহ' করা হয়, তখন তাকে বলা হয় 'সতীদাহ'। প্রাচীনকালে সতীদাহ প্রথা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—'সহমরণ' ও 'অনুমরণ'। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর চিতায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তাকে বলা হত 'সহমরণ'। আবার কখনো কখনো স্বামী দূরদেশে মারা গেলে অথবা অসুস্থতার কারণে স্বামীর সাথে স্ত্রীকে পোড়ানো না গেলে, স্বামীর ব্যবহৃত কোনো বস্ত্র বা দ্রব্যের সাথে আলাদা চিতায় স্ত্রীকে পোড়ানো হলে তাকে বলা হত 'অনুমরণ'। সহমৃতা নারীকে মৃত্যুর পর 'সতী' আখ্যায় ভূষিত করা হতো।

বীভৎস এই প্রথার জন্য নির্বাচন করা হতো গঙ্গা বা যে-কোনো নদীর তীরভূমি। এরপর সেখানে সাজানো হত চিতা। তারপর সদ্যবিধবাকে নববধূর মতো আলতা-সিঁদুরে সাজিয়ে ধীরে ধীরে তোলা হতো সেই চিতায়। তার পূর্বে পরিকল্পিতভাবে আফিম বা সিদ্ধি জাতীয় কোনো উত্তেজক মাদকদ্রব্য খাইয়ে বিধবাকে বেহুঁশ করার চেষ্টা করা হতো। চিতায় তোলার পর তাকে স্বামীর পা-দুটি বুকে জড়িয়ে ধরতে অথবা মৃতস্বামীকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করতে নির্দেশ দেওয়া হতো। তারপর যখন আগুনের লেলিহান শিখা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠত, তখন যদি অসহনীয় দাহ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারে বা সিদ্ধির নেশা কেটে গিয়ে সেই বিধবা ধর্মকাজে ছন্দপতন ঘটিয়ে বসে, সেজন্য চিতার পাশে দাঁড়ানো সতীদাহ কাজে নিয়োজিত হিতাকাঙ্ক্ষীরা বাঁশের লাঠি দিয়ে নির্দয়ভাবে প্রহার করে দূর করে দিত সেই সব নীতিমূলক আশঙ্কা। সেই সঙ্গে বেজে উঠত ঢাক-ঢোল, কাঁসর-ঘন্টা, শঙ্খ; আর হাজার হাজার কণ্ঠের হরিধ্বনির পৈশাচিক চিৎকারের উল্লাসে চারিদিক হয়ে উঠত মুখরিত।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম পঞ্চাশ বছর শাসকরা সতীদাহ প্রথার ব্যাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করেননি, পাছে হিন্দু সম্প্রদায়ের জাত্যাভিমানে আঘাত লাগে। চতুর ইংরেজরা হিন্দুধর্মের দুর্বলতার প্রতি বদান্যতা দেখিয়ে কোম্পানির ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তবে উনিশ শতকের প্রথম দশকে খ্রিস্টান পাদরিরা ভারতে আসেন। তাঁরা কলকাতা, শ্রীরামপুরসহ ভারতের নানা স্থানে বসবাস করতে শুরু করেন। শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান পাদরিরা ছিলেন সতীদাহ প্রথার ঘোরতর বিরোধী। এঁরা ১৮০৩ সালে সতীদাহ-বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে সচেষ্ট হন—"তাঁরা কলকাতার আশেপাশে লোক নিযুক্ত করে জানতে পারলেন যে ঐ বছর ৪০০ সতীদাহ হয়েছে। পরের বছর ১৮০৪ সালে গঙ্গার তীরে এই সন্ধানের ফলে ৬ মাসে ৩০০ সতীদাহের খবর তাঁরা পেলেন।"[২] কিন্তু হিন্দুধর্মের মুক্তমনা মানুষের অভাবে এবং সমাজপতিদের চাপে ব্যাপারটা সাময়িকভাবে চাপা পড়ে যায়।

ইতোমধ্যে রামমোহন রায়ের আবির্ভাবে প্রগতিশীল স্বাধীন মতামত প্রচারে বাংলাদেশে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত হয় 'আত্মীয় সভা', যার অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল সতীদাহ। তিনি প্রচলিত সমাজের বাস্তব দশা ঘনিষ্ঠভাবে বীক্ষণ করে নিদারুণভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। অনুভব করেছিলেন, কুসংস্কার ও অন্ধকারের ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন অবক্ষয়ী হিন্দু সমাজের কলুষিত রূপ। অচিরেই বুঝেছিলেন, সমগ্র রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজ চালাচ্ছে একদল সুচতুর, লোভী ও স্বার্থপর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। আর এঁরাই হিন্দু নারীর জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। তিনি কলকাতায় বসবাসকালে সতীদাহের হৃদয়বিদারক, অমানবিক, নিষ্ঠুর, নির্দয় ও নির্মম রূপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন এবং তাঁর দেহ-মনে দেখা দেয় তীব্র আলোড়ন। ফলে

গোঁড়া হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করে সতীদাহের বিপক্ষে লেখনী ধারণ করলেন রামমোহন। লিখলেন—'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮১৮)। গ্রন্থটি কাল্পনিক সংলাপের ভঙ্গিতে অর্থাৎ নাটকের আকারে বিরচিত। এখানে যুক্তি-তর্কের অবতারণায় প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র মন্থনের মাধ্যমে তিনি নিবর্তকের হয়ে যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। এদেশে নারীকে পশুতুল্য জীব মনে করে সহমরণের নামে বলি দেওয়া হয়। তাই দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম এই সকল সাধারণ প্রবৃত্তিগুলি পুরুষের কাছ থেকে নারীরা আশা করে না। গ্রন্থের সূচনায় দেখা যায়, প্রবর্তক বিস্মিত সহকারে সহমরণের প্রাচীন ঐতিহ্য তুলে ধরতে আগ্রহী। দীর্ঘদিনের এই প্রথা তুলে দেওয়া অনুচিত বলে নিবর্তককে জানান—

> প্রথমে প্রবর্তকের প্রশ্ন।—আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি যে তোমরা সহমরণ ও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস করিতেছ।
>
> নিবর্তকের উত্তর।—সর্ব্বশাস্ত্রেতে এবং সর্বজাতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘাত তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস পাইলে তাঁহারাই আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন।[৩]

নিবর্তকের কথা শুনে প্রবর্তক অঙ্গিরা ঋষি, ব্যাস, হারীত, বিষ্ণু ঋষি প্রমুখের সহমরণ-সমর্থক উক্তি ব্যাখ্যা করে সহমরণ ও অনুমরণ কেন শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয় তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। নিবর্তকের যুক্তি—মনু বিধবাকে ফল মূল ভোজনের দ্বারা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান দিয়েছেন। অতএব মনুস্মৃতির বিপরীত স্মৃতিসকল প্রশংসনীয় নয়। কেননা বেদবাক্য আছে, মনু যা কিছু বলেছেন তাই পথ্য হিসেবে গ্রহণীয়। এভাবে প্রবর্তক ও নিবর্তকের মধ্যে বাক্যযুদ্ধ চলতে থাকে। সেই সময়কার সামাজিক আবহাওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত বিবরণে—

> সতীদাহের পক্ষে ও বিপক্ষে শাস্ত্রের যুদ্ধ চলে; সেখানে শাস্ত্রের কথা মানার নাম ধর্ম, না মানার নাম অধর্ম। সতীদাহ নিয়ে পরিস্থিতিটা এইরকম দাঁড়ায়—যে সৎ-হিন্দু সে নারীমেধ যজ্ঞের পোষক; আর রামমোহন প্রমুখ নব্যের দল সতীদাহ-নিবারণের জন্য আন্দোলন করেন বলে তাঁরা ধর্মদ্রোহী। সতীদাহ প্রাচীন প্রথা; বাল্যকাল থেকে সতীদাহ দেখতে ও আর্তনাদ শুনতে অভ্যস্ত বলে এর মধ্যে কোনো নৃশংসতা আছে, এ ভাব দেশের অনেকের মনে জাগতই না। বিদেশী খ্রিস্টানদের চোখে সর্বপ্রথম এর বীভৎসতা প্রকট হয়।[৪]

আলোচ্য প্রবন্ধে লাঠির সাহায্যে বিধবাগণকে চিতায় নিক্ষেপ করা এবং স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে বিধবাদের বেঁধে রাখবার জন্য রামমোহন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে তিরস্কার করেছেন। সতীদাহের সময় সমাজপতিদের আদেশ মতো বিধবাদের প্রতি আত্মীয়স্বজনেরা বিলক্ষণ বলপ্রয়োগ করতেন। এ বিষয়ে রামমোহন বলেন, পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্বক আরোহণ করে কোনো সদ্যবিধবা স্ত্রীলোক পুড়ে মরতে চায় না—

> তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া ছুপিয়া রাখ। এ সকল বন্ধনাদি কর্ম কোন্ হারীতাদির বচনে আছে যে তদনুসারে করিয়া থাকহ অতএব এ কেবল জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যা হয়।[৫]

প্রবর্তক রামমোহনের কাছে পরাজয় স্বীকার করে পাপ ও নিন্দার কথা বলতে চেয়েছেন—"সহমরণ না করিলে পাপ হয় এবং লোকত নিন্দা আছে এনিমিত্ত আমরা করিয়া থাকি।"[৬] উত্তরে রামমোহন বলেন যে, জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীহত্যায় যে পাপ হয় তার কাছে লোক-নিন্দাভয়

তুচ্ছ ব্যাপার। এরপর প্রবর্তক বিরক্ত হয়ে আসল সত্যটি প্রকাশ করে ফেলেছেন—"যদ্যপি এরূপ বন্ধনাদি করা শাস্ত্রপ্রাপ্ত নহে তথাপি তাবৎ হিন্দুর দেশে এইরূপ পরম্পরা হইয়া আসিতেছে এ প্রযুক্ত আমরা করি।"[৭] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সতীদাহের গোঁড়া সমর্থকরা মনে করেন, সহমরণ দেশাচার ও পরম্পরা হয়ে আসছে তাই সহমরণে কোনো দোষ-ত্রুটি নেই বরং সেটি সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এর জবাবে নিবর্তক যা বলেছেন তা অত্যন্ত সারগর্ভ—

> তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রীদাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে যাহা কহিলে তাহা কদাপি নহে যেহেতু হিন্দুর অল্পদেশ যে এই বাঙ্গালা ইহাতেই কিঞ্চিৎ কাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ করিয়া আসিতেছেন।...বস্তুত ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণের উপায় শাস্ত্র এবং শাস্ত্রসম্মত যুক্তি হইয়াছেন সে শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকারে অসম্মত এরূপ স্ত্রীবধ হয় এবং যুক্তিতেও অবলাকে স্বর্গাদি প্রলোভ দেখাইয়া বন্ধনপূর্ব্বক বধ করা অত্যন্ত পাপের কারণ হয়।[৮]

সহমরণের ফলে পাপ হোক আর যাই হোক প্রবর্তক এটিকে বন্ধ করতে দেবেন না বলে নিবর্তককে জানান। কেননা স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী সহগমন না করে বিধবা অবস্থায় থাকলে তার ব্যভিচার হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সহমরণের ফলে এই লৌকিক আশঙ্কা থাকে না; ফলে জাতি কুটুম্বরা নিঃশঙ্ক থাকে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, এক অমূলক লৌকিক আশঙ্কাই সতীদাহ প্রথার আবির্ভাব ও বিস্তারের কারণ। প্রবর্তকের যুক্তি খণ্ডন করে নিবর্তক বলেন, স্বামী বর্তমান থাকলেও ব্যভিচারের আশঙ্কা থাকে, বিশেষত স্বামী দূরদেশে বহুকাল থাকলে ঐ আশঙ্কার সম্ভাবনা বিশেষভাবে রয়ে যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, স্বামীর বর্তমানে স্ত্রী স্বামীর শাসনে না থেকে স্বতন্ত্রা হয়ে গেছে। আসল কথা, আশঙ্কাকে দূর করার অছিলায় স্ত্রীবধ পাপ জেনেও নির্দয়ভাবে জ্ঞানপূর্বক দুষ্কর্ম তাঁরা করে থাকেন। বাল্যকাল থেকে স্ত্রীদাহ বারংবার দেখা এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তাঁদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে গেছে। এই কারণে স্ত্রী অথবা পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে নিবর্তকের মনে দয়ার বাহুল্য নেই। শেষ পর্যন্ত নিবর্তকের যুক্তির শাণিত অস্ত্রে পরাস্ত হয়ে প্রবর্তক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, বিশেষ মতে বিবেচনা করে দেখবেন। নিবর্তক তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এই বলে—

> এ অতি আহ্লাদের বিষয় যে এখন তুমি এ বিষয়ের বিবেচনা করিলে যাহা শাস্ত্রসিদ্ধ হয় তাহার অবশ্য নিশ্চয় হইতে পারিবেক এবং এরূপ স্ত্রীবধজন্য পাপ হইতে দেশের অনিষ্ট ও তিরস্কার আর হইবেক না ইতি।[৯]

কালাচাঁদ বসু নামে কোনো একজন কায়স্থর প্ররোচনায় কাশীনাথ তর্কবাগীশ রামমোহনের বিরোধিতা করে তাঁর মতামত প্রকাশ করলেন—'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' (১৮১৯) রচনার মাধ্যমে। তিনি এখানে রামমোহনের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের অনুসরণে নিবর্তকের যুক্তিকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। এখানে বিধায়কের যুক্তি সহমরণের সপক্ষে এবং নিষেধকের বাক্যে তার উত্তর নিহিত আছে; আবার সে-সবেরও প্রত্যুত্তর আছে বিধায়কের স্বতন্ত্র যুক্তিমতে। আর শেষ পর্যন্ত বিধায়কের জয়ধ্বনিতেই গ্রন্থটির সমাপ্তি ঘটেছে। এই গ্রন্থ রচনাতেও রামমোহনকে রুখে দেওয়া যায়নি; বরং দ্বিগুণ শক্তি ও পূর্ণ তেজকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদিন পরে তিনি লিখলেন—"সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ" (১৮১৯)। কাশীনাথ তর্কবাগীশকে উপযুক্ত জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনোকালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও

> গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন।[১০]

যাঁরা বলেন, এদেশের নারীরা ধর্মভীরু নয়, তাঁদের যুক্তিবাক্য খণ্ডন করে রামমোহন বলেছেন—"পঞ্চম তাহারদের ধর্ম্মভয় অল্প, এ অতি অধর্ম্মের কথা, দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে।"[১১] প্রবন্ধের উপসংহারে নারী সম্বন্ধে পাঁচ দফা আশঙ্কার উল্লেখ শেষে সহমরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে তৎকালীন সমাজপতিদের প্রতি আন্তরিক আবেদন জানিয়ে রামমোহন লিখেছেন—"দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"[১২]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর বিচারগ্রন্থগুলিতে তিনি প্রচলিত স্মৃতিবচন ও লোকব্যবহারের উপযুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন সতীদাহ অশাস্ত্রীয় ও ধর্মবিরুদ্ধ। এজন্য আধুনিককালে দাঁড়িয়েও কালস্রোতের বিপ্রতীপে উজান বেয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করার আশায় তাঁকে পৌঁছাতে হয়েছিল প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে প্রাচীনতম মনুসংহিতাতে। তাঁকে খণ্ডন করতে হয়েছিল চতুর্বেদের প্রাচীন বেদ 'ঋগ্বেদ'-এর সতীদাহ নির্দেশক প্রচলিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে এবং প্রতিষ্ঠা দিতে হয়েছিল সতীদাহ-নিরপেক্ষ তথ্যসূত্রকে, সকাম কর্মের তুলনায় নিষ্কাম কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁকে দ্বারস্থ হতে হয়েছিল প্রাচীন স্মৃতি পুরাণ ছাড়াও শ্রুতি প্রমাণের উপর। বেদ, উপনিষদ, গীতাসহ সতীদাহ-সমর্থক কিছু কিছু প্রাচীন অথচ প্রচলিত শাস্ত্রবাক্যের অসারতা প্রমাণও করতে হয়েছিল দ্রুততার সঙ্গে।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি এভাবেই সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছিলেন এবং জনমত গঠনে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর সহমরণ বিষয়ক প্রচার পুস্তিকাগুলিতে বিপুল জনসমর্থন মিলেছিল। তারপর এই কুপ্রথা নিবারণের অনুরোধ জানিয়ে তিনি বাংলার ৩০০ জন শিক্ষিত নাগরিকের স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কাছে জমা দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্ক এক আইন বলবৎ করেন এবং তাঁর পূর্ণ সমর্থনে সতীদাহ প্রথার বিলোপ ঘটে (৪ ডিসেম্বর, ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ)।

রামমোহন রায় প্রথম থেকেই গণ-জাগরণের উপর প্রত্যয়ী ছিলেন। তাই তিনি সরাসরি বড়লাটের দরবারে না গিয়ে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে মানুষের অন্তরের তমসাচ্ছন্ন চেতনাবোধকে জাগ্রত করতে অনায়াসেই সাহিত্যসৃষ্টির পথে হাঁটেন। এই প্রসঙ্গে জীবন মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ—তিনি মনে করেন যে, আইনের মাধ্যমে বলপূর্বক এই কুপ্রথা বন্ধ না করে জনমতের সাহায্যে এই প্রথা বন্ধ করা উচিত। এ ব্যাপারে বড়লাটের আপত্তি ছিল— তবে সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে জনমত গঠন করে রামমোহন যে তাঁর কাজকে অনেক সহজ করে নিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।[১৩] একথা বোধগম্য যে, এই জনমত গঠিত হয়েছিল আলোচ্য প্রচার-পুস্তিকাগুলি রচনার মাধ্যমে। আর সেই জনমতেরই প্রবল উচ্ছ্বাসে ভেঙে খান খান হয়েছিল সমাজপতিদের দৌরাত্ম্য; আর সেই সঙ্গে জনমানসে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছিল সতীদাহের মতো সামাজিক কুপ্রথা। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর বাঙালি তথা ভারতবর্ষীয় হিন্দু নারীদের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। কেননা ঐতিহাসিক এই দিনটিতেই বিভীষিকাময় পরম্পরার অবসান ঘটেছিল এবং এরই মধ্যে নিহিত ছিল ভবিষ্যতের নারীমুক্তি আন্দোলনের বীজমন্ত্র। রামমোহন

রায় সতীদাহ-বিষয়ক রচনার মাধ্যমে তিনটি মূল তথ্য পরিবেশন করেছেন—

প্রথমত, শাস্ত্র অনুযায়ী সহমরণ বা অনুমরণ কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। সহমরণ বিষয়ে শাস্ত্রের কোনো নির্দিষ্ট আদেশ নেই অর্থাৎ সহমৃতা না হলে পাপ হয় এমনটা কখনোই নয়। **দ্বিতীয়ত,** শাস্ত্রবাক্য অনুসারে সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্যের আসন শ্রেষ্ঠ। তাই সহমরণে না গিয়ে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক জীবনযাপন করাই বিধবাদের উচিত কার্য। **তৃতীয়ত,** শাস্ত্রে স্বেচ্ছামৃত্যুকে স্থান দেওয়া হয়েছে একথা অবিদিত নয়। কিন্তু জ্বলন্ত চিতানলে প্রবেশ করে নিজ দেহকে ভস্মীভূত করার সংকল্প বোধ হয় কেউই গ্রহণ করবে না। তাই তিনি মনে করতেন, সমাজধর্মের দোহাই দিয়ে যে জ্ঞানপাপীর দল বলপূর্বক নারীহত্যা করে চলেছে তা অতি গর্হিত কাজ। অবিলম্বে তা রহিত করতে হবে। বিলাসী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা ভুলতে বসেছি রামমোহনকে। তাই আমাদের ভাবতে অবাক লাগে সতীদাহের মর্মন্তুদ যন্ত্রণার ইতিকথা; কিন্তু পিছনের ইতিহাস স্বরণ করলে মনে অনুকম্পার উদ্রেক হয় আর সেই সঙ্গে গা শিউরে ওঠে। সে-সময় রামমোহনের প্রতি আমাদের ভাবুক মনে ভক্তিভাবের সঞ্চার হয় আর সেটুকুই তাঁর প্রাপ্য বলে অঙ্গীকার করি। তবে আমাদের কাছে এই কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মর্তব্য যে, রামমোহন রায় ছিলেন আধুনিক নারী মুক্তি আন্দোলনের একনিষ্ঠ সৈনিক, যিনি ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সাহিত্যের আলোকে সমাজপতিদের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচনের দ্বারা নারীসমাজকে রক্ষকরূপী ভক্ষকের হাত থেকে রক্ষা করে তাদের মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর শ্রীচরণে রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও আন্তরিক প্রণাম।

উৎসের সন্ধানে

১. রামমোহন রায় : ‘বেদান্ত গ্রন্থ’, “রামমোহন-গ্রন্থাবলী” ১ম খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৮১৫, পৃ. ১১
২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : ‘রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য’, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯, পৃ. ৩১২
৩. রামমোহন রায় : ‘সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’, “রামমোহন-গ্রন্থাবলী” ৩য় খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৮১৮, পৃ. ৩
৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : ‘রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য’, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯, পৃ. ৩১০-৩১১
৫. রামমোহন রায় : ‘সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’, “রামমোহন-গ্রন্থাবলী” ৩য় খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৮১৮, পৃ. ৯
৬. তদেব : পৃ. ১০
৭. তদেব : পৃ. ১০
৮. তদেব : পৃ. ১০
৯. তদেব : পৃ. ১২
১০. রামমোহন রায় : ‘সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ’, “রামমোহন-গ্রন্থাবলী” ৩য় খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৮১৯, পৃ. ৪৫
১১. তদেব : পৃ. ৪৬
১২. তদেব : পৃ. ৪৭
১৩. জীবন মুখোপাধ্যায় : ‘ভারতের ইতিহাস’, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, মার্চ ২০১৫, পৃ. ৩৯২

রামমোহন রায় : এক ধর্মনিষ্ঠ যুক্তিবাদী সংস্কারক

মিঠু জানা

ধর্মীয় গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে প্রথম যিনি সত্যিকারের যুক্তিবোধ নিয়ে প্রতিবাদী হয়েছিলেন তিনি একমেদ্বিতীয়ম রামমোহন রায়। সংস্কারের বদলে চিন্তা, নিষ্ঠার বদলে প্রয়োজনীয়তা,আনুগত্যের পরিবর্তে অমান্য করার দুঃসাহস বোধহয় তিনিই দেখাতে পেরেছিলেন। একদিকে কঠিন ধর্মানুশাসন আর অন্যদিকে প্রবল শাস্ত্রবিধির যাঁতাকলে আবদ্ধ সমাজকে দেখালেন মুক্তির প্রকৃত পথ। এক যুক্তিবাদী সংস্কারকের ভূমিকায় জাতির কর্ণে দিলেন মুক্তচিন্তার মহামন্ত্র। আসলে—

সমসাময়িক ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের মূলে যে স্বাধিকারবাদ ছিল,রামমোহনের চেষ্টার ভিতরেও ছিল সেই স্বাধীকারবাদের এক ভিন্নতর রূপ,শাস্ত্রবিধি ও সমাজশাসন হইতে ব্যক্তির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। রামমোহন নিজের জীবনে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন তাহাকেই এক তত্ত্ববুদ্ধি ও সূক্ষ্মযুক্তির ভিত্তির উপর জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।[১]

জানা যায় রামমোহন রায় প্রায় ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। অতঃপর একেশ্বরবাদ সম্পর্কিত আরবি-ফারসি পুস্তক 'তুহফাৎ-উলমুয়াহিদীন' (১৮০৩)প্রকাশ করেন। সেইসঙ্গে ফার্সী,সংস্কৃত আর ইংরেজী ভাষারও চর্চা শুরু করেন। অচিরেই হিন্দুশাস্ত্র ও মুসলমানশাস্ত্রাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। তবে তিনি ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় আসেন বসবাসের উদ্দেশ্যে।বলতে গেলে, সেই সময় কলকাতা ছিল মুসলমানি, হিন্দু ও ইংরেজি এই তিন প্রকার বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। একদিন—

এই কলিকাতাতেই রামমোহন এক নূতন জগতের সন্ধান পাইলেন। মুসলমানী বিদ্যায় হিন্দুর পৌত্তলিকতার বিষয়ে তাঁহার মনে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে তাহা পূর্ণ বিকশিত হয়।[২]

তবে তিনি আভিজাত্য,বিলাসিতা ও প্রবল সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস

করতেন।পাঁঠার মাংস ভক্ষণ ও সুরাপানে অভ্যস্ত ছিলেন। সৌখিন ও বিলাসী রামমোহনের বাড়িতে উৎসব হত বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। এমনকী বাঈজী নাচও বাদ ছিল না। বিষয়ী রামমোহন সেকালের সম্ভ্রান্ত লোকেদের মত মুসলমানী জোব্বা-চাপকান পরতেন। বাড়িতে মুসলমানী খানায় অভ্যস্ত ছিলেন।কাগজের ব্যবসা করতেন এবং কোম্পানির কর্মচারীদের টাকাপয়সা ধার পর্যন্ত দিতেন।

এহেন রামমোহন ধর্মের ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত যুক্তিবাদীতাঁর কাছে মানুষের কল্যাণ সাধনই ছিল একমাত্র ব্রত। তবে তিনি কখনোই তথাকথিত ভক্ত-ধার্মিক ছিলেন না। তিনি আবার নীতিবাদী এক ধর্মপ্রণেতাও। তাই সতীদাহের মত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তক সম্বাদ' নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকা (১৮১৮) প্রকাশ করেন। 'সমাচার দর্পণ' এপ্রসঙ্গে লেখে যে—"সহমরণ।—কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে,সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"[৩] 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রকাশিত হল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'-এর প্রত্যুত্তরে তিনি লিখলেন—

> যেহেতু শ্রুতি, স্মৃতি, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে নিন্দিত যে স্বর্গকামনা, এমত কামনাবিশিষ্ট সহমরণকে ব্রহ্মচর্যধর্ম যাহাতে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া মোক্ষ হওনের সম্ভাবনা আছে,তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কখন সর্বপ্রকারে অগ্রাহ্য ও পুর্ব ২ আচার্যের এবং গ্রন্থকারের মতবিরুদ্ধ হয়।[৪]

তবে শুধু সহমরণের বিরুদ্ধে লড়াই নয় পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিজ ব্যয়ে হেদুয়া অঞ্চলে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল (১৮২২) পর্যন্ত স্থাপন করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার সপক্ষে একটি দীর্ঘ পত্রে লর্ড আমহার্সকে লেখেন—

> 'Neither can such improvement arise from such speculations as the following, which are the themes suggested by the Vedant : In what manner is the soul absorbed into the deity What relation does it bear to the divine essence. Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines, which teach them to believe that all visible things have no real existence—that as father, brother etc. have no actual entirety, they consequently deserve no real affection and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better.[৫]

এমনকী পাদ্রী ডাফের স্কুলের জন্য চিৎপুর রোডের উপর নিজের ব্রাহ্মসভা ভবনের একটি ঘর সামান্য ভাড়ায় ছেড়ে দেন। ১৩ জুলাই, ১৮৩০ তারিখে স্কুলটি খোলা হলে ছাত্র সংগ্রহে রামমোহন স্বয়ং উদ্যোগী হন। কৌলিন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদ তিনি সমর্থন করতেন না। এগুলির বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে লেখনী চালনা করেন। তিনি বিধবাবিবাহের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। দেশীয় কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে তিনিই প্রথম বাঙালি হিসেবে বিলেতে যাত্রা করেন।

রামমোহন পৌত্তলিকতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন একেশ্বরবাদী। প্রকৃত ধর্ম বলতে বুঝতেন ঈশ্বরের উপাসনা ও জীবের কল্যাণসাধন। সেকারণেই হিন্দু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে হিন্দুদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন। খ্রিস্টীয় শাস্ত্রাদি অবলম্বনে খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করেন। আবার মুসলমান শাস্ত্রপাঠে একেশ্বরের কথাও বলেন। তবে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে খ্রিস্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ও একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে 'The Pre-

cepts of Jesus– the Guide to Peace and Happiness' নামক পুস্তিকায় খ্রিস্টধর্মের উক্তি-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। তবে এরপর তিনি নানা বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে প্রত্যুত্তরে তিনখানি পুস্তিকা রচনা করেন—

i. An Appeal to the Christian Public, in Defence of the Precepts of Jesus (1820)
ii. Second Appeal to the Christian Public, in Defence of the Precepts of Jesus (1821)
iii. Final Appeal to the Christian Public, in Defence of the Precepts of Jesus (1823)

তাছাড়াও তিনি খ্রিস্টধর্মের একত্ববাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' (১৮২১) নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এখানে নিয়মিত উপাসনা হত। জানা যায়,রামমোহনের এই সভার প্রতিষ্ঠা ও তদারকির ব্যাপারে পাদ্রী অ্যাডাম সাহেব বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তৎসত্ত্বেও অবশ্য রামমোহন ব্রাহ্মণ্যসংস্কার কোনোদিন বর্জন করতে পারেননি। তিনি বেদ-বেদান্তের সার 'বেদান্তগ্রন্থ'(১৮১৫) ও 'বেদান্তসার' (১৮১৬) প্রকাশ করেন। বলতে গেলে খ্রীষ্টানী আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্বের রক্ষার জন্যই তাঁর এই প্রয়াস। এমনকী ব্রহ্মসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) স্থাপন করেন। যেখানে শাস্ত্রীয় আলোচনা ছাড়াও বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ব্রহ্মসংগীত গাওয়া হত। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মোপাসনার জন্য চিৎপুরে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট কমললোচন বসুর বাড়ি ভাড়া নিয়ে 'ব্রাহ্মসভা' স্থাপন করেন। এখানে—

> প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত সভা চলিত। বাওজী নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদপাঠ করিয়া শুনাইতেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী সংগীত করিতেন ও গোলাম আব্বাস নামে একজন মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। এই সভায় হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের লোকই উপাসনা করিতে পারিত।[৬]

অর্থাৎ রামমোহনের ব্রাহ্মসভা কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের ছিল নাতিনি কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় স্থাপনও করেননি।বরং মানবধর্মানুশীলনের পক্ষে ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার উপদেশাবলী প্রচার করেন। ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি যে বিশ্বজনীনতা ও অসাম্প্রদায়িকতাতাই ছিল রামমোহনের ধর্মানুশীলনের দৃঢ় ভিত্তিভূমি।

তবে তিনি কোনো নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেননি। বরং তিনি তৎকাল প্রচলিত হিন্দুধর্মের বহুকাল সঞ্চিত আবর্জনা দূর করে উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের সংস্কারসাধন ও যুগোপযোগী রূপায়ন করতে চেয়েছিলেন।[৭] তাই বোধহয় আমাদের দেশীয় বৈষ্ণব ধর্মাচারকে সমালোচনা করতে বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। কখনও কখনও কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি। 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮) অথবা 'চারিপ্রশ্নের উত্তর'(১৮২২) গ্রন্থে তিনি নির্দ্বিধায় লেখেন 'নাসিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার সেবাতে প্রায় অর্ধদণ্ড ব্যয় হয় ও ভুরি কাল হস্তে মালা যাহাতে যবনাদির স্পর্শাস্পর্শ বিচার নাই এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ পর্যন্তেরও নিন্দা এবং সর্বদা এই ভাব দেখান যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলাম ও বাহ্যেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্বদা মুখে নির্গত হয় কিন্তু গৃহমধ্যে মৎস্যমুণ্ড বিনা আহার হয় না।'[৮] আসলে রামমোহন শুধুমাত্র বৈষ্ণবীয় ধর্মাদর্শের নিছক সমালোচক ছিলেন নাতিনি প্রবল যুক্তিনিষ্ঠতায় বৈষ্ণবধর্মের বিশুদ্ধিকরণের পথটি চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন।কারণ কোন ধর্মকেই তিনি যেমন অভ্রান্ত মানতেন না, তেমনই বিপরীতে প্রত্যেক ধর্মেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছেএ বিশ্বাসে তিনি ছিলেন অবিচল।

বলাবাহুল্য যখন যে সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ধর্মবিচার করেছেন, তখন সেই সম্প্রদায়ের অবলম্বিত শাস্ত্র দ্বারাই নিজের মত স্থাপন করেছেন। ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রতিপক্ষকে অনায়াসে পরাজিত করেছেন। মুসলমানের সঙ্গে তর্কে কোরাণ, খ্রিস্টানদের সঙ্গে তর্কে বাইবেল আর হিন্দু-পন্ডিতদের সঙ্গে তর্কে হিন্দুশাস্ত্রকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন। প্রত্যেক ধর্মের প্রতিই তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তাই মুসলমানদের কাছে তিনি মৌলবী,খ্রিস্টানদের কাছে ইউনিটেরিয়ান খ্রিস্টান হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তবে তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর হিন্দুসেকথা নিজেই বারেবারে বলেছেন। তদুপরি প্রত্যেক ধর্মের প্রতিই তিনি ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। তাই বোধহয় অসাধারণ মনীষা ও দক্ষতায় ধর্মরাজ্যে একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপনে তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁর ধর্মাচরণে মিলিত হতে পেরেছিল। সেদিক থেকে বলতে গেলে—

> হয়তো বা ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের চিন্তাও তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। এইরূপে রামমোহন তাঁহার অসাধারণ মনীষা দ্বারা বর্তমান ভারতে একটা সামঞ্জস্যের বাণী প্রচার করেন।। ইহার পূর্বেও সামঞ্জস্যের চেস্টা এদেশের মধ্যযুগের সাধক ও ধর্মপ্রচারকগণ করিয়া গিয়াছেন। নানক, কবির, দাদু, চৈতন্য প্রমুখ ধর্মচর্যাগণ এই সমন্বয়ের বাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই দিক দিয়া রামমোহন ইহাদেরই ভাবধারার সংবাহক।[৯]

তাই রামমোহনের ধর্ম কোনো হিন্দুধর্ম নয়, মুসলমানধর্ম নয়, খ্রিস্টান ধর্ম নয় সর্বসমন্বয়বাদী মানবতার ধর্ম। আর তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী এক ব্যতিক্রমী সংস্কারক ভারত চেতনার অবিসংবাদিত পৌরুষ।

উৎসের সন্ধানে

১. সুশীলকুমার গুপ্ত : 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ', এ মুখার্জী এন্ড কোং, পৃ. ৪৮
২. তদেব : পৃ. ৪৯
৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'রামমোহন রায়', ১৯৪৬, পৃ. ৮৫
৪. রামমোহন গ্রন্থাবলী ৩য় খণ্ড, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৪৫, পৃ. ১০৬
৫. ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর লিখিত পত্র
৬. সুশীলকুমার গুপ্ত : 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
৭. শ্রী অনিলচন্দ্র ঘোষ : 'রাজর্ষি রামমোহন', প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী (৫ম সং.), ১৯৩১, পৃ. ৪৩-৪৪
৮. রামমোহন গ্রন্থাবলী : ৬ষ্ঠ খণ্ড)/পূর্বোক্ত,পৃ. ৩
৯. শ্রী অনিলচন্দ্র ঘোষ : 'রাজর্ষি রামমোহন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

সাহিত্যের সংস্কার, সংস্কারের সাহিত্য ইতিহাস নির্মাতা বিদ্যাসাগর

সৌমিতা মুখার্জী

রুদ্ধ ভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,/হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে/নব উদ্বোধন গাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনাকাল ২৪ ভাদ্র ১৩৪৫, প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'দেশ' পত্রিকার অগ্রাহায়ন ১৩৪৬ সংখ্যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অক্ষয় অম্লান গৌরব উজ্জ্বল সিংহদ্বার যিনি স্বহস্তে উন্মোচন করলেন, তিনি নবজাগরণের প্রাণপুরুষ বিদ্যাসাগর। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশাল আকাশে তিনি ধ্রুবতারার মতো শাশ্বত ইতিহাস, কালের মধ্যে মহাকালের নির্মাতা। যিনি ইতিহাসকে সৃজন করলেন ব্যক্তিত্বের প্রয়াসে, মেরুদণ্ডের দুর্নিবার কাঠিন্যে। জীবনপ্রবাহে মহাজীবনকে চিনে নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সেইখানেই বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে যায়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন বলেছেন—"ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বাঙ্গালী বিদ্যাসাগর, প্রথম মানুষ বিদ্যাসাগর।"

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন—"তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে হায়/ধুলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা ওই পায়/সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠত এক এক বার/শিক্ষা দিতে অহংকৃতে শিষ্ট ব্যবহার।"—'কাব্য সঞ্চয়ন', সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ২৫-২৬। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন—"বিদ্যাসাগর এত বড়ো ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা, যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্দার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।" (চরিতকথা, পৃ. ১) বিদ্যাসাগরের বয়স তখন মাত্র আট। ঈশ্বরচন্দ্রের 'ইংরেজীর অঙ্ক চিনা' যথার্থ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য পিতা ঠাকুরদাস ষষ্ঠ মাইল স্টোনের প্রতি দৃষ্টি এড়িয়ে পঞ্চম মাইল স্টোনটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে বালক ঈশ্বরচন্দ্র বলেন—'এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।'

পিতার এই ক্ষুদ্র পরীক্ষাটি প্রমাণ করে যে, ভবিষ্যতে সেই সত্তার আবির্ভাব হতে চলেছে যে কিনা সমস্ত মিথ্যা, চালাকি, গ্রাম্য ভণ্ডামি, অজ্ঞতা, অশিক্ষার বিরুদ্ধে আদর্শের উৎকৃষ্ট মহীরূহ গড়ে তুলতে সক্ষম। নিজ জীবনবোধ মূল্যবোধ পাণ্ডিত্য দিয়ে তিনি প্রকৃত জীবনসত্য ও প্রজ্ঞার উদ্ভাবন করেছেন, রোপন করেছেন অমৃতবৃক্ষের বীজ যা আজও শাশ্বত ফলদানের উপযোগী। সাহিত্যের আকাশে বিচরণকারী ঈশ্বরচন্দ্র বাস্তবিকরূপে ঈশ্বররূপে বিরাজমান—

> গিরিশৃঙ্গোর দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক। শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীন কঠিন শক্তির দ্বারা। আপনাকে প্রচুর সরস শাখাপল্লব সম্পন্ন সরল মহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে তেমনি জন্মদারিদ্র্য এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। (বিদ্যাসাগর চরিত : চরিত্র পূজা, 'রবীন্দ্ররচনাবলী', একাদশ খণ্ড)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তখনো পথভ্রান্ত, যথার্থ পথ খুঁজে নেবার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়বন্ধ। সাহিত্য নিরসপ্রায় ও ভাষাভাব প্রকাশের স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণে রত। এমতাবস্থায় ইতিহাসের দুর্জয় কঠিন পথে হাত ধরলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে স্বহস্তে দেখালেন প্রগতির রাজপথ। সাহিত্যের সংস্কারসাধন করলেন ঈশ্বরচন্দ্র, আপন নিয়মে স্বতন্ত্র উপায়ে বাংলা ভাষা সাহিত্যের দিগ্‌ভান্ত নৌকার হাল ধরলেন তিনি, খেয়া বেয়ে নিয়ে গেলেন সংস্কারের অবগাহনে, জ্বালালেন আলোক শিখা। বৈতালপঞ্চবিংশতি-র ১০ ফাল্গুন, সংবৎ ১৯০৬ বিজ্ঞাপন অংশে ঈশ্বরচন্দ্র বলেছেন— "কলেজ অবফোর্ট উইলিয়াম নামক বিদ্যালয়, তত্রত্য ছাত্রগনের পাঠার্থে, বাংলা ভাষার হিতোপদেশ নামে যে পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল, তাহার রচনা অতি কদর্য্য।" কারণ দেখান, তা দুরূহ ও অসংলগ্ন যা থেকে অর্থবোধ ও তাৎপর্যসংগ্রহ হয়ে ওঠে না। হিন্দি বৈতাল পচীসীর সরল ভাবানুবাদে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দেখালেন গল্পপ্রবাহে ভাবের স্বচ্ছন্দ বহমানতা, ভাব ও ভাবনার যথার্থরূপায়ন—

> সে কহিল, আমি চোর; তুমি কে, কি নিমিত্তে আমার পরিচয় লইতেছে, বল। রাজা ছল করিয়া বলিলেন আমিও চোর। তখন সে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিল, আইস, উভয়ে একত্র হইয়া চুরি করিতে যাই। রাজা সম্মত হইলেন। চোর রাজাকে সহচর করিয়া, এক ধনাঢ্য গৃহস্থের ভবনে প্রবেশপূর্বক, বহু অর্থ হস্তগত করিল।

বিদ্যাসাগর রবার্ট ও উইলিয়ম চেম্বার্সের 'Biographies'-এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন এ দেশীয় বিদ্যার্থীদের বিশিষ্ট উপকারসাধনের চিন্তা থেকেই। 'জীবনচরিত' রচনার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ মহোপকারের। প্রথমত মহাত্মাদের জীবনপ্রবাহে দৃঢ় অধ্যবসায়, অক্লিষ্ট পরিশ্রম ইত্যাদি প্রদর্শনে সহস্র উপদেশের ফলপ্রাপ্ত হওয়া; দ্বিতীয়ত, ভিন্ন দেশের রীতি-নীতি-ইতিহাস-আচারের বাস্তব জ্ঞান লাভ করা।

১. **গ্যালিলিয় :** গ্যালিলিয়, এই দৃষ্টিপোষক নলাকার নূতন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করিয়া, দেখিতে পাইলেন, চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর; সূর্যমণ্ডল সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ্য হয়, ছায়াপথ সূক্ষ্ম তারকাস্তাবকমাত্র।

২. **স্যার আইজাক নিউটন :** এক দিবস, তিনি উপবন মধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্তী আতাবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের পতন নিয়ামক সাধারণ কারণ বিষয়িণী পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বলাবাহুল্য ভাষা, রচনারীতি, ভাবপ্রকাশে বহু অসংগতি আছে। কাঠিন্যবহুল শব্দ চয়ন অনেক স্থানে ভাষার বাঁধুনিকে করেছে শিথিল। 'জীবনচরিত'-এর জন্য বিদ্যাসাগর ৭৪টি ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষা রচনা করেছেন। যেমন—Botany–উদ্ভিদবিদ্যা, Museum—চিত্রশালিকা, Ticket —প্রবেশিকা, Report—বিজ্ঞাপনী, আবিষ্ক্রিয়া, (Times) অপ্রকাশিত অথবা অপরিজ্ঞাত বিষয় উদ্ভাবন। স্থিতিস্থাপক, (Elasticity) আকুঞ্চন, প্রসারণ, অভিঘাতাদি করিলেও বস্তু সকল যে নৈসর্গিকগুন প্রভাবে পুনর্বার পূর্বভাব প্রাপ্ত হয়। 'বোধোদয়' গ্রন্থটি নানা ইংরেজি পুস্তক থেকে সংকলিত করেছেন। অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক বালিকাদের বোধগম্যযোগ্য করে ঈশ্বরচন্দ্র অতিসরল ভাষায় বিষয়গুলির ধারনা দেন।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় মাতৃভাষার দ্বারা অভিনব সংস্কার আনেন। তিনি মননগ্রাহী চিন্তনের দ্বারা উপলব্ধি করেন যে প্রচলিত শিক্ষাধারায় ও পদ্ধতিতে বেশ কিছু জোরালো ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়নের প্রারম্ভে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আদ্যন্ত এবং ধাতুপাঠ, অমরকোষ-ভট্টিকাব্য-সিদ্ধান্তকৌমুদী কণ্ঠস্থ করা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য। সংস্কৃতে রচিত ব্যাকরণের নীরসতায় শিক্ষার্থীরা হতোদ্যম হয়ে ওঠে। 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা'-য় সরল বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ সংকলন ও সংগ্রহ রচনায় বিদ্যাসাগর দেশীয় ঐতিহ্যের সরলীকরণ করলেন শিক্ষার্থীদের স্বার্থে। 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩, মার্চ)-এ তিনি মহাকাব্য-দৃশ্যকাব্য-কোষকাব্য-দৃশ্যকাব্য-চম্পূকাব্য, গদ্যকাব্য ইত্যাদিগুলিকে গোষ্পদে আকাশ দর্শনের মতো বাংলা ভাষায় নিখুঁত সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ ঘটালেন। 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি অনুবাদে উপাখ্যানভাগে অলৌকিক চমৎকারিত্বকে অদ্ভুত ভাষা ও ভাবের প্রবাহে এমনভাবে নির্মাণ করলেন যাতে মনোহারিত্ব চূড়ান্ত শিখর স্পর্শ করে—

> নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপ্লুত হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবা মাত্র, মা মা করিয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসিল, মা! ও কে, ওকে দেখে তুই কাঁদিসকেন তখন শকুন্তলা গদগদ বচনে কহিলেন, বাছা! ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।

অনুবাদ সাহিত্যে তিনি স্বকীয় পাণ্ডিত্য ও বিবেচনাবোধ সংমিশ্রণে ভাষায় কারিকুরিতে ভাবের স্বচ্ছন্দ গতিময়তায় এক অনির্বচনীয় সাহিত্য ধারার সৃজন ঘটালেন, দেখালেন মাতৃভাষার মনোগ্রাহী প্রতিমার মাধুর্যমণ্ডিত রূপ। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (দ্বিতীয়ভাগ), 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'শব্দমঞ্জরী' প্রভৃতি রচনায় শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান, রসবোধ, ব্যাকরণবোধ, চরিত্রগঠন, আদর্শ জীবনবোধ বিষয়ে নীতিশিক্ষার দ্বারা উন্নত চেতনাসম্পন্ন মানসিকতা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। এক অন্যতর জীবনের রসদের সন্ধানের সুদূরের পিয়াসী হয়ে সমস্ত সমাজকে বর্ণপরিচয় করালেন যা মহৎ থেকে মহত্তরবোধের প্রধান ভিত্তিস্তর। বর্ণপরিচয়-বাংলাভাষায় ABC তথা ইউরোপীয় শিল্পাদর্শে রচিত শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচিতি। 'বর্ণপরিচয়' ১ম ভাগ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

> কেবল মনে পড়ে 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' তখন 'কর-ঘল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা।...

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধনে ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। ১৮৩৯ সালের ২২ এপ্রিল হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষা দেন ঈশ্বরচন্দ্র। ঐ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গো উত্তীর্ণ হয়ে ১৬ মে

‘ল কমিটি’র কাছ থেকে যে প্রশংসাপত্রটি পান, তাতেই প্রথম তাঁর নামের সঙ্গে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধিটি ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত কলেজে বারো বছর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর তিনি কলেজ থেকে অপর একটি প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাপ্ত দেবনাগরী হরফে লিখিত এই সংস্কৃত প্রশংসাপত্রে কলেজের অধ্যাপকগণ ঈশ্বরচন্দ্রকে ‘বিদ্যাসাগর’ নামে অভিহিত করেন। তবুও অহংকার নামক ব্যাধি থেকে তিনি বহু যোজন দূরে অবস্থান করতেন। একটু আধটু সংস্কৃত শিখে পণ্ডিত ভাবা, সংস্কৃতে কথা বলা খুব একটা পছন্দ করতেন না। নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ানো তাঁর অন্যতম শখ, খেতে বসিয়ে প্রায় রঙ্গ করে বলতেন—

হু হু দেয়ং হাঁ হাঁ দেয়ং দেয়াঞ্চ করকম্পনে।
শিরসি চালনে দেয়ং ন দেয়ং ব্যাঘ্র ঝম্পনে।।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদেশে শিক্ষায় স্ত্রী লোকের তেমন কোনো প্রগতি ছিল না। ১৮১৯ সালে প্রকাশিত ‘সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ’-এ রামমোহন রায় যুক্তি দেখিয়ে বলেন—“স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনোকালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন।”

এদেশে বালিকাদের শিক্ষাদান সমাজের চোখে ছিল মহাপাপ, মেয়েদের শিক্ষাদানের ফলে মেয়েদের বৈধব্য যন্ত্রণা, পূর্বপুরুষদের নরকবাস ও সমাজের রসাতলে যাওয়া সুনিশ্চিত এই ছিল জগদ্দল ধারণা। এই ভ্রান্ত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলারা ও Female Juvenile Society-র সদস্যরা। সেই পবিত্র যজ্ঞের অন্যতম হোতা ছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ১৫ মে এই সময় পর্বে বিদ্যাসাগর হুগলিতে কুড়িটি, বর্ধমানে এগারোটি, মেদিনীপুরে তিনটি, নদিয়ায় একটি; সর্বমোট পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। ভারত সরকারের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু তাঁরা বিমুখ। ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়ালেন তিনি। এর সঙ্গে শুরু হয় সমাজের সঙ্গে লড়াই। বিদ্যাসাগর নিরস্ত হলেন না। ঐ মেয়েদের বিদ্যালয়গুলি চালানোর জন্য নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুললেন, চাঁদার টাকায় বাঁচাতে চাইলেন বিদ্যালয়গুলি। নিজ চেষ্টায় ১৮৬১ সালে গভর্নমেন্টের কাছে মাসিক চোদ্দ টাকা, ১৮৬২-তে মাসিক বারো টাকা মঞ্জুর হয়। পরে আরো সাতটি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্য পান। সে সময়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন রঙ্গ করে বলেছেন—বাপরে বাপ, মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে। এক ‘আনো’ শিখিয়েই রক্ষা নেই। ‘চাল আনো’, ‘ডাল আনো’, ‘কাপড় আনো’ করে অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে। (শিবনাথ শাস্ত্রী : ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’, কলকাতা, ১৯০৪, পৃ. ১৯৬)

১৯৫০ সালের ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর বেথুনের বালিকা বিদ্যালয়ের সরাসরি সেক্রেটারি হলেন। বিদ্যালয়ের বালিকাদের বাড়ির দুপাশে বিদ্যাসাগর ‘মহানির্বাণ তন্ত্রে’র একটি শ্লোক খোদিত করার ব্যবস্থা করেন—“কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।” (মহানির্বাণ তন্ত্রঃ ৮ম উল্লাস, শ্লোক ৪৭) কেবল শিশুশিক্ষা বা স্ত্রীশিক্ষা নয়; সংস্কৃত কলেজে অব্রাহ্মণ হিন্দুদের পাঠাধিকার বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। সর্বোপরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিদ্যাসাগর এক নূতন দ্বিধাহীন পথের সন্ধান দেন, সংস্কার করেন তার দুর্বলতাগুলিকে, এক নির্ভীক স্বচ্ছন্দ প্রাণবন্ত গতিময়তা দান করেন। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে অধিক যথার্থতা পেয়ে যায়—

> ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার সাহিত্যভাষার সিংহদ্বার উদঘাটন করেছিলেন।...ভাষার একটা প্রকাশমননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানে ইতিহাসে; আর একটা প্রকাশ ভাবের বাহন রূপে রসসৃষ্টিতে; এই শেষোক্ত ভাষাকেই বিশেষ করে বলা যায় সাহিত্যের ভাষা।

বাংলার সেই ভাষাটাই দ্বিধাবিহীন মূর্তিতে বিদ্যাসাগরের লেখনীধারায় প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে। প্রমথনাথ বিশী বিদ্যাসাগর বিষয়ে লিখেছেন—

> এত বড় মানবপ্রেমিক অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন—আর শেষ জীবনে এত বড় মানববিদ্বেষী অল্পই দেখা গিয়েছে...আমরা অকৃতজ্ঞতা দিয়ে, কৃতঘ্নতা দিয়ে, করুণার পরিবর্তে নিন্দা দিয়ে, ঘর পুড়িয়া তাঁকে দেশছাড়া করেছিলাম; তিনি আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন কার্মাটাড়ের নিভৃত পল্লীতে।

কেবল শিক্ষা-ভাষা-ভাব-আবেগ-শব্দ-ব্যাকরণ নয়, সর্বোপরি সমাজব্যবস্থার কঙ্কালে যে ঘুনপোকা বাসা বেঁধেছিল তাকেও সংস্কার ও সংশোধন করতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। একা একজন ব্যক্তিত্বশালী মানুষ সমগ্র সামাজিক কুপ্রথা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন তবে তা শাস্ত্রীয় যুক্তির আলোকে। এক বিশেষ কালের প্রান্তে দাঁড়িয়ে এক নূতন ইতিহাস সৃজন করলেন তিনি। ভারতবর্ষ মাতৃস্বরূপা অথচ সেখানেই প্রতি পদে অপমানের দাগা। ১৮৭৪, ২৪ জানুয়ারি বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটি ও মিউজিয়াম দেখতে গেলে দ্বারোয়ান ঢুকতে বাধা দেন কারণ পায়ে তালতলার চটি। ১৮৫৪ ও ১৮৬৮ সালের সরকারি নির্দেশ অনুসারে যে কোনো সরকারি স্থানে ইউরোপীয় বুটের সাদর আমন্ত্রণ কিন্তু ভারতীয় জুতোর প্রবেশ নিষেধ। এ ছিল বিদেশিদের থেকে প্রাপ্ত অপমান। অন্যদিকে সমাজে স্ত্রী-লাঞ্ছনা, স্ত্রীদের প্রতি নির্যাতনে, বিধবাদের দুর্গতি, বহুবিবাহ নামক উৎপীড়নে, কুলীনপ্রথার ইত্যাদির শাণিত অস্ত্রে বিদ্যাসাগর বারংবার হয়েছেন ক্ষতবিক্ষত। তাই দেশি ও বিদেশি যাবতীয় লাঞ্ছনা ও বর্বতার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র কখনো করেছেন তীব্র প্রতিবাদ, কখনো প্রতিবাদে শান দিয়েছেন মগজাস্ত্রে।

'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫)-এ বিধবাদের দুরবস্থা বর্ণনা দ্বারা তাদের পক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তি এনেছে। সবচেয়ে জোরালো যুক্তি ছিল 'পরাশর সংহিতা'-র একটি শ্লোক—"নষ্ট মৃতে প্রব্রাজিতে ক্লীব চ পতিতে পতৌ।/পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।"—স্বামী অনুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, ক্লীব স্থির হলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করলে অথবা পতিত হলে, স্ত্রীদের পুর্নবার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত। যেখানে প্রতিবাদীরা বারবার বলেছে—"ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ।" অর্থাৎ, বিবাহবিধিস্থলে বিধবার পুনর্বার বিবাহ উক্ত নাই। তথাপি বিদ্যাসাগর শর্মা পরাশর সংহিতা, নারদসংহিতা, উদ্বাহতত্ত্ব আদিত্যপুরাণ, বশিষ্টসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ব্যাসসংহিতা, মনুসংহিতা ইত্যাদির অকাট্য বর্ণনার দ্বারা নিজ যুক্তিজাল রচনা করেছেন।

'বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভাবিষয়িনী' (১৮৮৪)-তে বলেছেন—স্বামী অনুদ্দেশ হলে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী আটবছর, সন্তান না হলে চার বছর; ক্ষত্রিয়া স্ত্রী ছয় বছর সন্তান না হলে তিন বছর, বৈশ্যজাতীয়া সন্তান না হলে চার বছর নতুবা দুই বছর, শূদ্র জাতীয়া স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রতিক্ষার কাল নিয়ম নাই। অনুদ্দেশ হয়ে জীবিত থাকলে পূর্বোক্তকালের দ্বিগুণ প্রতীক্ষা করবে। (নারদসংহিতা, দ্বাদশ বিবাদপদ) কেবল শাণিত বাক্য বিস্তার নয়, কখনো কখনো প্রতিবাদকে করেছেন রসময় রসিকতার আধার। 'রত্নপরীক্ষা'-তে ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন,

মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এই তিন পন্ডিতরত্নের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য নামে। 'রত্নপরীক্ষা'-র বিজ্ঞাপনে বলেছেন—

> ব্রজবিলাস লিখিয়া, বিদ্যারত্ন খুড়র মানবলীলা সংবরণের কারণ হইয়াছি।...আমাদের সমাজে গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে, ব্রজবিলাস লিখিয়া, কোন পাপে লিপ্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না।

বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ বিধির প্রবর্তন শুধুমাত্র করেননি, ন্যায়সংগত যুক্তিও দেখিয়েছেন দৃঢ়তার সঙ্গে। সমস্ত দেশে হই হই পড়ে যায়, পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা কাটাকাটি, হাটে বাজারে গ্রামের চাষা ভুষোর কাছে বিদ্যাসাগরের নাম হয়ে যায় বিধবার বিয়ে দেওয়া বিদ্যাসাগর। (বিহারীলাল সরকার : 'বিদ্যাসাগর', তৃতীয় সং পৃ. ২৬৯) শান্তিপুরের তাঁতিরা নতুন বিদ্যাসাগর পেড়ে শাড়ি বুনলেন—অনেক বেশি বিক্রি হতো সে সব শাড়ি। পাড়ে লেখা থাকত একটি গান—

> সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে।/মনের সুখে থাক মোরা মনোমত পতি লয়ে।/এমন দিন কবে হবে,/বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে,/আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই—/আলোচাল কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছাই,—/এয়ো হয়ে যাব সবে বরণ ডালা মাথায় লয়ে।। (বিহারীলাল সরকার : 'বিদ্যাসাগর', পৃ. ২৬৬)

ঐ গানকে ব্যঙ্গ করেও অনেক প্রকার গান বাঁধা হয়। সেই গানে প্রথম লাইন—"শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে।" ভবানীপুরস্থ কস্যচিৎ বিয়ে পাগলা ১৮৫৬, ১৩ ফেব্রুয়ারি 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক উদ্দেশ্যে লেখেন—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রাসাদাৎ এ রাজ্যে Second Hand (সেকেন্ড হ্যান্ড) রমণী অর্থাৎ দোজবরে কনে চলন হইবেক, এ কারণ ভরসা করি যে, আমরা অতি সুলভ মূল্যেই মনোহরা মহিলা লাভ করিতে সমর্থ হইব।" বঙ্গ সমাজে এক প্রলয় আনলেন বিদ্যাসাগর, নির্মাণ করলেন অনন্য ইতিহাস। বহুবিবাহ প্রথার বাড়বাড়ন্ত, বাল্যবিবাহ, অসহায় মেয়েগুলির পরিত্রাণ নেই। বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে টুঁটি চেপে ধরেন বিদ্যাসাগর। 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'—গ্রন্থে রয়েছে বারুদপূর্ণ উক্তি—

> এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যকারিতা লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পুরুষজাতি, কতিপয় অতিগাহিত প্রথার নিতান্ত বশবর্তী হইয়া, হতভাগা স্ত্রীজাতিতে অশেষবিধ যাতনা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতিজঘন্য অতিনৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই।

সুনিপুণ ন্যায় সংগত বিতণ্ডায় প্রামাণ্য যুক্তি দেখিয়ে তৎকালীন পরিস্থিতির খতিয়ান দেখান। সমসাময়িক কুলীনের নাম, বয়স, বাসস্থান, বিবাহসংখ্যার নিটোল পরিচয় দেন। যেমন—বছর পঞ্চান্ন বয়সের ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহসংখ্যা আশি, দেশমুখোর চৌষট্টি বয়সের ভগবান চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ সংখ্যা বাহাত্তর, পঞ্চান্ন বছরের চিত্রশালীর পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ সংখ্যা বাষট্টি ইত্যাদি পরিসংখ্যানের দ্বারা তিনি বিবাহ বিষয়ে কুলিনদের অত্যাচারের নমুনা দেখাতে চেয়েছিলেন। তিনি ৮৬টি গ্রামের ১৯৭ জন কুলীনের সর্বসমেত ১২৮৮ জন বঙ্গারমণীর পাণিগ্রহণের নিদর্শন দেখান। ঐ গ্রন্থেই বিদ্যাসাগর লিখেছেন—

> কুলীনমহিলা ও কুলীনতনয়াদিগের যন্ত্রনার পরিসীমা নাই। পৃথিবীর কোনও প্রদেশে স্ত্রীজাতির ঈদৃশী দুরবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামীগৃহবাস, স্বামীসহবাস, স্বামীদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন কুলীন কন্যাদের স্বপ্নের অগোচর। কোনও অতিপ্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

> ঠাকুরদাদা মহাশয়! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকলস্থানে যাওয়া হয় কি। তিনি অম্লানমুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট পাই, সেইখানে যাই।

সামাজিক সংস্কারের সাহিত্যিক প্রকাশে ও প্রয়াসে শুরু হয় চাপানউতোর। বিরুদ্ধবাদীদের প্রকাশ্য গালাগালির যোগ্য জবাব দিতে ১৮৭৩-এ লেখেন 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল'। বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলে দাবি করলে দিগ্বিজয়ী তারানাথ তর্কবাচস্পতি তাঁর মত খণ্ডন করলে বিদ্যাসাগর লঘু পরিহাসে মিছরির ছুরি বাগিয়ে ধরেন। গ্রন্থের শুরুতেই সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পদ্যের সম্ভাষণে দর্পহরণ করেন। 'আবার অতি অল্প হইল'-তে কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য নামে যে শাণিত আক্রমণ করেন তাঁর সাহিত্যিক গুরুত্ব অপরিসীম।

বহু বিবাহকে কেন্দ্র করে একে একে তারানাথ তর্কবাচস্পতি, রাজকুমার ন্যায়রত্ন, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, সত্যব্রত সামশ্রমী, গঙ্গাধর কবিরাজ, বঙ্কিমচন্দ্রসহ অনেকেই তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। 'হালিশহর পত্রিকা'য় সে সময় লেখা হয়—"যারে পায় তারে ধরে দিগাদিগনাই,/বাহবা বুকের পাটা বলিহারি যাই।/আবোল তাবোল বকে সকলেই নীরস,/সাগরে সাঁতার দিতে করেছ সাহস।" আবার বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধিতার কারণে প্যারী কবিরত্ন ছড়া বাঁধেন—"বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমৎকার,/এ দোষ দর্শনে রোষ হয় না কা'র/অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন,/সমালোচন কেন তা'র।" রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের গানে পাই—

> বহুদিন পরে এসেছি চিনি না শ্বশুরবাড়ি,/কোন পথে যাইব মাগো, বিশ্বনাথ বাড়ুড়ীর বাড়ি॥/যারা ছিল ছেলেপিলে, তাদের হল ছেলেপিলে,/বিয়ে করে গেলেম ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ি॥/দ্বিজ রাসবিহারী বলে আর ত হাসি রাখে নারি।/তুমি যারে মা বলিলে, সে বটে তোমারি নারী।

গানটির প্রেক্ষিতে রয়েছে জনৈক বহুবিবাহকারী কুলীন কুড়ি বছর পর শ্বশুর বাড়ির সন্ধানে এসে যথার্থ চিনতে না পেরে নিজ স্ত্রীকে মা 'গো' বলে সম্বোধন করার কৌতুক বাহিনী। (শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, ২য় সং, পৃ.১৫০-১৫২)

বিদ্যাসাগর সংস্কারবাদী শুদ্ধ আত্মা নিয়ে ইতিহাসের পদচারণায় অনন্য প্রতিবাদী সাহিত্যিক ফসল ফলালেন। তবে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কোনো সরকারি আইন পাশ হয়নি। বিশেষত তাঁর কৌতুকপূর্ণ বেনামে লিখিত প্রতিবাদী লেখাগুলি হাস্যপরিহাসের তরঙ্গে বিচক্ষণতার ও বিদ্যাবত্তার অপূর্ব নিদর্শন। পাশাপাশি তিনি বাল্যবিবাহের দোষ নিয়ে আপন মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রমথনাথ বিশী যথার্থই বলেছেন—"ঈশ্বরচন্দ্র কেবল বিদ্যাসাগর বা করুণাসাগর নন, রসসাগরও বটে।" বস্তুত, সেইসব শ্লেষ চাতুর্যপূর্ণ রচনায় মজলিশি মেজাজ, ক্ষুরধার বুদ্ধি, অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান সমবায়ে নৈয়ায়িকী Wit-এর ভাস্বর লক্ষণীয়। একটি উৎকৃষ্ট নমুনা নিম্নরূপ—

> একদিন বিদ্যাবাগীশের অধ্যাপক নদীতে অবগাহন করিয়া, স্নান করিতেছেন; বিদ্যাবাগীশ নদীর তীরে দণ্ডায়মান আছেন। বিদ্যাবাগীশ দেখিতে পাইলেন, একটা কুমীর তাঁহার অধ্যাপককে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, বিদ্যাবাগীশ স্বীয় অধ্যাপককে সতর্ক করিবার নিমিত্ত কহিলেন—গুরু, সাবধানো ভব, মহীলতা আয়াতি; গুরুদেব! সাবধান হউন, একটা মহীলতা আসিতেছে। বিদ্যাবাগীশের অধ্যাপক জানিতেন, 'মহীলতা' শব্দের অর্থ কেঁচো, কেঁচো আসিতেছে, সে জন্য অঙ্কিত ও সাবধান হইবার আবশ্যকতা কি এই ভাবিয়া তিনি, নিঃশঙ্ক চিত্তে, নদীতে স্নান করিতে লাগিলেন; ইত্যবকাশে, কুম্ভীর আসিয়া তাঁর প্রাণসংহার করিল। (রত্নপরীক্ষা)

কালের স্রোতধারায় সব কিছুই নিঃশেষ হয়, রয়ে যায় কীর্তি। বিদ্যাসাগর এমন এক প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্ব যিনি স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও বিদ্যাবত্তার দ্বারা যুগ প্রেক্ষিতে কেবল ইতিহাস রচনা করলেন না বরং

অপরদিকে ইতিহাসের রাজাধিরাজ সেই অগ্নিপুরুষকে পরিয়ে দিলেন স্বীকৃতির স্বর্ণমুকুট। নরনারীর দুঃখ-অসহায় জীবনের দিকে তাকিয়ে তিনি কেবল আবেগপূর্ণ নীরব অশ্রুপাত করেননি, প্রতিবাদে হয়েছেন বজ্র, ভ্রান্তপ্রথা কুসংস্কারের কালো মেঘ চিরে দান করেছেন প্রশান্তির বর্ষণ। সাহিত্যকে ঝিল্লিরবের একঘেঁয়েমি থেকে টেনে বের করে দাঁড় করিয়েছেন আত্মপ্রতিষ্ঠার সোপানে, নির্মাণ করেছেন গৌরব উজ্জ্বল সৌধ। ১২৯৮, ১৪ শ্রাবণ; মানকুমারী বসু লিখেছেন—

> আমি বেলা ৭ টার সময়ে নিমতলার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া যে হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিলাম, তাহা ভাষায় বলিতে পারি না। দেখিলাম মানব জগতের এক প্রদীপ্ত সূর্য খসিয়া পড়িয়াছে, ভারতবাসীর প্রধান অলংকার শেষ হইয়াছে, বঙ্গভূমির উচ্চ গৌরব ফুরাইয়াছে।

বস্তুত, আজ তাঁর সর্বোপরি ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক তিনি, বাঙালিয়ানাকে মনে প্রানে ঠাঁই দিয়ে পাশ্চাত্য যুক্তির শুভ্র আলোকে, প্রাচ্যের ন্যায়নিষ্ঠ সংকল্পে পরানুকরণ পরানুচিকীর্ষার প্লাবনের মাঝখানে তিনি উন্নত শির, শিখর হিমাদ্রির, বাংলা ভাষার অন্যতম স্রষ্টা। সময়ের বন্ধনে সীমার গণ্ডিকে ছাড়িয়ে অটল পৌরুষে, প্রখর তেজে তিনি উড্ডীয়মান ভীষণ উপেন্দ্র।

উৎসের সন্ধানে

১. ইন্দ্র মিত্র : 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' ১ম সংস্করণ, আনন্দ, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৬৯
২. বিপিনবিহারী গুপ্ত : 'পুরাতন প্রসঙ্গ : প্রথম পর্যায়', কলকাতা, ১৩২০
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বিদ্যাসাগরচরিত', কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ, ১৩৬৫
৪. প্রমথনাথ বিশী : 'বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার', কলকাতা ১৯৫৭
৫. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারন : 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত', কলকাতা, ১৮৯১
৬. শরৎকুমার লাহিড়ী : 'বিদ্যাসাগর-কথা', প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৭
৭. অমিয়কুমার সামন্ত : 'বিদ্যাসাগর', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা, মে, ২০০৪
৮. নির্মলকুমার সাহা : 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী' ১, সাহিত্যম, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৬
৯. নির্মলকুমার সাহা : 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী' ২, সাহিত্যম, কলকাতা, ২০০৬

বাংলা সংস্কৃতি চর্চায় বিনয় ঘোষ ও তাঁর সংস্কৃতি ভাবনা

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাংলার ইতিহাস নেই বলে আক্ষেপ করেছিলেন সে আক্ষেপ কিন্তু ছিল প্রকৃতপক্ষে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের অজ্ঞতা ও অবহেলার দিকে নির্দেশিত। 'সাহিত্য' ও 'সংস্কৃতি' শব্দদুটি একই প্রয়াসে উচ্চারিত হলেও চর্চার ক্ষেত্রে 'সংস্কৃতি' বা 'সংস্কৃতি তত্ত্ব' অদ্যাবধি ততখানি জনপ্রিয় ও চর্চিত বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি। প্রাবন্ধিক শ্রী বিনয় ঘোষের(১৯১৭-১৯৮০) নিরলস সংস্কৃতি চর্চা সেই সূত্রে বাংলা ভাষায় একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ রূপে বিবেচিত হতে পারে।

আধুনিক বাংলা সংস্কৃতি চর্চায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরাধিকার শ্রী বিনয় ঘোষের মননে ও জ্ঞানচর্চায় সঞ্চারিত হয়েছিল। শ্রী বিনয় ঘোষের পরিচয় নানা মাত্রায় নির্ণয় করা যায়। তিনি সমাজতাত্ত্বিক, সংস্কৃতিবিদও প্রাবন্ধিক। যৌবনারম্ভে তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাঁর লেখা গল্প, নাটিকা, রম্যরচনা তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়কেও প্রতিষ্ঠা দেয়।

বঙ্গ সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিবিধ তত্ত্ব ও তার গতিপ্রকৃতি বিষয়ে তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ' (১৯৪০), 'বাংলার নবজাগৃতি' (পরিবর্তিত সংস্করণ ১৯৭৯), 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (৪ খণ্ড) (যথাক্রমে ১৯৫৭, ১৯৭৮৮,১৯৮০,১৯৮৬), 'মেট্রোপলিটন মন, মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ' (১৯৭৩), 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' (১৯৭৯)। এই গ্রন্থগুলিতে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে তার পরিপূরক আলোচনা তাঁর রচিত আরও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে। যেমন রেনেসাঁস বিষয়ে তাঁর পরিপূরক আলোচনাগুলি পাওয়া যাবে 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (১৩৬৬), 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' (১৯৬১), 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' (১৯৬৮) প্রভৃতি

গ্রন্থে। আবার নগর সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর ভাবনার নিদর্শন পাওয়া যাবে 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত' (১৯৭৫), 'অটোমেটিক জীবন ও সমাজ' (১৯৭৮) এমন কি রম্যরচনা 'কালপেঁচার নকশা' (১৩৫৮), 'কালপেঁচার দুকলম' (১৩৫৯), 'কলকাতার কালচার' (১৩৬০) প্রভৃতি গ্রন্থে। সংস্কৃতি সম্পর্কে বিনয় ঘোষের যে আলোচনা তাকে কয়েকটি উপধারায় বিন্যস্ত করা যেতে পারে—

১. সংস্কৃতির তত্ত্বগত ভিত্তি সংক্রান্ত আলোচনা
২. বাংলার নবজাগৃতি ও তার মূল্যায়ন
৩. নগর সংস্কৃতি ও তার বিভিন্ন দিক
৪. বাংলার লোকসংস্কৃতির পরিচয়

১. সংস্কৃতির তত্ত্বগত ভিত্তি সংক্রান্ত আলোচনা : 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' (১৯৭৯) গ্রন্থের অন্তর্গত 'সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব' বিনয় ঘোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি 'সংস্কৃতি'র তাত্ত্বিক কয়েকটি দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব কেন, কীভাবে সৃষ্টি হয় এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক তা পর্যালোচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় এই ধরনের তাত্ত্বিক আলোচনা সেইসময়ে তো বটেই এখনও নিতান্ত সুলভ নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রী ঘোষ সংস্কৃতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়গুলি একাদিক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে—স্থিতি, সৃষ্টি, লয়—যে-কোনো জাতির, যে কোনো দেশের বা অঞ্চলের সংস্কৃতি ধারার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তিনটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়বে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে সমাজবিজ্ঞানীরা স্থিতি (Persistence), সৃষ্টি (Invention) ও লয় (Loss) বলে অভিহিত করেছেন। আমাদের অভ্যাস, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা, উৎসব-পার্বণ-অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করে দেখলে অতীত সংস্কৃতির অনেক মৃত উপাদানের জীর্ণ কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া যায়। এর উদাহরণ রূপে প্রাবন্ধিক গুরুবাদের কথা বলেছেন। এটি বহুকালের অতীত সংস্কৃতির একটি উপাদান হলেও আধুনিক কালের সাধু-পীরদের আস্তানা থেকে সমাজের বিভিন্ন কেন্দ্র পর্যন্ত তার যথেস্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাবিচ-কবচের আধিপত্য বর্তমান যুগে কিছু কমলেও তা একেবারে লোপ পায়নি। বিশেষত শিক্ষিতদের মধ্যে আজও তার পর্যাপ্ত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতির দীর্ঘ স্থিতির এই বৈশিষ্ট্যকে 'পার্সিস্টেন্স' বলে।

সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল নূতনের উদ্ভাবন, আবিষ্কার বা সৃষ্টি। যুগে যুগে সমাজের তাগিদে নূতন নূতন সাংস্কৃতিক উপাদান উদ্ভাবিত হয় এবং তার ঘাত-প্রতিঘাতে ধীরে ধীরে পুরাতনের ভাঙন ও নূতন ধারার গড়ন শুরু হয়। এই গড়নকে বলা হচ্ছে সৃষ্টি invention, তার ভাঙনকে বলা হচ্ছে সংস্কৃতির লয়শীলতা।

এই নূতন—পুরাতন উপাদানের মিলন মিশ্রণের ভিতর দিয়ে নূতন নূতন কালচার কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয়। ক-খ-গ উপাদানের সঙ্গে যখন নূতন ঘ-ঙ উপাদান মিশ্রিত হয় তথা পূর্বের উপাদানের বিন্যাস বা সন্নিবেশ বদলে যায় এবং তার ফলে উপাদানান্তর্গত এবং সন্নিবেশগত তাৎপর্য ও রূপান্তরিত হয়। সংস্কৃতিকে এই কারণে configuration বলা হয় এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভাবন ও বিলোপের ফলে এই জন্যই মৌল সংস্কৃতির তাৎপর্যান্তর ঘটে। কেবল একটা সমষ্টি থেকে দু-একটি উপকরণের যোগ বিয়োগ হয় না। প্রাবন্ধিকের মতে সৃষ্টিশীলতা ও লয়শীলতা সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার পরিচায়ক এবং এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত শক্তি তার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীলতার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল।

২. ট্র্যাডিশন ডিফিউশন ও মার্জিন্যালিটি : সংস্কৃতির স্থিতিশলতার একটি বড়ো দিক হল ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য। সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণের প্রবাহকে আশ্রয় করেই ঐতিহ্যের প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। সংস্কৃতির কালিক প্রবাহ হল ঐতিহ্য। এছাড়া সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রবাহও আছে, যাকে ‘ ডিফিউশন’ বলা হয়। ‘ট্র্যাডিশন’ এর গতি কালিক বলে তার চলন ‘ভার্টিক্যাল’ বা উল্লম্ব বলা যেতে পারে। আর ‘ডিফিউশন’ এর গতি ভৌগোলিক বলে তা ‘হরাইজন্টাল’ বা সমান্তর। সংস্কৃতির গভীরতা হল ‘ট্র্যাডিশন’। আর প্রসারতা হল ‘ডিফিউশন’। ট্র্যাডিশনের গতি কাল থেকে কালান্তরের দিকে ধাবিত হয়। আর ডিফিউশনের গতি দেশ থেকে দেশান্তরে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত সংস্কৃতির যে প্রবাহ তা হল সংস্কৃতির ডিফিউশনের ব্যাপার। আবার বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য-বণিক-গোপ-সদগোপ-মাহিষ্য-কৈবর্ত অথবা হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব কৌলিক সাম্প্রদায়িক সংস্কারের অস্তিত্ব দেখা যায়, সেগুলিকে ঐতিহ্যগত সংস্কার বলা যেতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীরা সেইজন্য সাংস্কৃতিক প্রসারণ বা diffusion কে বলেন ‘inter societal transmission of culture in space’ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা tradition কে বলেন ‘intra societal transmission of culture in time’.

যদি ভৌগোলিক কারণে সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থানের জন্য কোনো নব্য সংস্কৃতি যদি অনুন্নত থাকে তাহলে তাকে বিজ্ঞানীরা ‘মার্জিন্যাল কালচার’ বা প্রান্তীয় সংস্কৃতি বলেন। সংস্কৃতির এই internal marginality যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য যেমন ঘটতে পারে তেমনি আবার সমাজের শ্রেণিগত পার্থক্য এবং জাতি-বর্ণগত দূরত্বের জন্য ও ঘটতে পারে। প্রথমটিকে বলা যেতে পারে ভৌগোলিক প্রান্তীয়তা আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় সামাজিক দূরত্বগত প্রান্তীয়তা। এই সামাজিক দূরত্ব দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ফলে বিভিন্ন জাতি-বর্ণের মধ্যে একটা দুরপনেয় মানসিক দূরত্ব ও রচিত হয়েছে। একে বলা হয়েছে ‘ডিস্ট্যাটিয়েশন’। বাংলার সংস্কৃতিতে এই প্রান্তীয়তার সমস্যা একটি খুব বড়ো সমস্যা। প্রাবন্ধিক এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> কুলগত, বর্ণগত, জাতিগত ও সম্প্রদায়গত অজস্র সংস্কারের কুয়াশা বিভিন্ন জাতিবর্ণ সম্প্রদায়কে পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। একই গ্রামে বা একই অঞ্চলে অনেক কাছাকাছি বংশানুক্রমে বাস করেও মনের দিক থেকে তারা পরস্পরকে কাছে টানতে পারেনি। বাংলার গ্রাম্য সমাজেরও গ্রামীণ সংস্কৃতির (সাধারণভাবে ভারতীয় সমাজের) এটা একটা জটিল সমস্যা।[১] (ঘোষ, ১৪০৬, পৃ. ৬৫)

৩. অ্যাকালচারেশন : প্রাবন্ধিক এই সূত্রে বাংলার সংস্কৃতির আরেকটি উল্লেখ্য দিকের আলোচনা করেছেন। সেটি হল ‘অ্যাকালচারেশন’। এই কথাটির বাংলা প্রাবন্ধিক করেছেন—‘দুই সংস্কৃতির সান্নিধ্যজাত মিলনমিশ্রণ ও সমন্বয়’[২] (ঘোষ, ১৪০৬, পৃ. ৬৬)। প্রাবন্ধিক বলেছেন, সংস্কৃতি মিশ্রণ ও সমন্বয় তিন রকমে হতে পারে—‘১ দুটি ভিন্ন জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করে পরস্পরের সংস্কৃতির সঙ্গো পরিচিত হতে পারে এবং তার ফলে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত ও হতে পারে; ২. ভিনদেশাগত লোকেরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে সাংস্কৃতিক সান্নিধ্য ঘটাতে পারে; ৩. বিদেশিরা দেশ জয় করে বিজেতাদের উপর তাদের সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দিতেও পারে’।[৩] (ঘোষ, ১৪০৬, পৃ. ৬৬) বাংলাদশের সংস্কৃতির তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এই অ্যালচারেশনের গুরুত্ব খুব বেশি। প্রাগৈতিহাসিক দিগন্তরেখা পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তৃত। বিনয়

ঘোষ মনে করেন, বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে অ্যাকালচারেশনের একটি ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়। এখানে নিয়মিত সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটে যাওয়ার কারণে ডিসট্যাটিয়েশনের প্রভাব কিছুটা হলেও পরাহত হয়েছে। তবু শ্রী ঘোষ সামাজিক দূরত্ব বিষয়ে তাঁর সতর্ক বার্তা জ্ঞাপন করেছেন এই বলে—"কিন্তু এই সজীবতা চিরস্থায়ী নয়। সামাজিক দূরত্ব অদূর ভবিষ্যতে লুপ্ত না হলে, তার দেনা চক্রবৃদ্ধি হারে তাকে শুধতে হবে।"[৪] (ঘোষ, ১৪০৬, পৃ. ৬৭)

বলাই বাহুল্য, এটি অত্যন্ত সুলিখিত মূল্যবান প্রবন্ধ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলা ভাষায় 'সংস্কৃতি' তত্ত্বের আলোচনা জনপ্রিয় কোনো বিষয় নয়, শ্রী ঘোষ লিখিত এই প্রবন্ধ রচনার সমকালে তো নয়ই। তাঁর রচনার সমসাময়িককালে গোপাল হালদার দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে বঙ্গ তথা ভারত সংস্কৃতির পর্যালোচনা করেছিলেন। শ্রী ঘোষ মূলত সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে মার্কসবাদের প্রয়োগ যেমন আছে তেমনি প্রচলিত সমাজতত্ত্বসমূহ,—বিবর্তনবাদ, বিস্তারবাদ প্রভৃতিরও সাহায্য নিয়েছেন। বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি বিজ্ঞান চর্চায় এই প্রবন্ধটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোজন। বস্তুতপক্ষে সামাজিক দূরত্ব নিরসনে সংস্কৃতির ভূমিকা কি হতে পারে তারও একটি সমাধান সূত্র এখানে মিলতে পারে। এই তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে বাংলা সাহিত্যেরও স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আরো অনুপুঙ্খভাবে নিরূপণ করা যেতে পারে।

বাংলার নবজাগৃতিকে কেন্দ্র করে বিনয় ঘোষ বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলি হল—'বাংলার নবজাগৃতি', 'ডিরোজিও', 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ'। তবে 'বাংলার নবজাগৃতি' (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) এ বিষয়ে তাঁর মূল রচনা। বইটি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে তিনি বাংলার নবজাগৃতির পশ্চাদভূমির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর দ্বিতীয় পর্ব, যেটি প্রথম পর্ব রচনার কুড়ি বছর পরে ১৯৭০ সালে রচিত সেখানে তিনি নবজাগৃতির বৈপরীত্যসূচক একটি ভাষ্য রচনা করেছেন, যার শিরোনাম 'বাংলার নবজাগরণ একটি অতিকথা।' এটি উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের একটি নেতিবাচক ভাষ্য। বাংলার নবজাগরণ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের বক্তব্যকে সূত্রাকারে এইভাবে সাজানো যেতে পারে—

১. প্রাবন্ধিক ব্রিটিশ আমলে নগর কলকাতা ও তার নাগরিক সমাজের জন্মলাভকে বাংলার নবজাগরণের এক গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

২. ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, পুঁজিপতি বণিক, কারিগরী কৌশলের দ্রুত পরিবর্তন, নগর কলকাতার বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে এক গুণগত পরিবর্তন এনে দিল। এই পরিবর্তনের পক্ষপুটে বাঙালি বুর্জোয়ার জন্ম হয়েছিল।

৩. এই পরিস্থিতিতে নতুন ভাব সমন্বয় দেখা গেল, ইংরেজের সভ্যতা, সংস্কৃতির সঙ্গে নবোদ্বোধিত বাঙালি চেতনার।

৪. প্রাবন্ধিক উনিশ শতকীয় ভাবসমন্বয়ের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ইসলামিক—হিন্দু ভাব সমন্বয়ের পার্থক্য দেখেছেন। একালের ভাবসমন্বয়ে অর্থনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তন তাঁর নজরে এসেছে।

৫. নবজাগরণের ফলশ্রুতিতে ক্রমে সমাজতন্ত্রের আগমন ও প্রতিষ্ঠা তিনি প্রত্যাশা করেছেন।

৬. আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে তিনি পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষিতে অনুভব করেছেন নবজাগরণ প্রকৃতপক্ষে হয়নি। তা কেবল কতিপয় ইংরেজি শিক্ষিত মানুষের উচ্ছ্বাসমাত্র ছিল। তা 'অতিকথা' ছাড়া আর কিছু নয়।

৭. নবজাগরণকে তিনি বিপ্লবের সমতুল বলে যেন গণ্য করেছেন।

বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে বিনয় ঘোষের প্রাথমিক ধারণা যত ইতিবাচক ও দৃঢ় ছিল দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় তার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। বাংলার উনিশ শতকীয় নবজাগরণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা পরিবর্তনের কারকরূপে তিনি যে উপাদানগুলিকে গুরুত্ব দিলেন সেগুলি হল, ব্রিটিশ প্রবর্তিত new learning এর স্বল্প বিস্তার, বাণিজ্যিক প্রসারণের অপ্রতুলতা, জনসাধারণের জীবনের মানোন্নয়ন না ঘটা, নবচেতনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের মানসিক যোগসূত্র স্থাপিত হতে না পারা ইত্যাদি বিষয়কে। এই প্রসঙ্গে শ্রী ঘোষ বলছেন, 'মেকলে তাঁর পিতাকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন (১২ অক্টোবর ১৮৩৬) যে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হলে পরবর্তী তিরিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মধ্যে একজন ও পৌত্তলিক খুঁজে পাওয়া যাবে না। (there would not be a single idolater among the respectable classes in Bengal thirty years hence.) বাংলার সামাজিক জীবনের গতিধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাঙালি বিদ্বৎসমাজ সম্বন্ধে মেকলের এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবসত্যে পরিণত হয়নি। পৌত্তলিকতা দূরীভূত হওয়া তো দূরের কথা, নানারকমের সামাজিক কুসংস্কার আধুনিক শিক্ষিত বাঙালিরা শেষ পর্যন্ত কতদূর বর্জন করতে পেরেছিলেন এবং আজও পেরেছেন, তাও ভাববার বিষয়'।[৫] (ঘোষ, ২০০৭, পৃ. ১৯৮-৯৯) বস্তুতপক্ষে প্রাবন্ধিক মনে করেন ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু আলোচিত এবং বহু ঘোষিত রেনেসাঁসের প্রকৃত চরিত্র ছিল এই। এই রেনেসাঁসের প্রবক্তাগণ বিপ্লবের পরিবর্তে সংস্কারের আদর্শকেই মনে—প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তদুপরি, দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থান ও ছিল এই নবচেতনা থেকে বহুদূরে।

শ্রী ঘোষের এই সিদ্ধান্ত বাংলা রেনেসাঁসের আলোচকদের অনেকের দ্বারাই সমালোচিত হয়েছে। ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস' নামক গবেষণা গ্রন্থে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে সাধারণ মানুষ ইতালীর রেনেসাঁসের সঙ্গেও সংযুক্ত ছিল না। বরং শ্রী মুখোপাধ্যায় মনে করেছেন—'ইতালীর মতোই স্বল্পকালীন সময়গত দৈর্ঘ্যের মধ্যে বহু অনন্য বহুমুখী ও বৈশ্বিক প্রতিভা এখানে মাথা তোলে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে মেলে সেই সব সিংহহৃদয়, অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ'।[৬] (মুখোপাধ্যায়, ২০০০, পৃ. ৭২) এই প্রসঙ্গে শিবনারায়ণ রায় ও মন্তব্য করেছেন, 'সমাজবিপ্লব বা সর্বোদয় জাতীয় ব্যাপার ইতালীয় রেনেসাঁসে ঘটে নি।সমাজবিপ্লব রেনেসাঁসের না অপরিহার্য অঙ্গ, না আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু বিপ্লব ঘটেনি এই কারণে ইতালীয় রেনেসাঁসের স্বকীয় মূল্য কি হ্রাস পায়'[৭] (রায়, ২০০২, পৃ. ৫৩-৫৪) সুতরাং রেনেসাঁসের সংজ্ঞা ও পরিসর নিয়ে বিভ্রান্তি থাকার দরুন রেনেসাঁস সম্পর্কে তাঁর নেতিবাচক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে উনিশ শতকের বাংলাদেশের আর্থসামিজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে তিনি যে নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

৩. নগর সংস্কৃতি ও তার বিভিন্ন দিক : সংস্কৃতির বিভিন্ন মাত্রা নিয়ে অনুসন্ধিৎসু শ্রী বিনয় ঘোষ নগর জীবনের সাংস্কৃতিক পরিচয় দিয়েছেন তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধে। এখানে তিনি নগর জীবনের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক চরিত্রটি বিশ্লেষণ করেছেন। 'মেট্রোপলিটান মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ' (১৯৭৩) গ্রন্থে এই আলোচনাগুলি সংকলিত হয়েছে। এরই পরিপূরক আলোচনা পাওয়া যাবে 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' (১৯৭৩), 'বাংলার বিদ্বৎ সমাজ' (১৯৭৩), 'অটোমেটিক জীবন ও সমাজ' (১৯৭৮) প্রভৃতি গ্রন্থে। 'মেট্রোপলিটান মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ' গ্রন্থে প্রাবন্ধিক কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতির একটি আনুপূর্বিক পরিচয়

লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গো প্রাবন্ধিক স্বয়ং মন্তব্য করেছেন, লেখকের মন ও চিন্তাধারা ও অনেক প্রশ্নে ও সমস্যারআঘাতে আলোড়িত। যেমন, অ্যালিয়েনেশন বা আত্মবিচ্ছিন্নতা বোধের সমস্যা, যা আমাদের সমাজে ও আজ নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য সমস্যা এবং যার প্রতিক্রিয়ার ধর্মীয় বিকৃতি আজ অতীব বিস্ময়কর। যেমন—মধ্যবিত্তের সমস্যা বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রশ্ন ইত্যাদি। এবং কনজিউমারিজমের সমস্যা, যা সমাজের সুবিস্তৃত দারিদ্র্যের স্তরের উপরে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত ও ধনিকদের ভোগবিলাসের এক পরমাশ্চর্য দৃশ্য। কোনো সমস্যার সমাধান অথবা কোনো প্রশ্নের উত্তর অথবা কোনো সারগর্ভ জ্ঞান দান করার জন্য লেখাগুলি লিখিনি'।[৮] (ঘোষ, ১৯৯৯, পৃ. ২২৯) গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলিতে প্রাবন্ধিকের উপরিউক্ত মন্তব্যের সাক্ষ্য মিলবে। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম হল, 'কলকাতার মন', 'টাকা আর টাকা আর মন', 'অটোমোবিল মন','মেট্রোপলিটান মন', 'মহামৃত্যুর পথে মহানগর', 'স্বনামধন্যদের সমাজ', 'ইয়ং ক্যালকাটা', 'কলকাতার তরুণ মন', 'স্ট্রীট কর্নার গ্যাং', 'হিপি বীটনিক বিদ্রোহ', 'বিপ্লব মহানগর মধ্যবিত্ত মার্কসবাদ', 'বিজ্ঞাপন ও মন', 'কলকাতার সমাজ'। আলোচ্য অংশে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য সূত্রাকারে এইরূপ—

১. কলকাতা নগরীর জন্মের মধ্যেই একটা গ্রাম্যতা ও নাগরিকতার স্বতঃবৈপরীত্য ও ভোগবাদিতার বীজ নিহিত ছিল।
২. নগরীর ক্রমবিকাশে সমাজের সর্বস্তরে প্রাবন্ধিক অর্থ, যশ, প্রতিপত্তির প্রসার দেখেছেন। মানবিকতা সেখানে অবহেলিত।
৩. এর ফল পরিণামে এখানকার তরুণমন লাঞ্ছিত। তাদের ক্ষোভ শেষপর্যন্ত পরিণতি পাচ্ছে বিপথগামিতায়।
৪. বিশ্বব্যাপী মার্কসীয় চেতনায়ও তিনি উত্তরণের দিশা খুঁজে পাচ্ছেন না। বরং তৃতীয় বিশ্বের নবোত্থিত বিপ্লববাদী চেতনা সম্পর্কে তিনি আশাবাদী।
৫. বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে মার্কসবাদ যেন এক সচ্ছন্দ জীবিকা হয়ে উঠেছে।
৬. নতুনের গড়নের জন্য নতুন করে সমাজ নির্মাণ প্রয়োজন বলে প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্ত করেছেন।

পঞ্চাশ বছর আগের লেখা হলেও নগর সংস্কৃতি প্রসঙ্গো প্রবন্ধগুলি আজো গুরুত্ব হারায় নি। বিশ শতকের ছয়-সাত দশকের এই লেখাগুলিতে তিনি নগর কলকাতার যে চরিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তা একধরনের নৈরাশ্যের জন্ম দেয়। আমাদের মনে রাখতে হবে উনিশ শতকীয় রেনেসাঁস নগর কলকাতায় এক নতুন আশাবাদ ও মানবিকতাবোধের প্রত্যয়কে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। প্রাবন্ধিক বিশ শতকের কলকাতায় যেন তার উত্তরাধিকার খুঁজে পাচ্ছেন না। এই উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রাবন্ধিককে যেন এখানে তাড়িত করেছে।

৪. বাংলার লোকসংস্কৃতির পরিচয় : বাংলার লোকসংস্কৃতি বিষয়ে শ্রী বিনয় ঘোষের আলোচনাগুলি 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' (১৯৭৯), 'পশ্চিমবঙ্গোর সংস্কৃতি' ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ (যথাক্রমে—১৯৫৭, ১৯৭৮, ১৯৮০, ১৯৮৬) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। এইসব গ্রন্থে তিনি পশ্চিমবঙ্গোর লোকশিল্প, লোকধর্ম এবং বিভিন্ন জেলার লোকসাংস্কৃতিক পরিচয় লিপিবন্ধ করেছেন। আলোচ্য প্রসঙ্গো প্রাবন্ধিকের বক্তব্য সূত্রাকারে নিম্নরূপ—

১. আমাদের লোক সংস্কৃতি ধারায় লোকসংস্কৃতি সাধারণভাবে শিস্টজনের দ্বারা উপেক্ষিত।
২. রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ তাঁরা বাংলার নিহিত সম্পদের মর্ম বুঝেছিলেন এবং তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তাও আরম্ভ করেন।
৩. বাংলার বিভিন্ন লোকশিল্প, ডোকরাশিল্প, মৃৎশিল্প, পটশিল্প প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে

গিয়ে তিনি লোকশিল্পের ক্ষীয়মান অবস্থাটি লক্ষ করেছেন। শুধু লোকশিল্প নয়, লোকশিল্পীদের অবজ্ঞাত সামাজিক অবস্থার কথাও তিনি প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছেন। আর্থিক অনিশ্চয়তাও সামাজিক উপেক্ষা লোকশিল্পী সমাজকে তাদের কৌমশিল্প বিষয়ে অনাগ্রহী করে তুলেছে।

৪. কেন্দ্রীয় তথা নাগরিক সংস্কৃতির বিকাশের কালে গ্রাম বাংলার লোকসাংস্কৃতিক উপাদান বিনষ্টির সম্মুখীন হচ্ছে। অল্প কিছুদিন পরে তা হয়তো বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাবে। এই ভাবনা থেকেই তিনি 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'-তে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলার ক্ষেত্র সমীক্ষা করে সেখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের একটা তালিকা প্রস্তুত করেছেন। আবার শুধু তালিকাই নয়, বাংলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক উপাদানের সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণে তার স্বরূপ কীভাবে ফুটে উঠেছে তাও নিরূপণ করেছেন। বৌদ্ধ, জৈন, নাথ ধর্মভাবনা কীভাবে আমাদের হিন্দু ধর্মের স্বাঙ্গীকৃত হয়ে গেছে বিভিন্ন দেব-দেবীর সমীক্ষায় তাও জানা গেছে।

লোকসংস্কৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর কাজের পরিসর ও গভীরতা উভয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্প সংস্কৃতিকে নিছক নান্দনিকতার রঙিন মোড়কে না দেখে তার নিহিত সমাজ ও সমাজতত্ত্বকে খুঁজে বার করা এবং এত ব্যাপ্ত পরিসরে তাকে অনুধাবন করা শ্রী ঘোষের কাজকে একটি স্বতন্ত্র মূল্য দিয়েছে।

সামগ্রিক বিচারে বিনয় ঘোষ বলতে আমরা এক প্রজ্ঞাবান মানবদরদীকেই বুঝি সংস্কৃতি চর্চা যাঁর কাছে নিছক বিদ্যায়তনিক কোনো বিষয় হয়ে থাকে নি হয়েছিল স্বদেশ ও স্বজাতিকে অনুধাবন করবার ও করাবার অনিবার্য উপায়। তাঁর আলোচনাগুলি অনুসরণ করে আমরা বঙ্গ সংস্কৃতিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে বীক্ষণ করবার সুযোগ পাই। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে সাহিত্য স্রষ্টা এবং সহৃদয় সামাজিক উভয়েরই অবস্থান নির্দিষ্ট সময়পর্বে ও নির্দিষ্ট সমাজের প্রেক্ষাপটে। বাংলা সাহিত্যের জন্মকাল থেকে অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও রূপান্তরের সম্ভাব্যতা ও অনিবার্যতাকে বুঝতে গেলেও সংস্কৃতি বীক্ষা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। বিনয় ঘোষের রচনাগুলিকে বিচ্ছিন্ন রচনারূপে বিবেচনা না করে সেই ORGANIC WHOLE-এর মধ্যে স্থাপন করে বিবেচনা করলে রচনাগুলির সঠিক মূল্য নির্ধারিত হতে পারবে।

উৎসের সন্ধানে

১. বিনয় ঘোষ : 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব', ৩য় মুদ্রণ১৪০৬, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা
২. তদেব
৩. তদেব
৪. তদেব
৫. বিনয় ঘোষ : 'বাংলার নবজাগৃতি', ১৯৭৯, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা
৬. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় : 'ইতালীর রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস', প্রথম প্রকাশ ২০০০, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৭. শিবনারায়ণ রায় : 'প্রবন্ধ : বাংলার রেনেসাঁস জিজ্ঞাসা' মূল গ্রন্থ, বাংলার রেনেসাঁস, সম্পাদনা শিবনারায়ণ রায়, প্রথম প্রকাশ ২০০২, রেনেসাঁ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা
৮. বিনয় ঘোষ : 'মেট্রোপলিটান মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ', পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৯, প্রথম মুদ্রণ ১৯৭৩, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা

আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার রাভা জনজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর

উত্তম সরকার

প্রথম দিকে রাভা জনজাতির বসবাসের ঘর বাড়িগুলি মূলত শন এবং বাঁশের তৈরি ছিল। ঘরগুলি মূলত বারান্দা, মেঝে এবং রান্নার স্থান এই ভাবে বিভক্ত থাকত। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত ঘর আর নেই। বর্তমান সময়ের নিরিখে আধুনিক ও রুচিশীল বাড়ি তৈরি হচ্ছে, যেমন—টিন ও পাকা ঘরবাড়ি। বর্তমানে বনবিভাগের উদ্যোগে পরিবার প্রতি কাঠের ঘর অথবা পাকা বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে, এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগেও তারা এই সমস্ত বাড়ি তৈরি করছে। অর্থাৎ নগরসভ্যতার প্রভাবে রাভারাও প্রভাবিত হচ্ছে।

রাভা জনজাতি মূলত মাতৃতান্ত্রিক। রাভা সমাজে মাতৃ প্রাধান্যের রীতি প্রচলন আছে। মাতৃ নাম অনুযায়ী ছেলে মেয়েদের গোত্র নাম পরিচয় হয়। বাবার নামে গোত্র পরিচয় হওয়ার রীতি নেই। এমনকী বিয়ের পরেও মেয়েদের গোত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাদের গোত্রের প্রতীক—পশু পাখি, উদ্ভিদ, আকরিক ধাতু, জলজ প্রাণী দ্বারা চিহ্নিত। যেমন—সরদিনাং গোত্রের প্রতীক লৌহ, গমরেই গোত্রের প্রতীক কচ্ছপ, চিনচেত গোত্রের প্রতীক আদা ইত্যাদি। এদের বেশ কিছু গোত্র সরু বা বন্ধু নামে পরিচিত। যেমন—কানসেপ সরউ, কয়সরু, সরুপঞ্জাক, চিরাক চিসাক সরু। রাভা ভাষায় গোত্রকে বলা হয় হসুক। এই হসুক বা গোত্র অন্য পিতৃতান্ত্রিক আদিবাসীদের থেকে একেবারেই পৃথক।

রাভা সমাজে গোত্রান্তর্গত বিবাহ নিষিদ্ধ। রাভা সমাজে ছোটো কন্যাকে তার মামার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হতো কারণ মামার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে মাতৃ সম্পত্তিকে নিজের গৃহে রাখা হত। তবে এই ধারণা এখন আর প্রায় প্রচলিত নেই বললেই চলে। রাভা সমাজে ঘর জামাই প্রবণতা ছিল, এই প্রথাকে কিলাংপাঙি প্রথা বলে রাভা সমাজে বিধবা বিবাহ প্রথা রয়েছে, বাইরল্লং বলে।

এছাড়া পিসি, কাকার পুত্র বা কন্যার সাথে বিবাহ রীতি প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। এদের সমাজে ঘরজামাই প্রথায় কনের বাবা বরের বাবাকে এক বছর ধরে খাবার দাবার যোগানোর প্রথা ছিল, যাকে মায়াকায়াম প্রথা বলে। তবে বর্তমানে রাভা ছেলে মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। ফলে তাদের সমাজ ব্যাবস্থায় প্রভূত পরিবর্তন এসেছে।

রাভা জনজাতির জীবিকা মূলত কৃষি নির্ভর। প্রথম থেকে তারা প্রধানত ঝুম চাষ করতেন, পরবর্তিতে বনবিভাগের দেয় জমিতে তারা চাষাবাদ করতেন। কেউ আবার অন্যের জমিতে ভাগ চাষ করতেন। রাভা সমাজের একটি অংশ বনদপ্তরের নিয়োজিত শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া বস্ত্র বয়ন শিল্পও তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম মাধ্যম। অধিকাংশ রাভা রমণীরা বয়ন শিল্পের উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। এছাড়া বাঁশের তৈরি নানা প্রকার আকর্ষণীয় গৃহস্থলির জিনিস তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এছাড়া বর্গা অপারেশনের মাধ্যমে ভুমিহীন রাভারা খাস জমির পাট্টা পেয়েছেন। তবে বর্তমানে রাভা যুবক যুবতীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটায় বর্তমানে তারা সরকারি চাকুরি এবং শিক্ষকতার কাজেও নিযুক্ত হয়েছেন। অনেকে আবার পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবেও অন্যত্র কাজে নিযুক্ত হচ্ছেন।

রাভা সম্প্রদায় মূলত প্রকৃতি পূজায় বিশ্বাসী। প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিস প্রধানত নদী গাছ পাথর প্রভৃতিতে দেবত্ব আরোপ করে। এরা নিরাকার দেবদেবীর পূজার্চনা করে থাকেন। এদের প্রধান দেবতা মূলত ঋষি। রাভা সমাজ মূলত গৃহের দেবী হিসেবে রন্তক এর পূজা করেন। এই দেবীর অধিষ্ঠান মূলত ঘরের শস্য মাচা। রন্তক দেবীর প্রতীক হিসেবে একটি মাটির হাড়িতে চাল দিয়ে ভর্তি করে তাতে সিন্দুর দিয়ে একটি ডিমকে রাঙ্গানো হয়। রাভা রমণীরা এই পূজা করে থাকেন। তবে বিশেষ পূজা বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিয়ে অন্নপ্রাশন নবান্নের সময়ও এরা এই পূজা করে থাকেন। তাছাড়া গৃহ মঙ্গলের জন্য, শিশু ও মায়ের মঙ্গালের জন্য, শিশুদের জ্বরজারি হলেও বিভিন্ন দেবতার পূজা প্রচলিত রয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালে তারা প্রতিবেশী অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রভাবে বিশেষত হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। মূলত দুর্গা পূজা, কালি পূজা, গনেশ পূজা, শিব পূজা, সরস্বতী পূজার মতো উৎসব পালন করে। এভাবে রাভাদের ধর্ম একটি মিশ্র ধর্মে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

রাভাগণ মূলত আমিষ ভোজী। এদের প্রধান খাদ্য ভাত। আমিষের মাছ প্রধান হলেও এরা হাঁস মুরগি শুয়োর ছাগলের মাংস খেয়ে থাকেন। অতীতকালে ভেড়ার মাংসের প্রয়োজনে শিকার করতে যেতেন। কিন্তু বর্তমানে বন্য পশু শিকার আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হওয়ায় তারা বাড়িতেই পশুপালন করে তা দিয়ে বাসনা নিবৃত্ত করে থাকেন। রাভাদের খাদ্য তালিকায় মূলত চকত (rice beer) প্রধান মাদক হিসেবে ব্যাবহৃত হয়। তাদের সমাজে এই চকত পানীয়ের সাথে সাথে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও আবশ্যক হিসেবে বিবেচিত হয়।

উত্তরবঙ্গের উক্ত দুই জেলার রাভা জনজাতি তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত পোশাক তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ। রাভা রমণীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হল লাইফুন, কামুং, রাভা রমণীরা 'কন্তং'নামক ক্ষুদ্র তাঁতে অপূর্ব কৌশলে তাদের ঊর্ধাঙ্গ এবং নিম্নাঙ্গের আবরণ তৈরি করে। রাভা মেয়েরা কাঁধের উপর আড়াআড়িভাবে কোমর পর্যন্ত এক খণ্ড বস্ত্র জড়িয়ে নেয়, যার নাম হল ফাকচেক। রাভা পুরুষরা মূলত গামছা, মার্কিনের টুকরো ও খাটো ধুতি তাদের পোশাক হিসেবে ব্যবহার করে। সেই

সঙ্গে কাঁধে রাখত রঙিন চাদর বা চৌখুপি। তবে সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে এবং নগরায়নের প্রভাবে পুরুষরা প্যান্ট, শার্ট, পাজামা, পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ, চুড়িদার ইত্যাদি আধুনিক বস্ত্র পরিধান করে। রাভা সম্প্রদায়ের মহিলারা যথেষ্ট পরিমাণে অলংকার পরিধান করে থাকেন। তাঁরা সোনা রুপোর নানা ধরনের অলংকার পড়তে ভালোবাসেন। তাঁদের অলংকারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—কানে সোনার 'মৌতিংকল' নাকে 'নুকুংপার', পায়ে 'চাকামচসুর', গলায় চন্দ্রহার, মাথায় 'খুচমক্রং'পড়েন। অনেকে ঠ্যাংখাবুও পড়েন। এছাড়াও রয়েছে হাসুক, সুখী মালা, রৌংটা ইত্যাদি।

দেশের অন্যান্য জনজাতির মতো রাভা সম্প্রদায়ের জীবনেও নৃত্য এবং সংগীত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের অতীত ঐতিহ্য, জীবন সংগ্রাম, আনন্দ-প্রেম-বিরহ-মিলনের বিচিত্র চিত্র নাচ ও গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার্চনা, বিবাহ,মৃতদেহ সৎকার শ্রাধ্যানুষ্ঠান, ঋতু উৎসব প্রভৃতিতে রাভা মেয়েরা নাচ ও গানে অংশগ্রহণ করে থাকে। রাভা নাচগুলি ক্ষেত্র বিশেষে আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। যেমন—'নাক চেংবেনি' হল চিংড়ি মাছ ধরার নৃত্য। মৃতদেহ সৎকার বা শ্রাধ্যানুষ্ঠানের নাচকে বলা হয়— মৈরবার চাঙ্গি, কালি পূজা উপলক্ষ্যে নাচকে বলা হয়—মাকপর বসিনি বা ভালুক নাচ। এছাড়া 'হান্ডাবারু' হল যুদ্ধের নৃত্যের নাম। রাভা নাচকে বলা হয়—'বসিনি'। রাভা সংগীতকে বলা হয় 'চা-অ'। তাদের সংগীতের কথাগুলি মুখে মুখে প্রচলিত। তাদের এই সংগীতের সঙ্গে যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'ঢোল হ্যাম' যা কাঠ থেকে তৈরি, 'ডাংসী' যা বাঁশ দিয়ে তৈরি, নল খাগড়ার 'কালবংশী', 'দবদি'—যা পিতলের ঘটি,বাঁশের চটা থেকে তৈরি 'গোমান' ইত্যাদি। রাভা রচিত একটি গান হল—

লাম লৌজংতাম রমচি সবক সরক
আনায় বৌজু চকত ছাকায় ভঙ হলদি আমরক। (রাভা)
পথ চলতে গিয়ে ঘামে ভিজল আমার অঙ্গ।
শালিকা দিল হলদে চকত মদ খেয়ে হল রঙ্গ। (রূপান্তর)

তবে বর্তমানে রাভাদের এই সমস্ত ঐতিহ্যগত নাচ গানের সঙ্গে সঙ্গে তারা আধুনিক বাংলা এবং হিন্দি গানের প্রতি আকৃস্ট হচ্ছে এবং অত্যাধুনিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যে-কোনো ব্যক্তি এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নতি, উন্নত জীবনযাত্রার জন্য শিক্ষা আবশ্যক। রাভা সম্প্রদায় বনবাসী এবং এরা শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়, তবু বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা এই সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নতির জন্য খুবই আশাপ্রদ। রাভা সম্প্রদায়ের মধ্যে বয়স্ক লোকদের তুলনায় অল্প বয়সীরা বেশি শিক্ষিত। দেখা যায় ২০-৩০ বছর বয়সীদের মধ্যে শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি। কারণ এই বয়সের মধ্যে এরা এদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে। যদি ধাপে ধাপে বয়সের পর্যায়ক্রম বিচার করা যায়, তবে দেখা যায় বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার হার সবচেয়ে কম। তবে বর্তমানে রাভা উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা তাদের সম্প্রদায়ের উন্নতি করছে এবং এর ফলে অল্প বয়সীরা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে (কসেমি ও মোক্তন, ২০২০)। রাভা মূলত ভারতের চীন-তিব্বতীয় ভাষা পরিবারের ভাষা। রাভা জনগোষ্ঠীর লোকেরা এই ভাষা ব্যবহার করে। এই ভাষার সঙ্গে বড়ো

ভাষার যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে বর্তমানে রাভা ভাষায় কথাবলার লোকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এর কারণ রাভা সম্প্রদায়ের মানুষেরা একাধিক ভাষায় কথা বলে। মূলত আধুনিকতা ও বিশ্বায়ন এর অন্যতম কারণ। এর একটা ভালো দিক হল—এর ফলে এরা অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশছে এবং অন্য ভাষা শিখছে। আবার রাভা ভাষায় কম কথা বলে অন্য ভাষায় বেশি কথা বলার ফলে রাভা ভাষা অবলুপ্তির পথে। রাভা ভাষার তিনটি উপভাষা আছে। সেগুলি হল—রংদানিয়া, মাইতুরী এবং চঙ্গা বা কোচা। রাভা ভাষার নিজস্ব লিপি নেই। এই ভাষা লিখতে অসমীয়া লিপি এবং বাংলা লিপি ব্যাবহার করা হয় (কসেমি ও মোক্তন, ২০২০)।

আলোচ্য জেলায় রাভা উপজাতিরা সংখ্যায় কম হলেও তাদের ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম, সংগীত, নাচ, বাদ্যযন্ত্র, পোশাক, খাদ্যাভাস, সামাজিক রীতি-নীতি, পেশা ইত্যাদির একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ছিল। তবে মিশ্র সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বসবাস করার ফলে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যে প্রভাব পড়েছে। এর ফলে তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন এসেছে। তাদের ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্যগত স্বতন্ত্রতা হারিয়েছে। বর্তমানে তাদের গ্রামে সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ফলে তারা উচ্চতর শিক্ষার সংস্পর্শে এসেছেন। আশা করা যায়, দূর ভবিষ্যতে তারা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবেন এবং উন্নত জীবন যাত্রা অতিবাহিত করবেন।

তথ্যের সন্ধানে

১. বিমলেন্দু মজুমদার : 'রাভা জনজীবন ও লোককাহিনি'
২. রতন বিশ্বাস সম্পাদিত : 'উত্তরবঙ্গের জাতি ও জনজাতি'
৩. সুধাংশু কুমার সরকার সম্পাদিত : "চতুর্থবার্তা", 'আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি সংখ্যা'
৪. মহেন্দ্র দেবনাথ : 'উত্তরবঙ্গের প্রান্তভূমির জনজাতি ইতিহাস ও সংস্কৃতি'
৫. বিমলেন্দু মজুমদার : 'উত্তরবঙ্গের আদিবাসী'
৬. উপেন রাভা হাকাছাম : 'রাভা লোক-সংস্কৃতি'
৭. আনন্দ গোপাল ঘোষ : 'মধুপর্ণী' জলপাইগুড়ি বিশেষ সংখ্যা
৮. A Mitra : 'West Bengal Dist. Hand Book', Jalpaiguri, Govt. of West Bengal, 1953

নগর সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে কলকাতার উদ্ভব এবং তার অন্ধকার

দেবলীনা সেন

কলকাতা নামটি শুনলেই প্রথমে যে ছবি মাথায় আসে—ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজধানী, প্রাচ্যের প্যারি, বিবিধ জাতি-ধর্ম-বর্ণের মিলনক্ষেত্র, বাঙালির অহংকার, নব সভ্যতার জন্ম পীঠ, প্রাসাদকীর্ণ কালকাতা! কিন্তু এই প্রদীপের তলায় অন্ধকার থাকাটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। তাই হয়তো হরিহর শেঠের 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়'-এ শোনা যায় এমন কথা—'জাল, জুয়াচুরি মিথ্যে কথা/এই তিন নিয়ে কলকাতা' কিম্বা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'স্বাগত' কবিতায় বলেন—'এই কলিকাতা ব্যাঘ্র-বাহিনী ছিল এ একদা বাঘের বাসা,/বাঘের মতন মানুষ যাহারা তাহাদেরি ছিল যাওয়া ও আসা!' স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন এসে যায় কেন এই বৈপরীত্য? এর একটা কারণ হিসেবে হয়তো বলা যায় কলোনিয়াল কলকাতায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমন কিছু পলিসি গ্রহণ করেছিল, এমন এক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা তৈরি করেছিল, এমন একটা সোস্যাল হায়ারার্কি, ক্ষমতা, 'ডিসএমপাওয়ারমেন্ট' এর জাল তৈরি করেছিল, যার অনিবার্য ফলস্বরূপ নগর কলকাতা জন্ম দিল এমন সমস্ত অপরাধের যা প্রিকলোনিয়াল বাংলায় দেখতে পাওয়া যায়নি। এবং সেই অপরাধের পরিমাণ ও বীভৎসতা এত মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল, যে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়েছিল ব্যবস্থা নিতে, যার প্রত্যক্ষ ফল আজকের ভারতবর্ষের থানাকেন্দ্রিক পুলিশ ব্যবস্থা। ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে উনিশ শতকের তিন এর দশক থেকেই পুলিশ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে বাইশ নং পুলিশ কোড জারি করলেন, যা ছিল বর্তমান থানা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থার ভিত্তি। একদিকে কলকাতা ভূষিত হল 'সিটি অফ প্যালেস', 'সিটি অফ জয়' এর শিরোপায়, বিপরীতে আখ্যা পেল 'সিটি অফ ড্রেডফুল নাইট' এর। এই অবস্থাকে বুঝতে গেলে খুব সংক্ষিপ্ত ঝলকে একবার

দেখে নেওয়া যাক ব্রিটিশের হাতে কীভাবে তৈরি হল নগর কলকাতা। টমাস রো জাহাঙ্গীরের থেকে অনুমতি আদায় করলেন বাংলা ও বিহারে ব্যবসা চালানোর ও কুঠি বানানোর। শাহজাহান এর সময়ে ইংরেজরা আদায় করে বিণা শুল্কে বাংলা ও বিহারে বাণিজ্য করার অধিকার। এরপর সম্রাট ঔরঙ্গজেবের হুকুমে বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজদের ব্যবসা করার অনুমতি দিলেন সুতানুটিতে। লালদীঘি পাড়ায় তৈরি হল ইংরেজের প্রথম দুর্গ ফোর্টউইলিয়াম। লালদীঘির পশ্চিমপাড়ের জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে মাত্র তেরোশ টাকার বিনিময়ে ইংরেজরা কিনে নিল তিনটি গ্রাম-সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা। বাগবাজারের খাল থেকে বড়বাজারের টাঁকশাল পর্যন্ত ছিল সুতানুটির সীমা, কাস্টমস অব্দি কলকাতা, কলকাতার দক্ষিণে এখনকার ভবানীপুর পর্যন্ত গোবিন্দপুর। ১৭০৯ এ তৈরি হল ইংরেজের প্রথম গীর্জা সেন্ট অ্যান। এই বছরের লালদীঘিকে বাড়ানো হচ্ছে কেটেকুটে। কেল্লার উত্তর দিকে আজকের যেটি ক্লাইভ স্ট্রিট, সেখানে তৈরি হল 'হোয়াইট টাউন' অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রভুর পাড়া। ইংরেজের ভাষায় আরও একটা টাউন ওপাশে (মূলত আজকের কলকাতার উত্তরদিকে) গড়ে উঠছে, যার নাম 'নেটিভ টাউন'। এভাবেই তৈরি হচ্ছিল নগর কলকাতা।

নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার অপরাধজগৎ এ দেখা যাচ্ছিল নানা বৈচিত্র্য। কলকাতার এই অপরাধজগতের বাসিন্দারা যা কেবল দারিদ্র্যের কারণে, অভাব অনটনে পড়ে বাঁকা পথ নিয়েছিল এমন নয়, বরং দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ কর্মকর্তা, বাঙালি প্রিভিলেজড ক্লাস, ব্রিটিশ পলিসি মেকারেরা এমন সব অপরাধ করছেন, যাকে আধুনিক সময়ের করপোরেট ক্রাইম বা হোয়াইট কলার ক্রাইম এর সূচনা বলা চলে, যাকে তুলনা করা যায় আজকের দিনের রাজনৈতিক নেতা, বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের অপরাধের সঙ্গে। এই সব অপরাধের কারণ ছিল মূলত অর্থলোভ বা 'মানিমেকিং'। রবার্ট ক্লাইভ জালিয়াতি এবং উৎকোচ নেওয়াতে ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। বিচারে দেখা গিয়েছিল ক্লাইভের উৎকোচের পরিমাণ ছিল ২,১১,৫০০ পাউন্ড। ওদিকে ওয়ারেন হেস্টিংস, এডমণ্ড বার্ক যার সম্পর্কে বলেছিলেন, "He is robber. He steals, he filches, he plunders, he oppresses, he extorts."[১] হেস্টিংস এর সম্পর্কে মূল অভিযোগ ছিল, তিনি ১৭৭২ সালে গর্ভনর থাকাকালীন গুরুদাস নামক এক ব্যক্তির থেকে ১,০৪,১০৫ টাকা ঘুষ নেন তাকে দেওয়ান পদ পাইয়ে দেওয়ার জন্য এবং মীরজাফরের স্ত্রী মুন্নিবেগমের থেকে ২,৫০,০০০ টাকা নেন তাকে নাবালক নবাবের অভিভাবিকা করার জন্যে। নন্দকুমার এই অভিযোগ আনলে হেস্টিংস তার বন্ধু সেসময়ের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পের (ইনি 'Justice Pulbandi' নামে পরিচিত) সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নন্দকুমারকে ফাঁসিতে ঝোলালেন। সত্য চাপা দেওয়ার জন্য হেস্টিংস তার তিন কাউন্সেলার John Clavering, George Monson, Philip প্রত্যেককে জাজার পাউন্ড উৎকোচ দেন। এবং ক্লাইভ থেকে হেস্টিংস, ইম্পে কাউকেই কিন্তু দোষী সাব্যস্ত করা যায়নি ব্রিটিশ আদালতে। দেশীয় বণিক, দালাল, গোমস্তাদের কাছ থেকে কারণে অকারণে উৎকোচ নিতেন এই দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা এবং তা আসতো দরিদ্র তাঁতী, কর্মকার এবং উৎপাদক শ্রেণি এককথায় পরিশ্রমজীবীর কাছ থেকেই। এইজন্যই বোধহয় বলা হয় নগর কলকাতায় অপরাধের দ্বার উদ্ঘাটন করেছিল ইংরেজশাসক, বিচারপতিরা, বাঙালি বড়োলোকেরা। অন্যদিকে একবার বাঙালি ভদ্রলোকের দিকে যদি তাকানো যায়, ১৭০৫ এ নন্দরাম সেন 'ব্ল্যাক ডেপুটি' পদে উত্তীর্ণ হয়েই

তহবিল তছরূপ করলেন। এর পরের ডেপুটি জগৎ দাসও অনুসরণ করলেন অগ্রজের পদাঙ্ক। কিন্তু এখানে যার নাম না করলেই চলে না তিনি ১৭২০-র ডেপুটি জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র। তিনি তার পাইক, নায়েবদের দিয়ে সাধারণ মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে টাকা শুষে নিতেন রেভিনিউ এর নাম করে। তিনি পরিচিত হয়েছিলেন 'ব্ল্যাক জমিনদার' নামে। চল্লিশ টাকা বেতনে কাজে ঢুকে লাভ করলেন রাজৈশ্বর্য। এদিকে আঠেরো উনিশ শতকে কলকাতা শহরে যে মুৎসুদ্দি বা বেণিয়া শ্রেণির দেখা মিলছিল, মহাজনীব্যবসা ও বাণিজ্যের মাধ্যমে যাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল মুদ্রা তা যে অসৎ রাস্তাতেই হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে 'হুঁতোম প্যাঁচার নকশা', 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর পাতায়। কলকাতার অধিকাংশ বনেদি সেদিন বনেদি হতে পেরেছিল ঠকচাচার জীবনদর্শনকেই মেনে 'দুনিয়া সাঁচ্চা নয়-মুই সাঁচ্চা হয়ে কি করব?'[২] এই তো গেল একদিকের ছবি। এবার একটু বিপরীত ছবি দেখে নেওয়া যাক।

ব্রিটিশ শাসিত বাংলার গ্রামগুলিতে জমির খাজনা এত অসম্ভব পরিমাণে বাড়তে থাকল যে অসংখ্য মানুষ নিজেকে, নিজের পরিবারকে বাঁচাতে চলে আসছে কলকাতা শহরে জীবিকার সন্ধানে এবং এরা সবাই যে কর্মসংস্থান করে উঠতে পারল এমন নয়। কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি যখন ধ্বংসের মুখে অনেক গ্রামীণ মানুষই ভেবেছিল গ্রামে পড়ে থেকে আর জীবিকা নির্বাহ সম্ভব নয়, কলকাতা নগরী তার জৌলুসে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছিল তাদের। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এখানে আসে জীবনধারণের ন্যূনতম উপকরণ সংগ্রহ করতে পারল না। এই ব্যর্থতা তাদের অনেককে নিয়ে গেল অপরাধের পথে। অন্যদিকে ইংরেজরা যখন ৩টে গ্রাম নিয়ে নগর কলকাতা তৈরি করছে, 'Urbanisation'-এর ফলে ওই অঞ্চলের পুরোনো বাসিন্দারা অনেকেই শেকড়চ্যুত হচ্ছে, ১৭৫৭ সালে কোম্পানি যখন ফোর্ট পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নিল, তখন গোবিন্দপুর গ্রামটিকে আবার ঢেলে সাজাতে গিয়ে দেশীয় মানুষদের ভাগ্যেই বিপর্যয় ঘনিয়ে এল, কৃষিজমি বিনষ্ট হল, অনেক মানুষ পেশা হারাল, ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে বস্তি—

> This process of clearing the agricultural areas of the old three villages to turn them into a city to house by the end of the century, the rural acreage of the three villages had shrunk by almost half from 2,525 acres in 1756 to 1,283 in 1794.[৩]

এই পেশাহারা মানুষদের অনেকে 'হোয়াইট টাউনে' ব্রিটিশদের বাড়িতে কিম্বা ব্ল্যাক টাউনে বাঙালি বনেদীর গৃহে নিযুক্ত হল ভৃত্যরূপে, আর অনেককেই আকৃষ্ট করল কলকাতার 'আন্ডারওয়ার্ল্ড'। ১৭৭৮ এর কোলকাতা পুলিশের চার্জশিটে দেখা গেল ১০টি কেস লিপিবদ্ধ হয়েছে, যেখানে ইউরোপীয় বাড়িতে ভারতীয় ভৃত্যরা চুরি ডাকাতি চালিয়েছে। এই সময়ে কোলকাতা শহরে ডাকাতির পরিমাণ এত বেড়ে যায় যে ১৮৫২ তে সরকার বাধ্য হয় ডাকাতি দমন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু এই ডাকাতির চরিত্র এবং গ্রাম বাংলার ডাকাতির স্বরূপ একেবারেই ভিন্ন। এরা কেউই রঘু ডাকাত বা বিশে ডাকাত নয়। এদের মূল টার্গেট ছিল ধনী বাঙালি, ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং পদস্থ কর্মচারীরা। আঠেরো শতকের কিছু সাড়া ফেলে দেওয়া ডাকাতির মধ্যে রয়ে গেছে কলুটোলার ধনী চৈতন্য দত্তের বাড়ির ডাকাতি, ভবানীপুরের সামরিক অফিসার লেফটেন্যান্ট মার্শারের বাড়ির ডাকাতি ইত্যাদি। একদিকে কলকাতার ধনীদের অপরিসীম বিলাসিতা, আড়ম্বর, ঐশ্বর্য, বিপরীতে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এই বৈষম্য এ হেন অপরাধের জন্ম দেবে এতে অস্বাভাবিকতা নেই। এই ডাকাতদলের সদস্যরা সকলেই বাঙালি ছিল এমনটা নয়, ছিল ভারতের নানা প্রান্তের

এমনকী ইউরোপের নানা দেশের মানুষ। আসলে কলকাতার সোনার খনির সন্ধানে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেদিন ছুটে এসেছিল প্রচুর মানুষ, কিন্তু এলডোরেডোর সন্ধান পায়নি অধিকাংশেই, বরং বেড়ে উঠছিল সিটির আন্ডারওয়ার্ল। কলোনিয়াল কলকাতার একদিকে ভদ্রলোকের অপরাধ, বিপরীতে ক্রাইমের উদ্ভব ঘটছিল বস্তিঅঞ্চল, মদের দোকান, জুয়ার আড্ডা, বেশ্যাবাড়ি থেকে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতা শহরে বহুল পরিমাণে কৃত্রিম মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়, যার ফলস্বরূপ ব্রিটিশসরকারকে অপরিসীম ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাবে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের কৃত্রিম মুদ্রা নামক গল্পের শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক অসম্ভব ধুরন্ধর বুদ্ধিমান কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুতকারীকে। উনিশ শতকের কোলকাতাতে স্বাক্ষর, হস্তাক্ষর, জমির দলিল, কোম্পানির কাগজ, সরকারি নথিপত্র জাল করা কি ভয়ংকর পরিণামে বেড়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ মেলে হুতোমের নকশায় বা বাঁকাউল্লার দপ্তর এর নবীন নবেসেন্ধা গল্পে। নগর কোলকাতায় বেড়ে গিয়েছিল পকেটমারি। এই ধরনের অপরাধে অনেক সময় নিযুক্ত থাকত কিশোর সমস্ত ছেলে। যেখানে নতুন শহরের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে দিশা জোগানোর কথা ছিল, সেখানে জুভেনাইল ক্রাইম এর উদ্ভব ঘটছে নগর কোলকাতার হাত ধরে। কলোনিয়াল কোলকাতায় দেখা মেলে মহিলা অপরাধীরও। যদিও তাদের গোত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে তারা অধিকাংশই পতিতা। সে সময়ের কোলকাতা, যেখানে প্রায় ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে বেশ্যাপাড়া, তা যে নগরায়নের থেকেই একটি প্রাপ্তি তা বলা বোধহয় ভুল হবে না। গহনা ও সম্পদের লোভে যে সে কালে খুন হতে হয়েছে বেশ্যাদের, কিম্বা অনেকসময় বাবুরা যে তার পোষ্য রক্ষিতার 'দ্বিচারিতা' দেখে ঈর্ষাকাতর হয়ে খুন করেছে তাদের তার সন্ধান মেলে দারোগার দপ্তর এর পাতায় পাতায়। আবার গণিকাকেও দেখা গেছে খুনীর ভূমিকায়। এ প্রসঙ্গে হয়ত মনে পড়ে যাবে ত্রৈলোক্যের কথা। কিন্তু ত্রৈলোক্যকে এ হেন নৃশংস কাজ করতে বাধ্য করেছিল কে সবসময় খুন না হলেও জুয়াচুরি, জাল ব্যবসাতেও অনেকক্ষেত্রে নিযুক্ত হত এই শ্রেণীর মেয়েরা।

১৮০০ এর ৩১ শে জানুয়ারী জাস্টিস অফ পিসের একটি রিপোর্ট থেকে সে সময়ের কোলকাতায় আট ধরনের অপরাধীর দেখা মিলছে। প্রতারণা, জালিয়াতি, জোচ্চুরিতে ভরে যাচ্ছে শহর। এই অপরাধীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে তার পেছনে রয়ে গেছে নগর কোলকাতার বিকাশ। নাগরিক জটিল মনস্তত্ত্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ করেছে বিচ্ছিন্ন, একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার লড়াইতে তারা হয়েছে মত্ত। নগর মানুষগুলিকে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর করে তুলছিল। ব্যক্তিগতসুখ, লাগামছাড়া অর্থপিপাসা, হতাশা, হিংসা, ঈর্ষার কোপে ঘটে চলছিল একের পর এক অপরাধ। খুনের মত অপরাধ গ্রহণ করছিল ব্যক্তিগত অপরাধের চরিত্র হিসেবে। এর পেছনে অনিবার্য কারণ হিসেবে রয়ে গেছে নতুন উদ্ভূত নগর কোলকাতার আর্থসামাজিক বৈষম্য। বাঁকাউল্লার ভাষা ধার করে বলা যেতে পারে 'সে বড় বিষম কাল।'[৪] ব্রিটিশ সরকারের পরিস্থিতি সামাল দিতে তখন নাজেহাল দশা। প্রতারণা, তহবিলতছরূপ, জালিয়াতি, জোচ্চুরি, খুন প্রভৃতি আর রেগুলেশন দিয়ে দমন করা যাচ্ছিল না। তাই ১৮৬০ সালে আসতে বাধ্য হল ভারতীয় দণ্ডবিধি বা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড। পুলিশের দক্ষতা বারবার পড়ছিল প্রশ্নচিহ্নের মুখে। নগর কোলকাতাকে অপরাধের হাত থেকে মুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন পুলিশ কমিশনার স্যার স্টুয়ার্ট হগ। ১৮৬৮ তে তার হাতে তৈরি হল কোলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগ। ১৯০০ তে ঘটছে প্রথম

ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরোর প্রতিষ্ঠা। ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত বাড়ি থেকে পালিয়ে সিনেমায় কাঞ্চন কোলকাতায় আসার আগে কোলকাতা সম্পর্কে বন্ধুকে বলেছিল, 'সে দারুণ শহর, সেখানে রাতের বেলায় দিনের মত আলো, সেখানে গিয়ে পয়সা করব।' আর কোলকাতা থেকে ফিরে যাবার আগে হরিদাকে সে প্রশ্ন করেছিল 'এ শহরে এত দুঃখ কেন' একদিকে সেখানে প্রাসাদের সারি, অন্যদিকে পচাগলা অন্ধকূপ। নতুন গড়ে ওঠা শহর প্রদীপের তলায় দলা দলা অন্ধকার নিয়ে এভাবেই এগিয়ে চলল।

উৎসের সন্ধানে

১. William Dalrymple, The Anarchy, London, 2020, P. 308-309
২. টেকচাঁদ ঠাকুর : 'আলালের ঘরের দুলাল', শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ
৩. Report on the Census of the Town of Calcutta, 1876, P. 40
৪. বাঁকাউল্লার দপ্তর, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও সৌমেন পাল সম্পাদিত, চর্চাপদ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৯

তথ্যের সন্ধানে

১. আব্দুস শুকুর, বাংলার পুলিশ সেকাল একাল, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ ২০১২
২. কালীপ্রসন্ন সিংহ, সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, অরুণ নাগ সম্পাদিত, আনন্দ, ২০১৯
৩. নিখিল সুর, সেকালের অপরাধ জগৎ, আশাদীপ, জানুয়ারি ২০২২
৪. প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, দারোগার দপ্তর, অরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, খণ্ড ১, পুনশ্চ, ২০১৮ সংস্করণ
৫. প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, দারোগার দপ্তর, অরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, খণ্ড ২, পুনশ্চ, ২০২১ সংস্করণ
৬. প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, দারোগার দপ্তর, অরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, খণ্ড ৩, পুনশ্চ, অগাস্ট, ২০২১ সংস্করণ
৭. বাঁকাউল্লার দপ্তর, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও সৌমেন পাল সম্পাদিত, চর্চাপদ, জানুয়ারী ২০১৩
৮. হেমেন্দ্রকুমার রায়, কলকাতার রাত্রি রহস্য, কৌশিক মজুমদার সম্পাদিত, বুকফার্ম, জানুয়ারী ২০২০

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

1. Sumanta Banerjee, Crime and Urbanization, Tulika, October 2006
২. Sumanta Banerjee, Dangerous Outcast, Seagull Books, May ২০১৯.
৩. Sumanta Banerjee, The Wicked City, Orient Black Swan, January ২০০৯

মুসলমান বাঙালির মাতৃভাষা সংকট প্রসঙ্গ 'সওগাত' পত্রিকা

গীতশ্রী সরকার

নবজাগরণ, নবচেতনা, আলোকায়ন এই শব্দগুলি এক নতুন যুগ, নবপর্যায়, নব্য চিন্তন-দর্শনকে নির্দেশ করে। ইংরেজ আগমনের হাত ধরে উনিশ শতকের সময়পর্বে আমাদের দেশে, এই বাংলায় এক প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী চিন্তন মননের পথ চলা শুরু হয়। এই নব্য দর্শন, শিক্ষা, প্রগতিশীল ভাবনা বাঙালির চিন্তাজগতে এক বিস্ফোরণ সংগঠিত করেছিল। উনিশ শতক জুড়ে আধুনিকতার দর্শনে নির্ভর করে মধ্যযুগীয় সমাজ-দর্শন-সংস্কার-অজ্ঞানতা-ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার চর্চা শুরু হয়।

এই আধুনিকতার চর্চায় বাঙালি জাতির দুই স্তম্ভ—হিন্দু এবং মুসলমান একসঙ্গে অংশগ্রহণ করেনি। ইংরেজ শাসন পর্বের প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজ সাহিত্যের আঙিনায় যে নবজাগরণ সূচিত হয় তাতে প্রথমেই স্নাত হয়েছিল বাঙালি হিন্দু সমাজ। এইসময় বাঙালি মুসলমান সমাজে যে ভাব আন্দোলনগুলির সূচনা হয় তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল প্রাচীন ধর্মজীবনের আদর্শে ফিরে যাবার ইচ্ছা। তৎকালীন মুসলিম সমাজের ভাব আন্দোলন, আধুনিকতার চর্চা প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান বলেছেন—"এসব আন্দোলনের মূল্য স্বীকার করেও বলা যায় যে বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে আধুনিক জীবন ও জগতের বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য এদের দায়িত্ব যথেষ্ট।"[১]

উনিশ শতকে সমাজে যে মৌলিক পরিবর্তনগুলি সংগঠিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজের ভাঙন, শহরকেন্দ্রিক জনজীবনের নির্মাণ, অর্থনৈতিক মাপকাঠি জমি থেকে স্থানান্তরিত হয় মুদ্রায়। এই পরিবর্তনের সূত্রে সৃষ্টি হয় শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালির। পুরাতন ব্যবস্থার ক্ষয়ের প্রভাব হিন্দু ও মুসলমান বাঙালি উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্যি হলেও মুসলিম বাঙালি তৎকালীন অর্থনীতিকে পরিচালনা করতে পারেনি প্রাথমিক পর্বে।

অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য জমিদারিতে প্রাধান্য লাভ করে হিন্দু বাঙালি। ফলত, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিতেও হিন্দু প্রাধান্যই লক্ষণীয়। আধুনিক সমাজ-সাহিত্যের ধারায় পুরোধা হয়ে উঠল হিন্দু বাঙালি, আর অন্যদিকে ঘটনার পারম্পর্যে মুসলিম সম্প্রদায় পিছিয়ে পড়ল সাময়িকভাবে।

বদরুদ্দীন উমর বাঙালির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, বাংলাদেশের যে-কোনো জায়গায় যারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করে, বাংলায় কথা বলে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে নিজেদের ঐতিহ্য মনে করে তারাই বাঙালি। ধর্ম পরিচয় যাই হোক, যে মানুষ বাংলায় কথা বলে সেই বাঙালি। কিন্তু তৎকালীন নানা ঘটনা প্রবাহে বহুস্বরিক বাঙালি সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু একাধিপত্য স্থাপন করে 'বাঙালি' পরিচিতি সত্তার ওপর। ভাষাভিত্তিক ও ধর্মভিত্তিক পরিচয়ের একাত্তীকরণের মাধ্যমে হিন্দু বাঙালি হয়ে ওঠে 'বাঙালি' যার আত্মানুসন্ধানের মাধ্যম বাংলা ভাষা। অন্যদিকে মুসলিম সমাজের গঠনও অবিমিশ্র, অখণ্ড ছিল না। একদিকে অবিমিশ্র বাঙালি মুসলমান (নিম্নবর্গীয়, ধর্মান্তরিত, ইসলামের আদর্শে প্রায় অনভিজ্ঞ), অন্যদিকে অবিমিশ্র অভিবাসী মুসলমান (অভিজাত, বাঙালি সঙ্গে সম্পর্করহিত শরিয়ত বিশ্বাসী) এবং মিশ্র বাঙালি মুসলমান (যারা আরব পারস্য ও বাংলার সংস্কৃতির মেলবন্ধন প্রয়াসী)। এই মিশ্র মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক সামাজিক বোঝাপড়ার প্রশ্নে দ্বৈরথ ছিল অবশ্যম্ভাবী। ফলে উচ্চবিত্ত মুসলমান নিজেদের সংস্কৃতির আশ্রয় খোঁজে ফারসি বা উর্দুতে। বাংলাকে তারা সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যম মনে করেনি। অন্যদিকে আধিপত্যবাদী, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুসলিম বাঙালিকে 'অপর' করে রাখার চেষ্টাও লক্ষণীয়। ফলত জন্ম হয় মুসলিম বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ওপর নির্ভর করে হিন্দু বাঙালির যে অগ্রগতি ঘটেছিল মুসলিম বাঙালির ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। ফলে হিন্দু বাঙালির তুলনায় মুসলিম সমাজ সাংস্কৃতিক-আর্থিক-সামাজিক স্তরে পশ্চাৎপদ হয়ে রইল। কলকাতা অভিজাত শ্রেণির বাসস্থান হিসেবে গড়ে ওঠার পরবর্তীতে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন, মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা, হুগলি কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রাথমিক পর্বের কাজ শুরু হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ, স্যার আমীর আলী, আবদুল লতিফদের মতো সমাজ নেতাদের সমাজ-সংস্কারমূলক কাজ, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, সরকারি নীতির পৃষ্ঠপোষকতা মুসলিম বাঙালিকে আধুনিক শিক্ষা-চিন্তন সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে আলিগড় আন্দোলনকারীরা ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার ও ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলমান সমাজের উন্নয়ন নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। গোঁড়ামি থেকে ইসলামকে রক্ষা, ইংরেজ ও মুসলমানের বৈরিতার অবসান, পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে এক বৌদ্ধিক শ্রেণির উন্মেষই ছিল তৎকালীন শিক্ষিত মুসলিম সমাজনেতাদের উদ্দেশ্য। ১৮৬৩ সালে কলকাতা মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা, ১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা, মুসলিম বাঙালি শিক্ষাসংক্রান্ত নানা স্মারকলিপি, আলোচনা বাঙালি মুসলমানের চেতনায় আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোড়ন তৈরি করে। অতঃপর উনিশ শতকের শেষ, বিশ শতকের গোড়ায় চাষবাসের খানিক উন্নতির ফলে নিম্নবিত্ত মুসলমানের হাতে কিছু পয়সা আসায় তারাও সন্তান-সন্ততির শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৮৭০ সাল থেকেই কতিপয় মুসলিম সমাজ নেতাদের অংশগ্রহণ, নিম্নবিত্তের আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের অগ্রগতি সূচিত

হয়। মুসলিম বাঙালি শিক্ষাগ্রহণ কাজে অংশগ্রহণ করলেও কোন্ ভাষা তার শিক্ষার মাধ্যম হবে সে প্রসঙ্গো নানান মতানৈক্য ছিল। ১৮৩৫ পূর্বকালে সরকারি, প্রশাসনিক ভাষা ছিল ফারসি। তাই হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ফারসি শেখার প্রভাব লক্ষণীয়। হিন্দুশাস্ত্র চর্চার মাধ্যম সংস্কৃত, মুসলমানের আরবি—এই ছিল তৎকালীন ভাবনা। এইসময় নবজাগরণের প্রভাবে ইংরেজি চর্চার যেমন সূচনা হয়, তেমনি মাতৃভাষার চর্চাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে ওঠে। নবজাগরণের প্রাথমিক পর্যায়ে সাহিত্যচর্চায় মাতৃভাষা চর্চার জোয়ার আসে হিন্দু বাঙালির হাত ধরে। এই সময় বাংলা ভাষার গঠন পর্বেও হিন্দু বাঙালির প্রভাব স্বভাবতই বেশি ছিল। সংস্কৃতগন্ধী এক বাংলা ভাষা চর্চা শুরু হয় বিদ্যাসাগর, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারদের হাত ধরে। আবার আরেকদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অভিজাত অংশ উর্দু বা আরবিকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের মনোভাবে তাই বাংলাকে মনে হয়েছিল হিন্দুর ভাষা। মুসলমানের মাতৃভাষা চর্চার দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গো আলোচনায় 'সওগাত'-এ প্রকাশিত 'ভাষাজ্ঞান ও চিন্তাশীলতা' প্রবন্ধে আবুল ফজল বলেন—

> অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানেরা উর্দুকে তাঁহাদের মাতৃভাষা এবং কালারের ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার মুসলমান বহুদিন পর্যন্ত কোন ভাষাকেই তাহার কালারের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করে নাই। অভিজাত পরিবারের মুসলমানেরা উর্দুতে কথা বলেছেন কিন্তু বাংলাদেশের ভিন্ন আবেস্টন ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তাহারা উর্দুর কৃষ্টিসম্মত একটি আবহাওয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই।[২]

এইসময় মুসলিম বাঙালির আত্মানুসন্ধানের সূত্র ধরেই বাঙালি জাতির গঠন, বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রারম্ভিক পর্যায় আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। সমাজ সাহিত্যের সংগঠনে পত্রপত্রিকায় ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের প্রাথমিক পর্বে হিন্দু শিক্ষিত সমাজের দ্বারাই সংবাদ সাময়িক পত্রের সূচনা হলেও উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে মুসলিম সম্পাদিত সাময়িকপত্র আলোচনার শিরোনামে স্থান পায়। এ সময়কার পত্রিকাগুলির চিন্তন দর্শন ছিল বিবিধ; এরমধ্যে সমাচার সভারাজেন্দ্র, আখবরের এসলামিয়া, ছোলতান, মোসলমান পত্রিকা, আল এসলাম, নবনূর, কোহিনুর, আহমদী, মোহাম্মদী, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা প্রভৃতি পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতির অনুসন্ধানের সূত্রেই এই সময়কার বেশকিছু পত্রিকা হিন্দু মুসলিম ঐক্য, অখণ্ড বাঙালিত্বের ধারণার নির্মাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯১৮ সালে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত সওগাত পত্রিকা। জীবনের প্রাথমিক পর্বেই মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সচিত্র মাসিক সাময়িকী প্রকাশের সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছিলেন। প্রগতিশীলতা আধুনিকতার চর্চা, নব্য লেখক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠায় সওগাত এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। উনিশ শতকের শেষ পর্বে মুসলিম বাঙালির সাহিত্য ও সাময়িক পত্র চর্চার সময় থেকে ভাষার প্রশ্নে ভিন্ন মতামতের অবস্থান লক্ষণীয়। মুসলিম বাঙালির মাতৃভাষা কী হবে এই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের দ্বন্দ্ব। বিশ শতকের গোড়ায় এই বাঙালি মুসলমানের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা স্বীকৃত হয়। তবে হিন্দু বাঙালির সাহিত্যিক ঐতিহ্যের পাশে মুসলমান বাঙালির স্বকীয়তা সম্পন্ন অংশগ্রহণ পর্বটি সহজ ছিল না। বঙ্গাদর্শনের পাতায় মুসলিম বাঙালি সাহিত্যচর্চা, ভাষাচর্চা প্রসঙ্গো বলা হল—

> যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ববোধ থাকিবে যে তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখবেন না, বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু ফরাসির চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না।[৩]

বাংলা ভাষায় মুসলমানের অধিকার ও চর্চা বিষয়ে হিন্দু বাঙালির বোঝাপড়া খুব আশানুরূপ ছিল না তা স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গো 'সওগাত'-এর পাতায় প্রাবন্ধিক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

বলেছেন---“মুসলমানরা সাহিত্যে, দৈনন্দিন কথাবার্তায়, ভাষায় ব্যবহার্য দু”চারটে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ব্যবহার করেন বলিয়া হিন্দু সাহিত্যিকরা ভাষার জাতি নাশের আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।”[৪] সওগাত-এর পাতায় 'বাঙ্গালী মোসলেমের ভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে মাতৃভাষা নির্বাচনের দোলাচলতার ছবিটি প্রকাশ করেছেন প্রাবন্ধিক—

> মুসলমানের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে রাজ্য চলে যাওয়ায় বাংলাভাষা তার নিজস্ব স্বরূপ হারিয়ে ফেলল। সে গতি রুদ্ধ হলো এবং পুরাতন হিন্দু মুসলিম কবিরা ডুবে গেলেন বিস্মৃতির গর্ভে, আর তাঁদের স্থান দখল করে বসলেন সংস্কৃত বাঙলার রচনাকারীগণ।[৫]

তৎকালীন পরিস্থিতি প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন যে এইসময় একদল উর্দুকে মাতৃভাষা মনে করল, একদল সংস্কৃতানুগ-সাহিত্য গড়ল, আরেকদল আরবি-ফারসি মেশানো বাংলা লিখল। নিম্নস্তরের মধ্যে আধিপত্যও রইল না, আর সাহিত্যের ভিতর দিয়ে শক্তি সঞ্চয় হল না বলেই বাঙালি মুসলমানের আঁধারে পড়ে রইল। বাংলা ভাষার নির্মাণে মুসলিমের অবদান অনুসন্ধান প্রসঙ্গে বলা যায় মুসলিম বাঙালির ভাষা প্রতিষ্ঠা পর্বটি সহজ ছিল না। তৎকালীন মুসলিম বাঙালির ভাষা চর্চার ধারাটি 'সওগাত'-এ প্রকাশিত নির্বাচিত লেখার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব।

উনিশ বিশ শতক জুড়ে মুসলিম বাঙালি ভাষাকেন্দ্রিক যে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিল তার নানান দিক ছিল। প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, সওগাত-এর লেখার মাধ্যমে মাতৃভাষা চর্চা, মুসলিম বাঙালির বাংলা ভাষা চর্চা, জাতিভিত্তিক অখণ্ডতার বোধ নির্মাণের প্রচেষ্টা চলেছিল। 'সওগাত'-এর পাতায় প্রকাশিত ভাষার বোধ অনুযায়ী ভাষা কেবল প্রকাশ মাধ্যম নয়, ভাষা চিন্তার জন্মদাতা ও বাহক। সওগাত-এর পাতায় এ প্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেছেন—“মানুষের নৈতিক মানসিক ও রুচিজ্ঞানের বিকাশ অনেকখানি তার ভাষাজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে-ভাষা তার অন্তর্নিহিত সব সুকুমারবৃত্তি গুলির বিকাশে সহায়তা করে।”[৬] এই প্রবন্ধেই আবুল ফজল চিন্তা ও প্রকাশের দৌর্বল্যতার কারণ হিসেবে পরিপূর্ণ ভাষাজ্ঞানের অভাবকে চিহ্নিত করেছেন। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা চর্চার দ্বিধা প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ইংরেজি শিক্ষিত সাধারণ বাঙালি মুসলমান বাড়িতে বাংলা বলিলেও এতদিন কিন্তু বাহিরে উর্দুর ওকালতি করিয়াছে। কাজেই বাংলা ভাষাকে সে তাহার কালচারের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করে নাই। রাজকার্যের জন্য সে ইংরেজি শিখিয়াছে, ধর্ম হারাবার ভয়ে আরবি পারসি উর্দু পড়িয়াছে এবং ব্যবহারিক জীবনের সুবিধার জন্য বাংলাও তাকে কিছু কিছু পড়িতে হইয়াছে, ইহাতে তাহার ইহপরকালের জীবনযাত্রার একরকম চলনসই সুবিধা হইয়াছে কিন্তু চিন্তা ও কালারের দিককে সে একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে।[৭]

তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি নানা শব্দের আগমন, তার ব্যবহার, বাংলা ভাষায় তার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাংলা ভাষার গঠন পর্বটি সংগঠিত হয়েছে। তুর্কি আক্রমণ পরবর্তীকালে মুসলিম শাসকের অনুপ্রেরণায় মধ্যযুগের সাহিত্য রচনার কাজ শুরু হয়। তার ফল মঙ্গলকাব্য থেকে অনুবাদ সাহিত্য, আরাকান রাজসভা থেকে কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারের ভারতচন্দ্রের লেখনী। এই সময়কার বাংলায় স্বাভাবিকভাবেই আরবি-ফারসি শব্দের প্রাধান্য ছিল। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ফারসি ভাষা চর্চার অনুষঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের পরিবার তাকে ফারসি শেখায় অনুপ্রাণিত করেছিল, রাজা রামমোহন রায়ের গদ্যও ফারসি ভাষা শিক্ষার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এই সময় সংস্কৃতানুগ বাংলার যে চর্চা শুরু হয় সেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিজস্ব বাংলা ভাষা চর্চার স্বর প্রতীয়মান হয়। সওগাত-এর পাতায় মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য কেন' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন প্রাচীন বাংলা বর্জন পূর্বক তাহার স্থানে দাঁত ভাঙ্গা সংস্কৃত আমদানি করিলেন তখন মুসলমানদের চৈতন্য আরো অধিক পরিমাণে ফিরিয়া আসিল। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যের বিষক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার পূর্ব হইতেই বাংলার মুসলমানদের ব্যবহৃত আরবি ফারসি শব্দ বহুলভাবে ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন।[৮]

হিন্দু-মুসলমানের পৃথক নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমেই উভয়ের ভাব ও চিন্তার সঙ্গে পরস্পরের পরিচয় ঘটবে, তাহলে সমবেত শক্তি প্রয়োগে এই দুই সম্প্রদায় মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পরিচর্যা করতে পারবে এই ছিল লেখকের ভাবনা। তবে মুসলিম বাঙালির প্রতিও সাবধানতা অবলম্বন প্রসঙ্গে বলেছেন—"একটি বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইব। বর্তমান যুগের হিন্দু সেবিত সাহিত্যের ভাষা ও আমাদের ভাষায় যাহাতে গুরুতর রকমের পার্থক্য না ঘটে আমরা আবশ্যক মত আরবি-ফারসি ব্যবহার করিব কিন্তু ঐরূপ শব্দ ব্যবহারে যেন আমাদের অতি লোভ না জন্মে।"[৯] বাংলা ভাষার প্রাত্যহিক চর্চায় আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার বিষয়ে সওগাত-এ বেশকিছু প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। সওগাত-এ মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরীর ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'বাংলা ব্যাকরণ সমস্যা' প্রবন্ধে বলেছেন—

> বাংলা ব্যাকরণ বাংলা ভাষা হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাংলা ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ এখনো তৈয়ার হয় নাই বাংলা ভাষা কেবল হিন্দুরও নহে, কেবল মুসলমানেরও নহে। ইহা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মাতৃভাষা। মুসলমানকে বাদ দিয়ে কেবল হিন্দুকে লইয়া ব্যাকরণ রচনা করিলে ইহা অসম্পূর্ণ থাকিবে।[১০]

মুসলিম শাসকদের দীর্ঘকালীন রাজত্বের প্রভাবে তার নানা দান বাংলাভাষার অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে। বাংলায় ব্যবহৃতদের, রা বিভক্তিও ফারসি থেকে আগত। এরকমই নানা প্রত্যয় (দার, গার, চা, বে) যা উর্দু, ফারসি থেকে এসেছে তার উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করেছেন মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী। 'বাংলা বর্ণমালার কথা' প্রবন্ধে (সওগাত, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সহজ শিক্ষা, তার ভার বাহুল্য বর্জন করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রয়াস করেছেন। 'বাংলা সাহিত্যে পরিভাষা' সংক্রান্ত আলোচনায় বিভিন্ন ভাষার দান গ্রহণ করে কিভাবে একটি ভাষার নির্মাণ হয় এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ কতটা অগ্রহণযোগ্য তার আলোচনা করেছেন—"অন্য কোন ভাষার সাহায্য ছাড়া দুনিয়ার কোন ভাষারই উন্নতি সম্ভবপর নহে।"[১১] 'বাংলা সাহিত্যে আরবি ফারসি শব্দের স্থান' প্রবন্ধে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত আরবি, ফারসি শব্দের প্রয়োগ অব্যহত রাখার প্রসঙ্গে আহবাব চৌধুরী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্যকে প্রামাণ্য হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। দোয়াত, আদালত, পাট্টা, কলম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের বিরোধিতা করে বাংলাকে শুদ্ধ করার যে প্রক্রিয়া সেসময় সংগঠিত হচ্ছিল মহামহোপাধ্যায় তার বিরোধিতা করেন। এ প্রসঙ্গে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে প্রকাশিত জসীমউদ্দীন আহমেদের 'সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার পরস্পর সম্বন্ধ' প্রবন্ধে সংস্কৃত ফারসিতে বিভিন্ন শব্দের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন বিভিন্ন ভাষায় তার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য। ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার মিল, সাধারণ নিয়মের দিকগুলির উল্লেখ করে তিনি প্রমাণ করতে চান সংস্কৃত ও ফারসি একই ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তিনি বলেন—"পুরাতন পারস্য ভাষা ও পহ্লবীর সহিত সংস্কৃত ভাষার অনেক মিল আছে। old persian হইতে পহ্লবী ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই উভয় ভাষাই সংস্কৃতের মতো রূপান্তরবহুল ছিল।"[১২] এই প্রসঙ্গে ১৩৩৪ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত মোঃ আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরীর 'সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার পরস্পর সম্পর্ক', এ কে এম হাবিবুল্লাহর 'বাংলা ভাষার বিবর্তন' উল্লেখযোগ্য।

নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, মসজিদ এই গোত্রীয় নানা শব্দের বলপূর্বক অনুবাদের ফলে সঠিকভাব প্রকাশে সমস্যা দেখা যায়; এই সমস্যার নিরসনে 'বাংলা ভাষা সংস্কার' প্রবন্ধে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বলেছেন—"এইভাবে বাংলার প্রকাশশীলতা ও সৌন্দর্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কিছু অপ্রচলিত আরবি ফার্সি ও উর্দু বা হিন্দুস্তানি শব্দ আমরা নিয়ে নিতে পারি। এতে আমাদের হিন্দু ভ্রাতারা আপত্তি না করলেই বাংলার কল্যাণ হবে।"[১৩] হিন্দু বাঙালি দ্বারা মুসলিম বাঙালির ভাষা চর্চার অবদান, ইতিহাসকে অবহেলা করার যে অভিযোগ ছিল তা খানিকটা লাঘব করার চেষ্টা করেন দীনেশচন্দ্র সেন। 'বঙ্গভাষার ওপর মুসলমানের প্রভাব' প্রবন্ধে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন, হুসেন শাহ ও অন্যান্য সম্রাটদের অবদান, অনুবাদ সাহিত্য, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন বিদেশি শব্দের সাবলীল প্রয়োগ, লোকসাহিত্যে পল্লিবাংলার মুসলিম সমাজের প্রভাব, মুর্শিদি গান, বাউল, সুফি গান বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে কিভাবে উর্বর করেছে তার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"মুসলমান সম্রাটগণ বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের একরূপ জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"[১৪] মুসলিম বাঙালির মাতৃভাষা নির্বাচনের দ্বন্দ্ব বিষয়ে বলেছেন—"যাহারা বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা এদেশে প্রচলনের প্রয়াসী, তাহারা কখনোই সে চেষ্টায় কৃতকার্য হইবেন না। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের বাংলাই মাতৃভাষা, মায়ের মুখে তাহারা বাংলা ভাষা প্রথম শুনিয়াছে—সে ভাষা তাহাদিগকে ভুলাইয়া দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা।"[১৫]

'সওগাত' পত্রিকায় প্রথম থেকেই নারী প্রগতি, নারী শিক্ষা, নারীর উন্নয়ন এর দিকটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলা ভাষা শিক্ষা, ভাষাচর্চা প্রসঙ্গে তৎকালীন মেয়েদের বক্তব্যে আধুনিকতার প্রকাশ লক্ষণীয়। নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী 'আমাদের কাজ' প্রবন্ধে বলছেন—

> এখন এমন আর বাংলা শিখবার ভয়ে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে সংকুচিত হলে চলবে না। বলতে হবে আমি বাঙালি আর এই বাংলা সাহিত্যই আমার সাহিত্য। সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমাদের পুরুষরাই এখনো বহু দূরে পড়ে আছেন। আমরা তো পর্দানশীন মহিলা। কিন্তু এখন সাধনা দ্বারা আমাদের এই দূরত্বকে ক্রমে ছোট করে আনতে হবে।[১৬]

ওমদাতুনেচ্ছা খাতুন তার 'কোন মোল্লায় অভক্তি' প্রবন্ধে বলেছেন—"মাতৃভাষা বাংলা ভাষা ও রাজভাষা ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে যে মোল্লা ফতোয়া দেয়-সে মোল্লায় আমাদের অভক্তি।"[১৭]

বাংলা ভাষাকেই বাঙালি মুসলমান তার মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করলেও মুসলমানদের বাংলা ভাষা শিক্ষার যে সুবন্দোবস্ত হয়নি তা আবুল ফজলের লেখায় স্পষ্ট। মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রণালী আদর্শস্থানীয় নয় মাদ্রাসায় অনুপযুক্ত শিক্ষক, কুলিখিত পাঠ্যবই—এই সমস্যাগুলি ভ্রান্ত বাংলা ভাষা চর্চাকেই ত্বরান্বিত করছিল। ভাষাকে পরিশুদ্ধ না করলে ত্রুটি পূর্ণ ভাষায় চিন্তাশীল লোকের জন্ম হয় না তার কারণ হিসেবে বলেছেন—"আমাদের চিন্তায় ও প্রকাশে যে দৌর্বল্য পরিলক্ষিত হয়, তাহার অন্যতম কারণ বোধহয় আমাদের পরিপূর্ণ ভাষা জ্ঞানের অভাব।"[১৮] বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার আঙিনায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় এর অবদানে বাংলা ভাষা কীভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা 'সওগাত'-এ প্রকাশিত লেখার মধ্যে দিয়ে আলোচনার চেষ্টা করলাম। বাংলা ভাষার স্বরূপ প্রসঙ্গে আবদুল মাজিদের এর কথাটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য—"এই নতুন করে গড়া ভাষাকে হিন্দুর ভাষায় বলুন আর মুসলমানের ভাষায় বলুন ইহা বাঙালির ভাষা। এতে করেই বাঙালী নিজের প্রাণের কথা বলেছে, শুনেছে, গেয়েছে।"[১৯] কোনো একটি অংশকে বাদ দিয়ে এগোতে চাইলে তার প্রগতি হবে পশ্চাদগামিতার নামান্তর। এ প্রসঙ্গে আবুল ফজলের লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য দিয়েই আমরা মুসলমান বাঙালির মাতৃভাষা চর্চার পাঠটি বোঝার চেষ্টা করব। লেখক বলেন—"মুসলমান সমাজের নিত্য ব্যবহৃত শব্দ যদি ভাষায় স্বতই প্রবেশ

লাভ করে তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে না, বরং বলবৃদ্ধি হবে, বাংলা ভাষার অভিব্যক্তির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে।”[২০] বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে বাঙালি জাতি দুই স্তম্ভ হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ। কোনো একটি অংশকে বাদ দিয়ে অখণ্ড বাংলা সাহিত্যের নির্মাণ প্রকল্পটি ভ্রান্ত হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই আমাদের আলোচনা শেষ করব। ওই একই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন—“দুর্দৈবক্রমে বাংলাদেশের আধখানা সাহিত্যের আলো যদি না পড়ে তাহলে আমরা বাংলাদেশকে চিনতে পারব না, না পারলে তার সঙ্গে ব্যবহারে ভুল ঘটতে থাকবে।”[২১]

উৎসের সন্ধানে

১. আনিসুজ্জামান : ‘মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য’, ঢাকা, চারুলিপি, ১৯৬৪, পৃ. ২৫
২. সফিউন্নিসা সম্পাদিত : আবুল ফজল ‘ভাষাজ্ঞান ও চিন্তাশীলতা’, শতবর্ষের সেরা সওগাত, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ প্রা. লি., মাঘ ১৪২৪, পৃ. ২৯৭
৩. রাজ্যেশ্বর সিনহা সম্পাদিত : ‘আপন হতে বাহিরে’, কলকাতা, বিভাগীয় গবেষণা প্রকল্প DRS SAP PHASE II, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মে ২০২০, পৃ. ১৭
৪. সফিউন্নিসা সম্পাদিত : আবুল কালাম মহম্মদ শামসুদ্দীন ‘সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা’, শতবর্ষের সেরা সওগাত, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ প্রা. লি., মাঘ ১৪২৪, পৃ. ২৬৮
৫. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত : আবদুল মাজিদ ‘বাঙ্গালী মোসলেমের ভাষা ও সাহিত্য’, সওগাত পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৩৩, পৃ. ১৬-১৭
৬. উৎস-২, পৃ. ২৯৬
৭. তদেব : পৃ. ২৯৮
৮. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ‘সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য কেন’, সওগাত পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, পৃ. ৩৪৯
৯. তদেব : পৃ. ৩৫২
১০. মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী : ‘বাংলা ব্যাকরণ সমস্যা’, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত, সওগাত পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, কলকাতা, কার্তিক ১৩৩৩, পৃ. ২৮৪
১১. তদেব : পৃ. ৫১৬
১২. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত : জসীমউদ্দীন আহমেদ ‘সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার পরস্পর সম্বন্ধ’, সওগাত পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ. ৪৯২
১৩. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী : ‘বাংলা ভাষার সংস্কার’, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ঢাকা, সওগাত প্রেস, জুলাই ১৯৮৫, পৃ. ৪৯৫
১৪. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত : দীনেশচন্দ্র সেন ‘বঙ্গভাষার ওপর মুসলমানের প্রভাব’, সওগাত পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৩৫, পৃ. ৬১৯
১৫. তদেব : পৃ. ৬১৯
১৬. সফিউন্নিসা সম্পাদিত : নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী ‘আমাদের কাজ’, শতবর্ষের সেরা সওগাত, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ প্রা. লি., মাঘ ১৪২৪, পৃ. ৪২৬
১৭. ওমদাতুনেচ্ছা খাতুন : ‘কোন মোল্লায় অভক্তি’, সফিউন্নিসা সম্পাদিত, শতবর্ষের সেরা সওগাত, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ প্রা. লি., মাঘ ১৪২৪, পৃ. ৪২৭
১৮. সফিউন্নিসা সম্পাদিত : আবুল ফজল ‘ভাষাজ্ঞান ও চিন্তাশীলতা’, শতবর্ষের সেরা সওগাত, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ প্রা. লি., মাঘ ১৪২৪, পৃ. ২৯৭
১৯. উৎস-৫, পৃ. ১৬
২০. সফিউন্নিসা সম্পাদিত : ‘বাংলা ভাষায় মুসলমানী শব্দ’, রবীন্দ্রনাথ ও আবুল ফজলের পত্র বিনিময়, শতবর্ষের সেরা সওগাত, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ প্রা. লি., মাঘ ১৪২৪, পৃ. ৩০২
২১. তদেব

বৌদ্ধ ধর্ম ও নারীদের নির্বাণ

সঙ্কেত সরদার

মহামানব গৌতম বুদ্ধ সাধারণ মানুষের মধ্যে অপার করুণা, সুমধুর বচন, প্রেম, অহিংসা, মৈত্রী বিতরণ করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ সাধারণ নর-নারীর জীবনে নির্বাণের বীজ রোপণ হয়েছিল। বুদ্ধদেব সমস্ত জগতকে শিখিয়েছেন পিতার স্নেহ, প্রিয়তমা পত্নীর প্রেম, নবজাতক পুত্রের আকর্ষণ সবই অনিত্য। এই জীবন দুঃখময়। তিনি ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি রাজসুখ উপেক্ষা করেছেন কারণ এই প্রকার সুখ ক্ষণিক। অপরদিকে কঠোর কৃচ্ছসাধনে শরীর শীর্ণ হয়, মুর্চ্ছিত হয়। সুতরাং এই দুটির কোনোটাই গ্রাহ্য নয়। কেবল মধ্যম পন্থাই শ্রেয়। তাঁর অভয় বাণী ধনী-গরিব, তরুণ, বৃদ্ধ, বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, স্ত্রী, পুরুষ সবাই দলে দলে গ্রহণ করেছেন। তিনি ভিক্ষুণীদের (নারী সন্ন্যাসীদের) জন্য একটি আলাদা সঙ্ঘ আবার ভিক্ষুদের (পুরুষ সন্ন্যাসীদের) জন্য আলাদা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমি এই নিবন্ধে যা দেখাতে চাই তা হল, বৌদ্ধ ধর্মে নারীরা কিভাবে বৌদ্ধ সংঘে স্থান পেয়েছেন এবং নির্বাণ লাভ করেছেন তা তুলে ধরা। আমার এই আলোচনা পর্বটি আমি তিনটি পর্বে বিভক্ত করেছি। প্রথম পর্বে নির্বাণের স্বরূপ এবং দ্বিতীয় পর্বে ভিক্ষুণীদের বৌদ্ধ সংঘে যোগদান ও আচরণ বিধি। তৃতীয় পর্বে ভিক্ষুণীদের নির্বাণ লাভ প্রসঙ্গে আলোচনা।

১. নির্বাণের স্বরূপ : বৌদ্ধরা বলেন অবিদ্যা আমাদের দুঃখের মূল কারণ। আমরা যদি নির্বাণ লাভ করি তবেই আত্যন্তিক দুঃখ মুক্তি সম্ভব। নির্বাণের স্বরূপ জাগতিক কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না কারণ নির্বাণ হল অতিজাগতিক অবস্থা। যে সমস্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা নির্বাণ উপলব্ধি করেছেন তাঁদের উপলব্ধি ভাষায় যেভাবে ব্যক্ত করেছেন আমরা কেবল তা জানতে পারি। তাঁদের ভাষায় নির্বাণ হল সমস্ত চিত্তক্লেষ হতে চরম বিযুক্তির অবস্থা। নির্বাণ হল তৃষ্ণা নিবৃত্তি এবং শুভের চরম অবস্থা। বৌদ্ধ দার্শনিকরা বলেন তর্ক-বিতর্ক দ্বারা নির্বাণ

প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কেননা, তার্কিক তাঁর সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টা দ্বারা কেবল অপরের মত খণ্ডন করতে সমর্থ। পালিতে নির্বাণকে বলা হয় নিব্বান। নি-উপসর্গের সহিত বান/বাণ শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। বান তৃষ্ণারই নামান্তর। তৃষ্ণার সাথে বিভিন্ন সহকারি কারণ যুক্ত হয়ে জীবগণকে বন্ধনযুক্ত করায়। তাই একে বাণ বলা হয়। 'নি' উপসর্গ তৃষ্ণার অভাব অর্থ প্রকাশ করেছে। যে ধর্ম প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি ধারা তৃষ্ণা বন্ধন ছিন্ন হয় তা হল নির্বাণ। আবার পুনরায় 'ণ' সহযোগে বাণ শব্দের অর্থ হলো অগ্নি। নির্বাণকে আগুনের সাথে তুলনা করা হয়েছ। এইভাবে নির্বাণ শব্দের অর্থ হয় রাগ অগ্নি বা লোভ অগ্নি, দ্বেষ অগ্নি এবং মোহ অগ্নি চিরতরে নির্বাপন বা ধ্বংস। এখানে রাগ দ্বেষাদি অগ্নির চির-নির্বাপন হল নির্বাণ লাভের উপায়। যা দ্বারা নির্বাণমুখী স্রোতে পতিত হওয়া যায়। পরিণতি নির্বাণ।[১] 'মিলিন্দপঞ্হ' গ্রন্থে বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা প্রসঙ্গে সাত প্রকার চিত্তের উল্লেখ আছে। যথা—১. ক্লেশমুক্ত চিত্ত, ২. স্রোতাপত্তি, ৩. সকৃদাগামী, ৪. অনাগামী, ৫. অর্হৎ, ৬. সর্বজ্ঞবুদ্ধি, ৭. সর্ব বিষয় পরিশুদ্ধ। এই সাত প্রকার চিত্ত প্রবর্তিত হয়।

স্রোতাপত্তি যখন সাধক অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম ক্রম উত্তীর্ণ হন তখন তাকে স্রোতাপন্ন বলে। স্রোতাপন্ন ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টি প্রাপ্ত ও শাস্ত্র অবগত হন। এই স্তরে মিথ্যা দৃষ্টি বা বিভ্রান্তি, সংশয় দূর হয়। তবে এই স্তরে অহংভাব বা আমিত্ব থাকে। স্রোতাপন্ন ব্যক্তি বর্তমান জন্মে ঊর্ধ্বস্তরে না যেতে পারলে সেই ব্যক্তির সাত বারের বেশি জন্মগ্রহণ করতে হয়। সকৃদাগামী স্তরে অষ্টাঙ্গিক মার্গের দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়।

● **সকৃদাগামী :** এই স্তরে সংসার চক্র সীমিত হয়ে যায়। তাঁর আর একবার পৃথিবীতে আসতে হয়। এই স্তরে কামরাগ বা হিংসা এবং ব্যাপাদ বা বিদ্বেষ দুর্বল হয়ে পড়ে।

● **অনাগামী স্তর :** এই স্তর উদ্ধতর উন্নত হওয়ার জন্য সাধক শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা উজ্জ্বল অনুশীলন করেন। এই স্তর হল অনাগামী স্তর।

● **অর্হৎ :** এই স্তরে উত্তীর্ণ হলে সাধকের আর পৃথিবীতে আসতে হয় না। কামরাগ ব্যাপাদ সম্পূর্ণরূপে বিনস্ট হয়। এই স্তরে রাগ (আসক্তি), মান (অভিমান), ঔদ্ধত্য (আত্মম্ভরিতা), অবিদ্যা অর্থাৎ জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা দুর্বল হয়। এই শৃঙ্খল ভঙ্গ করে আর্য মার্গ অনুশীলন করে। সাধক চরম সীমায় উপনীত হন। সাধক অর্হৎ হন। নির্বাণ উপলব্ধির চরম স্তরে উপনীত হন। অন্তরের সকল ঋতু বা অরি হত হওয়ায় অর্হৎ। এক্ষেত্রে সাধকের আর পুনর্জন্ম হয় না। অর্হতের অবস্থা অর্হত্ত্ব। অর্হত্ত্বের ফল 'উপাধিশেষ নির্বাণ।' যখন সাধক দেহত্যাগ করেন তখন তার পরিনির্বাণ (অনুপাধিশেষ নির্বাণ) লাভ হয়ে যায়।

'মিলিন্দপঞ' অবলম্বনে নির্বাণের স্বরূপ-নির্বাণ প্রসঙ্গে মিলিন্দ নানান প্রশ্ন করেন এবং নাগসেন তার উত্তর প্রদান করে সংশয় নিরসন করেন। যার অতিসংক্ষিপ্ত নিম্নে বলা হল—নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স, প্রমাণ, যুক্তি, উপমা, হেতু ও প্রণালী প্রদর্শন করা যায় কিনা প্রশ্ন করা হয়। যার উত্তরে নাগসেন বলেন, 'যেমন মহা সমুদ্রের জলের পরিমাণ বলা অসম্ভব। সমুদ্রে কত সংখ্যক জীব আছে বলা যায় না। তেমন নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স ইত্যাদি বিষয়ক অবান্তর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না।' যেমন—নিরাকার দেবতা শোনা গেলেও দেবতাঁদের স্বরূপ, আকার, বয়স প্রদর্শন করা যায় না। সেইরূপ নির্বাণের আকার, বয়স, কিংবা পরিমাণ ইত্যাদি প্রদর্শন করা যায় না। নির্বানে প্রকার গুণ অনুপ্রবিষ্ট। যথা—পদ্মের এক গুণ, জলের দুই গুণ, মহাসমুদ্রের চার গুণ, ভোজনের পাঁচ গুণ, আকাশের দশ গুণ, মনিরত্নের তিন গুণ ইত্যাদি নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট। পদ্ম যেমন

জলদ্বারা লিপ্ত হয় না তেমন নির্বাণ সর্ববিধ কলুষে নির্লিপ্ত হয় না। এইভাবে নির্বাণে বিভিন্ন প্রকার গুণ অনুপ্রবিষ্ট। নির্বাণ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গো নাগসেন বলেন—

> শান্ত, সুখময় ও উত্তম নির্বাণ ধাতু আছে। মম্যকনিয়োজিত যোগী বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে সংস্কার ধর্ম পুঞ্জকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করে প্রজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করেন। অন্তেবাসী যেমন আচার্যের উপদেশ অনুসারে প্রজ্ঞা দ্বারা শিল্প বিদ্যা আয়ত্ত করেন সেইরূপ প্রজ্ঞা নিয়োজিত হয়ে বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে প্রজ্ঞা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

● **নির্বাণের অবস্থান :** পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর দিকে কোনো দিকে সেই স্থান নেই যেখানে নির্বাণ অবস্থিত। যেমন—অগ্নি দুটি কাঠের সংঘর্ষে উৎপত্তি হলেও দুই কাঠের কোথাও নেই সেইরূপ নির্বাণের সংস্থিতির কোনো অবসর নেই, তাও নির্বাণ আছে। এরপর আরও বিভিন্ন উপমাসহযোগে বিষয়টি উপস্থাপনা হয়েছে।

২. ভিক্ষুণীদের বৌদ্ধ সঙ্গে যোগদান ও আচরণ বিধি

২.১ ভিক্ষুণীদের বৌদ্ধ সঙ্গে যোগদান: ধর্ম প্রচার তখন পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করেছে এবং তথাগতের পিতা মৃত্যুশয্যায় আছেন। সে সময়ে শুদ্ধোধনের বয়স ৯৭ বছর। সে সময়ে ভগবান তাঁর পিতার কাছে জগতের সমস্ত কিছুর অনিত্যতা ব্যাখ্যা করেছেন। তা শ্রবণ করে তথাগতের পিতা অহৎ লাভ করেন এবং নির্বাণ লাভ করেন। পিতার মৃতদেহ সৎকার করে এবং জাতি বর্গের সান্তনা প্রদান করে তিনি বৈশালী ফিরে যান। তখন একপ্রকার বাধ্য হয়ে তিনি ভিক্ষুণী সঙ্ঘের অনুমতি দেন।[২] তথাগতের মাসি গৌতমী কপিলাবস্তুতে তার কাছে গিয়ে তিনবার প্রব্রজ্যা চাইলেন কিন্তু তিনি দেননি। পরে আনন্দের সহায়তা তিনি সংঘে প্রবেশের অধিকার পেয়েছিলেন। আনন্দ প্রথমে ভগবানের নিকটে নারীদের সংঘে প্রবেশের অধিকার চাইলে তিনি রাজি হননি। আনন্দ অন্য প্রকারে ভগবানের নিকট বললেন, নারীরা কী স্রোত, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হত্ব ফল লাভে সমর্থ নয়? তাঁর উত্তরে তিনি বলেছিলেন— সমর্থ। তাঁর অভিভাবিকা, পোষক, জননীর মৃত্যুর পর যিনি স্তন পান করিয়েছেন, যিনি উপকারিণী তিনি প্রব্রজ্যা লাভে সমর্থ হোক। তারপর তথাগতের আদেশে আটটি অনুশাসন পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রমণীরা সংঘে প্রবেশের অধিকার লাভ করেছেন। কয়েকটি এইরূপ সংঘ প্রবেশের অনুশাসন।[৩]

● **অনুশাসন**

১. ভিক্ষুণীর বয়স যদি একশো বছরও হয় তাহলেও তাকে একজন তরুণ ভিক্ষুর আরাধনা করতে হবে।

২. যেখানে কোনো ভিক্ষু নেই, সেখানে ভিক্ষুণী তার বর্ষাবাসের কাল যাপন করবে না।

৩. ভিক্ষুণীকে মাসে দু'বার করে ভিক্ষুর কাছে থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে।

৪. উপবাসের অবসানে যে অপরাধ দৃষ্ট, শ্রুত বা কল্পিত হয়েছে তার জন্য ভিক্ষু, এবং ভিক্ষুণীকে সংঘ এই উভয়ের কাছেই ভিক্ষুণীকে মার্জনা ভিক্ষা করতে হবে।

৫. যদি কোনোও গুরুতর অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহলে ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘের কাছেই ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে।

৬. দুই বৎসর ধরে ছয়টি উপদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে ভিক্ষুণী উভয় সংঘের কাছে উপসম্পদা যাচঞা করবে।

৭. ভিক্ষুণী কোনোও ভিক্ষুকে অপমান করবে না। বা তার নিন্দা করবে না।
৮. কোনোও ভিক্ষুণী কোনোও ভিক্ষুর সহিত বাক্যালাপ করতে পারবে না, কিন্তু ভিক্ষু, ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে।[৪]

২.২ আচরণ বিধি

উপরোক্ত আট প্রকার অনুশাসন মেনে ভিক্ষুণীরা সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এই সময়ে আরো পাঁচ শত ভিক্ষুণী সংসারের মায়া কাটিয়ে এই সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও সময় যত এগিয়েছে তাঁদের পথ আরো কঠিন হয়েছে। সামনে এসেছে নানান আচরণ বিধি। যখনই সংঘে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে তখনই তাঁদের আচরণ বিধি বেড়ে চলেছিল। কোনো ভিক্ষুণী কিংবা ভিক্ষু যদি কোনো গুরুতর অপরাধ করে তা পারাজিক দোষ হয়। 'পারাজিক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পরাজয় প্রাপ্ত। এই অপরাধে তাঁরা দীক্ষিত জীবনে মৃত বলে গণ্য হয়। পারাজিক আপত্তি চারি প্রকার, যথা—

১. যদি কোনো ভিক্ষু, কোনো স্ত্রী বা পুরুষ, এমনকী কোনো ইতর প্রাণীর সঙ্গে যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো ভাবে স্বেচ্ছায় মৈথুন আচরণ করে তার প্রথম পারাজিক অপরাধ হয়।
২. চুরি করা অর্থাৎ পরদ্রব্য গ্রহণ করলে দ্বিতীয় পারাজিক।
৩. প্রাণী হত্যা করলে বা অন্যকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দিলে কিংবা হত্যা বা আত্মহত্যার উপায় বলে দিলে তৃতীয় পারাজিক হয়।
৪. ধ্যান-বিমোক্ষ ইত্যাদি দ্বারা লোকোত্তর কোনো গুণে অর্জন করেননি অথচ কোনো কিছু লাভের ইচ্ছায় সেই গুণগুলি লাভ করেছে বলে মিথ্যা ভাষণ করলে চতুর্থ পারাজিক আপত্তি হয়।

এই বিভাগের প্রথম ও তৃতীয়টি গুরুতর অপরাধ, দ্বিতীয়টি নৈতিক অপরাধ এবং চতুর্থ মিথ্যাভাষণ ভিক্ষুদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।[৫]

ভিক্ষুদের তুলনায় ভিক্ষুণীদের অধিকতর কঠোরতার সহিত ব্রহ্মচর্য জীবন যাপনের কারণে ভিক্ষুণীদের জন্য পারাজিকা ৮টি নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম চারিটি ভিক্ষুদের অনুরূপ। অপর পারজিকায় নিম্নে বলা হলো—

৫. যদি কোনো ভিক্ষুণী কামরাগে নিমজ্জিতা হয়ে কোনো পুরুষকে নাভির নিম্নভাগ হতে হাটুর উপরিভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ জানুমণ্ডলের উপরিভাগের কেশ, হস্ত, বাহু, কর্ণ প্রভৃতি অংশে স্পর্শ বা পীড়ন করে, রোমাঞ্চিত হওয়ার মত স্পর্শ করতে দেয় তার পারাজিকা আপত্তি হয়।
৬. যদি কোনো ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীর পারাজিকা আপত্তি গোপন করে, তারও পারাজিকা আপত্তি হয়।
৭. সংঘ থেকে যে ভিক্ষু বহিষ্কৃত হয়েছে সেই ভিক্ষুর পক্ষ অবলম্বন করলে পারাজিকা আপত্তি হয়।
৮. যেই ভিক্ষুণী কামাসক্ত হয়ে, কামাসক্ত পুরুষের—১. হাত ধারণ করবে, ২. সংঘাটির কোণা ধারণ করবে, ৩. একস্থানে দাঁড়াবে, ৪. কথা বলবে, ৫. সংকেতে গমন করবে,

৬. পুরুষকে আগুবাড়ায়ে আনবে, ৭. গুপ্ত স্থানে অনুপ্রবেশ করে ৮. কামসম্ভোগের মতো অসদ্ধর্মার্থে দেহ-দান করবে তাতে তার পারাজিকা হবে।[৬]

সংঘাদিসেস-এই বিভাগে ১৭টি আপত্তি আছে। নিম্নে কয়েকটি বলা হল—

১. যে ভিক্ষুণী গৃহপতি, গৃহপতি, পুত্র, দাস, কর্মচারী বা সর্বশেষ পর্যায়ে অশ্রমণ-পরিব্রাজকের সাথে মামলায় বাদিনী হয়ে অবস্থান করবে; সেই ভিক্ষুণী সংঘাদিসেস নামক প্রথম ধর্মাপন্ন অপরাধ প্রাপ্ত হয়ে সাময়িক বর্জিতা হবে।
২. যেই ভিক্ষুণী নিজেও জানে এবং অন্যেও জানে যে প্রব্রজ্যা প্রার্থিনী চৌরী। তার বিষয়ে রাজা, সংঘ, গণ, ব্যক্তি বা সৈনিকের নিকটে বিনা জিজ্ঞাসায় প্রব্রজ্যা প্রদান করলে, সেই ভিক্ষুণী প্রথম ধর্মাপন্ন সংঘাদিসেস অপরাধ প্রাপ্ত হয়ে সংঘ হতে সাময়িক বহিষ্কার যোগ্যা হবে।
৩. যেই ভিক্ষুণী একাকী গ্রামান্তরে গমন করবে, বা একাকী নদী পার হবে অথবা রাতে একাকী গৃহ থেকে বের হবে, অথবা একাকী সঙ্গীদের ব্যতীত মলমূত্র ত্যাগে যাবে, সেই ভিক্ষুণী তৎক্ষণাৎ সংঘাদিসেস আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে নিস্সারনীয় দণ্ডযোগ্যা হবে।
৪. সমগ্র সংঘের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুণীকে যেই ভিক্ষুণী ধর্ম-বিনয় ও শাস্তা-শাসনের পক্ষভুক্ত না হয়ে, কারক সংঘের অজ্ঞাতে এবং গণের মতামত না নিয়ে দণ্ড প্রত্যাহার করে; সেই ভিক্ষুণী তৎক্ষণাৎ সংঘাদিসেস আপত্তি প্রাপ্ত হয়ে নিস্সারনীয় দণ্ডযোগ্যা হবে।
৫. যেই ভিক্ষুণী আসক্ত হয়ে আসক্ত পুরুষের হাত থেকে খাদ্য-ভোজ্য নিজ হাতে প্রতিগ্রহণ করে খাবে এবং ভোজন করবে; সেই ভিক্ষুণীর তৎক্ষণাৎ সংঘাদিসেস আপত্তিগ্রস্ত হয়ে নিস্সারনীয় দণ্ডযোগ্য হবে।
৬. যেই ভিক্ষুণী এরূপ বলবে,- হে আর্য্যা ! পুরুষটি আসক্ত বা অনাসক্ত এতে কী আসে যায় যদি তুমি অনাসক্ত হও, তবে এসো আর্য্যা, পুরুষটি খাদ্য বা ভোজ্য যা দেয় তা স্বহস্তে গ্রহণ করে খাও বা ভোজন কর। এভাবে প্ররোচিত দুক্কট আপত্তি হবে। তাঁর কথায়- অপর ভিক্ষুণী 'খাবো, ভোজন করবো"- এই ইচ্ছায় গ্রহণ করলে দুক্কট আপত্তি হবে। প্রতি গ্রাসে গ্রাসে থুল্লচ্চয় আপত্তি হবে। ভোজনের সমাপ্তিতে সংঘাদিসেস আপত্তি হবে।[৭]

অষ্ট পারাজিকা ধর্ম, সতেরো সংঘাদিসেস ধর্ম, ত্রিশ নিস্সগ্গিয়, ছয়ষট্টি পাচিত্তিয় ধর্ম, অষ্ট প্রতিদেশনীয় ধর্ম, সেখিয় ধর্মের উদ্দেস করা হয়েছে, সপ্ত অধিকরণ সমর্থ ধর্ম উদ্দেস করা হয়েছে।[৮]

৩. ভিক্ষুণীদের নির্বাণ : এই মায়ার সংসারের মায়া কাটিয়ে অনেক ভিক্ষুণী অর্হৎ লাভ করেছিলেন। তাঁরা অরি কে হত করে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। সেইসব প্রধান প্রধান ভিক্ষুণীগণ হলেন মহাপজাপতি গৌতমী, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, যশোধরা, ধম্মদিন্না, পটাচারা, ভদ্দা কুণ্ডলকেশা, ভদ্দা কপিলানী, নন্দা থেরী, সোণা থেরী, সিগাল মাতা, স্কুল থেরী, আম্রপালী ইত্যাদি। থেরীগাথাতে বিভিন্ন ভিক্ষুণীদের নানান কাহিনী গীতি আকারে উল্লেখ আছে। নানান সামাজিক প্রেক্ষাপট, বৌদ্ধ জীবন দর্শন উল্লেখ আছে। কিভাবে তাঁরা বুদ্ধের উপদেশ শুনে অর্হৎ লাভ করেছেন, নির্বাণ লাভ করেছেন তার উল্লেখ আছে। থেরীগাথায় তৎকালীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক অবস্থা বর্ননা হয়েছে। পুত্র শোকাতুরা জননী, পতিহীনা নারী, বারবনিতাএইরূপ বহু নারী চরিত্র থেরীগাথায় চিত্রিত হয়েছে। মনে সান্তনা ও শান্তি লাভের জন্য বৃদ্ধের শরণ নিয়ে ভিক্ষুণী হয়েছেন। অসামান্যা সন্দরী নর্তকী বারবনিতা আম্রপালী জীবন ও রূপলাবণ্যের ক্ষণস্থায়িত্ব উপলব্ধি করে কিভাবে বুদ্ধের শরণ নিয়ে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করেছেন তা থেরীগাথায় ব্যক্ত হয়েছে। নিম্নলিখিত শ্লোকটি পূর্ণা নাম্নী বিদ্যার্থিনী উচ্চারিত—"পূর্ণে, পঞ্চদশ দিবসের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পবিত্র জীবনের

পূর্ণতা সাধন কর। পূর্ণ-প্রজ্ঞা দ্বারা অবিদ্যার অন্ধকারকে দূরীভূত করহ।”[৯]

ধীরা কর্তৃক উচ্চারিত

“ধীরে, চিত্ত বৃত্তির নিরোধে উপনীত হও, সংজ্ঞার উপশম সুখময়। যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সেই বন্ধন-মুক্তিরূপ শান্তির উৎস নির্বাণের আরাধনা কর।”[১০]

নিবন্ধটি পর্যালোচনা করে বেশ কিছু বিষয় অনুধাবন করা যায়। আধ্যাত্মিক জীবনে নারীরা পুরুষের সমকক্ষ তা বলাবাহুল্য। নারীরা ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নারীরা সেসময়ে তাঁদের ভক্তি, নিষ্ঠাও সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। থেরীগাথায় তাঁদের সাহিত্য বোধ, শিক্ষা ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে।

উৎসের সন্ধানে

১. সুকোমল চৌধুরী : ‘গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন’, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৪, পৃ. ১৮৯
২. সুকোমল চৌধুরী : ‘মহামানব গৌতম বুদ্ধ’, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৪, পৃ. ২৪৫
৩. শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাস্থবির : ‘বিনয়পিটকে চুলবর্গ’, মেরাংলোয়া সীমা বিহার রামু, কক্সবাজার, ২০০০, পৃ. ৩৬৬
৪. ঐ, পৃ. ৩৬৭
৫. বুদ্ধবংশ ভদন্ত ভিক্ষু : ‘বিনয় পিটকে পারাজিকা’, (অনুবাদক), চট্টগ্রাম, প্রজ্ঞাবংশ সদ্ধর্ম গ্রন্থ প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ১৪, ৫৭, ৯৬, ১৩২
৬. ঐ, পৃ. ২-৫৩
৭. মহাস্থবির, ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ, ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ (বাংলা ই- ত্রিপিটক), রাজভবন বিহার-রাঙা মাটি, পৃ. ৫৪-৭৭
৮. ঐ, পৃ. ২৭৮
৯. ভিক্ষু, শিল্পভদ্র, থেরীগাথা, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৫৭, পৃ. ৩
১০. ঐ, পৃ. ৬

তথ্যের সন্ধানে

বাংলা

১. সুকোমল চৌধুরী : ‘গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন’, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৪
২. সুকোমল চৌধুরী : ‘মহামানব গৌতম বুদ্ধ’, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৪
৩. বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী : ‘বৌদ্ধ সাহিত্য’, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫
৪. স্বামী বিদ্যারণ্য : ‘বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম’, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই, ১৯৯৯

মগনলাল মেঘরাজ : ফেলু কাহিনির এক দুর্ধর্ষ প্রতিনায়ক

শাখী ঘোষ

গোয়েন্দাকাহিনির প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালীন। গোয়েন্দাকাহিনি পাঠে পাঠক একইসঙ্গে নিটোল গল্পের পাশাপাশি রোমাঞ্চের আস্বাদও পেয়ে থাকেন। যে কোনও গোয়েন্দাকাহিনির মূল ভিত্তি হল অপরাধ আর মূল উদ্দেশ্য হল অপরাধীকে শনাক্ত করা। কাহিনিতে এই শনাক্তকরণের কাজটি করে থাকেন কাহিনির প্রধান চরিত্র তথা গোয়েন্দা চরিত্রটি। গোয়েন্দাকাহিনিতে গোয়েন্দাই নায়ক আর অপরাধী প্রতিনায়ক। এই দুই চরিত্রের ইঁদুর-বেড়াল খেলার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে গোয়েন্দাকাহিনির মেদ-মাংস। গোয়েন্দাকাহিনির স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই পাঠকের নজর কেড়ে নেয় গোয়েন্দা চরিত্রটি আর পাঠকের সর্বাপেক্ষা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাগীদার হয় অপরাধী চরিত্রটি। তবে, লেখক কিন্তু উভয় চরিত্র নির্মাণেই মনোযোগী হয়ে থাকেন। বলা ভালো গোয়েন্দা চরিত্র অপেক্ষা অপরাধী চরিত্র অঙ্কনে কিঞ্চিদাধিক যত্নবান হন। অপরাধীকে ধূর্ত ও বুদ্ধিমান করে তোলাই তার উদ্দেশ্য। কারণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই গোয়েন্দার কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। আর এই প্রতিবন্ধকতার মাত্রা ও তাকে লঙ্ঘন করার সামর্থ্য ও পটুত্বেই গোয়েন্দার কৃতিত্বের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। তাই বলা যায়, গোয়েন্দাকাহিনিতে যতটা গুরুত্বপূর্ণ অপরাধীকে প্রমাণসহ চিহ্নিত করা গোয়েন্দা চরিত্রটি, ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ অপরাধকারী ক্রিমিনাল চরিত্রটি। এই ক্রিমিনাল ও ক্রাইম ছাড়া কোনো গোয়েন্দাকাহিনি গড়ে উঠতে পারে না।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ডিটেকটিভ উপন্যাসের জন্মের অনেক আগে থেকেই বৈদিক, সংস্কৃত, বৌদ্ধ, জৈনসাহিত্যেও গোয়েন্দাকাহিনি এবং বেশ কিছু দুর্ধর্ষ অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে 'চোর' বোঝাতে 'স্তায়ু' শব্দটি ব্যবহৃত হত। আবার, প্রবঞ্চিত, প্রবঞ্চক বোঝাতে 'ধূরতি' শব্দ ব্যবহৃত হত, আর

'কিতব' শব্দটি ব্যবহৃত হত 'জুয়াড়ী' অর্থে। সংস্কৃত সাহিত্যে 'খুনি' বোঝাতে 'আততায়িন' শব্দটি পাওয়া গেল। আর 'চোর' বোঝাতে 'চউর' ছাড়াও 'লোপ্তৃ' ও 'লোপত্র' শব্দ দুটির প্রয়োগ দেখা গেল। প্রথম শব্দের অর্থ ছিনতাইকারী চোর আর দ্বিতীয় শব্দের অর্থ 'চোরাইমাল'। ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম রচিত 'চন্ডীমঙ্গল' এবং ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এও গোয়েন্দা, অপরাধ ও অপরাধীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন পুলিশি কাহিনি দিয়ে গোয়েন্দাকাহিনি রচনার সূত্রপাত হল, সে সময় কাহিনিতে অপরাধ হিসেবে উঠে এসেছে ঠগীদের উৎপাত, সরকারি নথি জাল, দলাদলি জনিত হত্যাকাণ্ড, অবৈধ সম্পর্কজনিত খুন, কৃত্রিম মুদ্রা তৈরির প্রসঙ্গ। তবে, এই সময়ের গোয়েন্দাকাহিনিগুলোতে অপরাধী চরিত্র নির্মাণ অপেক্ষা ঘটনার জাল বুননের দিকেই অধিক আগ্রহ ছিল লেখকদের। অ্যাডভেঞ্চারের তুলনায় মানব মনস্তত্ত্ব ও গোয়েন্দা-অপরাধীর বুদ্ধির খেলাকে গোয়েন্দাকাহিনিতে প্রথম প্রাধান্য দিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তার ব্যোমকেশ সিরিজের কাহিনিগুলোতে। সৃষ্টি করলেন প্রফুল্ল রায় ('পথের কাঁটা), অমরেশ রাহা ('চিত্রচোর')-র মতন অপরাধী চরিত্রদের। তারপর, কোনান ডয়েল, অগাথা ক্রিস্টির অনুরাগী পাঠক সত্যজিতের আবির্ভাব ঘটল গোয়েন্দাকাহিনির লেখক হিসেবে। সত্যজিৎ জানতেন, তার কাহিনির টার্গেট রিডাররা মূলত কিশোর-কিশোরী। তাই তাঁর গোয়েন্দাকাহিনিতে অপরাধের বৈচিত্র্য সেরকম চোখে পরে না। তার ফেলুদাকেন্দ্রিক গোয়েন্দাকাহিনিগুলোতে অপরাধের বিষয় মাত্র তিনটি—চুরি, খুন, অপহরণ। অপরাধের এই সীমিত পরিসরেও সত্যজিৎ বহু বিচিত্র অপরাধী সৃষ্টি করলেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বনবিহারী সরকার ('বাদশাহী আংটি'), মন্দার বোস, অমিয়নাথ বর্মণ ('সোনার কেল্লা'), নরেশচন্দ্র পাকড়াশী ('বাক্স রহস্য'), মহাবীর চৌধুরী ('গোরস্থানে সাবধান'), মি. গোরে ('বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'), মগনলাল মেঘরাজ, মণিমোহন সমাদ্দার ('সমাদ্দারের চাবি), রমেন ব্রহ্ম (ভূস্বর্গ ভয়ংকর'), বিলাস মজুমদার ('হত্যাপুরী'), হীরালাল সোমানি ('টিনটোরেটোর যীশু') প্রমুখ।

ফেলুদার প্রতিদ্বন্দ্বী অপরাধী চরিত্রগুলোর মধ্যে যে চরিত্রটি শুধু পাঠক নয়, স্বয়ং গোয়েন্দাকেও বারবার মুগ্ধ করেছে সে হলো মগনলাল মেঘরাজ। তাই ফেলুদা বলেছে—"এর মতো ধুরন্ধর প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়েও আনন্দ।" কথক তোপসেও ফেলুদার সমস্ত প্রতিপক্ষের মধ্যে এই প্রতিনায়কটিকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন—"আর কতবার এই লোকটার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে প্রতিপক্ষ হিসাবে এর চেয়ে সাংঘাতিক আর কাউকে কল্পনা করা যায় না।" অনুমান করা যায় যে, মগনলাল চরিত্রটি হয়তো লেখকেরও খুব পছন্দের ছিল। তাই থ্রি মাস্কেটিয়াস ও সিধু জ্যাঠা ছাড়া এই একটিমাত্র চরিত্রকেই তিনি একাধিক ফেলু কাহিনিতে ব্যবহার করেছেন—'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'যত কান্ড কাঠমান্ডুতে' ও 'গোলাপী মুক্তা রহস্য'। এই তিনটি কাহিনি মিলিয়ে আমরা তার যে পরিচয় পাই, তাতে বোঝা যায়, সে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, বিত্তবান এক অসাধু ব্যবসায়ী। মহাজনী ব্যবসার আড়ালে সে নানারকম চোরাকারবারে যুক্ত। বিভিন্ন মূল্যবান আর্ট সামগ্রী, হীরে-জহরত, মণি-মুক্তো সে চোরাপথে চড়াদামে বিদেশে বিক্রি করে। শুধু তাই নয়, 'যত কান্ড কাঠমান্ডুতে' আমরা তাকে জাল ওষুধ ও ড্রাগের ব্যবসা করতে দেখি।

একজন দুঁদে ব্যবসায়ীর যা গুণ থাকা দরকার, মগনলালের তা পূর্ণমাত্রায় ছিল। সে জানত, বেআইনি ব্যবসা করতে হলে রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনকে হাতে রাখা প্রয়োজন। প্রশাসনের এত উচ্চস্তর অবধি তার যোগাযোগ এবং অপরাধ জগতের সঙ্গে তার এতটাই চেনাজানা ছিল যে, পুলিশও তাকে ঘাঁটাতে ভয় পেত। তাই 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ দেখি, ফেলুদা ঘোষাল বাড়ির

গণেশ চুরির বিষয়ে তদন্ত করছে জেনে স্থানীয় থানার সাব-ইন্সপেক্টর মি.তেওয়ারি তাকে সাবধান করে বলেন, পুলিশকে বোকা বানাতে সে পারদর্শী। তার বেনারসের ও কলকাতার বাড়িতে দু'বার সার্চ হলেও পুলিশ কিছুই খুঁজে পায় না। অনুমান করা যায় যে, সার্চ হবার খবর আগাম পেয়ে সে সমস্ত বেআইনি দ্রব্য লুকিয়ে ফেলতে পেরেছিল। একজন পাকা চোরাকারবারির মতনই মগনলালের নিজস্ব পেশাদার, ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনী আছে। তার অঙ্গুলিলেহনে তারা যে কোনও কাজ করতে পারে। কারোর উপর নজরদারি করা থেকে শুরু করে কাউকে আক্রমণ করা, এমনকী হত্যাও করতে পারে। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' এ দেখি, ফেলুদা ঘোষাল বাড়িতে গণেশ চুরির বিষয়ে তদন্ত করছে, সে কথা জানা মাত্রই মগনলাল তার পিছনে টিকটিকি লাগিয়ে দিয়েছে। বেনারসে ফেলুদার গতিবিধির সব খবরই সে রাখে। 'গোলাপী মুক্তা রহস্য'তে আবার দেখি তারই পোষা গুন্ডাবাহিনী ট্রেনে জয়চাঁদ বাড়ালের মাথায় লাঠি মেরে তার সব জিনিস লণ্ডভণ্ড করেছে, ফেলুদাকে তার নিজের বাড়িতেই অজ্ঞান করে আলমারিতে রাখা গোলাপি মুক্তো চুরি করেছে। আবার, 'যত কান্ড কাঠমান্ডুতে' সে অনীকেন্দ্র সোমকে কলকাতার হোটেলে লোক লাগিয়ে খুন করেছে। শুধু তাই নয়, যখন সে জানতে পেরেছে, অনীকেন্দ্র ফেলুদার সাথে যোগাযোগ করেছিল, তখন তাকে বিপথে চালিত করতে সে তার শাগরেদ বাটরাকে ব্যবহার করেছে। এই কাহিনিতে ফেলুদা, তোপসে ও জটায়ুকে অপহরণ করে তাঁদের একটা গুরুতর শাস্তি দিয়ে মগনলাল তার প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। যদিও ফেলুদার তৎপরতায় তা সম্ভব হয়নি। তবে, মগনলাল কিন্তু প্রথমেই চুরি, খুন, অপহরণে যায় না। সে প্রথমে একজন ক্রেতা হিসাবে বিক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য দেবার কথা বলে। 'জয় বাবা ফেলুনাথ'এ সে অষ্টধাতুর গণেশের পরিবর্তে ন্যায্যমূল্য দিতে চেয়েছে। আবার, 'গোলাপী মুক্তা রহস্য'তে মুক্তোর পরিবর্তে চল্লিশ হাজার টাকা দেবার কথা বলেছে। কিন্তু, তারা যখন তাতে অসম্মত হন, তখন ব্যবসায়ী সত্তার খোলস ছেড়ে তার অপরাধী সত্তাটি বেড়িয়ে আসে।

শুধু অর্থ ও বল নয়, মগনলালের মতন অপরাধীর আর এক অস্ত্র তার বুদ্ধি। অপরাধ করার তার যে পরিকল্পনা সেগুলোর দিকে নজর দিলে বোঝা যায়, সে সমস্ত স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে এমন পরিকল্পনা করত, যাতে সহজে প্রতিপক্ষকে বোকা বানিয়ে কর্ম সিদ্ধি করা যায়। তার পরিকল্পনার উৎকৃষ্টতম নিদর্শন 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর মছলিবাবা। সে জানত, বারাণসী হিন্দুদের পুণ্যতীর্থ। সেখানে বহু অন্ধ ধর্মবিশ্বাসী মানুষের বসবাস। তাই সে চেয়েছিল এমন এক মানুষকে তার অপরাধের সঙ্গী করতে, যাকে সেখানকার মানুষজন বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবে না। তাই সে জেল পালানো এক দাগী আসামীকে সাধু সাজিয়ে পাঠায়। অভয়াচরণ চক্রবর্তী নামে জনৈক ব্যক্তির ভক্তিপরায়ণতায় তার অলৌকিক ক্ষমতার কথা সারা শহরে ছড়িয়ে পরে। বারাণসীর অন্যান্য বাসিন্দাদের মতন মগনলালও মছলিবাবার কাছে যেত এবং নানা উপাচার তাকে দক্ষিণা হিসাবে দিত। কিন্তু, সেই উপাচারেই লুকানো থাকতো তার নির্দেশ। মগনলাল তার ছেলে সূরযলালের (রুকুর বন্ধু) কাছ থেকে জানতে পারে, সে গণেশের মূর্তিটা সিংহাসনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। তখন সে স্থির করে, দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের পর গঙ্গাবক্ষ থেকে সে এই মূর্তিটা চুরি করবে আর তাকে এ কাজে সহযোগিতা করবে মছলিবাবা। তাই মগনলালের নির্দেশেই মছলিবাবা ঘোষণা করে সে দশমীর দিন গঙ্গায় সাঁতার কেটে বারাণসী পরিত্যাগ করে চলে যাবে। কিন্তু, এই নিঁখুত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায় ফেলুদার মগজাস্ত্রের আঘাতে। 'যত কান্ড কাঠমান্ডুতে'-তে মগনলালই বাটরাকে নির্দেশ দিয়েছিল যমজ বাটরার আবহ তৈরি করতে, যাতে ফেলুদা নকল বাটরাকে অপরাধী ভেবে তার সন্ধান করতে গিয়ে সময় নষ্ট করে ও দিকভ্রান্ত হয়। শুধু তাই নয়, কাঠমান্ডুর হোটেলে

সে এই যমজ বাটরার তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। বাটরা ওরফে জগদীশকে তার ডান হাত হিসেবে পরিচয় করে দেবার সাথে সাথে সে আর এক বাটরার অস্তিত্বের কথা শুনে চিন্তিত হবার ভান করেছে এবং বলেছে—"সে লোক যদি আপনার দোস্ত হয়, তাহলে টেল হিম টু বি ভেরি কেয়ারফুল।"[৩] এখানে মগনলালের অভিনয় ক্ষুতা প্রশংসা করার মতন।

অপরাধী হিসাবে মগনলালের আর এক বৈশিষ্ট্য, সে জানে প্রতিপক্ষের উপর কিভাবে স্নায়ুর চাপ তৈরি করে তাকে কিছুটা দুর্বল করে দেওয়া যায়। এই খেলাটা সে বারবার খেলেছে লালমোহনবাবুর সাথে। 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ সে নাইফ থ্রোয়িং-এর মতন জীবনবাজি ধরা খেলার ঘুঁটি বানিয়েছে লালমোহনবাবুকে। শুধু তাই নয়, 'যত কান্ড কাঠমান্ডুতে' লালমোহনবাবুর চায়ে সুগার কিউবের বদলে এল এস ডি মিশিয়ে তার সাথে এক ঘৃণ্য প্র্যাকটিকাল জোক করেছে। এই দুটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়, মগনলাল সমগ্র পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। অর্থ, বল ও ক্ষমতা—এই ত্রিবিধ শক্তির সম্মিলিত অবস্থান মগনলালকে অহংকারী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ করে তুলেছে। তাই তার এই প্রবৃত্তি। আর এই প্রবৃত্তি থেকেই সে ফেলুদাদের নিজের বাড়িতে ডেকে এনে যেমন হুমকি দিয়েছে, তেমনি ফেলুদাকে তার বাড়িতে গিয়েও হুমকি দিয়েছে। 'গোলাপী মুক্তা রহস্য'-তে দেখি সে মুক্তো নেবার জন্য ফেলুদার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়ে তাকে বলেছে তিনদিনের মধ্যে মুক্তো না পেলে সে তা আদায় করে নেবে। সবাই জানতো মগনলাল তা পারে। আর সে কারণেই জটায়ু তোপসের সহায়তায় আসল মুক্তোর জায়গায় নকল গোলাপী মুক্তো রেখে দেয়। মগনলালের আর এক বৈশিষ্ট্য যে, সে ঘটনার প্রারম্ভেই জানিয়ে দেয় যে, সে অপরাধ করেছে বা করবে, যদি ফেলুদা পারে তাকে প্রমাণসহ গ্রেফতার করুক বা তার প্রতিরোধ করুক। 'গোলাপি মুক্তা রহস্য' গল্পে দেখি সে ফেলুদাকে বলে—"আমার লোক তাছাড়া আর কার লোক হবে বলুন। আপনি এভাবে বলবেন না, মিস্টার। আপনার কোন প্রমাণ নেই যে, আমার লোক কাজটা করেছে।"

মগনলাল দেখতে সুপুরুষ না হলেও তার ব্যক্তিত্বটি আকর্ষণীয়। তার পোশাক এবং সর্বোপরি তার কণ্ঠস্বর তার ব্যক্তিত্বে এক অন্যমাত্রা যোগ করেছে। ফেলু কাহিনিতে আমরা মগনলালকে প্রথম পাই 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ বারাণসীতে মছলিবাবার দরবারে। সাদা পাঞ্জাবি আর সাদা টুপি পরিহিত মগনলালকে দেখেই বোঝা গেছিল যে, সে বেনারসের এক বিত্তশালী ব্যবসায়ী। তার পাঞ্জাবির বোতামগুলো হীরের আর তার দশ আঙুলে দশটি মূল্যবান পাথরের আংটি। এই সময় সে ধুতির উপর পাঞ্জাবি পড়ত। কিন্তু, 'যত কান্ড কাঠমান্ডুতে' এসে আমরা তাকে ধুতির উপর শেরওয়ানি পরতে দেখি। আর 'গোলাপী মুক্তা রহস্য'তে তার নবতম সংযোজন হীরের কানের দুল। অনুমান করা যায়, বারবার পুলিশের হাতে ধরা পরলেও তার ব্যবসায় বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি। উপরন্তু তা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আসলে ফেলুদা 'গোরস্থানে সাবধানে'-তে মহাবীর চৌধুরী সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন যে এদের মতন মানুষদের জেলে আটকে রাখা যায় না, সেই একই কথা মগনলাল সম্পর্কেও সত্য। মগনলালের পদবি মেঘরাজ। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, সে গুজরাটের বাসিন্দা। কারণ, গুজরাটে মেঘরাজ নামে একটি সদর শহর আছে। এছাড়া তার বসার ঘরে অতিথিদের বসার জন্য যে নীচু চেয়ারগুলো ছিল, সেগুলো গুজরাটেই দেখা যায়। অন্যত্র লেখক আবার তার প্রাদেশিকতা সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন—"এক ভদ্রলোক পশ্চিমা কিংবা মারোয়াড়ি হবে।"[৫] অর্থবান এই মানুষটির বারাণসি শহরের কেন্দ্রস্থলে দুটি বাড়ি। 'গোলাপী মুক্তা রহস্য'-তে এসে আমরা জানতে পারি, কলকাতায় তার বাড়ি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে। শুধু তাই নয়, কলকাতার বড়ো বাজারে তার ব্যবসাও আছে। অন্যান্য ব্যবসায়িদের মতনই সেও ভগবান

ভক্ত। তার নিজের ঘরে প্রচুর দেব-দেবীর ফটো সাজিয়ে রাখা থাকে। তার বেনারসের বাড়িতে তিনটি গোরু আছে। হিন্দু ধর্মে গোরু পুণ্যপ্রাণী। তার সেবা করলে পুণ্য হয়। সে আবার সংসারীও। তার স্ত্রী, পুত্রের উল্লেখ আমরা পাই 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ। মগনলাল শিক্ষিতও। সে কলেজে উমানাথ ঘোষালের সহপাঠী ছিল। হিন্দী, ইংরাজী ও বাংলা তিনটি ভাষাতে সে সমান স্বচ্ছন্দ। যদিও বাংলা উচ্চারণে তার টান আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বহু সমালোচক মগনলালকে প্রফেসর মরিয়ারটির সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু, আমার মতে উভয়ের বিস্তর পার্থক্য। বিদ্যা-বুদ্ধি থেকে শুরু করে অপরাধ করার পদ্ধতি সবই তাদের আলাদা। এ প্রসঙ্গে সমালোচক উদয় রতন মুখার্জি তাঁর 'এ বি সি ডি ভার্সেস ক্রিমিন্যালস' প্রবন্ধে বলেছেন—

> সত্যজিৎ হয়তো মরিয়ারটি চরিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই মগনলালকে তৈরি করেছিলেন, যেমন মাইক্রফট হোমসের আদলে গড়েছিলেন সিধু জ্যাঠাকে। কিন্তু, মরিয়ারটির মত বিদগ্ধ, উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন, মেধাবী, চূড়ান্ত হৃদয়হীন, অসামাজিক ভিলেন হিসাবে মগনলালকে বানাতে চাননি তিনি। মগনলাল যেন অনেকটাই আমাদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে অবস্থান করে। কুটিলতা ও হিংস্রতা ছাড়া সে খুব একটা জটিল চরিত্র নয়।

তবে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সত্যজিৎ মগনলালের মতন আর দ্বিতীয় কোনো খল চরিত্র তৈরি করেননি। সত্যজিৎ 'জয় বাবা ফেলুনাথ' লিখেছিলেন ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আর 'যত কান্ড কাঠমান্ডুতে' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে। 'সোনার কেল্লা'র সাফল্যের পর সত্যজিৎ 'জয় বাবা ফেলুনাথ' চলচ্চিত্রায়িত করেন। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' চলচ্চিত্র হিসাবে মুক্তি পায় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি। 'সোনার কেল্লা'র মতই এই চলচ্চিত্রিটিও সাফল্যের মুখ দেখেছিল। এখানে প্রতিনায়ক হিসাবে মগনলালের ভূমিকায় উৎপল দত্তের অভিনয় দর্শক মহলে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল। হয়তো সেই কারণেই ঠিক পরের বছর সত্যজিৎ 'যত কান্ড কাঠমান্ডুতে' মগনলালের পুনরাবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন।

পরিশেষে বলার, সত্যজিৎ তাঁর গোয়েন্দাকাহিনিতে গোয়েন্দা চরিত্রটি যতটা মনোযোগ দিয়ে এঁকেছেন, ঠিক ততটাই মনোযোগ দিয়েছিলেন অপরাধী চরিত্র অঙ্কনে। তাঁর বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ অপরাধীদের মধ্যে মগনলাল নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। মগনলাল আগেও অপরাধ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। সে মহীতোষ সিংহ রায়, মহেশ চৌধুরী, রঞ্জন মজুমদারের মতন নয় যে নিজের অপরাধের কথা ভেবে অনুতপ্ত হবে। মণিমোহন সমাদ্দার, সুনীল তরফদার, বিশ্বনাথ মজুমদারও নয় যে শুধু অর্থের লোভে খুন করবে। ঠান্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে সে অপরাধ করে তার ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। সে well informed অর্থাৎ সব বিষয়ে খবর রাখে। তার মেধা, বুদ্ধি (দুর্বুদ্ধি) যে-কোনো শিক্ষিত মানুষের সমতুল। মানুষকে খুন করার তুলনায় বুদ্ধি দিয়ে কাজ হাসিল করাকেই সে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর সে কারণেই সে পাঠকের কাছে অপরাধী হিসাবে এত আকর্ষণীয়।

উৎসের সন্ধানে

১. সত্যজিৎ রায় : 'ফেলুদা সমগ্র', ১ম খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ২১১
২. তদেব : পৃ. ৫৩৫
৩. তদেব : পৃ. ১২১
৪. তদেব : ২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৫৪৩
৫. উৎস-১, পৃ. ৫৪৩

নন্টে ফন্টে : শিশু মনের বিকাশ

দীপাঞ্জনা দেব

অন্যান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে নারায়ণ দেবনাথ (১৯২৫-২০২২)-এর রচনাশৈলীর প্রথম যে পার্থক্য, বা বলা যেতে পারে তাঁর স্বাতন্ত্র্য সেটি হল তাঁর রচনা কমিকস-এর ছবির মধ্যে দিয়ে কথাশিল্প সৃষ্টি, গল্প বলা। তিনি যেসব কার্টুন স্ট্রিপের একটা প্যানেলের মধ্যে দিয়ে একটা গল্প ছোটো আকারে বর্ণনা করতেন, তেমন কমিকস-এর মধ্যে দিয়ে ছোটোদের উপযোগী সহজ, সরল সংলাপের মধ্যে দিয়ে বুনতেন নানা কথার কাঁথা। সাধারণত যে যে কথা আমরা প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ব্যবহার করি, সেই ধরণের উক্তি বা কথাই তাঁর রচনশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য'।[১] নারায়ণ দেবনাথ 'নন্টে ফন্টে' সিরিজে আমাদের যা উপহার দিয়েছেন তা হল—

১. একজোড়া চরিত্র, দুজনেই প্রায় সমবয়সী, নাম তাদের 'নন্টে ফন্টে' অর্থাৎ নামের দিক থেকে দুজনেরই গভীর সাযুজ্য, যেমনটি আগে তিনি এর আগে সৃষ্টি করেছিলেন হাঁদা ভোঁদার মতো দুটি চরিত্র। বাঁটুলকে যেমন কমিকসে স্বদেশপ্রেমী রূপে দেখা যায়, তেমনি হাঁদা, ভোঁদা, নন্টে ফন্টের মধ্যেও এক ধরনের আত্মীয়তা, একটা root এর প্রতি আকর্ষণ চোখে পড়ে। তারা আত্মকেন্দ্রিক নয় তারা global নয়, এরা প্রত্যেকে বাঙালি।[২]

২. নন্টে ফন্টের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে কিশোর 'ভারতী' পত্রিকায়, সালটা হল ১৯৬৯। তার মানে নন্টে ফন্টের আত্মপ্রকাশ প্রায় সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের মুখে।

৩. ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ এই দুই বৎসর কাল এই দুই কমিক চরিত্রের আদল ছিল 'হাঁদা ভোঁদা'র অনুরূপ।

৪. ১৯৭২ সাল থেকে নন্টে ফন্টের চারিত্রিক পরিবর্তন সূচিত হল। এদের হোস্টেল জীবন উপস্থাপিত হল, যুক্ত হল কেল্টু নামীয় এক চরিত্র, আবির্ভাব হল সুপারিনটেন্ডেন্টের। ইনি হলেন পাতিরাম হাতি। আরো পাই রাঁধুনিকে।

৫. নন্টে ফন্টে হল ছবির মাধ্যমে গল্পকথন। গল্পকথন বললে বুঝিবা আতিশয্য দোষে দুস্ট হবার সম্ভাবনা রয়ে যায়। নারায়ণবাবু ঘটনাকে বিবৃত করেন কথোপকথনের মাধ্যমে। সংযম গুণ সেখানে প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনো অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য প্রকাশের পরিসর সেখানে থাকে না। মূল ঘটনা বা পরিকল্পনা রূপায়িত হয় ছোটো ছোটো সংলাপের মাধ্যমে।

৬. কথায় বলে Made for each other। সংলাপের উপযুক্ত চিত্র অথবা বিপরীত ভাবে বলতে গেলে চিত্রের উপযোগী সংলাপ 'পরিপূরক' শব্দটি যেন নারায়ণ দেবনাথের কমিক্সের প্রসঙ্গেই সুপ্রযোজ্য যেমন ছবি তেমন লেখা। ছবির পরিপূরক সংলাপ, আবার সংলাপের পরিপূরক কথোপকথন। নিছক কথোপকথন উপস্থাপিত হলে তা কি তেমনভাবে পাঠককে আকৃস্ট করতে পারত একইভাবে সংলাপের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ইলাসট্রেশান না থাকলে তা যেমন আকর্ষণহীন হত, সংলাপ ব্যতিরেকে নিছক ইলাসট্রেশান তেমন আকর্ষণীয় হত না কোনো মতেই। লেখক সংলাপ এবং সেগুলির চিত্রায়ন উভয় ক্ষেত্রেই অকল্পনীয় স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, স্বাক্ষর রেখেছেন মুন্সিয়ানার।

৭. শিশু মনস্তত্ত্ব ভালো বুঝতেন নারায়ণবাবু। কী ধরনের দুস্টুমি বুদ্ধি তাদের মাথায় আসে, কীভাবে তারা তাদের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে সেসব তাঁর ভালো মতো জানা ছিল। কস্ট কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি তাঁকে। এক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁর সহায়ক হয়েছিল। বয়স বাড়লে কী হবে নারায়ণবাবুর মনটা ছিল শিশুর মতো। কিংবা বলা চলে তিনি শিশুদেরই একজন হয়ে উঠেছিলেন। তাই তাদের মনের খবর জানতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি।

৮. সংগীতের ক্ষেত্রে একজন গান রচনা করেন, একজন তাতে সুরারোপ করেন আর একজন সেই সুরারোপিত গান নিজ কণ্ঠে ধারণ করে পরিবেশন করেন। তিনজনের সমন্বয়ে একটি গানের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু যদি এমন হয় যিনি গান রচনা করলেন তিনি সুরারোপ করলেন আবার তিনিই তা গাইলেন, একেবারে সোনায় সোহাগা নয় ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটে যায়। নারায়ণবাবু যদি ইলাসট্রেশান করতেন আর লেখাগুলি হত দ্বিতীয় কারুর, সেক্ষেত্রে হয়তো বাঞ্ছিত সাফল্য মিলত না কিন্তু লেখক এবং চিত্রকর অভিন্ন হওয়ায় লেখার বক্তব্যের সঙ্গে চিত্রের অসাধারণ সমন্বয় ঘটেছে।

৯. শিশুদের লেখায় দুটি ত্রুটি সহজেই চোখে পড়ে।
১. অবাস্তব কল্পনার আধিপত্য ২. সুগার কোটেড কুইনাইনের মতো শিশুদের ছলে বলে কৌশলে শিক্ষাদান। এই মাস্টারি করার মানসিকতা শিশু সাহিত্য রচয়িতাদের যেন মজ্জাগত। সৌভাগ্যবশত নারায়ণবাবু এই দুটি ত্রুটি থেকেই মুক্ত থেকেছেন। বলা ভাল মুক্ত থাকতে পেরেছেন। তাঁর উপস্থাপনে কোনও অস্বাভাবিকত্ব নেই, কস্ট কল্পনার উপস্থিতি ঘটেনি। একান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই তিনি আশ্রয় করেছেন আর উপদেশদান কিংবা জ্ঞানদানের প্রলোভনটুকুকে অনায়াসে জয় করেছেন।

১০.নারায়ণবাবুর উদ্দেশ্য কী ছিল উদ্দেশ্য ছিল শিশুপাঠককে নির্মল আনন্দ দান। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর রচনা এবং চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে শিশু নিজেকে আবিষ্কার করুক। নন্টে ফন্টের সঙ্গে নিজেকে আইডেন্টিফাই করুক। এক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছেন। শিশুপাঠক তাঁর রচনায় নিজেকে খুঁজে পায়। তাঁর চিত্রিত চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নেয়। তাতেই নারায়ণবাবুর সৃষ্টির এতখানি জনপ্রিয়তা এবং অভাবনীয় সিদ্ধিলাভ।

১১. নন্টে ফন্টে এমন দুই কিশোর, যারা প্রায়ই একে অন্যের পিছনে লাগে, মজা করে। ১৯৭২ সালে যোগ হয় এদের হোস্টেল জীবন, যুক্ত হন পাতিরাম হাতি, কেল্টুদার মত চরিত্র।[৩] এবারে আমরা নারায়ণবাবুর রচিত কয়েকটি এপিসোড নিয়ে আলোচনা করব।

১. সময়টা পুজোর ছুটি। স্থান স্কুল বোর্ডিং। বোডিং-এর কর্মচারীর হেপাজতে থাকা কেক থেকে কয়েকটি সরাবার পরিকল্পনা করে নন্টে। ফন্টে জানতে চায় কিরূপে তা সম্ভব নন্টে কর্মচারীটিকে বলে তাকে কে যেন খুঁজছে। কর্মচারীটি অনুসন্ধানকারীর সন্ধানে গেলে নন্টে কয়েকটা কেক চুরি করে নেয়। কর্মচারীটি ফিরে আসে কাউকে না দেখে। ধরা পড়ে কেক চুরি। সে বোঝে এ নন্টে ফন্টের কর্ম। সে গিয়ে হোটেলের সুপারের কাছে নালিশ জানায়। বলে নন্টে ফন্টে তার চোখে ধুলো দিয়েছে। নন্টে ফন্টে অস্বীকার করে বলে তারা কারোর চোখেই ধুলো দেয়নি। সুপার যুক্ত করে নেন কর্মচারীটির চোখ নাকি লাল হয়ে আছে। গুঁইবাবুকে সুপার প্রশ্ন করেন তাঁর চোখে নন্টে ফন্টে সত্য সত্যই ধুলো দিয়েছে কিনা। গুঁইবাবু একবার বলেন আজ্ঞে হাঁ পরে বলেন না। সুপার বুঝে উঠতে পারেন না তার কথা। গুঁইবাবু তখন জানান আক্ষরিক অর্থে তার চোখে ধুলো দেওয়া হয়নি। তিনি কথাটা আলংকারিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। সুপার আবার হতভম্ব হন চোখে অলংকার কীরূপে ব্যবহৃত হয় যাই হোক শেষ পর্যন্ত সুপার ব্যাপারটা বোঝেন। জানান নন্টে ফন্টের কেক সরানোর বিরুদ্ধে পরে ব্যবস্থা নেবেন। সকলে সুপারের ঘর ছাড়ে। এরপর শোনা যায় চিৎকার চেঁচামেচি ছেলেদের ঘর থেকে। সুপার ছেলেদের ঘরে ঢোকেন অনুসন্ধানের জন্য। ছেলেরা জানায় হট্টগোলের কারণ একটা বই। পুজোর ছুটিতে বই পড়ার জন্য চেঁচামেচি। সুপার বিস্মিত হয়ে বইটি দেখতে চান। বইটি দেখে সুপার খুশি হন। কেক চুরির অপরাধ ক্ষমা করে দেন। বইটি ছিল কিশোর ভারতী। নন্টে ফন্টে জোর বাঁচা বেঁচে যায়।

এই এপিসোডের বৈশিষ্ট্য হল কৌশলে কিশোর ভারতী পত্রিকার প্রচার। বলা যায় সুকৌশলে। দ্বিতীয়ত গুঁইবাবুর কথিত চোখে ধুলো দেওয়া সুপারের আক্ষরিক অর্থে তা গ্রহণ এবং সেজন্য ছেলেদের জিজ্ঞাসাবাদ, নন্টে ফন্টের যথারীতি তা অস্বীকার করা। গুঁইবাবুর শেষে অলংকার ব্যবহারের কথা বলা, সেক্ষেত্রেও সুপারের আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ এবং তজ্জনিত সমস্যার সৃষ্টি। নন্টে ফন্টের দুটি উপস্থিত বুদ্ধির কথা না বললেই নয়। এক, গুঁইবাবুকে কেউ একজন তাকে খুঁজছে বলে তাকে বাইরে আনা আর সেই সুযোগে তাদের ছটি কেক চুরি, দ্বিতীয়ত ছেলেদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সুপার উপস্থিত হলে তারা দিব্যি কিশোর ভারতী দেখিয়ে জানিয়ে দেয় বইটির কারণেই চেঁচামেচি। কেক চুরি অপরাধ নিশ্চয়ই কিন্তু দেখা যাচ্ছে নন্টে ফন্টে নিজেরা খাবে বলে কেক চুরি করেনি, বন্ধুদের সঙ্গে চুরি করা কেক ভাগাভাগি করে নিয়েছে। তাই এক্ষেত্রে চুরিটা তেমন গুরুতর অপরাধ হয়ে ওঠেনি। নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন লেখক তথা এই এপিসোডটির পরিকল্পনায়।

২. নন্টে নিজের হাতে ক্যামেরা বানিয়েছে। নতুন ক্যামেরার উদ্বোধন করতে প্রথম ফন্টের ছবি তুলতে মনস্থ করে, ফন্টে তো খুব খুশি। সে ছবি তোলার জন্য একটা ভালো জায়গা স্থির করে, তারপর সেখানেই দাঁড়ায়। প্রথমে তার একটি ক্লোজ আপ ছবি তোলা হয়। এরপর ফন্টেকে হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়াতে বলে নন্টে। ফন্টে সেই মতো দাঁড়ালে প্রতীক্ষারত ফন্টের মুখে কালো কালি ঢেলে দিয়ে পালায় সে। কালিমালিপ্ত মুখ নিয়ে গজরাতে থাকে ফন্টে। হাসতে থাকে নন্টে। ফন্টে প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবে। কীরূপে ঠিক করে নন্টেকে তার তৈরি ক্যামেরার সাহায্যে

আঘাত করবে। ফন্টে নন্টে মনে করে একজনকে আঘাতও করে বসে ক্যামেরার সাহায্যে। আঘাত হানার পর জানা যায় যাকে আঘাত হানা হয়েছে সে অন্য কেউ। পুলিশ উপস্থিত হয় অকুস্থলে জানায় ঠিক লোককেই আঘাত হানা হয়েছে। যাকে আঘাত হানা হয়েছে সে একজন সোনা চোরাইয়ের কারবারি। ফন্টে জানতে পারে চোরা চালানকারীকে আঘাত হানার জন্য সে পুরস্কৃত হবে। ফন্টে খুব খুশি হয়। সে সংবাদটা নন্টেকে জানায়। সে এও জানায় সে একলা পুরস্কার গ্রহণ করবে না। প্রাপ্ত পুরস্কার দুজনে ভাগাভাগি করে নেবে। ছবি তোলার নাম করে বন্ধুর মুখে কালি ছেটানো একটা চরম দুষ্টামি। আবার ক্যামেরার সাহায্যে চোরাচালানকারীকে অজান্তেই আঘাত করে পুরস্কার প্রাপ্তি এবং সেটি নন্টে ফন্টের সমানভাগে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে উভয়ের সৌহার্দ্যের কথাই প্রমাণিত হয়। এখানে প্রকারান্তরে সৌভাগ্য সুখ অন্যের সঙ্গে বণ্টন করে নেবার পরামর্শ সূক্ষ্ম ভাবে প্রদত্ত হয়েছে। নন্টের নিজের হাতে ক্যামেরা তৈরির কথা বলে এই বয়সীদের সৃজনাত্মক কিছু করার ক্ষেত্রে পরোক্ষে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৩. নন্টের দাদুর হাঁপানিটা বেড়েছে। তাই ডাক্তার ডাকতে হবে। সে ফন্টের শরণাপন্ন হলে দুজনে ডাক্তারবাবুর কাছে হাজির হয়। ডাক্তারবাবু জানালেন তিনি নিজেই নন্টেদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। কারণটা হল নন্টের দাদু একটা লটারির টিকিট কেটেছিলেন। সেটিতে ফার্স্ট প্রাইজ দু'লক্ষ টাকা। কাগজে সেটি দেখে ডাক্তারবাবু নন্টের দাদুকে সংবাদটি দিতে যাচ্ছিলেন। হাঁপানি রুগী তিনি তাই ডাক্তারবাবু তাই তাকে কায়দা করে খবরটা শোনাতে চাইলেন। নন্টের দাদু গড়গড়ি ডাক্তারবাবুকে জানালেন তিনি ভালো নেই। টানটা তাঁর বেড়েছে। শুরু করেন ডাক্তারবাবু, বলেন গড়গড়ি মশাই যদি হঠাৎ দশ হাজার পেয়ে যান তাহলে তিনি কী করবেন। গড়গড়ি জানালেন সেই টাকায় ভালো করে চিকিৎসা করাবো। ডাক্তারবাবু টাকার অঙ্কটা এবার বাড়ালেন। বললেন গড়গড়ি যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা পান তবে গড়গড়ি জানালেন সেক্ষেত্রে মনের মতো তীর্থে ঘুরবেন। এরপরই ডাক্তারবাবু জানালেন, টাকার পরিমাণটা যদি দু'লক্ষ টাকা হয় গড়গড়ির কোনও উত্তেজনা দেখা গেল না। দিব্যি তিনি সুস্থই রইলেন। ভাবলেন ডাক্তারবাবু তাঁর সঙ্গে অহেতুক রসিকতা করছেন। তিনিও সেই মতো জবাব দিলেন সেক্ষেত্রে তিনি অর্ধেক অর্থাৎ এক লক্ষ টাকা ডাক্তারবাবুকেই দিয়ে দেবেন। এই কথা শুনে ডাক্তারবাবু তো বেজায় খুশি। এক লক্ষ টাকা তাঁর করায়ত্ত হবে। ব্যাস, উত্তেজনায় ডাক্তারবাবু একেবারেই অজ্ঞান। গড়গড়িবাবু ডাক্তারবাবুকে চিকিৎসা করানোর জন্য একজন ডাক্তার ডেকে আনতে বললেন। নন্টের মন্তব্য, 'তাজ্জব মাইরি। হেঁপো রুগি দাদু ঠিক টাইট হয়ে বসে রইল, আর টাকা পাবে শুনে উল্টে ডাক্তারবাবুই ফট' অতএব ডাক্তারের জন্য তাদের ডাক্তার ডাকতে ছুটতে হল।

এই এপিসোডের মজাটা হল যে ডাক্তারবাবু ভয় পেয়েছিলেন হঠাৎ করে দু'লক্ষ টাকা লটারিতে জেতার খবরে যদি গড়গড়িবাবুর কিছু ঘটে যায়। বাস্তবে দেখা গেল ডাক্তারবাবুর চিন্তাটা ছিল অমূলক। তিনি নিজেই এক লক্ষ টাকা পাবেন জেনে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।

৪. 'নেপোয় মারে দই' এই প্রবাদ বাক্যটিকে অবলম্বন করে নারায়ণবাবু একটি মজাদার এপিসোড তৈরি করলেন। স্যার খেতে বসে রোজই দেখেন তাঁর ভাগের দই হাওয়া। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে সেই উত্তর দেয় রসুইঘর থেকে সে নন্টে ফন্টেকে বের হতে দেখেছে। অর্থাৎ স্যারের দই ওরাই খেয়েছে। স্যারের মেজাজ যায় চড়ে। আচ্ছা করে দু'জনকে তিনি ঠেঙালেন। নন্টে দুঃখ করে বলেছে, স্যারের দই না খেয়েও রাম ঠ্যাঙানি খেতে হল। তারা অঙ্গীকার করে যার জন্য

তাদের মার খাওয়া সেই দই খেকোকে তারা হাতে নাতে ধরবে। পরদিন সন্ধ্যাবেলা ফন্টে বের হচ্ছে। নন্টে জানতে চাইল তার গন্তব্যস্থলের কথা। ফন্টে হেঁয়ালি করে বললে মাছ ধরার জন্য টোপ কিনতে যাচ্ছি। খানিক পরে ভাঁড়ে করে টোপ নিয়ে এসে হাজির হয়। বলে দারুণ জিনিস দেখা যাবে। রাতে দুজনে নজর রাখে টোপ খেতে কেউ আসছে কিনা। মনে মনে তাদের বিশ্বাস, দই-এর লোভে দই খেকোকে ঠিক আসতেই হবে। ফন্টে নন্টেকে জানায় তাদের মক্কেল হাজির হয়ে গেছে। এরপর অটোমেটিক ক্যাচ হবে। একটু পরেই শুরু হয় চিৎকার। আই রে বাপ একদম মর গিয়া। কণ্ঠস্বরেই বোঝা যায় চিৎকারকারী অন্য কেউ নয় ঠাকুরই। স্যারকে তারা ডেকে আনে। দই-এর বদলে ঠাকুর চুন খেয়ে মরেছে। স্যার বুঝতে পারেন তাঁর দই ঠাকুরই খেত, দোষ চাপত অন্যদের ওপর। স্যার চিৎকার করে ওঠেন হতচ্ছাড়া নেপো! তুমি শেষে আমারই দই মেরেছো, ফন্টে নন্টের কাছে জানতে চায় টোপটা তার কী রকম হয়েছে। নন্টে বলে জবাব নেই।

নন্টে ফন্টের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তারা দই না খেয়েও দই খাওয়ার তথাকথিত অপরাধে শাস্তি ভোগ করেছে। তাই তাদেরও জেদ চেপেছে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণে, দই খেকোকে হাতেনাতে পাকড়াও করবে। এক ভাঁড় চুন এনে রেখেছে দই-এর পরিবর্তে। লোভী ঠাকুর ধরতে পারেনি টোপটি। যথারীতি টোপ গিলেছে এবং ধরাও পড়েছে। এখানে মাছ বলতে ঠাকুর এবং টোপ বলতে চুনকে বোঝানো হয়েছে। নেপোয় মারে দই-এর চমৎকার প্রয়োগ দেখানো হয়েছে।

৫. ফন্টেই কেল্টুকে প্রস্তাবটা দেয়। প্রস্তাবটা হল জল পিস্তলে ডুয়েল লড়াই। সে আরো জানায় নন্টে লড়তে চাইছে না। পিস্তলের জলে যে অন্যের মুখ ভেজাতে পারবে সেই জিতবে। কেল্টু রাজি হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। সে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে সে নাকানিচোবানি খাইয়েই ছাড়বে। নন্টে তার জল পিস্তলটা কেল্টুকে দেয়, সে আরো জানায় যে সেই মধ্যস্থতা করবে। ব্যাস, রেডি ওয়ান টু থ্রি বলা মাত্রই ফন্টে তার জল পিস্তল থেকে জলের বদলে কালি ছোঁড়ে কেল্টুর মুখ লক্ষ করে। কেল্টু এমনটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। স্বভাবতই সে ক্ষিপ্ত হয়। চিৎকার করে সে বলে ওঠে কৌশলে যেমন করে তার মুখে কালি লেপন করা হয়েছে, সেও তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে, কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে ছাড়বে। নন্টে ফন্টে তো আগেই পালিয়ে যায় কেল্টুর রোষানল থেকে বাঁচার জন্য। কেল্টু লক্ষ করে একজন দৌড়ে স্যারের ঘরে ঢুকছে। সে ভেবে নেয় নিশ্চয়ই স্যার তার ঘরে নেই অতএব তার হাত থেকে রেহাই মিলবে না আসামির। এইভেবে কেল্টু স্যারের ঘরে ঢোকে। ঢুকে দেখে স্যারের টেবিলের ওপাশে একজন উবু হয়ে বসে আছে। মজাটা টের পাওয়াবার জন্য টেবিলের কাছে গিয়ে গদাম করে কষিয়ে দেয়। আসলে টেবিলের তলায় কিছু একটা কারণে উবু হয়ে বসে ছিলেন স্যার, তাকেই নন্টে বা ফন্টে ভেবে মেরে বসে কেল্টু। আর যায় কোথায়। স্যার ক্ষিপ্ত হন। বলেন তিনি কেল্টুকে শূলে চড়াবেন। নন্টে ফন্টে মহা খুশি একপ্রস্থ কালি মাখানো গেছে কেল্টুকে, দ্বিতীয়ত স্যারের কাছেও মার খেয়েছে। তারা মন্তব্য করেছে পিস্তলের জল যে এতদূর গড়াবে তা কে জানত। নন্টে ফন্টের বোঝাবুঝির জন্য কেল্টুকে চরম হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জল পিস্তলে কালি ভরে কেল্টুকে কালিমালিপ্ত করা হয়েছে। কেল্টু নন্টে ফন্টে ভেবে স্যারকেই বেদম প্রহার করে বসেছে এবং তার জন্য এক প্রস্থ শাস্তি ভোগ করেছে। নন্টে ফন্টের বুদ্ধির কাছে কূট কৌশলের কাছে কেল্টু পর্যুদস্ত হয়েছে। কেল্টুকে ফন্টেই প্ররোচিত করেছে। বেচারি কেল্টু ফন্টের কৌশল ধরতে পারেনি। কেল্টুর দুর্দশায় পাঠক না হেসে পারে না। অন্যদিকে নন্টে ফন্টে দিব্যি তারিফ কুড়োয় পাঠকের কাছে। এখানেই লেখকের সার্থকতা।

৬. একটা মিষ্টি গন্ধ পায় নন্টে ফন্টে। তারা হদিশ পায় গন্ধটা আসছে কেল্টুদার ঘর থেকে। অতএব তারা দুজনে ঢুকে পড়ে কেল্টুদার ঘরে। দেখে কেল্টু ছানাবড়া করছে। নন্টে ফন্টে জানতে চায় নতুন বছরে তাদের খাওয়াবার জন্য কেল্টু ছানাবড়া বানাচ্ছে কেল্টুর জবাব তা নয় মোটেই। সে জানায় স্যার আর তার বন্ধু হুলোবাবুর জন্য ছানাবড়া তৈরি করছে। সাবধান করে দেয় কেল্টু নন্টে ফন্টে যেন ছানাবড়ার দিকে নুলো না বাড়ায়। নন্টে ফন্টে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মতলবটা ঠিক করে নেয়। যেভাবেই হোক কেল্টুর তৈরি ছানাবড়া খেতে হবে। অগত্যা কী করা যায়?

তারা দু'জনে জানায় তারা নিজেরা যেহেতু ছানাবড়া তৈরি করতে পারে না তাই দোকান থেকে ছানাবড়া কিনে এনে স্যার আর তার বন্ধুকে খাওয়াবে। তারা চ্যালেঞ্জ জানায় কাদের ছানাবড়া স্যার ও তার বন্ধু তারিফ করেন দেখা যাবে। এরপর দুজনে হাজির হয় মাটির জিনিস তৈরির দোকানে। জানতে চায় সেখানে মাটির ছানাবড়া আছে কিনা। দোকানদার জানায় আছে। আরো বলে নকল ছানাবড়া এমনই যে আসলকে দিব্যি হার মানায়। তারা মাটির পুতুলের দোকান থেকে দুটো নকল ছানাবড়া কিনে নেয়। এরপর কেনা ছানাবড়ার ওপর একটু গ্লিসারিন ছড়িয়ে দেয়। মাটির ছানাবড়া সত্যকার ছানাবড়ার মতো দেখতে হয়। তারা কেল্টুর ঘরে যায়। কেল্টুকে তারা বলে যেহেতু তারা নিজেরা ছানাবড়া তৈরি করতে পারেনি তাই কিনেই খাওয়াচ্ছে। তারা প্রস্তাব দেয় কেল্টুকে যেন তার ছানাবড়া আগে পরিবেশন করে। যথা সময়ে স্যার এবং তার বন্ধু ডেকে পাঠান কেল্টুকে। নন্টে ফন্টে চালাকি করে মাটির ছানাবড়া এগিয়ে দেয়। সুপার এবং তার বন্ধু খুব তারিফ করেন। বেশ বড় সাইজ কেল্টু নিজে বানিয়েছে তাদের খাওয়াবার জন্যে। এবারে ছানাবড়া মুখে দিয়ে দুজনের তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। এত শক্ত। ছানাবড়া এত সাংঘাতিক কড়া। তাদের বুঝতে আর বাকি থাকে না কিছু। মাটির ছানাবড়া দিয়ে কেল্টুকে আঘাত করেন। ওদিকে কেল্টুর তৈরি ছানাবড়া দিব্যি মজা করে খায় নন্টে ফন্টে। নন্টে ফন্টের বুদ্ধিতেই কেল্টু পরিশ্রম করে ছানাবড়া তৈরি করেও তারিফ লাভে বঞ্চিত হল। অন্যদিকে তাকে বোকা বানিয়ে নন্টে ফন্টে দিব্যি মজা করে তার তৈরি ছানাবড়া খেল। বেচারি কেল্টু কিছুই বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কী দাঁড়াল।

৭. নববর্ষ উপলক্ষ্যে কেক ঘরে স্পেশাল কেকের অর্ডার দিয়েছে নন্টে ফন্টে। কেল্টু খবরটা জানতে পারে। জেনে সে জিজ্ঞাসা করে কেকের ডেলিভারি দেবে কবে নন্টে ফন্টে জানায় দাম দেওয়াই আছে। দোকানে গেলেই কেক মিলবে। কেল্টু আর অপেক্ষা করে না। সে চলে যায় কেক ঘরে। নন্টে ফন্টে আসতে পারছে না তাই দোকানদার যেন তারই হাতে কেকটা দিয়ে দেয়। সরল বিশ্বাসে দোকানদার কেল্টুর হাতে কেক তুলে দেয়। কেল্টু মজা পায়। নন্টে ফন্টে যখন জানতে পারবে কেক তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে তখন তাদের কী প্রতিক্রিয়া হবে নন্টে ফন্টে কেক ঘরে গিয়ে শোনে তাদের বোর্ডিংয়ের একজন কেকটা নিয়ে গেছে। আকাশ থেকে পড়ে দুজন। তাদের বুঝতে বাকি থাকে না কাজটা কার। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যেভাবেই হোক কেল্টুর কাছ থেকে কেকটা কেড়ে নিতে হবে। বোর্ডিংয়ে ফিরে গিয়ে নন্টে ফন্টে কেল্টুর কাছে জানতে চায় কেন সে কেক নিয়েছে। কেক নিয়ে বিরোধ বাধে তাদের মধ্যে। কেল্টু প্রশ্ন করে কেকে কি তাদের নাম লেখা আছে। প্রমাণ কি কেকটা তাদের। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সুপার উপস্থিত হন। কেল্টু সুপারকে বলে বসে নতুন বছরে তাঁর জন্য সে এই কেক নিয়ে এসেছে। সুপার খুবই খুশি হন। কেক যে তাঁর ভারি পছন্দের। দু'ঘন্টা পরে কেক ঘর থেকে লোক এসে একটি কেক দিয়ে যায়। সে জানায় আগের দেওয়া কেকটা ভালো নয়। ঐ কেক যেন কেউ না খায়। এদিকে সুপার খারাপ কেক খেয়ে

বারবার টয়লেটে ছোটেন। বার ছয় তাঁর ঘোরা হয়ে যায়। খুবই ক্ষিপ্ত হন কেল্টুর ওপর। বলেন তার সঙ্গে কেল্টুর বোঝাপড়া হবে। ওদিকে নন্টে ফন্টে মজা করে ভালো কেক খেতে থাকে।

কেল্টু চালাকি করে নন্টে ফন্টের অর্ডারি কেক এনে ফেঁসে যায়। সেটি যে খারাপ তা সে জানবে কী করে। তাৎক্ষণিক ভাবে বাঁচতে কেল্টু নিজে কেক না খেয়ে সুপারকে দিয়েছিল। ব্যাস সুপারের অবস্থা খারাপ। বেচারি কেল্টু নিজে তো কেক খেতে পেলই না উপরন্তু সুপারকে খারাপ কেক খাওয়ার জন্য গোবেড়ন খেল। লেখকের একধরনের পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। নন্টে ফন্টেকে তিনি সকল ক্ষেত্রেই জিতিয়ে দেন। তাদের কেউ পরাস্ত করতে পারে না। মাঝে থেকে ফেঁসে যায় কেল্টুরা।

৮. বোর্ডিং-এ রোজ থালা বাটি ঘটি চুরি যাচ্ছে। থানাও কিছু করতে পারছে না। সুপারকে তাই চোর ধরার ব্যবস্থা করতে হল। তিনি বোর্ডিং-এর সকলকে জানালেন প্রতি দিন দুজন করে পাহারায় থাকবে। দুদিন পরে পাহারা দেবার ভার এসে পড়ল নন্টে ফন্টের ওপর। একদিকে আবার আলো নেই তার ওপর সুপারের পেট খারাপ। তাই তিনি সঙ্গে থাকতে পারবেন না। যাইহোক নন্টে ফন্টেকে তাই খুব সাবধানে এবং সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেন সুপার। নন্টে ফন্টে আশ্বস্ত করল তারা ঠিক মতোই দায়িত্ব পালন করবে। কোনও চিন্তা নেই। নন্টে ফন্টে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল শেষ রাতেই চুরিটা হয়। তাই ঐ সময়েই বেশি সতর্ক থাকা দরকার। রাতে দুজনে বের হল। মুখে বলল চোর বেটাকে ধরতে পারলে আচ্ছা মতো শিক্ষা দেবে তারা।

তখন শেষ রাত দুজনেরই ঘুম ঘুম পাচ্ছে। দুজনে ঠিক করল কোথাও একটু বসবে। হঠাৎ তাদের নজরে পড়ে বোর্ডিং-এর খিড়কি দিয়ে কেউ একজন বের হচ্ছে। কিছু একটা হাতিয়ে নিয়ে ব্যাটা সরে পড়ছে। হাতে তার গাড়ুর মতো কী একটা ব্যাস, আর যায় কোথায়। দুজনে মিলে লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় মারধর।

পরে জানা গেল লোকটি সুপার চোরটোর কেউ নয়। তিনি প্রাতঃকৃত্য করতে বের হচ্ছিলেন। তাঁকেই কিনা চোরের মার খেতে হল। সুপার ক্ষেপে আগুন। বললেন প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে নন্টে ফন্টেকে উচিত মতো শাস্তি দেবেন। দুজনে চিন্তায় পড়ে যায় কী রকম শাস্তিটা হবে।

চোর ভ্রমে সুপারকে বেধড়ক মার দিয়ে নন্টে ফন্টে সেম সাইডে গোল দিয়ে বসে। তারা দায়িত্ব পালন করেছে ঠিকই। রাতে না ঘুমিয়ে পাহারা দিয়েছে ঠিকই। সুপারকে চোর বলে মনে করাটাকেও তাদের কোনও ত্রুটি বলা যাবে না। বেচারিরা শুধু শুধু সুপারের হাতে শাস্তি পেতে চলেছে। সুপার প্রহৃত হলেও ঘটনাটি নির্মল হাস্যরস সৃষ্টির কারণ হয়েছে।

বোর্ডিং-এর সুপারের জন্মদিন। সেই উপলক্ষে নন্টে ফন্টে টিফিনের পয়সা জমিয়ে স্যারকে দেবার জন্য একটি ফুলদানি কিনেছে। কেল্টু দেখল ফুলদানিটা। নন্টে ফন্টে জানতে চাইল কেল্টু কী দেবে কেল্টু জানাল স্যারের একটা প্রতিকৃতি এঁকে স্যারকে দেবে। কেল্টু জানায় প্রতিকৃতির একটু বাকি আছে। সেটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সে নন্টে ফন্টেকে দেখাবে। কেল্টু সাবধান করল ফুলদানিটি খুব ঠুনকো। তাই সেটিকে যেন খুব সাবধানে রাখে। যে কোনও সময়ে সেটি ভেঙে যাবার সম্ভাবনা। কেল্টুর অনুপস্থিতিতে নন্টে ফন্টে কেল্টুর ঘরে ঢোকে তার আঁকা প্রতিকৃতিটা যাচাই করতে। ইত্যবসরে কেল্টু তার হাতের টিপ পরীক্ষা করে নেয়। ভেঙে যায় ফুলদানিটা। নন্টে ফন্টের বুঝতে অসুবিধা হয় না কাজটা কার। তারা বোঝে স্যারের কাছে তাদের অপদস্থ করার পরিকল্পনা করেছে কেল্টু। প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ করে কেল্টু নন্টে ফন্টেকে ডাকে দেখাবার জন্য। নন্টে ফন্টে বোঝে প্রতিকৃতিটা কেল্টু বাইরে থেকে করিয়েছে। চালাচ্ছে নিজের নামে। সে বলে সামান্য একটু ফিনিশিং টাচ দিয়ে প্রতিকৃতিটা স্যারের হাতে তুলে দেবে। পরদিন স্যার গদগদ হয়ে তাঁর

প্রতিকৃতি দেখতে আসেন। প্রতিকৃতি দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন তিনি। কেল্টু জানায় প্রতিকৃতিটা এমন তো ছিল না। সে বুঝতে পারছে না কেমন করে প্রতিকৃতিটার এমন হাল হল। স্যার ক্ষেপে গেলেন। স্যারের ছবি দেখেই তো প্রতিকৃতিটা করা। আর এখন বুঝতে পারছে না সেটির এমন দশা কেমন করে হল। স্যার কেল্টুকে মর্কট বলে গালি দিলেন। সবশেষে নারায়ণবাবু জানিয়েছেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাঠকের কৌতূহল মেটাবার জন্যই স্যারের ছবিটি দেখানো হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে তাঁর বিশাল গোঁফ জোড়া দুদিকে ঝুলে পড়েছে। নারায়ণবাবু লিখেছেন, 'কিন্তু কী করে ওটা গজালো ওটা জানতে না চাইলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।' বুঝতে বাকি থাকে না গোঁফ যুক্ত করেছে নন্টে ফন্টে। তাদের কেনা ফুলদানিটা ভাঙার প্রতিশোধ তারা এইভাবেই নিয়েছে। প্রতিকৃতি দেখার পূর্বে ও পরে স্যারের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে আকাশ পাতাল পার্থক্য ঘটে গেছে। কারণটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৯. কেল্টু জানতে চাইল নন্টে ফন্টে এবারে কী বাজি তৈরি করছে। ওরা জানাল কালীপূজায় তুবড়ি না করে এবার রঙমশাল এবং হাত পটকা বানাবে। একথা শুনে কেল্টু ব্যঙ্গ করে বলে নন্টে ফন্টের দ্বারা রঙমশাল বানানো সম্ভব নয়। ওরা রঙ বাদ দিয়ে বড়জোর মশাল বানাতে সক্ষম। নন্টে ফন্টে জানায় বাজির কারখানায় কাজ করে এমন একজনের কাছ থেকে তারা ফর্মুলা পেয়েছে। তাতেই চমৎকার রঙমশাল তৈরি হবে। নানা রঙের ফুলকি দেখা যাবে। কেল্টু জানায় তার কাছে এমন ফর্মুলা আছে যাতে করে রঙমশালের থেকে রামধনুর মতো রঙ ফুটে বেরুবে। নন্টে ফন্টে ভাবে সেক্ষেত্রে তাদের বানানো রঙ মশাল বাজে হবে। নন্টে বুদ্ধি বাতলায় তারা রঙমশাল বানাবে না। তারা শুধু হাতপটকা বানাবে। আরো ঠিক করে কেল্টুর তৈরি মশলা তারা হাত সাফাই করে সংগ্রহ করবে। ওদিকে কেল্টুও প্লান করে নন্টে ফন্টের মশলা হাতিয়ে নিয়ে রঙমশাল বানাবে। নন্টে ফন্টেদের হাতপটকার মশলা রঙমশালের মশলা ভেবে চুরি করে কেল্টু এবং রঙমশাল বানায়। সে সুপারকে প্রথমটি জ্বালাতে বলে। জ্বালানো মাত্র সেটি ফেটে যায়। এরকম ঘটনা প্রত্যাশিত ছিল না। তাই ছুটে পালায় কেল্টু। নন্টে ফন্টে বোঝে ব্যাপারটা কী ঘটেছে।

কেল্টু একটি বিশেষ চরিত্র যার স্বভাব নন্টে ফন্টেকে হেয় প্রতিপন্ন করার। আর সেটা করতে গিয়ে নন্টে ফন্টের পরিশ্রমের ফসল আত্মসাৎ করে এইভাবেই সে নাম কিনতে চায়। কিন্তু নন্টে ফন্টেও তেমনি। কথায় বলে যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের বুদ্ধিমত্তার কাছে পর্যুদস্ত হয় কেল্টু তবু তার হুঁশ ফেরে না, এরপরেও সে নন্টে ফন্টেকে ফাঁকি দিয়ে নিজেকে বড়ো করে দেখাতে সচেস্ট হয়। নানাভাবেই সে সুপারকে খুশি করার চেস্টা করে কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে ব্যর্থ হয়।

নন্টে ফন্টের এপিসোডগুলির চমৎকারিত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে, সেইসঙ্গে আঁকা কার্টুনগুলি অসামান্য। বক্সের মধ্যেকার লেখাগুলি নারায়ণবাবু অত্যন্ত নৈপুণ্য সহকারে তুলির সাহায্যে লিখেছেন কলমের সাহায্য নেননি। কার্টুনগুলি দেখলেই হাসি পায় তাদের অভিব্যক্তিগুলি অসাধারণ। নন্টে, ফন্টে, কেল্টু, সুপার প্রত্যেককেই কার্টুন দেখে চিহ্নিত করা যায়।

<u>তথ্যের সন্ধানে</u>

১. সোমদত্তা ঘোষ : 'নন্দন কানন' ২০২০, পৃ. ১৩৩-১৩৪
২. তদেব : পৃ. ১৩৪
৩. তদেব : পৃ. ১৩৯

মূকাভিনয় : নৈঃশব্দ্য যখন বাঙ্‌ময়

বর্ষা পণ্ডা

মূকাভিনয় শব্দটির উৎপত্তি 'মূক' এবং 'অভিনয়' শব্দ দুটি থেকে।[১] 'মূক' মানে যে কথা বলতে পারে না, যথা বাক্‌প্রতিবন্ধী আর অভিনয় মানে চরিত্র অনুকরণ করা। সুতরাং মূকাভিনয় হল সংলাপবিহীন অভিনয়। যে-কোনো প্রকার সংলাপ উচ্চারণ না করে নান্দনিক শিল্পসম্মত এবং অর্থপূর্ণ অভিনয় কৌশলকে সাধারণ অর্থে মূকাভিনয় বলা যায়। সেই জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে।"[২] রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, শব্দ-কথা-বাক্য ব্যতীত শুধুমাত্র মূকাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।

মূকাভিনয়-এর আধুনিক ইংরেজি প্রতিশব্দ Pantomime (প্যান্টোমাইম)। Pantomime কথাটি এসেছে Pantomimus (প্যান্টোমিমাস) অর্থাৎ মূকাভিনেতা থেকে যে শিল্পী কেবল ছন্দোময় অঙ্গভঙ্গি দ্বারাই কোনো বক্তব্য ও ঘটনা প্রকাশ করেন (মূল অর্থ Pantomime dancer, ইংরেজি Pantomimist[৩] Pantomime শব্দটি গ্রিক শব্দ, এর বিশুদ্ধ অনুকৃতি (All mimic) Pantos ও Mimeomal শব্দদ্বৈতের মিলনসম্ভূত শব্দরূপ Pantomime[৪]

মূকাভিনয় শিল্পটিকে বিশেষজ্ঞগণ নানাবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছেন। এতদ্বিষয়ক উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞানিচয় উদ্ধৃতকরণের মাধ্যমে মূকাভিনয় সম্পর্কে সাধারণ ধারণায় উপনীত হওয়ার প্রয়াস পাওয়া যেতে পারে। ভারতের প্রথম আধুনিক মূকাভিনয় শিল্পী শ্রী যোগেশ দত্তের বিবেচনায় মৌন অভিব্যক্তির দ্বারা মানুষের অন্তরের আবেগ ও উৎকণ্ঠা, সুখ, দুঃখ, উল্লাস ও আতঙ্ককে জীবন্ত করে তোলার এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিঃশব্দ সঞ্চালনের দ্বারা গতিশীল জীবনের কোনো রূপ ও আকার ফুটিয়ে তোলার যে শিল্পকৌশল তাকেই বলে মূকাভিনয়।[৫]

মূকাভিনয়-তাত্ত্বিক অধ্যাপক শ্যামমোহন চক্রবর্তীর মতে মূকাভিনয়ের অর্থ

সংলাপ উচ্চারণ না করিয়া শুধুমাত্র অঙ্গের অভিব্যক্তি দ্বারা আপন মনোভাব ব্যক্ত করা।[৬] সঞ্জীব সেন বলেন মূকাভিনয় হচ্ছে সংলাপ না বলে শুধুমাত্র অভিব্যক্তি এবং আঙ্গিক অভিনয়ের দ্বারা নাট্যবস্তুকে মঞ্চে প্রকাশ করা।[৭] অধ্যাপক জিয়া হায়দারের সিদ্ধান্ত, মূকাভিনয় এমন এক ধরনের নাট্যকলা যাতে অভিনেতা কোনরূপ সংলাপ ছাড়াই কেবল অভিব্যক্তি ও এ্যাকশন দ্বারা কোনো ঘটনা, কাহিনি ও বক্তব্য প্রকাশ করে থাকে।[৮]

উপযুক্ত সংজ্ঞা-সমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, প্রকৃত প্রস্তাবে মূকাভিনয় হচ্ছে, এক বা একাধিক অভিনেতা কর্তৃক কোনো ঘটনা বা বিষয়বস্তুর আবেগ অনুভূতি স্বীয় অন্তঃকরণে ধারণপূর্বক কোনরূপ সংলাপ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র শারীরিক আবেগ, অনুভূতি, অভিব্যক্তি ও অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে উক্ত ঘটনা বা বিষয়বস্তুকে দর্শকসম্মুখে শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপনা।

মূকাভিনয়ের উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সমকালীন স্বনামখ্যাত মূকাভিনয় শিল্পী মার্সেল মার্সো বলেছেন, ''In identifying ourselves with the elements that surround us, the art of mime makes visible the invisible, makes concrete the abstract.''[৯] সুতরাং মূকাভিনেতাকে অবশ্যম্ভাবীভাবে স্বীয় শরীর সহযোগে কাঙ্ক্ষিত বস্তু, পরিবেশ তথা অনুভূতির মায়া সর্বোচ্চ সার্থকভাবে সৃষ্টির মাধ্যমে দর্শক কল্পনাকে ও স্ব-কল্পনার সমান্তরালে প্রবাহিতকরণে সক্ষম হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মূকাভিনেতা যখন একটি কাল্পনিক অস্তিত্বহীন-অবাস্তব 'ভারী বস্তু' উত্তোলনের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন, সেখানে দর্শকও অভিনেতার শারীরিক অঙ্গাভঙ্গি অভিব্যক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে বর্ণিত বস্তুটির আকার-আয়তন-ওজন ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করবেন। কিংবা রৌদ্রজ্জ্বলকালের ঘটনা উপস্থাপিত হলে দর্শক মূকাভিনেতার অবয়বের মাধ্যমই রৌদ্রের তীব্রতা, সময়, স্থান প্রভৃতি অনুধাবনে সক্ষম হবেন। এতদ্সঙ্গে অভিনয় চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও, যেমন দুঃখ, ক্রোধ, ভালোলাগা, ঘৃণা প্রভৃতি মূকাভিনেতার অভিব্যক্তির মাধ্যমেই প্রকাশিত হবে। উল্লিখিত শৈল্পিক উদ্দেশ্যপূরণের স্বার্থে মূকাভিনেতাকে মঞ্চে, সাধারণভাবে, সর্বপ্রকার অঙ্গাভঙ্গি ও অভিব্যক্তি স্বাভাবিক বাস্তবতার সাপেক্ষে ঈষৎ উচ্চকিত ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে হয়। উপরন্তু, মূকাভিনয়ে অভিনেতার প্রতিটি অঙ্গাভঙ্গি ও অভিব্যক্তি অবশ্যই অর্থপূর্ণ হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় অভিনেয় বিষয় সম্পর্কে দর্শকান্তরে বিভ্রান্তি উপজাত হবে। সাধারণভাবে মূকাভিনয় উপস্থাপনাকালে, নির্বাক-অভিনয় সদৃশ অভিনেতার ওষ্ঠাধরের অযাচিত সঞ্চালন বা Lipping এবং কোনোরূপ সংলাপ বা শারীরিক শব্দ প্রত্যাশিত নয়।

অভিনয় ইতিহাস বা প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ড. সেলিম আল দীন অভিমত প্রকাশ করেন যে, নৃত্য ও নাট্যের আদি ইতিহাস মানব শরীরের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অভিনয় মানব শরীরের সুনির্দিষ্ট ক্রিয়ার ঊর্ধ্বে মানবসৃষ্ট এক বিস্ময়কর সৃজনশীলতা। জীবজগতেও ভঙ্গি আছে, বানর থেকে বাঘ, শালিখ অথবা ময়ূর কিন্তু সেসব স্বকৃত নয়, স্বভাবজ। শিল্পকলার অন্যান্য শাখার সঙ্গে অভিনয়ের উপাদানগত যে পার্থক্য তা নির্ণয়পূর্বক বলা যায় যে—অভিনয় সম্পূর্ণত মানবদেহকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে।[১০] অভিনয়-এর বিশেষ শ্রেণি মূকাভিনয়-এর ন্যায় নৃত্যশিল্প ও আপাদশীর্ষ মানবদেহকে অবলম্বন করেই বিকশিত। শিল্পীর শরীর তথা আঙ্গিক ও অভিব্যক্তি উল্লিখিত শিল্পদ্বৈতের সাধারণ প্রকাশমাধ্যম সত্ত্বেও এদের অভ্যন্তরে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান এবং তা মূলত প্রয়োগকৌশলগত। নৃত্যকলায় উপস্থাপিত বিষয় উচ্চকিত তাল-লয়-ছন্দানুযায়ী

প্রকাশিত। অন্যপক্ষে মূকাভিনয়ের ক্ষেত্রে শিল্প-সুষমার নিমিত্ত আবশ্যকীয় তাল-লয়-ছন্দ মূকাভিনয়ের অন্তর্পদেশে সতত বর্তমান সত্ত্বেও তা নৃত্যানুরূপ উচ্চকিত বা প্রকাশ্য নয় এবং মূকাভিনয়ের প্রবণতা প্রকৃত প্রস্তাবে অভিনয়াভিমুখী। নৃত্যে প্রয়োগের জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় মুদ্রা (হস্তভঙ্গি)। পক্ষান্তরে, মূকাভিনয় শিল্পের ক্ষেত্রে ঈদৃশ শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত কোনো মুদ্রার অস্তিত্ব নেই। যাহোক, মূকাভিনয় এবং নৃত্যশিল্পের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে বিদিত অভিনয়রীতির সাপেক্ষে মূকাভিনয় ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যধারী। সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা অবান্তর নয় যে, মূকাভিনয় যথার্থই অভিনয় ও নৃত্যের প্রতিবেশি, অর্থাৎ সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, শিল্প হিসেবে মূকাভিনয়ের অবস্থান 'নৃত্য' শিল্প ও 'অভিনয়' শিল্পের মধ্যবর্তী অঞ্চলে।

ভরত-নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী সমগ্র অভিনয়কলা চতুর্বিধ শ্রেণিতে বিন্যস্ত, যথা—১. আঙ্গিক অভিনয় (শরীর, মুখজ এবং শাখা, অঙ্গ-উপাঙ্গ কর্তৃক চেষ্টাকৃত অভিনয়)। ২. বাচিক অভিনয় (বচন বা কথা অর্থাৎ উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে সংঘটিত অভিনয়)। ৩. আহার্য অভিনয় (পোশাক-পরিচ্ছদ, অঙ্গরচনা ও আবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মাধ্যমে প্রকাশিত অভিনয়-ব্যঞ্জনা)। ঘ. সাত্ত্বিক অভিনয় (আন্তরিক ভাব, সমষ্টির দ্বারা প্রাণের আবেগ পরিস্ফুটনের মাধ্যমে প্রকাশিত অভিনয়)[১১]। বর্তমান আলোচ্য মূকাভিনয়কে উপযুক্ত অভিনয় চতুষ্টয়ের কোনো বিশেষ বিভাগবৃত্তে স্থাপন করা যৌক্তিক। মূকাভিনয়-এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার প্রত্যক্ষণপূর্বক অনেকে উক্ত রীতির অভিনয়কে সম্পূর্ণরূপে 'আঙ্গিক অভিনয়' অভিধায় শ্রেণিকরণে প্রবৃত্ত হন।

বলাবাহুল্য মূকাভিনয়ে মূকাভিনয় শিল্পীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার মাত্রই যথেষ্ট নয় বরং তৎসঙ্গে সঠিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে ভাব-রস প্রভৃতির বহিঃপ্রকাশও অত্যাবশ্যকীয়, অর্থাৎ মূকাভিনয়ে আঙ্গিক অভিনয়ের সঙ্গে সাত্ত্বিক অভিনয়ও সমমাত্রায় প্রয়োজনীয়। সাধারণ বিবেচনায় বলা যায় যে, মূকাভিনেতার শরীরই যেহেতু মূকাভিনয়ে প্রধান নির্ভরতা, সুতরাং উপস্থাপনকালে পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ শারীরিক মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনে সুসহায় রূপে পরিকল্পিত হওয়া আবশ্যক। যেমন—বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত অধিক ঢিলা পোশাক-পরিচ্ছদ বর্জনীয়। উপরন্তু, পোশাকের বর্ণ যেন কোনোক্রমেই মূকাভিনয় শিল্পীর অভিব্যক্তি প্রকাশে তথা উপস্থাপিতব্য বক্তব্য-বিষয় হৃদয়ঙ্গমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে এবং মঞ্চের পশ্চাদপটের রঙের সঙ্গে একীভূত না হয়—এ সকল বিষয়েও সচেতনতা জরুরি। মূকাভিনয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে, সাধারণত মূকাভিনেতা মুখাভিব্যক্তি উচ্চকিতকরণের লক্ষ্যে বিশেষ 'সাদা-মুখ অঙ্গরচনা' প্রযুক্ত হয়। যা হোক, সার্বিক বিবেচনায়, সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা অমূলক হবে না যে, মূকাভিনয় প্রকৃতপক্ষে আঙ্গিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের বিশেষ মাত্রার সুসমন্বয়, তাই মূকাভিনয় বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে মূকাভিনয় শিল্পী জিল্লুর রহমান জন প্রদত্ত বিবেচনা যে রীতিতে এক বা একাধিক অভিনেতা/অভিনেত্রী নির্দিষ্ট মঞ্চে দর্শকের সামনে বাচিক ব্যতিরেকে আঙ্গিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক কলা ব্যবহার করে মোহ সৃষ্টির মাধ্যমে গতিশীল জীবনের কোনো চিত্র শিল্পসম্মতভাবে অর্থপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন, তাকে মূকাভিনয় বলা যেতে পারে।[১২]

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, মূকাভিনয় শিল্পের প্রধান অবলম্বন মূকাভিনয় শিল্পীর শরীর এবং এর মাধ্যমেই উক্ত অভিনয় আঙ্গিকে সংযোগসাধন এবং ভাব ও ক্রিয়ার শৈল্পিক প্রকাশের অন্তহীন যাত্রা। প্রশ্ন উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক যে, সংলাপ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র আপাতমৌন শরীর নির্ভরতায় বিশ্বজগতের ভাব ও ক্রিয়া প্রকাশের সীমা কোন মাত্রায় আধুনিককালের নাট্যবিশেষজ্ঞ ড. সেলিম

আল দীন-এর বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর সুচিন্তিত অভিমত, সপ্তস্বরের ষড়জ বা ঋষভ অথবা গান্ধার কিংবা অন্যস্বরের মধ্যে যেমন অনন্তকালের অজস্র সুর বাঁধা আছে তেমনি অঙ্গ উপাঙ্গ ও দ্বাদশ দেহ-স্বরে বাঁধা। সংগীতের সপ্তস্বরে যেমন পৃথিবীর সব ভাব সুর হয়ে ওঠে তেমনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে দিয়েও নিখিলের সব ভাব ও ক্রিয়া প্রকাশ করা যায়।[১৩] সুতরাং মূকাভিনয়-এর মাধ্যমে বিশ্বের সর্ববিধ অব্যক্ত ভাব ও ক্রিয়াকে শিল্পসুষমায় মুখরিতকরণ সম্ভব এবং তা নিশ্চয়ই মৌখিক ভাষার সংকীর্ণতার সীমা বিলুপ্তির সমুন্নত মতাধারী।

নাটকে মূকাভিনয় বা মূকাভিনয়ে নাটক দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অভিনয় ধারা। দুটি মাধ্যমেই অভিনয় সম্পূর্ণ হয় দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে। নাটক একটি যৌগিক শিল্প। তথাপি এর একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে। আবার নাটকে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য শিল্পমাধ্যমগুলোও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই শিল্পগুলোর ব্যবহার নাটককে সাবলীল,গতিশীল, বিশ্বাসযোগ্য ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তবে এক্ষেত্রে মূকাভিনয় একটু বেশি স্বতন্ত্র। অন্যান্য শিল্পের সংযোগ কম হলেই বরং মূকাভিনয় সত্যিকার অর্থেই স্বরূপে আবির্ভূত হয়। নাটক ও মূকাভিনয়ের বিষয় ও উদ্দেশ্য অভিন্ন হলেও উপস্থাপন রীতিতে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। নাটকের উপাদানগুলোকে যদি আমরা দেখি, সেখানে দেখা যায় চরিত্র, প্লট, সংলাপ, চিন্তা, সংগীত এবং দৃশ্য আছে। মূকাভিনয়ের উপাদান কি এর থেকে ব্যতিক্রম কিছু নিশ্চয়ই নয়। প্রশ্ন আসতে পারে সংলাপ নিয়ে। নাটকের সংলাপ সবাক, এটা নিয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। একটু ভেবে দেখলে বলা যায় মূকাভিনয়ের সংলাপ কী আদৌ আছে কিনা আছে, অবশ্যই আছে, সেটা হল নির্বাক কথোপকথন। মূকাভিনয়ে অনুচ্চারিতভাবে সংলাপ বিনিময় হয়। এই আলোচনার দুটি অংশ। প্রথমটি নাটকে মূকাভিনয় এবং দ্বিতীয়টি মূকাভিনয়ে নাটক। বক্তব্যের সুবিধার্থে বিভাজন করে আলোচনার সূত্রপাত করা যাক। মূকাভিনয় স্বতন্ত্র মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও নাটকে এর ব্যবহার হয়। নাটকের অংশবিশেষ হিসেবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাটকের সীমাবদ্ধতা দূর করতে মূকাভিনয়ের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। নাটকে যে বিষয়টি উপস্থাপনা করতে ব্যয়বহুল সেট, কালারফুল প্রপস কিম্বা আলোর রকমারি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তা হয়তো মূকাভিনয়ের সাবলীল প্রয়োগে নিমেষেই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় অভিনেতার শরীরকে ব্যবহার করে। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে একটি চাকরির ইন্টারভিউয়ের দৃশ্যে দেখানো হয়েছে মূকাভিনয়ের সাহায্যে, মূকাভিনয়ের দৃশ্য দেখানো হয়েছে তৃতীয় অঙ্কে কমল মঞ্চে প্রবেশ করেছে, তারা মঞ্চের একদিকে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল। এই নিরন্তর কথা বলার দৃশ্যকে দীর্ঘায়িত না করে নাট্যকার মূকাভিনয়ের সাহায্য নিয়েছেন। নীরবতা যে কতখানি সরব হতে পারে তাই মূকাভিনয়ের বিষয়। বাদল সরকার এই আঙ্গিকটি ব্যবহার করে জীবনের বিমূঢ় একঘেয়েমির দিকটি স্পষ্ট করেছেন। উল্লিখিত নাটকগুলি ছাড়াও আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে নাটকে সচেতনভাবে মূকাভিনয়ের ব্যবহার হয়েছে নাটকেরই প্রয়োজনে। যেভাবে নাটকে সংগীত কিংবা নৃত্যের ব্যবহার হয়ে থাকে।

এবার মূকাভিনয়ে নাটক নিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করবো। মূকাভিনয়ে নাটক, কথাটি কেবল যেন গোলমেলে ঠেকে। মূকাভিনয় তো কথা না বলে যে অভিনয় তাই-ই। এখানে আবার নাটক এল কোত্থেকে নাটক আর মূকাভিনয় তো ভিন্ন জিনিস। এই গোলমেলে বিষয়টি খোলসা করা যাক। সাধারণভাবে নাটক হল সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা। যেখানে বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনে একটি কাহিনির সূচনা, বিস্তার ও সমাপ্তি ঘটে। মঞ্চে প্রযোজনার আগে পর্যন্ত একটি নাটক পাণ্ডুলিপি বা স্ক্রিপ্ট আকারে থাকে। সাধারণভাবে একটি নাটক দু'টি উপায়ে মঞ্চস্থ হতে পারে। একটি

হল—বাচিক অভিনয়ের মাধ্যমে আর অন্যটি হল— মূকাভিনয় বা নির্বাক অভিনয়ের মাধ্যমে। তাহলে সহজেই প্রশ্ন এসে যায় মূকাভিনয় সমৃদ্ধ উপস্থাপনাগুলো কী নিশ্চয়ই মূক নাটক, নির্বাক নাটক তথা নাটক। অর্থাৎ এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ হল নাটকের উপস্থাপনাগত আঙ্গিক বা কৌশল। এখানে দুটি মাধ্যমেই নাটকের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে বিবেচ্য। অতএব দ্বিধাহীনভাবেই আমরা বলতে পারি একটি মূকাভিনয় একেকটি নাট্যাংশ বা নাটক। আমরা সচরাচর যে মূকাভিনয়গুলো দেখি তাকে কি নাটক বলা যায় যায় না। কারণ সেখানে নাটকীয় অবস্থা বিরাজ করলেও আমাদের প্রচলিত ধারার নাটকের গুণাবলী দৃষ্ট হয় না। এই মূকাভিনয়গুলো সাধারণত একটিমাত্র দৃশ্যের মধ্যে শেষ হয়। কখনো কখনো সময়ের ব্যাপ্তি বোঝাতে দৃশ্যান্তর হয় বটে, তবে মঞ্চ ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। মূকাভিনয়ের গল্পগুলোর গভীর তাৎপর্য থাকলেও পরিবেশনার ধরন হয় সাধারণত কমেডি নির্ভর। ফলে সাধারণ দর্শক শিল্পমাধ্যমটিকে হাস্যরসাত্মক কৌতুক হিসেবেই চিহ্নিত করে থাকেন। এই মূক নাটকগুলো আমাদের প্রচলিত গ্রুপ থিয়েটার চর্চার মতোই পূর্ণাঙ্গ দৈর্ঘ্যের নাটক। এখানেও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ধারাটি প্রবলবেগে নিয়মিত চর্চার দিকে ক্রম অগ্রসরমান। উল্লেখ্য, মূকাভিনয় চর্চার সকল ব্যক্তিত্বই শুরুতে প্রচলিত নাট্যধারায় স্নাত হয়ে মূকাভিনয় চর্চা করলেও এটা তাদের কাছে মূলত থিয়েটারই। মূকাভিনয়কে তার নির্বাকতা অক্ষুণ্ণ রেখেই নাটক হিসেবে অবস্থান চিহ্নিত করতে হবে। অর্থাৎ মূকাভিনয়ের প্রথম শর্তই হল তার নাট্যকাঠামো। মূকাভিনয় হল তার উপস্থাপনগত কৌশল। অর্থাৎ প্রকাশের শিল্পীত মাধ্যম। নাটকবিহীন মূকাভিনয় একটি অসম্পূর্ণ উপস্থাপনা যাকে কৌতুক বা সার্কাসের সাথে তুলনা করা যায়। একথা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি ভারতবর্ষে বর্তমান মূকাভিনয় চর্চা ক্রমেই নিয়মিত থিয়েটার চর্চার অংশ হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন হতে পারে প্যান্টোমাইম কি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পমাধ্যম বলা যেতে পারে নাটকে সবসময় যেটা জরুরি তা হল বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। চরিত্র অনুযায়ী অভিনেতা কীভাবে দাঁড়াবে, চলাফেরা করবে, পড়ে যাবে ইত্যাদি অথবা হাত, দেহ, পা কীভাবে ব্যবহার করবে, মোদ্দা কথা হল জেশচার-পশচার কী হবে এই সমগ্র কিছু একটি নাটককে মঞ্চে সার্থক করে তোলে। এই অঙ্গাভিনয় প্যান্টোমাইমের প্রধান বিষয়। শিল্পের প্রাথমিক শর্ত যদি হয় কমিউনিকেশন ও আনন্দদায়ক, অবশ্যই প্যান্টোমাইম সে অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পমাধ্যম। একজন মিউজিসিয়ান যেমন তার মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের সাহায্যে সুর-তাল-ছন্দের মেলবন্ধনে গড়ে তোলেন মিউজিক্যাল পরিমণ্ডল, পৌঁছে যান এক Abstract Idea-তে, অথবা একজন পেইন্টার যেমন তার ক্যানভাসের উপর রঙের বিন্যাসে তুলির টানে কম্পোজিশন-টেক্সচার-টোন ছন্দের সাহায্যে এঁকে চলেন তার নিজস্ব ছবি। পৌঁছে যেতে চান Abstract Idea-তে ঠিক তেমন একজন নির্বাক শিল্পী শুধুমাত্র বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে নিজস্ব অন্তর্নিহিত ছন্দে বাস্তবের অনুকরণে নয়, অথচ বাস্তবের কাছাকাছি একের পর এক ইলিউশন তৈরি করে মঞ্চে দাপিয়ে বেড়ান অনায়াসে। ফুটিয়ে তোলেন একের পর এক ছবি। তারপর কোন এক সময়ে পৌঁছে যান Abstract Idea-তে। প্রমাণ করেন প্যান্টোমাইম স্বয়ংসম্পূর্ণ অসাধারণ এক ছন্দময় শিল্পমাধ্যম।

সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনিসূত্র খুব সহজেই প্রকাশ করা যায়। কিন্তু মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি বা শারীর ভঙ্গির মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনিসূত্র ধরানো যথেষ্ট কঠিন। এর জন্য করা চাই কঠিন অনুশীলন। যেমন বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের ভাষা, সফদর হাসমির পথ নাটকের পথ নাটকের ভাষা, অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'জগন্নাথ' নাটকের শারীর ভাষা আমাদের দেশের মানুষের

চেতনায় সাড়া জাগায়, তেমনি মূকাভিনয় শিল্পীদের শারীর ভাষা মানুষের মনকে নাড়া দেবেই। আর কৃত্রিম আড়ম্বরপূর্ণ কলরব ভাষার কান ফাটানো দৌরাত্ম্যে যখন মানুষ দিশেহারা, তখন মূকাভিনয়ের নিরাভরণ হার্দিক শারীর ভাষা দর্শকমনকে ছোঁবেই। তাই অনুশীলনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে মূক নাটক তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য পৌঁছে দেবে দর্শকের মনে। আর মূকাভিনয়ের সর্বজনীনতা তো সর্বজনবিদিত। মূকাভিনয়ই একমাত্র প্রয়োগশিল্প যা দেশগত বা ভাষাগত ব্যবধান ঘুচিয়ে সকল দেশের মানুষের হৃদয় সংবেদ্য হতে পারে। যে-কোন বিদেশি মূকাভিনয়-শিল্পীর অভিনয় উপভোগ করতে আমাদের কোন অসুবিধাই হয় না। এক্ষেত্রে আর একটি কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে, অনেক সময়ে আমরা ভিনদেশি কোন নাটক বা চলচ্চিত্র দেখে সেই দেশের ভাষা একদম না জেনেও যে রসগ্রহণ করতে পারি, তারও কারণ কিন্তু সেই সব নাটক বা চলচ্চিত্রে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় শারীরিক অভিনয় থাকা। বস্তুত এই সর্বজনীন শরীরী ভাষার জন্যই আমরা সেগুলো উপভোগ করতে পারি। চার্লি চ্যাপলিন, লরেন হার্ডি, বাস্টার, কীটন প্রমুখ অভিনেতা মূকাভিনয়কে শিল্পসম্মত চিত্ররূপ দান করেছেন। চ্যাপলিনের মূকাভিনয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়। না, মূকাভিনেতা নন, চার্লি শ্রেষ্ঠ অভিনেতাই, মূকাভিনয় তার শৈল্পিক আত্মপ্রকাশের মাধ্যম ছিল শুধু। সুতরাং, সংলাপ উচ্চারণকারী কোন অভিনেতার থেকে নির্বাক অভিনেতা মোটেই কম ক্ষমতাশালী নন। মূকাভিনয়ও নয় কোন ব্রাত্য শিল্পমাধ্যম। প্রকৃত মূকাভিনেতা যখন নৈঃশব্দকে বা য় করে তোলেন, তখনই, সম্ভবত শিল্পের অমরাবতীতে প্রবেশের দ্বার অর্গলমুক্ত হয়।

উৎসের সন্ধানে

১. শরীফ আহমদ : সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (সম্পাদিত), ঢাকা বাংলা একাডেমি, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কার্তিক ১৪০৬ বঙ্গাব্দ/ অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ৪৭৩
২. ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ খ্রি., অমিয় চক্রবর্তীর লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। চিঠিপত্র ১১, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, পৃ. ২২৪
৩. হায়দার জিয়া, থিয়েটারের কথা, প্রথম খণ্ড, ঢাকা বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ৫২
৪. চক্রবর্তী শ্যামমোহন : প্যান্টোমাইম তত্ত্ব ও প্রয়োগবিধি, নবগ্রন্থ নবকুটির, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ১১
৫. দত্ত যোগেশ : মূকাভিনয়ম নাথ ব্রাদার্স,৯ শ্যামমোহন দে স্ট্রিট, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৩/ মাঘ ১৩৯৯, পৃ. খ।
৬. চক্রবর্তী শ্যামমোহন : প্যান্টোমাইম তত্ত্ব ও প্রয়োগবিধি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৭. সেন সঞ্জীব : থিয়েটারের চালচিত্র, লিপিকা, ৩০/১ এ কলেজ রোড, কলকাতা, পৃ: ৫২।
৮. হায়দার জিয়া : থিয়েটারের কথা (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৯. Atival Samuel : Mime Wordbook, Colorado, LE CENTER DU SILENCE, 1975, P. 8
১০. আল দীন সেলিম : অভিনয় দর্পণ (অনূদিত), মূল নন্দিকেশ্বর, কথা প্রকাশন, ৪ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা, ১৯৮৯ খ্রি., পৃ. ১০
১১. বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশচন্দ্র : ভরত নাট্যশাস্ত্র (সম্পাদিত), দ্বিতীয় খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ৪৪
১২. মূকাভিনয়ের ইতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
১৩. আল দীন সেলিম : অভিনয় দর্পণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫, ভূমিকাংশ

আধুনিক বিজ্ঞানে আধ্যাত্মিকতার প্রসার

শান্তিময় ঘোষ

"বলি আমি এই হৃদয়েরে; সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!"[১] জীবনানন্দের ভাষায় প্রবল জল স্রোতে জলের ঘূর্ণাবর্তে এক বিরল ভাষা কথার সৃষ্টি হয়, যে ভাষা-কথা কেউ বোঝে না। অধুনা বিশ্বে বিজ্ঞানের ঘেরা জালে মানুষ বারে বারে তার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতাকে পিছনে ফেলে আত্মকেন্দ্রিকতাকে স্থান দিয়েছে সকলের উর্ধ্বে। মানুষ আজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান এই সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের উপকরণ মজুত করতে গিয়ে কখন যেন মানুষকেই এক যন্ত্রে পরিণত করে তুলেছে। একটু গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, বিজ্ঞান সৃষ্ট কৃত্রিম এই জগৎ আমাদের বিলাসী করে তোলার পাশাপাশি চরম বিষন্নতা ও মানসিক প্রতিবন্ধকতাকেও স্বাগত জানিয়েছে। বিজ্ঞান নানা দিক হতে মানুষের মানবত্বকে দূরে ঠেলে আমিত্বের প্রসার ঘটিয়ে এই মানব সমাজকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করে চলেছে। মানুষের মনের সুপ্ত আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে করে তুলেছে দিশেহারা। এভাবে প্রতিনিয়ত মানবত্বের উপর আমিত্বের প্রলেপ লাগতে থাকলে মানুষই এই মানব সমাজকে একদিন ধ্বংস করে ফেলবে। তাই মনোবৈজ্ঞানিক চেতনাতে শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করতে না পারলে বিধ্বস্ত মানব সমাজকে রক্ষা করা কখনোই সম্ভব হবে না। এজন্য সর্ব প্রথমে প্রয়োজন মানুষের সুপ্ত আধ্যাত্মিক বোধকে জাগ্রত করা। এই সুপ্ত আধ্যাত্মিকতাকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের দার্শনিক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ধর্মকে বুঝতে হবে। কারণ আধ্যাত্মিকতার এক অপরিহার্য অঙ্গ হলো ধর্ম। ধর্মই পারে মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ ধর্ম যেন নিছক অন্ধ বিশ্বাস না হয়। কারণ নিছক অন্ধবিশ্বাস মানুষকে গভীর অন্ধকারে ঠেলে দেয় এবং তার পরিণাম হয় ভয়ংকর। দার্শনিক চেতনার মধ্য দিয়ে তাই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে অনুধাবন করা হয়েছে।

আমরা যদি বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাবো, সমাজের বহু পূর্বে মানুষের জীবন ছিল অতি সহজ ও সরল। মানুষের মনে আধ্যাত্মিকতাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ লোভ্য অর্থ। সর্বহারা মানুষরা ছিল আত্মহারা। বিশ্বাস, প্রেম, ভালোবাসা ও সহনশীলতার মধ্যে দিয়ে মানুষ পেয়েছিল মুক্তির স্বাদ। কিন্তু বর্তমান সমাজ আজ সেই জায়গা থেকে বহু ক্রোশ দূরে। কারণ আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে আধ্যাত্মিক তৃপ্তির পরিবর্তে কিছু বাহ্যিক সন্তুষ্টি ও সাময়িক আনন্দ দিয়েছে। এই সন্তুষ্টি হলো ক্ষণস্থায়ী, যাকে মানুষ পূর্ণ সন্তুষ্টি ভেবে আবেগকে আহ্বান করেছে। সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের প্রভাবে মানুষ তার অন্তরের আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত স্বরূপকেই ভুলতে বসেছে। আমাদের অন্তরের আধ্যাত্মিক চেতনাবোধের উপলব্ধিতে পরম সত্তা ও পূর্ণতাকে যে জানা সম্ভব তা প্রাচীন কিছু ভারতীয় দার্শনিকের মতবাদ থেকে বিষয়টি অবহিত হয়। এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক ভারতীয় দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্নন বলেন—

> মানুষের অন্তরে যে পরম সত্তা রয়েছে তা স্বরূপত আধ্যাত্মিক। এই পরম সত্তা হলো মুক্ত আত্মা, যাকে কোন কিছু দ্বারা সীমিত করা যায় না। তাঁর মতে, পরম সত্তা অসীম, যা সান্ত হতে পারে না। পরম সত্তায় রয়েছে অনন্ত আনন্দ ও দীর্ঘ সুখানুভূতি। এই আধ্যাত্মিকতা হলো তাই যা নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার এক প্রবণতা। মানুষই পারে নিজেকে অতিক্রম করতে এবং আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত হতে।[২]

এখানে আধ্যাত্মিকতাকে সর্ববৃহৎ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আধ্যাত্মিকতা বলতে শুধুই আত্মিক চেতনা নয়, আত্মিকচেতনার পাশাপাশি দৈহিক সুস্থতারও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কারণ, দৈহিক সুস্থতা ব্যতীত আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ কখনোই মানুষের পক্ষে অনুকূল নয়। এছাড়াও আধ্যাত্মিকতাকে জানতে হলে ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে জানা প্রয়োজন। কারণ ধর্মীয় অভিজ্ঞতাই হলো আধ্যাত্মিকতার সঠিক পথ। এই প্রসঙ্গে বলা হয়, 'চিন্তাশীল আধ্যাত্মিক জীব রূপে মানুষ তার ক্ষুদ্র জীব সত্তাকে অতিক্রম করে এবং সংবেদন ও অনুভূতির সংকীর্ণ জগতের সীমারেখাকে অতিক্রম করে এক অতীন্দ্রীয় পরম সত্তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। হেগেলকে অনুসরণ করে দার্শনিক কেয়ার্ড বলেন যে, মনুষ্য চিন্তা স্থানু-প্রকৃতির নয়, তা ক্রমবর্ধমান স্বভাব ধর্মে তা ক্রমশই সম্প্রসারিত হতে চায়। মানুষের চিন্তাশীল আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকাশ ঘটে জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছার মাধ্যমে, কোনো একটি মাত্র মানসবৃত্তিকে অবলম্বন করে নয়।'[৩] আত্মসচেতন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি কেবল এই প্রকৃত সত্যকে জানতে পারে। এই প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কখনোই সম্ভব নয়।

ধর্ম আজ সম্প্রদায়িকতার খাঁচায় বন্দি, মানুষই মানুষকে বিচার করে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে। কিন্তু ধর্ম কী? এ প্রশ্ন আজ অবান্তর। কারণ মানুষ তার সীমিত অভিজ্ঞতায় সাম্প্রদায়িক প্রথাকে রূপ দিয়েছে ধর্মে। বর্তমানে ধর্ম বলতে বোঝায় আধুনিক বিজ্ঞানের আধুনিক যান্ত্রিকতায়। ধর্মের পরিধিতে আজ আধ্যাত্মিকতার কোনো স্থান নেই। ধর্ম তাই বিকৃতরূপে প্রকাশিত। প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ আজ পুঁথিগত বিদ্যার ছেঁড়া পাতায় এবং ধুলো মিশ্রিত আত্মার অন্তরায়। আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টির জন্যই আজ এত বাড়বাড়ন্ত। সামঞ্জস্যের দৃষ্টি ছাড়া অন্য দৃষ্টি সংকীর্ণ। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে, সুন্দর, মঙ্গাল এবং সত্তা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। এই শ্রেয় সাধনা আত্ম উপলব্ধির সাধনা। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "মানুষের কাছে তার অন্তরতম সুন্দর্যের মধ্য দিয়ে সুন্দর প্রকাশিত।"[৪] মানুষের

মহান গুণগুলি তখনই প্রকাশ পাবে যদি ধর্মের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি ঘটানো সম্ভব হয়। এই ধর্মের মানদণ্ড হল, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, ত্যাগ, শ্রদ্ধা ও প্রেম নিবেদন, যা আধ্যাত্মিকতার অনিবার্য শর্ত রূপে কাজ করে। এই মানদণ্ডকে সামনে রেখে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবেই মানুষ সাম্প্রদায়িক এই প্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে। এই বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার মূলে রয়েছে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, যার দ্বারা মনের আত্মশুদ্ধি ঘটে। যদি মনকে দৃঢ় ও একাগ্রচিত্তে সাধনার দ্বারা ধর্মের পথে পরিচালনা করা সম্ভব হয়, তবেই আধ্যাত্মিকতার নতুন উন্মেষ ঘটানো সম্ভব। সাম্প্রতিককালে ধর্মের পরিধিতে বিজ্ঞানের হস্তক্ষেপ বুঝতে হলে আমাদের এই বিষয় গুলি স্মরণে রাখতে হবে। স্বামীজির কথায়, " 'The practicalization of the Eternal Truth-the Oneness of all beings' উপলব্ধিই আসল কথা।"[৫] ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় আমাদের হৃদয়ানুভূতির প্রসারতা ঘটিয়ে এক পরম সত্তা বা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়। এই পরম সত্তার সান্নিধ্যই হল প্রশান্তি ও প্রসন্নতা। এই ধর্মই মানুষকে কর্মযোগী করে তোলে। যার ফলে মানুষ নিঃস্বার্থভাবে কর্মে লিপ্ত হয়। মানুষকে তাই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই আধ্যাত্মিকতায় পৌঁছাতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে আধ্যাত্মিক সত্তাকে উপলব্ধি করার সুপ্ত বাসনা মানুষের অন্তরে রয়েছে, তাকে জাগিয়ে তোলায় হলো ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বলাবাহুল্য মানুষের বিশ্বাস থেকেই ধর্মের উত্তরণ। তাই ধর্ম বিশ্বাসই হলো আধ্যাত্মিকতার প্রথম সোপান। কিন্তু এ ধর্ম আজ আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে, প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞান তাই আত্মীক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি স্থাপন না করে, কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষনের ভিত্তিতে নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ধর্মীয় জ্ঞান আজ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্বারা নানা ভাবে আচ্ছাদিত, যার প্রভাবে মানুষ ধর্মকে সমালোচনার বিষয় রূপে অন্তরে স্থান দিয়েছে। প্রাণিবিজ্ঞান থেকে শুরু করে রসায়ন শাস্ত্র, জীববিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান এই বিশ্বকে শাসন করে চলেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে ধর্মতত্ত্বের আলোচনা বা পরম সত্তার অস্তিত্বের নিশ্চয়তাকে মানুষ নিছক সময়হীন বিষয় ভেবে এগিয়ে গেছে।

বিজ্ঞানের পথে ধর্ম, নাকি ধর্মের পথে বিজ্ঞান' তা আজ মানুষের চিন্তার বিষয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিজ্ঞান কি মানুষের মনের প্রশান্তি আনতে পেরেছে আদৌ কি বিজ্ঞান মানুষের পূর্ণতাকে তুলে ধরতে পেরেছে নাকি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষের মানসিকতাকে এক যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত করেছে আধুনিক বিজ্ঞানের কর্তৃত্বে মানুষ মহাকাশে পাড়ি দিলেও মানুষের আত্মার অন্তঃস্থলে তা এখনও পৌঁছাতে পারেনি। রোবটীয় জীব সৃষ্টিতে বিজ্ঞান তার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে কোনো আত্মিক প্রাণের সৃষ্টি ঘটাতে পারেনি। তাই সাময়িক সুখ ও বিলাসিতা মানুষকে তৃপ্তি দিলেও, বিজ্ঞানের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা মানুষের অভ্যন্তরের পূর্ণ প্রশান্তিকে আজও খুঁজে পাওয়া যায় না। সর্বোপরি, বিজ্ঞান আজ আমাদের আধুনিক করে তুললেও আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তাকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না।

এই আধ্যাত্মিকতার মধ্যে দিয়েই কেবলমাত্র মানুষ তার পূর্ণ প্রশান্তিকে লাভ করতে পারে। মানুষ আজ একটু বেশি আধুনিক হতে গিয়ে নিজের অজান্তেই অন্তরের সুপ্ত আধ্যাত্মিকতাকে মুছে ফেলছে। এখন সময় হয়েছে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোয় যান্ত্রিক মানবতাকে ত্রুটিমুক্ত করে অন্তরের

আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটানো। বিজ্ঞানের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতাকেও সমমর্যদায় প্রতিষ্ঠিত করা। এর জন্য আমাদের সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হল প্রকৃত আধ্যাত্মিক বোধের উপলব্ধি। এই আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে এক বিশেষ আলোচ্য দিক আমরা লক্ষ করি ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায় গুলির মধ্যে, যেখানে ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, বেদান্ত থেকে শুরু করে চার্বাক ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক সম্প্রদায় এই আধ্যাত্মিকতাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য কী? প্রকৃত সত্য কী? প্রকৃত সত্যকে আমাদের কেন জানা প্রয়োজন?

এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে রয়েছে। একে জানতে হলে আমাদের আধ্যাত্মিকতার স্তরে গিয়ে জানতে হয়। এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আমরা কেবলমাত্র এই সম্প্রদায়গুলির মধ্য দিয়ে খুঁজে পাই। আধ্যাত্মিকতায় মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়। এছাড়াও প্রকৃত সত্যকে জানার এক আকাঙ্ক্ষা তখনই জাগ্রত হতে পারে যদি আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করতে পারি। পাশ্চাত্য দর্শনের দিকেও কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বুঝতে পারি দার্শনিকগণ তাদের আত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন এই আধ্যাত্মিকতাকেই কেন্দ্র করে। আধুনিক বিজ্ঞানে আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব যে রয়েছে তাই এর প্রমাণ। মহামারি, দাঙ্গা, বিবাদ, মানসিক অবসাদ ও একঘেয়েমিতা থেকে শুরু করে যা কিছু আজ মানুষের চলার পথে বাধাস্বরূপ তা আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানে আধুনিক চিন্তার প্রসারের ফল। মানুষ আজ তাৎক্ষণিক ফলের আশায় প্রতিনিয়ত ধাবিত। ফলত, চলার পথে ক্ষণিকের সুখকে অনায়াসে আহ্বান করছে। আর এখানেই অন্তর্নিহিত রয়েছে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার মূল সমস্যা।

দৈনন্দিন দিনে বিজ্ঞান আমাদের সকল কিছুকে পরীক্ষাগারে নিয়ে গেলেও মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সন্ধানে ব্যর্থ। কারণ মানুষের প্রকৃত স্বরূপ নির্ভর করে তার সাত্তিক উপলব্ধিতায়। এই সাত্ত্বিক উপলব্ধি কোনো যন্ত্রের যান্ত্রিকতায় পাওয়া সম্ভব নয়। রাধাকৃষ্নন বলেন, মানুষের দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো বিজ্ঞানীকে তার স্বীয় বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের বর্ণনায় চালিত করে এবং অন্যটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যায়। এই অতিক্রম করে যাওয়ার স্তরই হলো আধ্যাত্মিকতার স্তর। বিজ্ঞান দাবি করে যে, ব্যক্তি শরীরের প্রতিটি অঙ্গের ক্রিয়া নির্ধারিত কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করতে পারে না যে, মানুষের কেবল দৈহিক স্বরূপের অংশকে জানলেই প্রকৃত মানুষকে জানা সম্ভব নয়। কারণ, প্রকৃত মানুষকে দৈহিক ক্রিয়ায় পর্যবসিত করা যায় না। তাই মানুষের বৈজ্ঞানিক চিত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ ও আংশিক।'[৬]

মানুষের প্রকৃত স্বরূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ যোগ্য নয়, উপলব্ধির বিষয়। মানুষকে জানতে হলে তার অন্তরের আধ্যাত্মিক বোধকে জাগ্রত করতে হবে। উপলব্ধির মাধ্যমেই কেবল মানুষের প্রকৃত চিত্রকে তুলে ধরা যায়। যাইহোক, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞানের আজ আবিষ্কারের যে বিরোধ রয়েছে তার সংযোজন করাই হলো মানুষের লক্ষ্য। যদি মানুষ এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যতা বিধানে সচেস্ট না হয় তাহলে একদিন যান্ত্রিক মানব সমাজ বিধ্বংস মানবিক ভূমিকম্পের আকার নেবে। তখন মানুষ নিজ কৃত্রিম সৃষ্ট যান্ত্রিক মানব সমাজের দ্বারাই ধ্বংসলীলায় মেতে উঠবে। তাছাড়াও এর পরিণাম কি ভয়ংকর রূপ হতে পারে তা আমাদের আটপৌরে ভাষায় যথাযথ প্রকাশ সম্ভব নয়। এজন্য সর্বপ্রাণবাদকে স্বাগত জানিয়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সেতুবন্ধন স্থাপন করা প্রয়োজন। সমকালীন বিশ্লেষণাত্মক দর্শন

চিন্তনে এই বিষয়কে বিশেষ মর্যাদা সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সর্বোপরি, ধর্ম ও বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারমূলক ঘটনার ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার পরিণাম রয়েছে। আমাদের উচিত এই ভালোত্বকে গ্রহণ করে মন্দত্বকে নির্দ্বিধায় বর্জন করা। তবেই এক উৎকৃষ্টতর মানব সমাজ মানুষের পক্ষে গঠন করা সম্ভব হবে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে আধ্যাত্মিক চেতনা আপন ছন্দে প্রকাশ পাবে। বহু ও বিচিত্রের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ঐক্য বিরাজ করে তা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কখনো পরিস্ফুট হতে পারে না। একমাত্র মানুষের আত্মিক দৃষ্টিতে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগম্য।"[৭] যা এক কবির কাব্যে বলা হয়েছে—

> Wisdom and spirit of the Universe
> Thou soul, That art the eternity of thought,
> And givest to forms and images a breath,
> And everlasting motion.

অর্থাৎ, "হে বিশ্বাত্মা, হে বিশ্বমন!/এ মহাজগতে বিরাজ করছে তোমারই ধী,/রূপে রূপে তুমি যোগাইছো প্রাণবায়ু,/জগৎ চলিছে, চলিছে অন্তহীন।"[৮]

উৎসের সন্ধানে

১. তপন গোস্বামী : 'এ সময়ের কবিতা', আশাদীপ এর পক্ষে অনিরুদ্ধ মন্ডল কর্তৃক নতুন ডাঙ্গালপাড়া, সিউড়ি, বীরভূম থেকে প্রকাশিত এবং বঙ্গাবাসী লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১০২

২. নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন', স্বদেশ, কলকাতা, পৃ. ১৮১

৩. সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য : 'ধর্মদর্শন', বিপ্লব ভাওয়াল, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৭১

৪. দিলীপ কুমার মহান্ত : 'ধর্মদর্শন পরিচিতি', শ্রী ডি এল এস জয়বর্ধন, মহাবধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ. ৯৭

৫. তদেব, পৃ: ১৮৭

৬. গোবিন্দ চরণ ঘোষ : 'সমকালীন ভারতীয় দর্শন', শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

৭. শংকর সেনগুপ্ত : 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দি রিলিজিয়ন অফ ম্যান', শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃ. ৯৩

৮. তদেব, পৃ. ৯৩

৯. দিলীপ কুমার মহান্তি : 'ধর্মদর্শনের কতিপয় সমস্যা', অভিষেক পাল, কলকাতা

১০. রবীন্দ্রনাথ দাস : 'ধর্ম ও দর্শন', মিত্রম, কলকাতা

বাংলা দলিল-দস্তাবেজ : কৃষি-অর্থনীতি বিকাশের প্রামাণিক ঐতিহাসিক উপাদান

পিন্টু শীট

কৃষিনির্ভর গ্রামীণ বাংলার আর্থিক বিকাশের ধারায় কৃষির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তথাকথিত রুগ্ন কুটির শিল্পগুলি হয়তো জনজীবনে অতিসামান্য পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করলেও বলা চলে গ্রাম জীবনে আর্থিক-কাঠামোর মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির ইতিহাস জানা সম্ভব হয়নি মূলত উপাদানের অভাবে। সেই সঙ্গে বাংলার কৃষি-অর্থনীতির ইতিহাসও। এদেশে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য করার সনদ লাভ এবং পরবর্তী সময়ে ইংরেজদের শাসনব্যবস্থা কায়েম করায় জনজীবনে যে প্রভাব পড়তে থাকে তাতে কৃষির উপর প্রভাব পড়ে বহুল। বাংলার জমি কুক্ষিগত ছিল রাজার, জমিদারে, সমাজের প্রধান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতায়। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের জমির উপর কোন অধিকার ছিল না। এইসব ভূমধ্যকারীরা যে-কোনো প্রকারে সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে কৃষিক্ষেত্রে একপ্রকার ‘বেগার’ খাটিয়ে কৃষিজাত পণ্য ভোগ-দখলে আনত। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পরে ইংরেজ সরকার কৃষিজাত পণ্য থেকে অধিক কর আদায়ের চেষ্টায় জমির উপর ভূমধ্যকারীগণের অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করে। তারই ফলশ্রুতিতে ঘটে ‘পাঁচশালা’, ‘দশশালা’ বন্দোবস্ত। ‘পাঁচশালা’ বন্দোবস্তে জমিদারগণকে পাঁচ বছরের জন্য কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান। এর ত্রুটি লক্ষ্য করে পুনরায় দশবছরের ‘দশশালা’ বন্দোবস্ত। আবার এই ব্যবস্থার ত্রুটি লক্ষ করে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে জমিদারগণকে শেষে রাজস্ব আদায়ের ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ করা। ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ প্রথা প্রবর্তনে বাংলার গভর্ণর লর্ড কর্ণওয়ালিশ আশা করেছিলেন জমিদারগণ জমির উপর স্থায়ী অধিকার পেলে নিজ নিজ জমিদারির উন্নতি বিধান কল্পে উৎসাহী হয়ে, একদিকে যেমন কৃষির উন্নতি ঘটিয়ে আর্থিক বিকাশে

সহায়ক হবেন তেমনি অপরদিকে প্রজাসাধারণকে 'আপন জন' ভেবে 'বাজে কর' আদায় থেকে বিরত থাকবেন। কিন্তু, বাস্তবে তা ঘটল না। কৃষকরা তো বিন্দুমাত্র উপকৃত হল না অধিকন্তু জমিদারগণের কাছে 'দয়ার পাত্র' রূপে বিবেচিত হতে থাকল। তবে রাজা কিংবা জমিদারগণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে হলে জমি ও কৃষির উন্নতি বিধান করা দরকার। এই চিন্তার প্রেক্ষাপটে আসে জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী কর নির্ধারণ করতে হলে জমির শ্রেণি নির্ণয় প্রয়োজন। এই জেলায় জমির শ্রেণি বিভাজন হল এইরূপ—নিমকীমহল, জলপাই জমি, নাখোরাজ সম্পত্তি, খাসমহল, জলজমি, ডাঙাজমি ইত্যাদি। নির্দিষ্ট সময়ে জমির খাজনা আদায়ের জন্য তৈরি হল 'Sunset Law' বা 'সূর্যাস্ত আইন'। 'কর' আদায়ের জন্য জমিদারগণ জমিদারীকে খণ্ড খণ্ড বিভাজনে ইজারাদার নিয়োগ করলেন। ইজারাদারগণ পুনরায় নিজ নিজ অধিকারভুক্ত জমিকে খণ্ড খণ্ড করে এক একটি খণ্ডের কর আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন 'দরইজারাদার'।

আবার মূল জমিদারগণ রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টায় বহু জমি কোম্পানির হিসেব থেকে লুকিয়ে রাখতেন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি প্রথম এইসব খাস জমি নাখরাজ সম্পত্তি নিজেদের করায়ত্বে এনে জরিপের বন্দোবস্ত করেন এবং জমির উপর প্রজাসাধারণের ন্যায্য অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন' তৈরি করে প্রজাস্বত্ব রক্ষার চেষ্টা করেন। অদ্যাবধি ঐ আইনই প্রজাস্বত্ত রক্ষায় 'রক্ষাকবচ' রূপে কাজ করে আসছে। গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে জমির ভূমিকা কতখানি তা বোঝার কারণেই জমি সম্পর্কিত এই ইতিহাসটুকু স্মরণ করা প্রয়োজন।

কৃষি-অর্থনীতি বিকাশের প্রথম পর্বে কৃষির উন্নতি বিধানে সবচেয়ে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়—খরা, বন্যা, অতিবৃষ্টি, ঝড়ঝঞ্ঝা ইত্যাদি। এগুলির কারণে কৃষিভূমি হয়ে ওঠে অনুৎপাদিকা। এর ফলে দেখা যায় দুর্ভিক্ষ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এর বাইরে ছিল বিদেশি আক্রমণ, সম্পদ লুঠপাট ইত্যাদি ঘটনা। পশ্চিম বাংলার মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় মারাঠা আক্রমণ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে প্রজারা দলে দলে গ্রাম ছেড়ে জীবন রক্ষার তাগিদে অন্যত্র পালাতে বাধ্য হয়। ফলে কৃষিকাজে ঘটে শ্রমিকের অপ্রতুলতা। এই সমস্যার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কাশীজোড়া (পাঁশকুড়া) পরগণা ও সাহাপুরের জমিদারগণ পলাতক কৃষিজীবিদের স্বগ্রামে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে কৃষির উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হন। কৃষি-অর্থনীতির অবনতিতে কেবল শ্রমিক সমস্যা, উৎপাদনে অপ্রতুলতাই মূল কারণ ছিল না, সুষ্ঠু বাণিজ্যিক ব্যবস্থা চালু না থাকাও উৎপাদিত কৃষিপণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় হত না। কৃষি-অর্থনীতি আরও পঙ্গু হয়েছিল সরকারি নীতির ফলে। বহির্বাণিজ্যে অধিক মুনাফালাভের আশায় সরকার কৃষিজমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে জোর করে কৃষকদের তুঁত চাষ করতে বাধ্য করায় শস্য উৎপাদনে ভাটা দেখা দেয়। তুঁত চাষের ইতিহাস সমৃদ্ধ নথিগুলি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, তবুও যে দু'একটি নথি 'বিজন-পঞ্চানন সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রে' আছে তাতে জানা যায় ঘাটাল-দাসপুরে এই চাষ হতো ব্যাপক পরিমাণে।

জমির উপর কৃষকের স্থায়ী অধিকার না জন্মালে কৃষিপণ্য উৎপাদন যে সঠিক মাত্রায় সম্ভব নয় একথা সরকার বুঝেছিল। তারই ফলস্বরূপ 'পাঁচশালা', 'দশশালা', 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। এর উপর ছিল ইজারাদার, দরইজারাদারদের অন্যায্য কর আদায়, জমি লিজে দেওয়া, 'আগতরা খাজনা' নেওয়া ইত্যাদি প্রথা কৃষি উৎপাদন পদ্ধতিকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। পুরোনো নথিপত্রে সেই

মর্মান্তিক ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এখানে ইজারা প্রথার কয়েকটি নথির বিষয় উল্লেখ করছি—জনৈক স্বরূপ নারায়ণ দাস ১২৬৮ সালে পাচবাড্যা সাকিনের গুরুপ্রসাদ মাইতিকে বাংলা সন ১২৬৯ সাল থেকে ১২৭৬ সাল পর্যন্ত মোট আট বছরের মেয়াদে জমি ইজারা (আর্কাইভ নং ৪০৮) দিচ্ছেন সন সন খাজনা পাওয়ার আশায়। অনুরূপ একটি ইজারাপত্রে (আর্কাইভ নং ২৪৭) জগত নারায়ণ ফকিরচাঁদ মাইতিকে চৌদ্দ বিঘা জমি প্রতিবছর মাত্র সতের টাকা চৌদ্দ আনা সাড়ে বার গণ্ডা হিসাবে মোট একশ ঊনআশি টাকা নয় পাই নিয়ে ১২৬৯ সাল থেকে ১২৭৮ সাল পর্যন্ত মোট দশ বছরের জন্য ইজারা দিচ্ছেন। অনুরূপ ইজারাপত্রগুলি হল—আর্কাইভ নং ১০৩, ৪১৫, ৪, ৭৭৬ ইত্যাদি। 'ঠিকা পত্তনি পত্র' এক প্রকারের ইজারাপত্র। নির্ধারিত রাজস্ব প্রদানে কয়েকটি শর্তপালনের অঙ্গীকারে কিছুকালের জন্য জমি ভোগ-দখলের অধিকার পাওয়া। সে সব শর্ত সম্পর্কে একদিকে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি অন্যদিকে সেকালে কৃষি-অর্থনীতি বিকাশে জমির ভূমিকা কিরূপ ছিল তার স্বরূপ উপলব্ধির জন্যই 'ঠিকা পত্তনি পত্র'টি দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত করছি—"মহামহিম শ্রীযুত ইন্দ্রনারায়ন মাইতি ঁগুরুপ্রসা মাইতির পুত্র ও শ্রীযুক্ত রমানাথ মাইতি ঁউদয় চাঁদ মাইতির পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মাইতি ঁরাজনারায়ন মাইতির পুত্র জাতিয়ে মাহিস্য পেশা তালুকদারি আদী সাং পাঁচবেড়্যা পং তমলুক স্টেশন শবরেজেস্টর মহিসাদল জেলা মেদীনিপুর বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রী উপেন্দ্রনাথ ঘোস ঁযদুনাথ ঘোসের পুত্র জাতিয়ে কায়স্ত পেশা জমীদারী আদী ও ওকালত আদী শাং বেলুন পং কেদারকুণ্ডু হাং শাং ছোটবাজার সহর মেদীনিপুর ও জেলা মেদীনিপুর।

কস্য চিরস্থায়ী পত্তনি ও দরপত্তনি পট্টকপত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে স্টেশন সবরেজেস্টর তমলুকের অধিন ময়না পং কলেক্টরি ১৭৯৮ নং তৌজীভুক্ত মাহাল মদনমোহনচক মৌজায় রঃ আনা অংশ আমার পৈত্রিক জমিদারি হইতেছে ও ঐ মৌজায় রঃ আনা অংশ আমার সহোদর ভ্রাতা গোপিন্দ্র নাথ ঘোষের পৈত্রিক জমীদারি ছিল গোপীন্দ্র নাথ ঘোষ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তদিয় ওয়ারিশ পত্নি শ্রীমতি উপেন্দ্র মোহিনী দাসী তাহাতে সত্ববতি হইয়া বৈধ ও আইন সঙ্গত কারণে উক্ত মদনমোহনচক মৌজায় রঃ আনা ও অন্যান্য তালুকাৎ ও দেবত্তরশহ আমাকে সন ১৩০৪ সালের ২৮ শা কাত্তিক তারিখে রেজস্টারিকৃত পত্তনী পাট্টার বিলি করিলে আমি তদবধি অন্যের অবিবাদে দ্বাদশ বৎশ্যরের উর্দ্ধকাল উক্ত রঃ। . আনা অংশে সত্ববান ও দখলকার আছী এক্ষনে উক্ত মদনমোহনচক মৌজার উক্ত রঃ চারি আনা অংশের কাত মং ১৬০ ১১ টাকা তস্কিশ আপনারা আমার অধীনে পত্তনী ও দরপত্তনী লইতে ইচ্ছুক হওয়ায় উক্ত অংশের মোট মজুদাদ মঃ ৩৬১ টাকার মধ্যে গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য বাদে বক্রি লভ্য মঃ ১৭৩/১৪ টাকার মধ্যে কেবলমাত্র মঃ ৫০ পঞ্চাশ টাকা মালিকানা রাখিয়া বক্রি লভ্য বাবৎ মঃ ১২৩/১৪ একশত তেইশ টাকা এক আনা চৌদ্দ গণ্ডা মঃ ২০০০ দুই হাজার টাকা পণ গ্রহনে নিম্ন লিখিত স্বত্যাধিনে আপনাদিগকে উক্ত মাহাল নিজাংশ রঃ আনা ও দরপত্তনি বিলি করিয়া অঙ্গিকার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছী যে আপনারা অদ্য হইতে উক্ত পত্তনি ও দরপত্তনি স্বত্যাধিনে দান বিক্রয় আদীর ক্ষমবান হইয়া কুল হক হকক সংম্পুন তালুকদারি স্বত্যে পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিসানক্রমে ভোগদখল করিতে থাকিবেন ও আমলীসন ১৩১৫ সাল বকয়া খাজনাদী ও বর্তমান সন ১৩১৬ সালের অদ্যতক খাজনাদী আপনারা প্রজাগনের নিকট আদায় লইবেন আমার সহ উক্ত বকয়া ও হাল খাজনার কোন এলাখা রহিল নাই—

১. উক্ত মালিকান মঃ ৫০ পঞ্চাশ টাকা আপনারা প্রতি বৎশ্যর মাঘ মাসের শেষে আমার

বসতবাটী বেলুন গ্রামের স্থিত কাছারি বাটীতে আদায় দিতে থাকিবেন রিত মত দাখিলা গ্রহণ করিবেন বিনা দাখিলায় টাকা আদায়ের ওজর করিতে পারিবেন না মালিকানা আদায়ের ত্রুটি হয় তাহা হইলে আমি আইনমত শতকরা মাসিক ১ একটাকা হারে সুদসহ টাকা আদায় লইতে পারিব কস্মিনকালে কোন কারণে উক্ত মালিকানা টাকার উপর বেশী জমা তলফ ফি ধার্য করিতে আমি বা আমার ওয়ারিশানের ক্ষমতা রহিল না এবং আপনারা বা আপনাদের ওয়ারিসানগন কস্মিনকালে কোনরূপ কারণে জমা কমির কোনরূপ ওজর বা দাবি করিতে পারিবে না মফঃস্বলের শীমা সরহর্দ্দ বজায় রাখিবেন মাহালের মুল্য খর্বতাজনক কোন কার্য্য করিবেন না দেওয়ানী ফৌজদারি কি অন্য কোন হাকিমানের সরকারে যে কিছু হুকুম তামিল করিতে হয় ও সংবাদআদী দিতে হয় তাহা আপনারা তামিল করিবেন ঐ মৌজার সম্বন্ধে উক্তরূপে তামিল না করা জন্য আমার কোনরূপ দণ্ড বা ক্ষতি হয় তাহার ক্ষতিপুরণ আপনারা করিতে বাধ্য রহিলেন উক্ত মালিকানা ৫০ পঞ্চাশ টাকা আদায়ের মাতর্ব্বরি জন্য আপনাদের উক্ত পত্তনী ও দরপত্তনী স্বত্য আবদ্ধ রহিল ভবিষ্যতে আমার প্রাপ্য মালিকানার উপর যদি কোনরূপ করআদী ধায্য হয় তাহা আমি আদায় দিব তজ্জন্য আপনাদের কোনরূপ দ্বায়িত্ব রহিল না।

২. উক্ত মাহাল বাবত কালেক্টরিতে রেভিনিউ সেষ ও পুলবন্দীআদী যাহা ধায্য আছে ও ভবিষ্যতে গবর্ণমেন্ট হইতে যাহা ধায্য হইবে তৎসমস্ত আপনারা কিস্তীমত কালেক্টরিতে দাখিল করিতে থাকিবেন যদি আপনাদের ত্রুটিবসত উক্ত অংশ নিলাম হয় বা আমার অন্য কোনরূপ ক্ষতি হয় তজ্জন্য আপনারা সমুহ ক্ষতিপুরণ ও মায় আদায় কালতক মাসিক শতকরা একটাকা হারে যুদসহ মিটাইয়া দিতে বাধ্য রহিলেন গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য টাকার সহিত আমার কোনরূপ এলাখা রহিল না। উক্তরূপ দেয় কালেক্টরি বাবত দাখিলী টাকা আমার প্রাপ্য মালিকানা বার্সিক মঃ ৫০ পঞ্চাশ টাকা আপনারা পৃথক রূপে আদায় দিতে থাকিবেন।

৩. আমি উক্ত শ্রীমতি উপেন্দ্র মোহিনী দাশীর সরকারে তাঁহার প্রাপ্য টাকা নিয়মিত রূপে আদায় দিতে থাকিব আপনাদিগকে কোনরূপ দায়িক হইতে হইবে না যদি আমার উক্ত টাকা দেওয়ায় ত্রুটি বশত আপনাদীগকে কোনরূপ দায়গ্রস্ত হইতে হয় কিম্বা আমার অন্য কোনরূপ কৃতকার্যের জন্য উক্ত অংশ নিলাম হয় অথবা আপনাদের দখলের কোনরূপ বিঘ্ন হয় তজ্জন্য সমস্ত ক্ষতিপুরণ আপনারা কি আপনাদের ওয়ারিশানগন আমার কিম্বা আমার ওয়ারিশানগণের নিকট বেদখলের তারিখ হইতে আদায় কালতক মাসিক শতকরা একটাকা হারে যুদসহ টাকা আইনানুসারে আদায় করিয়া লইবেন।

৪. মফঃস্বলে প্রজাগনের নিকট যাহা জমা ধায্য আছে তাহা কিম্বা ভবিষ্যতে মাহাল জরিপ জমাবন্দী আদী করিয়া কিম্বা পতিত বিলীবন্দবস্ত আদীতে প্রজাগনের উপর যাহা জমা ধায্য হইবেক তাহা আপনারা আমার স্বরূপ আপসে বা নালিসের দ্বারায় আদায় করিতে থাকিবেন বৃদ্ধি জমা আদীর দরুন আমি কোনরূপ দাবি দায়া করিতে পারিব না আপনারা উক্ত মাহালের হাটঘাট ঘোলাগঞ্জ পতিত বাঁদ খাল আদীতে কুল হকহকুক সত্বে দখল করিতে থাকিবেন।

৫. জদি গবর্ণমেন্ট হইতে উক্ত মাহালের কোন অংশ খাল বাঁদ কি রেলরাস্তা আধী কোন কারণে গৃহিত হয় তাহা হইলে যে পরিমান অংস গৃহিত হইবে তাহার লভ্য ও লোকসান ও মুল্যের টাকা আদী পরস্পর হারাহারিমতে পাইব।

৬. প্রকাশ থাকে যে উক্ত মাহাল আমি ইতিমধ্যে অপর কোনরূপ দায় সংযোগ করি নাই যদি কোন দায় প্রকাশ হইয়া তজ্জন্য আপনাদের পত্তনী ও দরপত্তনীর স্বত্বের ক্ষতি হয় তাহা আমি পুরণ করিতে বাধ্য রহীলাম।

৭. উপরূক্ত স্বত্বসমুহে আমি ও আমার ওয়ারিসানগন কি স্থলাভিসিক্তগন বাধ্য রহীলাম ও রহিল এবং আপনারা ও আপনাদের ওয়ারিসান ও স্থলাভিসিক্তগন সম্পূর্ণরূপে বাধ্য রইলেন মাহালের নয়া জমা কাগজআদী নিম্নের তপশীল মত আপনাদের হাওলা করিয়া শাক্ষিগণের মোকাবিলায় মুল্যের টাকা নগদ বুঝিয়া লইয়া উসিয়া কবুলতি গ্রহনে আপন সেইচ্ছায় অত্র পত্তনীতে দরপত্তনীপাট্টা লিখিয়া দীলাম। ইতি সন ১৩১৬ শাল তাং ২৪শা মাঘ ইংরেজি ১৯০৯। ৫ ফেব্রুয়ারি।"

'ঠিকা পত্তনি পত্রে'র অনুরূপ 'আগতরা খাজনানেনা পত্র'। এই 'আগতরা খাজনানেনা পত্র'-গুলিতে দেখা যায় একটি নির্দিষ্ট বছরের জন্য জমি চাষ আবাদের অধিকার দিয়ে জমির মালিক প্রাপকের কাছ থেকে অগ্রিম খাজনা নিয়ে নিতেন। এইরূপ রীতিতে জমি চাষা-বাদের অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে জমিদাতার কোনো ঝক্কি থাকছে না খাজনা পাওয়ার বিষয়ে। এরূপ নথিপত্রগুলি হল আর্কাইভ নং ৪৬৫, ১০৩, ৫০৪, ৫০৯ ইত্যাদি।

যেভাবেই হোক জমি চাষ-আবাদের অধিকার পেলেও একজন কৃষকের পক্ষে চাষ আবাদ করা সহজ ছিল না অর্থাভাবের কারণে। চাষের মূলধন হল—শ্রম, অর্থ, বীজ ইত্যাদি। একজন কৃষক পরিবারের সকলের শ্রমদানের বিনিময়ে জমি আবাদ করতে হয়তো পারে কিন্তু অর্থ না থাকলে বীজ, সার, লাঙল ইত্যাদির ব্যয় বহন করা সহজ ছিল না। এজন্য তাকে যেতে হত মহাজনের কাছে অর্থ ঋণ নেওয়ার কারণে অত্যন্ত চড়া সুদ দেওয়ার অঙ্গীকারে। যে কৃষক একবার মাত্র মহাজনের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়েছে, তার সম্পূর্ণ ঋণমুক্তি ঘটেছে কিনা বলা শক্ত। অভাব-অনটনে জর্জরিত কৃষকদের অর্থনৈতিক হালচাল কেমন ছিল তা জানতে আমাদের কাছে ঐ সব 'তমসুক' প্রামাণ্য নথিরূপে বিবেচিত। এমনই কয়েকটি নথি আর্কাইভ নং ২৫০, ২৬৩, ৩২৪, ৩৬৬, ১, ৬৩, ৩৬৯ ইত্যাদি। এগুলি পর্যালোচনা করলে কৃষি-অর্থনীতির ভঙ্গুর অবস্থাটি সহজে জানা যায়। কৃষকরা মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিত সেকথা পূর্বেই বলেছি। অনেক সময় এই ঋণ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতো। এই বিরোধের মীমাংসার জন্য সরকারকে তাই আইন তৈরি করে 'ঋণ সালিশী বোর্ড' গঠন করতে হয়। আবার ঋণ গ্রহীতা যথাসময়ে মহাজনের ঋণ শোধ করতে না পারায় অনেক সময় বন্ধকী সম্পত্তিও নিলাম হয়ে গেছে আইনের দরবারে। বলা বাহুল্য, এই ঋণের দায়ে একজন কৃষকের বাস্তুভিটে সহ কৃষিজমি নিলামে তো উঠেছেই এমনকি মায় শ্মশান ভূমিও বাদ যায়নি।

একদিকে কৃষকদের এই অবস্থা অন্যদিকে জমি হস্তান্তর, মামলা, মোকদ্দমা, তমসুকপত্র তৈরি ইত্যাদি নানা কাজে স্ট্যাম্প পেপারের ব্যবহার কৃষক জীবনকে পঙ্গু করে দেয়। আবার দু' একটি ক্ষেত্রে সরকারকে Stamp duty দেওয়ার ক্ষেত্রেও রেহাই দেওয়া হয়েছে এমন নথিও রয়েছে। কৃষি-অর্থনীতিতে এই Stamp duty দেওয়ার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

উৎসের সন্ধানে

১. সুকুমার মাইতি : 'কোম্পানী আমলে দক্ষিণ বঙ্গে ভূমিব্যবস্থা ও কৃষি অর্থনীতি চর্চার তথ্যাবলী' (১ম খণ্ড), বিজন-পঞ্চানন সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
২. সুকুমার মাইতি : প্রাগুক্ত
৩. এটা বলতে সমস্ত সংগ্রহ বোঝায়

মৌসুনী দ্বীপের ইতিকথা
একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান
গুরুপদ দাস

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন মোট ৯৬৩০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এর ৪২৬০ কিলোমিটার রয়েছে বনভূমি এলাকা সমৃদ্ধ ৪৮টি ব-দ্বীপ ও ৫৩৭০ কিলোমিটার রয়েছে মনুষ্য বসতি এলাকা সমৃদ্ধ ৫৪টি ব-দ্বীপ। এই ৫৪টি ব-দ্বীপের একটি আলোচিত এবং ইতিহাস সমৃদ্ধ দ্বীপ হল মৌসুনী দ্বীপ।[১] এই দ্বীপটি গঙ্গাসাগর ও ফেজারগঞ্জ বকখালীর মধ্যস্থলে হুগলী শাখা নদী মুড়ি-গঙ্গার মোহনায় একটি লম্বাটে ভূখণ্ড নিয়ে অবস্থান করেছে যার দূরত্ব কলকাতা থেকে ১৩৫ কিলোমিটার। দ্বীপটির নিচের অংশ অনেকটা পিপীলিকা ভুক্ত প্রাণী পাঙ্গোলিনের সুরের আকারে সমুদ্রের দিকে নেমে গিয়েছে যার উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর রয়েছে জনাকীর্ণ সুরক্ষিত বনভূমি সমৃদ্ধ জম্বু দ্বীপ।[২] মানচিত্রে যেখানে মৌসুনীর অবস্থান ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত "A chart of the Mouths of Hooghly River" মানচিত্রে সেই দ্বীপের নাম "Brunswick Island"। এই মানচিত্রটির প্রস্তুতকারক হিসাবে উল্লেখ রয়েছে—from the survey of John Rictche Marine Survey to the Honorable the East India company and those of Benjanin Lacam। মানচিত্রটিতে দ্বীপটির উত্তরাংশ (পয়লা ঘেরী) 'Prince Island' নামে চিহ্নিত ও দক্ষিণাংশের (সল্ট ঘেরী) নাম ছিল 'Pitty Point'। ১৯১৮-তে প্রকাশিত "Map of River Hooghly" মানচিত্রে দ্বীপটির নাম Brunswick Island রাখা হলেও সেখানে উত্তরাংশ 'Prestons Points' ও দক্ষিণাংশ 'Dundas Point' নামে পরিচিত। দ্বীপটির পূর্ব দিকে প্রবাহিত 'চিনাই নদীর' পূর্ব নাম ছিল "Pittós Creek"। ১৯১৭ সালে Survey of India করা টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রে সর্বপ্রথম এই দ্বীপটিকে "Mahisan Island" নামে উল্লেখ করা হয়েছিল[৩]। মৌসুনী দ্বীপের নামকরণ কারো মতে মৌসুমী বায়ু থেকে

হয়েছে, আবার কারো মতে 'মৌ বা মধু' শব্দ থেকে 'মৌসুনী' নামটি এসেছে। আর ইংরেজরা যেহেতু মৌসুনী শব্দটা উচ্চারণ করতে পারতেন না, তাই তারা 'Mahisan' বলে ডাকতেন। তাই তারা 'Mahisan Island' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

২

মৌসুনী দ্বীপের বসবাসের যাত্রা কীভাবে শুরু হয়েছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় মৌসুনী দ্বীপে প্রবীণ শিক্ষক মোঃ কাজীহার মল্লিক[৪] (৯২ বছর), সমাজসেবক অরূপ মণ্ডল[৫] (৫২ বছর), স্কুলের ক্লার্ক সরল কুমার দাস[৬] (৫৪ বছর), প্রবীণ শিক্ষক জালালুদ্দীন শাহ[৭] (৭৬ বছর) প্রমুখদের মতামত অনুযায়ী জানা যায়—"সারা ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশ শাসনাধীন সরকারীরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের মাধ্যমে একে একে সুন্দরবনের অরণ্যময় দ্বীপগুলোকে বসবাস উপযোগী এলাকায় পরিণত করা হচ্ছিল। ১৯২৫ সাল। মৌসুনী দ্বীপকে জনবসতি এলাকায় পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে এখানে মধ্যস্বত্ত্বভোগী জমিদার ও লাঠদার দের মাধ্যমে নয়, ২৪ পরগনা জেলা কর্তৃপক্ষের ভূমি রাজস্ব বিভাগের মাধ্যমে সরকারি কৃতিত্বাধীনে বন জঙ্গাল পরিষ্কার করে মৌসুনী দ্বীপের জমি সরকারি কৃষক প্রজাদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং এভাবেই শুরু হয়েছিল কর্মযজ্ঞ। জমি জরিপে দেখা গেল দ্বীপের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারযোগ্য জমির পরিমাণ খাল ও জলাভূমি সহ প্রায় ৪০ হাজার বিঘে। আবাদ যুক্ত জমি গুলিকে ৫, ১০, ও ১৫ বিঘা খন্ডে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং ১০ রশ্মি অন্তর জল নিকাশির ড্রেনসহ রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, যাতে রাস্তার পাশে মানুষ বাসস্থান করতে পারে। সুদূর উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে ১৬ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল।" মৌসুনী দ্বীপটিতে মোট চারটি মৌজা রয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণে যথাক্রমে পয়লা ঘেরী, বাগডাঙ্গা, কুসুমতলা ও বালিয়াড়া। বাগডাঙ্গাবাসী লালমোহন ডিঙাল (৬৪ বছর) মৌজা সম্পর্কে বলেছিলেন—

> পয়লা ঘেরী নামকরণের কারণ এই দ্বীপের 'প্রথম এখানেই জঙ্গাল পরিষ্কার' করা হয়েছিল, বাগডাঙ্গা নামকরণ হয়েছে কারণ এখানে 'বাঘে'র বাস ছিল, কুসুমতলা নামকরণ হয়েছে অঞ্চলটি কাটার সময় অনেক 'ডিমের কুসুম' পাওয়া গিয়েছিল এবং বালিয়াড়া নামকরণ হয়েছে এখানে বড় বড় 'বালির ডিপি' থাকার জন্য।[৮]

বন-জঙ্গাল সমৃদ্ধ ও বাঘ-হরিণ-কুমির এর বিচরণ ক্ষেত্র এই মৌসুনী দ্বীপে মনুষ্য বসতি কোথা থেকে এলো তার একটা ধারাবাহিক বর্ণনা করা যেতে পারে। সার্ভে করে দেখা গেছে বেশির ভাগই এসেছেন উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, মেদিনীপুর ও ডায়মন্ড হারবারের আশেপাশের অঞ্চল থেকে। ব্রিটিশ সরকার 'জমি বিলি ব্যবস্থা' শুরু করেছিলেন ব্রিটিশ কর্মী জনৈক মৌলবী সাহেবের হাত দিয়ে। এছাড়া ব্রিটিশ সরকার তিন জন এক্স-মিলিটারি ম্যানকে ১০০ বিঘে করে জমি দান করেছিলেন। সেই তিনজন ব্যক্তি হলেন কেবলকৃষ্ণ ঘোষ (বালিয়াড়া) প্রফুল্ল চন্দ্র সেন (কুসুমতলা) ও বিপিন মণ্ডল (বালিয়াড়া ও বাগডাঙ্গা)।

প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ সরকার মৌশুনী দ্বীপকে বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ থেকে সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষদের আনিয়েছিলেন। এবং তাঁরাই এখানকার প্রথম ব্রিটিশ প্রজা যারা জঙ্গাল কাটাই ও পরিষ্কার করেছিলেন। এই তথ্য জানা গেছে দাসোচন্দ্র কিস্কু, সোনারাম সোরেন, সাগর মাঝি, সাবিত্রী হেমরম ও ফুলমণি হাসদাদের পূর্বপুরুষদের বলে যাওয়া স্মৃতি কাহিনি থেকে। ব্রিটিশ সরকার এঁদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে ১৫ বিঘে করে জায়গা বিলি

করেছিলেন। মৌসুনী দ্বীপবাসী ও মৌসুনী কো-অপারেটিভ হাইস্কুলের ক্লার্ক বিভাগের কর্মী সরল কুমার দাসের 'স্নেহময়ী মৌসুনী দ্বীপ : এক স্বল্লায়ু স্মৃতিচারণ' প্রবন্ধ থেকে সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষদের মৌসুনীতে আসার কাহিনি পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ রয়েছে যে "আবিন অকাসেন খন বিন? হাজু : কানা উড়িষ্যা পনত রেনা : ময়ূরভঞ্জ খন।"[৯] অর্থাৎ তুই কোথা থেকে আসছিস? উত্তর : উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ থেকে।

এছাড়া আরও কয়েকজনের স্মৃতিচারণ থেকে মৌসুমী দ্বীপে আসার কাহিনি উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন---মৌসুনীতে সি.পি.আই.এমের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান তথা 'বাগডাঙা-কুসুমতলা-কুসুমতলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে'র প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সন্তোষ মালের (৮৩ বছর) মতে, "আমার বাপ-জ্যাঠারা মেদিনীপুরের গড় গ্রামের বাড়ি থেকে কামারদা কলাগাছিয়া হয়ে তেখালি ব্রিজ পেরিয়ে খাল পাড় দিয়ে হেঁটে বটে করে কাকদ্বীপ হয়ে মৌসুনী দ্বীপে এসেছিলেন।"[১০] মৌসুনী দ্বীপের প্রথম খণ্ড জুনিয়র বেসিক স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক বিষ্ণুপদ সাঁতরার (জন্ম, ১৬ মে ১৯৪৯) বক্তব্য অনুসারে "বাবা (যুধিষ্ঠির সাঁতরা) এসেছিলেন মেদিনীপুরের কাণ্ড পসরা গ্রাম থেকে হেঁটে হেঁটে নরঘাটে এসে বোট ধরে তেরপেখ্যা হয়ে হলদি নদী ধরে হুগলি নদী পেরিয়ে কাকদ্বীপের আসেন ও রাতে কাকদ্বীপের বাসা ঘরে থেকে পরের দিন টেকার বাজার হয়ে মৌসুনী দ্বীপে এসেছিলেন।" এবং এও বলেন "আমার বাবা মৌসুনীর প্রথম জঙ্গল কাটাইয়ের প্রজাদের একজন ছিলেন"।[১১] বালিয়াড়া কিশোর হাইস্কুলে"র প্রাক্তন অংক বিভাগের শিক্ষক জালালউদ্দিন শাহ (৭৬ বছর) স্মৃতিচারণা করে বলেন "আমার বাবা মেদিনীপুর থেকে গঙ্গাসাগরের কমলপুরে এসেছিলেন, আর আমি কর্মসূত্রে ১৯৭১ সালে এই মৌসুনী দ্বীপে আসি" এবং তিনি এও জানান যে "মৌসুনী দ্বীপের ক্ষয় কার্যের দরুন আমাকে তিনবার বাড়ি পরিবর্তন করতে হয়েছে।"[১২] গঙ্গা পল্লির এক অধিবাসী শেখ কলিমুদ্দিন জানান "আমার বাবার জন্ম হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে পরে তিনি এই দ্বীপে চলে আসেন"[১৩] আমার ঠাকুরদা সীতারাম দাস ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের পশ্চিম ভাঙ্গানমারির এক বৈষ্ণব, ঠাকুরদা ১৬৬৪ সালে মৌসুনীতে এসেছিলেন এবং এখানেই বিবাহ করে স্থায়ী ভাবে থেকে গেছেন।

প্রারম্ভিক সময়কালে মৌসুনী দ্বীপের জনসংখ্যার তথ্য পাওয়া না গেলেও ২০০১[১৪]-এ ১৭৭৮১ জন, ২০১১[১৫]এ ২২০৭৩ জন ও ২০২২[১৬] জনসংখ্যা ২৯,৪৯৯ জনে এসে দাড়ায়। যার মধ্যে ভোটার আছে ১৭১৪০ জন এবং পরিবার সংখ্যা হয় ৬,০৯০টি। এর মধ্যে এস.সি সম্প্রদায়ভুক্ত রয়েছে ১২৫৩টি, পরিবার এস.টি সম্প্রদায়ের ভুক্ত পরিবার রয়েছে ১৩৪টি, অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার রয়েছে ২১৭৫টি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার রয়েছে ১৪টি ও বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার রয়েছে ৬৫টি।

৩

ব্রিটিশরা মৌসুনীতে বসবাসের জন্য অন্যান্য অঞ্চল থেকে যেমন মানুষজন আনিয়েছিলেন ও জমি বিলি বন্দোবস্ত করেছিলেন, ঠিক তেমনি নিজেদের থাকার জন্য মৌসুনী দ্বীপ-এর মধ্যস্থলে অর্থাৎ বাগডাঙ্গাতে একটি খাসমহল অফিস তৈরি করেছিলেন। বাগডাঙ্গাবাসী নিশিকান্ত দাশ মতামত পোষণ করেছেন যে "ইংরেজ সাহেবরা থাকার জন্যে প্রায় কুড়ি বিঘা প্লটের চতুর্থাংশে কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে দিয়ে সম্পূর্ণ চুন-সুরকি, পাতলা ইট ও শাল কাঠের কড়ি-বর্গা দিয়ে এটি বানিয়ে ছিলেন।"[১৭] এখনও পর্যন্ত এই খাসমহল অফিস অক্ষত রয়েছে, যার চারিধারে বট, অশ্বত্থ

গাছে ঢেকে রয়েছে। ১৯৩০-এর দশকের প্রথমের দিকে ব্রিটিশ সরকার মৌসুনী দ্বীপকে তাদের অর্থনৈতিক উৎপাদনের কাজে লাগানোর জন্য মৌসুনী দ্বীপের সুদূর দক্ষিণে একটি লবণ কারখানা তৈরি করেছিলেন। যার জন্য সুদূর দক্ষিণের মৌসুনীকে 'সল্ট ঘেরী' নামে ডাকা হয়ে থাকে। এই লবণ কারখানার ভগ্নাবশেষ নদীর তীর বরাবর রয়েছে যা নদীর ভাটার সময় দেখা যায়। সল্ট ঘেরীর প্রাথমিক অবৈতনিক স্কুলের শিক্ষক শেখ হামিদ মাস্টারের বক্তব্য অনুসারে জানা যায় এখানে লবণ তৈরি করে ব্রিটিশরা জাহাজে করে নিয়ে যেতেন। ব্রিটিশরা মৌসুনী দ্বীপের দুই প্রান্তে দুইটি ইটের তৈরি দিশারু নির্মাণ করেছিলেন যা দিয়ে জাহাজগুলোকে পথ করা হত। সরল কুমার দাসের মতে—

> দিশারুর চারিধারে ইটের তৈরি সিঁড়ি ছিল। আমরা ছোটোবেলায় উঠেছিলাম, তখন ১৯৮৫ সাল। তখনই তো প্রায় ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা ছিল। এই দিশারুর উপর থেকে নামখানা (পাশের একটি দ্বীপ) অবধি দেখা যেত।[১৮]

এই দুটি দিশারুর মধ্যে শুধু দক্ষিণ সল্টঘেরীতে নির্মিত দিশারুটি এখনো রয়েছে, তবে ইটের বানানো সিঁড়িগুলো অক্ষত অবস্থায় নেই।

৪

১৯২৫ সালের শুরু হওয়া সদ্য বসবাসযোগ্য এই দ্বীপটিতে মাত্র ১২ বছর পর ব্রিটিশ সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর দিয়েছিলেন, যার ফলস্বরূপ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে 'মৌসুনী কো-অপারেটিভ মিডল-ইংলিশ স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাগডাঙ্গা মৌজার সমাজসেবক শ্রীপ্রভাত মন্ডলের (৭৫ বছর) ভাষায় "১৯৩০-এর দশকে ডিসট্রিক্টের অফিস থেকে সার্কেল অফিসার (বর্তমানে এস.ডি.ও) বাগডাঙ্গা খাসমহল অফিসে এসেছিলেন তখন বিপিনচন্দ্র মন্ডল (এক্স-মিলিটারি ম্যান) সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সার্কেল অফিসারকে অনুরোধ করেছিলেন এবং সেই অফিসার এক কথায় রাজিও হয়েছিলেন। যে কারণে তিনি স্কুলের জন্য ৭০ বিঘে জমি দিয়েছিলেন।"[১৯] এই স্কুল তৎকালীন সময়ে নামখানা ব্লকের মধ্যে প্রথম স্কুলের মর্যাদা পেয়েছিল। স্কুল শুরু হয়েছিল মাত্র ১০ থেকে ১৫ জন ছাত্র নিয়ে যা বর্তমানে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ১২০০-তে এসে পৌঁছেছে। স্কুলের প্রথম ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন হলেন নিশিকান্ত দাস, বসন্ত মাইতি, প্রকাশ মণ্ডল প্রমুখ।[২০] স্বাধীনতার ১৮ বছর পরে ১৯৬৫ সালে বালিয়াড়া মৌজাতে আরও একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার নাম 'বালিয়াড়া কিশোর জুনিয়র হাইস্কুল'। স্কুলটি শুরু হয়েছিল মোট ৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রীদের (৫-৬ ক্লাসের ছাত্র ছাত্রী নিয়ে) নিয়ে শুরু হয়েছিল। স্কুলের প্রথম ছাত্র ছিলেন গোলাম আজম। স্কুলটি ১৯৬৯ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারি 'বালিয়াড়া কিশোর হাইস্কুল' নামকরণ হয়।[২১] দ্বীপটিতে বর্তমানে ২টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ৮টি অবৈতনিক স্কুল, ৩টি আবাসিক মাদ্রাসা ও ৯টি মক্তব রয়েছে। (পঞ্চায়েতের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী) একটি গ্রামীণ হাসপাতালও রয়েছে যা, ১৯৭৪ সালের প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।[২২]

৫

মৌসুনী দ্বীপ বাসীদের প্রাথমিকভাবে জীবিকা নির্বাহের অন্যতম কেন্দ্র ছিল নদী, নদীকে কেন্দ্র করেই তাদের এই সভ্যতা। ভারতে পূর্বে নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার বিস্তারিত কেন্দ্রগুলো পাই যেমন হরপ্পা মহেঞ্জোদারো বা সিন্ধু সভ্যতা, আর্য সভ্যতা প্রভৃতি। যারা নদীকে কেন্দ্র করে তাদের বসবাসের উপযোগী করে তুলেছিল। আবার নদীর গতিপথের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বসবাসের

অসুবিধা হয়েছিল এবং তারা অন্যত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করেছিল। তাই নদী খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক মাধ্যম যাকে অবলম্বন করে একটা সুসম্পন্ন সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে। মৌসুনিবাসিরা নদীতে মাছ ধরা[২৩] (যেমন বাগদা বা মিন, বড় চিংড়ি, ভুঁড়ি চিংড়ি, কাঁকড়া, নিহেরা মাছ, প্রভৃতি সামুদ্রিক মাছ), জঙ্গালে মধু সংগ্রহ করা, চাষবাসের (ধান, উচ্ছে, ঝিঙে, তরমুজ, পান ইত্যাদি) এসবের মধ্য দিয়ে জীবন জীবিকার পরিচালনা করতেন। এমনকি মাছ ধরার জন্য সল্টঘেরীতে 'খটি কেন্দ্র' বা 'ফিশিং ক্যাম্প' বসত। আশেপাশের দ্বীপগুলিতেও যেমন-সাগর-দ্বীপ, জম্মুদ্বীপ, ঘোড়ামারা-দ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ-বকখালিতে এরকমই খটি মৎস্যকেন্দ্র বসিয়ে মাছ ধরা হত। এখানে মেহেন্দি জাল ও সরু নেট জাল দিয়ে মাছগুলোকে ধরে এনে হয় জ্যান্ত, না হয় শুকিয়ে পাইকারি হিসেবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রি করা হতো।[২৪] নিরঞ্জন জলদাস "Fisherman 'The Forest Act' and 'Narratives of Eviction from Jammudwip Island' "[২৫] বইতে দেখিয়েছেন ১৯৫০ এর দশকে অন্ধ্রপ্রদেশ, মেদিনীপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন উপকূলের কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, শিখরপুর, সাগর আইল্যান্ড, জম্মু দ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে একই রকম 'খটিকেন্দ্র' শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং মৎস্য ব্যবসার এক বড়ো মাধ্যম তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে নদীর ক্ষয় কার্যের জন্য উপযুক্ত মাছ ধরার পরিবেশ না থাকার দরুন আজ মৎস্য জীবিকা অস্তিত্বহীন। বর্তমানে নদীর পাড় অঞ্চলে মীন বা বাগদা মাছ ধরার ব্যবস্থা থাকলেও তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। এক্ষেত্রে এও লক্ষ্য করা যায় যে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বেশি এই মীন বা বাগদা-মাছ ধরার কাজ করতো। এখনও বাগদা বা মিন ধরার চল রয়েছে। তবে বর্তমানে মৌসুনী বাসীদের একটা বড় অংশ ভিন রাজ্য ও ভিন দেশে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নিয়েছে।[২৬]

মৌসুনী দ্বীপের অত্যধিক Climate Change[২৭] এর প্রভাবের সঙ্গো সঙ্গো নদীর ক্রমবর্ধমান ক্ষয়কার্যের দরুন দ্বীপটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অবস্থান নিয়েছে। যার একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায় Report of Expert Committee (July ২০২১)[২৮] দেওয়া তথ্যে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে—

বছর	১৯৭০	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০২০
মৌসুনীদ্বীপের আয়তন	৩৩.৫১	২৮.৯২	২৮.৩৯	২৭.৫৩	২৭.৩০	২৬.২১

এমনকী নদী বাঁধ প্রত্যেক বছর অনেকটা পরিমাণ ভেঙে যাওয়ার কারণে নদী উপকূল এলাকার মানুষরা স্থায়ী বাড়ি পর্যন্ত তৈরি করতে পারছে না। ২৯,৩০ যার কারণে কিছুসংখ্যক মানুষ মৌসুনী থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আশেপাশের নামখানা, কাকদ্বীপ ও পাথর-প্রতিমা অঞ্চলগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন।

মৌসুনী দ্বীপের ইতিহাসে হাল আমলের ঘটে যাওয়া কিছু বিষয়ের উপর কথা বলে এই লেখার ইতি টানব। বিশ্ব-উষ্ণায়নের প্রভাবে বেশ কয়েক বছর ধরে সুন্দরবন দ্বীপ অঞ্চলের অত্যধিক পরিমাণ Climate Change ও নদীর ক্ষয়কার্য বেড়েই চলেছে যার দরুন দ্বীপগুলোর অস্তিত্ব প্রশ্নময় হয়ে উঠেছে। শুধু মৌসুনী নয় আশেপাশের অন্যান্য দ্বীপ যেমন ফ্রেজারগঞ্জ, জম্বু দ্বীপ (২০০০ সালের প্রথম দশক থেকে মনুষ্যবসতি ও ফিশিং ক্যাম্প নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল) সাগরদ্বীপ, ঘোড়ামারা দ্বীপ (সিকিং আইল্যান্ড) গুলির ভৌগোলিক মানচিত্র ছোট হয়ে পড়েছে। মৌসুনী দ্বীপের সঙ্গো সঙ্গো সুন্দরবনের এই দ্বীপগুলিতেও স্বাধীনতার পূর্বে ও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালের বহু

মূল্যবান ইতিহাসের অনেক তথ্য বর্তমান রয়েছে। তাই দ্বীপগুলির সুরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস সমৃদ্ধ তথ্যগুলোর উপরও নজর দিতে হবে। নয়তো ভারতের দ্বীপ অঞ্চলের ইতিহাসকে ভালো করে জানার চেস্টা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

উৎসের সন্ধানে

১. Chakraborty, P : Evolution history of the coastal quaternaries of the Bengal plain, India' Proc Indian Natl Sci Acad, p. 343-354

২. আচার্য, সুভাসচন্দ্র, "দ্বীপের নাম মৌশুনী", শুধু সুন্দরবন চর্চা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৫ই অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ৩৪

৩. দাস, সরল কুমার "মৌসুনি একটি দ্বীপের নাম", শুধু সুন্দরবন চর্চা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৫ অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১২

৪. মল্লিক, মোঃ কাজীহার : সাক্ষাৎকার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌসুনী দ্বীপ, ১৭ জানুয়ারি ২০১৭

৫. মণ্ডল, অরূপ : সাক্ষাৎকার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌসুনী দ্বীপ, ৮ এপ্রিল ২০২০, (২০২২ সালে করোনা মহামারীতে শরীর চলে গেছে)।

৬. দাস, সরল কুমার : সাক্ষাৎকার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌসুনী দ্বীপ, ২৬ জানুয়ারি ২০২০ ও ১০ মে ২০২৩

৭. শাহ, জালালুদ্দীন : সাক্ষাৎকার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌসুনী দ্বীপ, ১১ মে ২০২৩ (তিনি ভারত এর প্রতিনিধি হয়ে ২৭ নভেম্বর ২০০৯, ইতালীয় সম্মেলনে সুরবনের দ্বীপ অঞ্চল বিষয়ক বক্তৃতা দিয়েছিলেন।)

৮. দাস, সরল কুমার : 'স্নেহময়ী মৌসুনি দ্বীপ : এক স্বল্পায়ু স্মৃতিচারণ', (জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী : 'সুন্দরবন আবিষ্কার' গ্রন্থ) কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২, পৃ. ২৯৬

৯. দাস, সরল কুমার : 'স্নেহময়ী মৌসুনি দ্বীপ : এক স্বল্পায়ু স্মৃতিচারণ', (জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী : 'সুন্দরবন আবিষ্কার' গ্রন্থ) কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২, পৃ. ২৯২

১০. মাল, সন্তোষ : সাক্ষাৎকার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌসুনী দ্বীপ, ১০ মে ২০২৩

১১. সাঁতরার, বিষ্ণুপদ : সাক্ষাৎকার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌসুনী দ্বীপ, ১০ মে ২০২৩

১২. WWF Report : 'Sundarban : Future Imperfect climate Adaption Report', 2010, P. 10

১৩. WWF Report : 'Sundarban : Future Imperfect climate Adaption Report' 2010, P. 7

১৪. 'Census of India', final population totals ministry of Home affairs Government of India, New Delhi, 2001

১৫. Karmakar, Madhusudan, Dey, Parthapratim and Roy, Madhushree : 'Rise of sea level and the sinking islands of sundarban region : a study of mousuni island in india', journal of global resources volume 6(01) August 2019 January 2020, P. 233

১৬. মৌসুনী দ্বীপের পঞ্চায়েতের কর্মী 'আক্রম মোল্লা' (সেক্রেটারি ইন চার্জ) 'অপূর্ব বিশ্বাস' (এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট) এর দেওয়া সংখ্যা দত্ত অনুযায়ী।

১৭. দাশ, নিশিকান্ত : সাক্ষাৎকার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌসুনী দ্বীপ, ৯ই মে ২০২৩

১৮. দাস, সরল কুমার : সাক্ষাৎকার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌসুনী দ্বীপ, ১০ মে ২০২৩

১৯. মন্ডল, শ্রীপ্রভাত : সাক্ষাৎকার, দক্ষিণ, ২৪ পরগনা, মৌসুনী দ্বীপ, ১০ মে ২০২৩

২০. দাস, সরল কুমার : 'স্নেহময়ী মৌসুনি দ্বীপ : এক স্বল্পায়ু স্মৃতিচারণ', জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী : 'সুন্দরবন আবিষ্কার' গ্রন্থ, কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২, পৃ. ২৯৬

২১. 'বালিয়াড়া কিশোর হাই স্কুলে'র ক্ল্যারিক্যাল স্টাফ বিভাগের কর্মী 'মির্জা আনোয়ার বেগ' এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী (২০০৮ সালে থেকে কর্মসূত্রে), ৯ মে ২০২৩

২২. মৌসুনী দ্বীপের পঞ্চায়েতের কর্মী 'আক্রম মোল্লা' (সেক্রেটারি ইন চার্জ) ও 'অপূর্ব বিশ্বাস' (এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট) এর দেওয়া সংখ্যা তথ্য অনুযায়ী, ১০ মে ২০২৩

২৩. দাস, সরল কুমার, "পরিবর্তনে পাল্টে যাওয়া দ্বীপভূমি থেকে" শুধু সুন্দরবন চর্চা, তেপান্তরের স্বপ্ন সংবাদ, সংবাদ বর্ষ ছয়, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৮

২৪. Ray Chaudhary, Bikash : 'The Moon and Net : Study of Transient Community Of Fisherman at Jumbudwip', Kolkata entropology survey of India, 1980

২৫. Jaladas, Niranjan : ''fisherman 'the forest act' and narratives of eviction from Jammudwip Island'', Kolkata, Nehru memorial museum and library, 2013, P. 15

২৬. সরকার, সুকান্ত, "ডুবন্ত মৌসুনীতে কাজ নেই, ভিন রাজ্যেই ভরসা দ্বীপবাসির", এইসময়, ২৩ ডিসেম্বর ২০২১

২৭. Mukherjee, Nabanita & Siddique, Giyasuddin : 'Climate change and vulnerability assessment in Mousuni Island : South 24 Parganas District', https://www.researchgate.net/publication, February 2018, P. 2-10

২৮. Report of Expert Committee (July 2021), 'Protection of Coastal Areas and Earthen Embankment Through Vegetative Solutions'.

২৯. দাস, সরল কুমার, "পরিবর্তনে পাল্টে যাওয়া দ্বীপভূমি থেকে", শুধু সুন্দরবন চর্চা, তেপান্তরের স্বপ্ন সংবাদ, সংবাদ বর্ষ ছয়, জানুয়ারি ২০১৯

৩০. Das, Shouvik & Hazra, Sugata : 'Micro Level Vulnerability Assessment of a Community Living in Mousuni Island in the Indian Sundarban : An Integrated Study Employing Geoinformaticsóó– https://www.researchgate.net/publication/ September, 2017, P. 197

উদারনীতিবাদের মূলতত্ত্ব, উৎস ও বিকাশ প্রসঙ্গো

মহঃ আমিরুল ইসলাম

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনায় রাষ্ট্রের কার্যাবলী এবং প্রকৃতি সম্পর্কিত রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী এবং তাৎপর্যপূর্ণ মতবাদ হলো উদারনীতিবাদ। উদারনীতিবাদ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Liber' থেকে, যার অর্থ হলো স্বাধীন। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, উদারনীতিবাদ হলো সমসাময়িককালের উপযোগী এমন একটি মতাদর্শ, যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো স্বাধীনতা। সংক্ষেপে বলা যায় উদারনীতিবাদের মূল বক্তব্য হলো রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদের বিরোধিতা করা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। ব্যক্তি স্বাধীনতা ছাড়াও এই মতবাদ ব্যক্তিগত সম্পতির মালিকানাকে ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশের উপায় মনে করে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে স্বীকৃতি প্রদান করে না।

নেতিবাচক অর্থে উদারনীতিবাদ বলতে বোঝায়, যেকোনো রকম একত্ববাদী সার্বভৌম যথা স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র কর্তৃপক্ষকে অস্বীকার করা। অন্যদিকে ইতিবাচক অর্থে উদারনীতিবাদ হলো ব্যক্তি স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক নীতিগুলিকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদকে অস্বীকার করে ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডে জন লকের চুক্তিবাদী তত্ত্বের মাধ্যমে। সাবেক উদারনীতিবাদী জন লকের (১৬৩২-১৭০৪) মতানুসারে জনসাধারণের সম্মতিই হলো রাষ্ট্রের ভিত্তি। জন লক মনে করতেন রাস্ট্রের ক্ষমতা প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং শাসনতান্ত্রিক সরকার আইনের অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে দেওয়ানী আইন হলো প্রাকৃতিক আইনের প্রকাশ। ব্যক্তি তার জীবনকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত করতে চাইলে রাষ্ট্র তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, বরং রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতার বাধাগুলি দূর করবে।

পরবর্তীকালে শিল্পবিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯), আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭৬) ইত্যাদি বৈপ্লবিক ঘটনার মাধ্যমে আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের

প্রেক্ষাপটে উদারনীতিবাদ ক্রমশ বিকশিত হতে হতে জেরেমি বেন্থাম, জেমস মিল এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের হাতে তা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়। জন স্টুয়ার্ট মিলের পূর্ববর্তী অর্থাৎ সাবেকি উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে অতিমাত্রায় সংকুচিত করে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর যথাসাধ্য গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই ক্ষেত্রে জন স্টুয়ার্ট মিল ব্যক্তি স্বাধীনতার জয়ধ্বনি করলেও ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বার্থে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কার্যক্ষেত্রকে সংকুচিত করতে চাননি। উদারনীতিবাদ শব্দটি দুটি অর্থেই ব্যবহার করা হয়, যথা সংকীর্ণ অর্থে উদারনীতিবাদ এবং ব্যাপক অর্থে উদারনীতিবাদ। সংকীর্ণ অর্থে উদারনীতিবাদ বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে গুরুত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে ব্যাপক অর্থে উদারনীতিবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকারসহ ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। তবে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, উদারনীতিবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা।

জন গ্রে (John Gray) তাঁর 'Liberalism' গ্রন্থে উদারনীতিবাদের উৎস ও বিকাশ প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রিসের নাম উল্লেখ করে বলেন খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রিসের সোফিস্টগণ সর্বপ্রথম সরকারের এলিটীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজকর্মের বিরুদ্ধাচারণ করেন এবং রাজনৈতিক সাম্যের কথা প্রচার করেন। এথেনীয় গণতন্ত্রে উদারনীতিবাদের অস্তিত্ব ছিল এবং সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ সেখানে ন্যায় বিচার ভোগ করত, স্বাধীনতার ঘাটতি ছিল না। দার্শনিক পেরিক্লিসও উদারনৈতিক ভাবধারার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল ছাড়া প্রাচীন প্লেটো উত্তর গ্রিসে প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে উদারনৈতিক ভাবধারার অস্তিত্ব ছিল।

অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, উদারনৈতিক চিন্তার বিকাশ ঘটেছে সুদীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। যোড়শ শতকে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তা পরবর্তীকালে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন হিসেবে এক নতুন ভাবধারার প্রতিষ্ঠা করে। বাস্তববাদী লেখক ম্যাকিয়াভেলি এবং টমাস ম্যুরের মতো প্রগতিবাদী রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অধ্যাপক ল্যাস্কি সপ্তদশ শতককে উদারনীতিবাদের পুনরুত্থানের যুগ (Aga of restoration) বলে অভিহিত করেছেন। সপ্তদশ শতক হলো উদারনীতিবাদের বিবর্তনের দ্বিতীয় ধারা এবং এই শতকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বস্তুজগৎ নিয়ে গ্যালিলিও এবং কেপলারের মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞান সাধকগণের নিত্য নতুন সফল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বাণিজ্যিক উন্নয়ন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাজার প্রতিষ্ঠা সবকিছুই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদারনৈতিক চিন্তার বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। শিল্প বিপ্লবের সুবাদে এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের অভিজ্ঞতায় ইংল্যান্ডে উদারনীতিবাদ বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বিধাহীনভাবে বলা যেতে পারে ব্যাপক শিল্পায়নের ফলস্বরপ ব্রিটিশ সমাজ সহজেই সমৃদ্ধ হয়েছিল। এমতাবস্থায় ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য ব্রিটিশগণ উদারনীতিবাদের মতো এক নতুন রাষ্ট্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই প্রসঙ্গে স্যাবাইনের মন্তব্য—

> Political liberalism as a whole was a massive movement that made itself felt in all the countries of Western Europe—but it was most characteristic development that took place in England.[১]

অষ্টাদশ শতাব্দী হলো উদারনীতিবাদ প্রতিষ্ঠার যুগ। ইতিপূর্বে ইংল্যান্ডে উদারনীতিবাদের সূচনা হলেও অষ্টাদশ শতকে উদারনীতিবাদের কেন্দ্রভূমি ছিল ফ্রান্স। অধ্যাপক ল্যাস্কি এই সময়টাকে

'The age of Enlightenment' বলে অভিহিত করেছেন। তবে উদারনীতিবাদের বিকাশে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম সমবেতভাবে কাজ করেছে। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজির দ্রুত বিকাশ শিল্পোদ্যোগীদের নিজ নিজ দায়িত্বে কলকারখানা স্থাপনে উৎসাহী করে। এমতাবস্থায় তাদের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ আদৌ কাম্য ছিল না। সন্দেহ নেই শিল্প বিপ্লবোত্তর যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাভাবনা উদারনীতিবাদের বিকাশে ইন্ধন যুগিয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতন্ত্রের দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ বণিক শ্রেণির মনে এই চিন্তাভাবনার উদ্রেক করে যে, সরকারের হস্তে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ক্ষমতা অর্পণ করলে সরকার মুনাফার উপর নিয়ন্ত্রণ এবং লগ্নির পরিমাণ হ্রাস করবে। বিখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ তাঁর বিখ্যাত 'The Wealth of Nations' (১৭৭৬) গ্রন্থে নানান যুক্তির জাল বুনে বাজার অর্থনীতি ও বাণিজ্য নীতিকে সমর্থন জানিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, উৎপাদক ও বণিক শ্রেণি যদি স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ পায় সেক্ষেত্রে বরং দেশের শ্রীবৃদ্ধিই ঘটবে। তাই এক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণের অর্থই হলো ব্যক্তিগত উৎসাহ ও শিল্পোন্নয়নকে মন্থর করে ফেলা। অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদের মুখ্য প্রবক্তা অ্যাডাম স্মিথের 'Wealth Of Nations' প্রসঙ্গে ওয়াটকিন্স মন্তব্য করে বলেন, "The first great Manifesto of economic liberalism" ওয়াটকিন্সের কথায়—

> The Wealth of Nations, by reflecting the liberal climate of opinion in terms of a clear and impressive theory, marks the coming of age of the earliest of our modern ideologies.[২]

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের বহু দেশে উদারনীতিবাদের বিকাশে প্রবুদ্ধকরণ বা জ্ঞানোন্মেষবাদ (Enlightenment) সোৎসাহে প্রচার হতে থাকে। রাষ্ট্র তার ইচ্ছামতো কোনো সিদ্ধান্তকে ব্যক্তির উপর পীড়নমূলক বা জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে পারে না। রাষ্ট্র যেকোনো অজুহাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করতে পারবে না। ফরাসি উদারনীতিবাদের অন্যতম রূপকার মন্তেস্কু সরকারি স্বৈরতন্ত্র রোধ করার উদ্দেশ্যে বা সরকারি ক্ষমতাকে সীমিত স্তরে রাখার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে স্বৈরতন্ত্রের একমাত্র প্রতিষেধক হলো সাংবিধানিক সরকার এবং আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা।

সাবেকি উদারনীতিবাদের একটি দৃঢ় ভিত্তি হলো হিতবাদ বা উপযোগবাদ (utilitarianism)। উপযোগিতাবাদ হলো মূলত ব্রিটিশ চিন্তাবিদগণের দ্বারা উদ্ভাবিত ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তত্ত্ব। ইংরেজ রাষ্ট্রচিন্তাবিদ জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) হলেন এর প্রধান রূপকার। তাঁর মতে, যে কাজ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সুখ দান করার উপযোগী, তাই ন্যায়, এবং যে কাজ সুখদানের পরিপন্থী, তা অন্যায়। সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক সুখ বিধান বা মঙ্গলসাধন (Greatest happiness of the greatest number) প্রত্যেক রাষ্ট্রের নৈতিক আদর্শ ও কর্তব্য হওয়া উচিত। বেন্থাম তাঁর 'An Introduction to the Principles of Moral and Legislation' নামক গ্রন্থে হিতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রকৃতি মানুষকে 'সুখ' এবং 'দুঃখ' নামক দুটি সার্বভৌম নিয়ন্তার অধীনে রেখেছে। বেন্থাম-এর মতে রাষ্ট্র হলো সকল অধিকারের উৎস, তাই মানুষ তার অধিকার, স্বাধীনতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের ব্যাপারে রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করতে পারে। মানুষ স্বভাবতই সুখের সন্ধান এবং দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। 'সুখ' এবং 'দুঃ

খ' এই দুটি বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম এবং চিন্তা-ভাবনা। বেন্থাম তাঁর হিতবাদী দর্শনে সুখ বলতে পার্থিব জীবনের সুখকেই বুঝিয়েছেন; কোনো অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক সুখ নয়। বেন্থামের নিকট সুখের পরিমাণগত দিকটাই বিচার্য, তিনি সুখের গুণগত বিচারে আগ্রহী নন। বেন্থামের উপযোগিতাবাদ অধিক সংখ্যক মানুষের উপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে মূলত উদারনীতিবাদী গণতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন করেছে। তাই হিতবাদ বা উপযোগিতাবাদের মূল বক্তব্য হলো জনগণের সেই সরকারকেই স্বীকৃতি প্রদান করা আবশ্যক, যে সরকার সর্বাধিক মানুষের স্বার্থ পূরণে সক্ষম হবে।

উপযোগিতাবাদ বা হিতবাদকে উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনের উল্লেখযোগ্য দিকদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বলাই বাহুল্য যে, উদারনীতিবাদের মধ্যে উপযোগিতা বা হিতবাদের উৎস নিহিত রয়েছে এবং উভয় মতবাদই ব্যক্তির সুখ, স্বাধীনতা, ব্যক্তির মঙ্গল ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা বলে। তাই উদারনীতিবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে উপযোগিতাবাদ নিয়ে আলোচনা করাও একান্ত আবশ্যক। উদারনীতিবাদের একজন সার্থক প্রবক্তা হলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'On Liberty' গ্রন্থে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে পবিত্র অধিকার বলে গণ্য করেন এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষে ওকালতি করেন। বোধহয় ইতিপূর্বে কোনো রাষ্ট্রচিন্তাবিদ স্বাধীনতার স্বপক্ষে এত জোরালো আবেদন জানিয়ে সুসংবদ্ধ উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শন উপস্থাপন করেননি। C.L Wayper জন স্টুয়ার্ট মিলের 'On Liberty' গ্রন্থ প্রসঙ্গে প্রশংসা করে বলেন যে, স্বাধীনতার স্বপক্ষে এই গ্রন্থের তুলনায় অধিক উৎকৃষ্ট রচনা নেই বললেই চলে।

উদারনীতিবাদের মূলমন্ত্র হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা। হিতবাদী স্টুয়ার্ট মিল ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, একশো জনের মধ্যে যদি একজনেরও ভিন্ন চিন্তা-ভাবনা থাকে, তবু বাকি নিরানব্বই জনের তরফে ওই একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করা যায় না। হিতবাদী মিল দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন সামাজিক হিত সাধনের প্রয়োজনেই সরকার গঠিত হয়েছে এবং মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও আগ্রহই হলো রাজনৈতিক সংগঠনের আধার। জন স্টুয়ার্ট মিল ব্যক্তির স্বাধীনতার পক্ষে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্মৃত ছিলেন না। তাই মিল ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর দুটি নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন, যথা—১. কোনো ব্যক্তি নিজের স্বাধীনতার নামে অন্য ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করবে না। ২. সামাজিক ক্ষতি যাতে না হয়, তার জন্য ব্যক্তিকে সকলের সঙ্গে পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের উপস্থাপক মিল রাষ্ট্রব্যবস্থাকে একটা প্রয়োজনীয় উপদ্রব (a necessary evil) বলে গণ্য করেন। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিস্তারকে উপদ্রব হিসেবে মন্তব্য করার পরেও স্টুয়ার্ট মিল সীমিত ক্ষেত্রবিশিষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর মতে সীমিত রাষ্ট্রের কাজ হবে সুনাগরিকতার পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার বিলুপ্তি ঘটিয়ে ব্যক্তি-মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের পথে আগত বাধাগুলি অপসারিত করা। জন স্টুয়ার্ট মিল বেন্থামের উপযোগিতাবাদের কিয়দংশ সংশোধনের মাধ্যমে উদারনীতিবাদকে অনেকখানি যুগোপযোগী করে তোলেন। বেন্থাম সর্বাধিক জনগণের সর্বাধিক সুখের কথা বললেও মিলের মতো নৈতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি। মিলের হিতবাদী তত্ত্বে ব্যক্তি নিজের সুখের পাশাপাশি সমাজের সকল ব্যক্তির অর্থাৎ সামাজিক সুখ কামনা করে, এটাই হলো নৈতিকতা। জন স্টুয়ার্ট মিলের উদারনীতিবাদ ব্যক্তি স্বার্থের পাশাপাশি বৃহৎ সামাজিক

পরিমণ্ডলের কথা ভাবে। মিল মেধাসম্পন্ন সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। মিল গণতন্ত্রের সমর্থক হলেও সর্বজনীন ভোটারাধিকার, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সমালোচনা করেন। তাঁর মতে গণতন্ত্র যেহেতু পরিমাণগত ও গুণগত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না, তাই তাঁর নিকট গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ অজ্ঞ ও বৈষয়িক সুখে বিশ্বাসীদের শাসন ব্যবস্থা। গুণগত উৎকর্ষতা গণতন্ত্রে নেই। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সাধারণত সৃজনশীল ব্যক্তি, দার্শনিকগণ ভীষণভাবে উপেক্ষিত হন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের দৌরাত্ম্য, আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচার গণতন্ত্রকে নিকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থায় পরিণত করে।

সাবেকি উদারনীতিবাদে ব্যক্তির অধিকারকে চরম এবং অনিয়ন্ত্রিত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আবার হবস, লক প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ অধিকারকে স্বাভাবিক অর্থাৎ জন্মসূত্রে অর্জিত বলে অভিহিত করেন। তাই তাঁরা মনে করেন জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এই স্বাভাবিক অধিকারগুলি বাতিল করার ক্ষমতা কোনো সংস্থার নেই এবং রাষ্ট্রের উচিত এই অধিকারগুলি সুরক্ষা করা। এই অধিকারগুলি সুরক্ষায় রাষ্ট্র ব্যর্থ হলে ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিরোধিতা করতে পারবে। যুগসন্ধিক্ষণের উদারনীতিবাদের সার্থক প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিল কিন্তু ব্যক্তির অধিকারকে কখনো চরম বা অপ্রতিহত বলে মনে করেননি বা হবস, লক প্রমুখ তাত্ত্বিকগণের মতো স্বাভাবিক অধিকারকে জন্মসূত্রে অর্জিত বলে স্বীকার করেননি। জে এস মিল ব্যক্তির গুণগত উৎকর্ষতার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন এবং ব্যক্তির গুণগত বিকাশে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কাম্য নয় বলে মনে করেন।

জন স্টুয়ার্ট মিল একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে (self regarding) ব্যক্তি স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত বলে মনে করলেও অপর ব্যক্তি সম্পর্কিত (other regarding) কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ স্বীকার করেছেন। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক ভাবধারাকে অনুকরণ করতে গিয়ে পুঁজিবাদ এবং অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থাকে সমর্থন করে মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে জন স্টুয়ার্ট মিল (J.S.Mill) তাঁর ‘On Liberty’ গ্রন্থে মুক্ত বাজার ব্যবস্থাকে সমর্থন করলেও পরবর্তীকালে বাজার অর্থনীতির কুফল সম্পর্কে সচেতন হন, এবং পরবর্তী রচনায় তিনি বাজার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করেন। মিলের মতে লাগামহীন মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন লাভবান হলেও সমাজের ব্যাপক অংশ দরিদ্র এবং অশিক্ষিত হয়ে পড়বে, যা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে অন্তরায়। এর ফলস্বরূপ সমাজে নৈরাজ্য দেখা দেবে।

ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) ছিলেন একজন রক্ষণশীল স্কটিশ উদারনৈতিক চিন্তাবিদ। তিনি কতকগুলি মৌলিক প্রাকৃতিক আইনের কথা উল্লেখ করে বলেন এগুলি যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে নাগরিকদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে। তাই হিউম রাষ্ট্রকে প্রাকৃতিক আইনগুলি কার্যকর করার সুপারিশ করেন। T.H.Green একজন ভাববাদী ইংরেজ দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের উদারনৈতিক ঐতিহ্যকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। গ্রিন উদারনৈতিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রতত্ত্বে (Welfare State) বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সংকুচিত করার পক্ষপাতী নন, বরং জনগণের সমর্থনভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তিনি নৈতিকতার শ্রেষ্ঠ আধার ও সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র বলে মনে করেছেন। T.H.Green-এর মতে রাষ্ট্র হলো সমষ্টিগত মঙ্গলের প্রকাশ, নাগরিকগণ কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সুরক্ষার জন্যই রাষ্ট্রের বিরোধিতা করতে পারে। অধ্যাপক ম্যাকাইভার রাষ্ট্রের হাতে অসীম ক্ষমতা প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি রাষ্ট্রকে নাগরিক অধিকারের স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্তা

হিসেবে সীমিত ক্ষমতা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র সমাজের থেকে বড় কিছু নয়। তাই সামাজিক প্রথা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেত্রে তিনি অনুমোদন করেননি। বহুত্ববাদী তাত্ত্বিক অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি (H.Laski) তাঁর "The state in theory and practice" গ্রন্থে রাষ্ট্রকে একটি জাতীয় সমাজ (National society) হিসাবে উল্লেখ করার পাশাপাশি সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ ও গোষ্ঠী সমূহের উপর বলপ্রয়োগের আইনসংগত সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। অধ্যাপক ল্যাস্কি প্রথম জীবনে উদারনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করলেও শেষ পর্যন্ত মার্কসীয় মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। উদারনৈতিক মতাদর্শে একচ্ছত্রবাদী চরম রাষ্ট্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক দায়িত্বশীল এবং সীমিত ক্ষমতা বিশিষ্ট জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অপরিহার্যতাকে স্বীকার করা হয়েছে। উদারনীতিবাদ সাংবিধানিক ও আইনগত সংস্কারে বিশ্বাসী। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন, ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ, আইনের অনুশাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, পরিকল্পিত উন্নয়ন, নগরায়ণ ও আধুনিকীকরণ, শিক্ষার প্রসার, নাগরিক নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি এই তত্ত্বের মূল লক্ষ্য। উদারনীতিবাদের পরিমার্জিত দর্শন পুঁজিবাদের নেতিবাচক ফলাফলকে রোধ করার লক্ষ্যে কল্যাণকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী।

রাষ্ট্রের কার্যাবলী এবং প্রকৃতি সম্পর্কিত উদারনৈতিক মতবাদকে অনেকেই অত্যন্ত নমনীয়, অস্পষ্ট, পরস্পর বিরোধী মতবাদ বলে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। মার্কসবাদীগণ উদারনীতিবাদকে বুর্জোয়া শ্রেণির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অনুকূল তত্ত্ব বলে মন্তব্য করে থাকেন। আবার অনেকেই উদারনীতিবাদকে একটি অপরিপক্ক, অপরিণত তত্ত্ব বলে মনে করেন। অধ্যাপক ল্যাস্কি তাঁর "Rise of European Leberalism" গ্রন্থে মন্তব্য করে বলেছেন, যে গতিতে ষোড়শ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উদারনীতিবাদের অগ্রগতি অব্যাহত ছিল, পরবর্তীকালে সেই অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। শিল্পায়ন, অবাধ বাণিজ্য, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সার্বিক ভোটারাধিকার, সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে উদারনীতিবাদ যে বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল পরবর্তীকালে সেই প্রত্যাশায় ভাটা পড়তে শুরু করে। বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনায় উদারনীতিবাদের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অনস্বীকার্য। নিঃসন্দেহে মানবতাবাদী ধ্যান-ধারণার বিকাশে উদারনীতিবাদ বিশ্বজুড়ে সাড়া জাগিয়েছে। উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রকে মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে আলোর দিকে ধাবিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং সমাজকে গতিশীলতা প্রদান করেছে।

উৎসের সন্ধানে

১. George H.sabine : A History of Political Theory, P. 671

২. Watkings, P. 11

তথ্যের সন্ধানে

১. রাষ্ট্র বিজ্ঞান (তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান); দেবাশীষ চক্রবর্তী, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড

২. অনাদিকুমার মহাপাত্র : 'আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান', সুহৃদ পাবলিকেশন

৩. প্রাণগোবিন্দ দাস : 'আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব' নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড

৪. প্রণব কুমার দালাল : 'পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা', বুক সিন্ডিকেট (প্রা.) লিমিটেড

৫. কল্যাণ কুমার সরকার : 'পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস', শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস

৬. দেবব্রত সিংহ : 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষক', ছায়া প্রকাশনী প্রা.লি.

Understanding Colonial Bengal and Reconstructing Bengali Culture and Ethos, Through the Lens of Detective Fiction: Kaushik Majumdar's Mason Trilogy (Surjotamosi, Nibarsaptak & Agniniroy)

Ayan Dutta

Kaushik Majumdar is a rising giant at writing both fiction and nonfiction, his 'Holmesnama' is considered a landmark text, for Bengali Holmes lovers and researchers alike. Majumdar also translated what is supposedly World's first picture book—Heinrich Hoffmann's 'Der Struwwelpeter' from German to Bengali.

Majumdar's 'Surjotamosi' started with the discovery of a European dead body, and the case would be investigated, by a native, Bengali, brahmin police officer–Priyonath Mukhopadhyay, who wanted to go home to rest a little at the year-ending, but a telegram took away his liberty, so the story started with an implicit and subtle detail, about the colonized state of his countrymen.

Majumdar openly dealt with the clash between the medical advancement of Colonial Bengal and preternatural mysticism in this text. While one part is due to European enlightenment, another one belonged to Indian Culture. This clash was first shown with a newspaper report saying that the Medical College was locked down, expecting an attack from the conservative Hindus, to stop Madhusudan Gupta from performing the surgery, which was then, considered a blasphemous act. Majumdar also portrayed the exploitation of lunacy to usurp property or hide disruptive information. The keeper of Dalanda Asylum, Jason Smith showed a patient to Sigerson and Priyonath, that the patient was a prince of a wealthy family, only his younger brother did not want that all the property to be taken by him ('Surjotamosi', p.122). As a result, he was

institutionalized in the asylum, with a possibly fake case altogether. Another patient told them about 'শল্ল' and how the 'শল্ল' entered his head and told him to kill his wife and daughter, how he tried to convince the police that it was not done by him, but 'শল্ল' did. Well, the doctors of this 'hell' understood him and drilled a hole in his head and let the 'শল্ল' go away from his head ('Surjotamosi', p.126). Although it sounds utter nonsense, in reality, he was talking about a particular type of surgery, Trepanning. Dr. Gopal Chandra Dutta in his speech at the Calcutta Medical College said, Robert Hook, Richard King and many more scientists had agreed that the reason behind humans becoming insane, is due to the rise of humor in their blood, which in turn increases the heat in the blood, especially the blood of the brain and the solution to this is Trepanning, where the doctors used to drill a hole in the patient's head so that the humor can get out ('Surjotamosi', p. 174). That's where the literary capability of Majumdar lies, he skillfully merged the supernatural and preternatural element 'শল্ল' with the medical treatment of Humor as if the entering of the 'শল্ল' is nothing but humor's Indianized superstitious interpretation. The same thing can be said with the mystery of dead bloodless animals, which, later turned out to be the results of another type of medical treatment for the insane – blood transfusion. Dr. Kailashnath Gupta stated, that Jean Baptiste Dennis was the first to talk about this procedure in 1667 and there was no need of drilling the skull to remove humor as he argued, ejecting the blood of the patient, and inserting an animal's blood in his body will cure the patient, as Dennis himself cured a fifteen-year-old boy, by changing his blood with a sheep. In reply, Gopal Chandra Dutta argued that it is a proven pseudoscience, and had been banned to use by the English Government, as two patients, on whom Dennis tried this procedure, died and Dr. Gupta can be arrested just for sharing this idea in the open stage of science (Surjotamosi, p.175). Yet, Ganapati, being superstitious, called it a devilish curse 'সূর্যতামসী' ('Surjotamosi', p.143-144) and Hiremon said the whole act was not committed by some human, rather, something inhuman, 'খোক্কসের বাচ্চা' and justified her point, asking who else are drinking those animal's blood ('Surjotamosi', p.183),

If 'Surjotamosi' is a detective fiction, both 'Nibarsaptak' and 'Agniniroy' are but conspiracy thrillers, trying to portray a hidden scheme to solve Jack the Ripper's mystery. Yet, both those texts successfully gave voice to the oppressed. Sigerson noticed that starting from Warner, Hilli, and Lakhan to Carter and Halide, all are either illegitimate children or half-born Anglo-Indian. Masons and Jahbulon do not really care about the purity of blood, but rather the opposite. Jahbulon brought them together under a single umbrella, whom our white or native Indian society had pushed away with hatred and disgust ('Nibarsaptak', p.186). Whom Sigerson missed to count, was Sheila Charan

Sanyal, a gay, feminine playwright and actress, whom his father disinherited, after his sexual connection with another actor Byomkesh Sarkar, son of drama director Akshay Sarkar, became public. After that, Sheila was gang-raped by four babus, who rigged the trial of the rape, to plant false witnesses, who put them elsewhere, as a result, Sheila was fired from National Theatre and somewhere along the line, joined the Freemasons and later the Jahbulon in exchange for revenge against his rapists. Jahbulon killed those Babus, by burning them alive.

Another person, who was rejected by society, but given a purpose by Jahbulon, was Lanson, an Anglo-Indian, whose mother was a prostitute in Kalinga Bazar. As Mukherjee argued, Blacks and Anglo-Indians were both exploited by the White English and instances of those are very vividly portrayed by Majumdar for example, the belligerent treatment of the Anglo-Indian students and particularly the black Lakshman's treatment in school by the 'pure' white English students and teacher alike (Mukherjee & Dasgupta, 2023). Majumdar wrote that in school, proper sahibs and Anglo-Indians used to sit away from each other. Lanson's situation was even more pathetic, even the Eurasians used to avoid him and because of no reason at all, the two words, 'blackie' and 'bastard' became synonymous with his name. Red-faced English sahib Grif used to teach them English and the English students were free to do anything, whereas, Eurasians became the victim of his anger. Among them, Lanson used to get beaten by Grif the most, as if the sahib used to get some sort of brutish pleasure from beating him. Grif would not stop until he became tired and had trouble breathing ('Nibarsaptak', p. 93). Majumdar, through Lanson's voice, has showcased this deeply disturbing side of Colonial Bengal. Lanson had three or four friends, all of whom were Anglo-Indians of a low kind. And, in retaliation against the ongoing discrimination, an Anglo-Indian friend of Lanson, named Boni, secretly used to, give him short leaflets, which comprised portrayals of how awfully Anglo-Indians used to get treated by the English Government and how much the native Indians despised them. And after Lakhan saved Warner from getting caught by the police, Henderson, a teacher of the school, awarded him confirming that the brotherhood will take care of Lanson's sister and mother, and in return, Lanson had to work for the organization, which may risk his life, but if the brotherhood wins, it would be a slap in the face of everyone, who despised them ('Nibarsaptak', p. 93). Majumdar showcased that the Anglo-Indians were otherized by both Indians and English alike. For the English, the Anglo-Indians were a disgrace to their superior race being demolished by being mixed with the native blood and for the Native Indians, they were the portrayal of their incapability to save a native woman, from being exploited by the Sahibs.

Due to this, friendship between two Anglo-Indians was usually of solid bonding, since no one else was there to understand their problems or to

look after them. Arun Mukhopadhyay told Turbosu, that Hilli and Warner did not know each other, but since they met, they never went against one another. This friendship was due to a common factor, both were what Proper Sahibs used to call 'Half-blood,' 'Eight Aanas,' and 'Country-born' - Anglo-Indians, whom the English did not acknowledge as Briton and Indians used to put up a social wall against. So, their only near and dear one would be nobody other than another Anglo-Indian ('Nibarsaptak', p. 83). Also, Mycroft's confidential document stated that at that time, some Indian native revolutionary parties are taking birth, and the British Intelligence is trying to find out the possibility of a connection between those parties and Jahbulon ('Nibarsaptak', p. 63). However, no such connection was developed in the later texts, as Mycroft failed to understand, that the native Indian Society, in itself was the oppressor, against whom Jahbulon wanted to take revenge. So, Jahbulon took these oppressed people and gave them a voice to fight against the society that wronged them, not with request, recognition, or equality, but rather with a proper subversion of the ongoing power structure.

The only problem with that is, Jahbulon was not the subversion of the power structure, rather it was just another hierarchy, replacing the old one. Sheila recognized himself, as an essential part of Jahbulon, and the brotherhood gave him the satisfaction of vendetta. Since his childhood, Sheila's purpose in life was to write plays and act in plays, since the second one was not a viable option, he was living life clinging and clutching the first one. So, when Lakhan asked him not to write plays anymore, as writers are fluidly minded and it is possible, that unknowingly, he might write secret details of the brotherhood, which may cause Jahbulon to suffer a hefty loss, Sheila felt violated and dejected thinking that this became his gift for his utter submission ('Agniniroy', p. 116). As Tarini assumed that Sheila was not the type of person, who will work under others. After a certain time, his artistic sensibility will try to find emancipation, but any organization wants submission without question ('Agniniroy', p.136). Sheila was already pushed and condemned by the heteronormative society for his nonconforming sexual orientation, so much so, even though, Sarkar's son Byomkesh wanted to have a relationship with Sheila and even after his rejection, Byomkesh kept on touching Sheila's private parts till Sheila agreed to his proposition, he betrayed Sheila when they were caught by Akshay Sarkar, saying that he had no intention of taking part in such a malicious act, it was Sheila, who kept on nagging. And, as Sheila's sexual orientation became public, he got disinherited by his father and expelled from the team by Akshay Sarkar. After that, When Sheila joined Natyasamaj to write plays, they did not want him to act, as they were aware of his relationship with Byomkesh Sarkar. And after, the rape, he simply was not allowed to act anymore by the command of societal discourse. So, he thought that Jahbulon might let him live freely, the revenge he got, but, in return, his artistic and creative liberty was usurped

by Jahbulon, binding him from both acting and writing and oppressing him even further, than the mainstream society itself. Although, Jahbulon was supposed to be the epitome of freedom, the organization, like any other authoritarian discourse, in general preaches, the virtue of freedom, but, forbids the act of free will, if the consequence makes the controllers unhappy, giving the oppressed, an illusion of choice, but not a real one.

Bhudeb Mukhopadhyay told Lanson and Mariana, that he will give them a place to stay, under one condition, as long as he is breathing, Lanson should not be seen doing anything of the Brotherhood's works or taking part in any form of dishonest work ('Agniniroy', p. 75). Lanson remembered this act of kindness, and upon meeting with the Master Mason, asked him if there is any chance available for him to say no, in reply, Master denied it and made Lanson feel inferior, as if, his birth was to serve the orders of the Master and if he does not, destruction will enter his home. So, Lakhan who joined Jahbulon, to get away from feeling inferior, can not even lead his life freely. So, the Jahbulon's plan to subvert the power structure, for the sake of the people, is nothing but an utter lie as it only replaces the controller, and does not necessarily bring any liberal change. But, selling this hope of a better world, Jahbulon hired its slaves of war and they died in war, Halide, Carter, and Sheila, but nobody can convict the true mastermind behind this façade ('Agniniroy', p. 157). While the soldiers were gay, anglo-Indian, and illegitimate children, in short, socially isolated, the king of this chess, Joseph Grant, had a special type of connection with the British Monarchy ('Agniniroy', p. 148), and using 'Bhut' Grant wanted to usurp all the power, becoming the grandmaster ('Agniniroy', p. 159). Both these ideas showcase how much different he was, from those whom he hired and fed false hope about subversion when in truth, Jahbulon was an oppressor of human rights.

Although the characters might enjoy liberty from the author to travel around fiction and reality, they are not free from the colonial empire, as shown at the beginning of Surjotamosi, a telegram took away Priyonath's liberty to go home to rest a little, Tarini deduced that, Akshay Tritiya was coming, Priyonath was supposed to go home, but he recently found out, maybe, he won't be able to, so, he bought some things to pamper his wife ('Nibarsaptak', p. 40). Tarini himself wrote that he is not capable to ignore the call of Sigerson sahib, the respect sahib had given to him, the pathetic native, he will always keep it in his mind ('Nibarsaptak', p. 35-36). Both these lines showcase the chained feeling of our native heroes, they were not really free to do anything. The culprit was found as the Lieutenant Governor General (Although the letter of Carter called him the Governor General, it is historically apt to call him the Lieutenant Governor General of Bengal, the name of the post, Governor General of India became Viceroy of India in 1858), he proudly said that he was sending Dr. Martin back to their homeland with doubled pension,

as a gift for helping him to arrange the murder of Halide ('Surjotamosi', p.222). Tomson then, confessed killing Carter to save the honor of the British Empire. The funny thing was none of them had to suffer the consequence of their action as it was to save the foundation of English colonialism. But the natives did not have the capability, even, the inclusive Jahbulon master told Lakhan that he is but an ordinary worker of the brotherhood and told him not to demand things which are not his in the first place (Agniniroy, p. 85), probably the master was talking about Alice, but it can also be interpreted as the valuable thing that, Lakhan asked for, was liberty and permission to live freely away from all these chaotic scenarios, but by the brotherhood's law, a member can only leave, by his death. The same thing can be stated for all the natives and their chained lives. Surjotamosi on its own does not refer to the factor of inequality all that much, but the most crucial one is that everyone knows that Prasanna Kumar Babu will never become the master mason, as that particular right is bound for the sahibs only (Surjotomasi, p.146). Mukherjee brilliantly portrayed a comparison between Priyonath and Sherlock, saying, "Holmes despite operating under the governmental authority, he can be a free bird, and make the authorities grant his wishes whereas, Priyonath has to do what his authorities ask him" (Mukherjee & Dasgupta, 2023). That's why not for a single second, we get to see a native challenging the British Raj, rather, Tarini, Ganapati, and Priyonath tried to save the foundation of the same English Government that doomed them.

At last, it can be understood, that all these conspiracies and bloodshed shown in Majumdar's text had nothing to do with India. The whole political turmoil was portrayed in such a way that Priyonath, Tarini and Ganapati kept on fighting for the very force that had oppressed them. Sigerson said, that Calcutta was known as the second London, all the perks London has to offer can be found here as well, yet, the piercing surveillance of the British Intelligence is absent ('Nibarsaptak', p. 183). And that's exactly the portrayal of Bengal we get from these texts, it is not the country of the colonized, but rather a place, where the Anglo-Indians get discriminated against every day. This is the place, that the colonizers call their own, so Priyonath had to sell his liberty and go to Chinatown against his will, and the criminals, who committed the crime, was already way outside of his reach.

Referrences

1. Majumdar, Kaushik : 'Agniniroy'. Book Farm. Kolkata. 2023.
2. Majumdar, Kaushik : 'Nibarsaptak'. Book Farm. Kolkata. 2021.
3. Majumdar, Kaushik : 'Surjotamosi'. Book Farm. Kolkata. 2022.
4. Mukherjee, Rajarshi, and Koyel Dasgupta. "Decoding Crime and Punishment in Colonial India: Analysing Surjatamashi, Nibarsaptak, and Thugee or Thug." International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS) 8.1.2023.

Laso Mung and Lepchas' Fight for Survival
A Political Interpretation of Lepcha Movement in the Darjeeling District of West Bengal

Abhsihek Chakravorty & Dr. Arpita Raj

The origin of Lepchas is shrouded with mystery. Scholars are divided in the topic of their birthplace and the migration they had to reach Sikkim and the northern portion of West Bengal. Some believe that the Lepchas are of Tibeto-Burmese origin with a Chinese connection. During the early 13th century, they migrated from their ancestral places and settled down in North Sikkim first and then came to occupy the hilly region of Darjeeling district. Known as the 'children of the snowy peaks', the Lepchas generally follow the 'Bon' ethno-religious belief. Their indigeneity has labelled them as worshippers of natural elements—the mountains, the rivers, the trees, the birds and various other elements of nature. Their approach towards life is more biocentric than anthropocentric. Though, later the Lepchas came into contact with Buddhism and Christianity, still majority of them try to remain true to their ancestral religious ideologies. Generally, the Lepchas believe that their creator Itbu-moo has created them from the snows of Mount Kangchenjunga and has given them the lower hilly regions to live and prosper. To the Lepchas, the place is known as 'Mayal Lyang' or 'the land of Paradise'. They believe that they live in 'Mayal Lyang' with divine beings- both good and evil. The good and benevolent beings are known as 'rum' and the evil and malevolent beings are known as 'mun'. This co-existence is the main base of Lepcha mythology. This mythological structure of their indigenous culture has been preserved in their different folk narratives and other cultural artifacts.

The Myth of Laso Mung: The Lepchas have a diverse collection of oral traditions which reflect their socio-cultural beliefs through various folk tales and descriptions of rituals. The word 'lungten sung' is generally used to denote the myths associated with the Lepcha origin story. 'Lungten' means 'tradition' and 'sung' means 'narrative' or 'tale' (Bentley, 100). The concept of 'lungten sung' can be understood, from the point of view of the Lepchas, as a structure to sustain their indigenous stories and at the same time, make them movable towards the future. The myth of Laso Mung is deeply connected with the origin story of the Lepchas. 'Laso' can be translated to 'to change appearance' and 'mung' means 'demon'. In Lepcha myth, Laso Mung is a demon, an outcast who threatened to destroy the Lepchas out of existence.

The myth of Laso Mung has been coloured with local variations through the ages while keeping the base model original. In this paper, we will be dealing with the story of Laso Mung popular in the Darjeeling district, especially in Kalimpong. The story begins with the creation of the first Lepcha man and woman by the divine creator Itbu-moo-Fadrongthing and Nazongnyu (Bentley, 103). Both of them were created as brother and sister. Itbu-moo forbade them to indulge in any sexual activities. But, they violated that doctrine and Nazongnyu got pregnant, eventually, for several times giving birth. But, as those babies were unwanted, they were thrown away by the couple only to hide their sin from Itbu-moo. According to Lepcha scholars, the numbers of children thrown away were seven. But, ironically, those children were not dead. In Lepcha myth, those abandoned children became the 'mun' or 'mung' or 'demons'. Generally the demons dwell in the jungles, lone mountain paths and other desolate places to avoid the contact of the Lepchas out of sheer hatred. But occasionally they try to inflict harm on them to satisfy their thirst for revenge for being abandoned by the ancient mother and father of the Lepchas. According to myth, Laso Mung was the eldest of those seven demonic children and he vowed to take revenge on the Lepchas (Doma, 11). It has been stated in the legends that Laso Mung could took the forms of several animals and birds and using that power he started killing the Lepchas without any mercy. Ahbong chyokung sung, a Lepcha book, contains all the details of the tyrannical deeds of Laso Mung (Bentley, 105). Being unable to stop the aggression of the demon king, the Lepchas went to pray to Itbu-moo for help. The Lepcha myth is divided regarding the story of the hero who fought against the demon lord. Majority of the Lepchas from Sikkim (except North Sikkim) and Darjeeling believe that it was Jor bongthing who was send by the divine creator, Itbu debu rum or Itbu-moo, to protect them. Jor bongthing is generally depicted as a demi-god figure who has the power to expel any demonic presence from the environment. This same attribute has also been given to another deity figure Tamsang thing. The mythical figure of Tamsang thing is regarded as the

heroic figure who saved the Lepchas from Laso Mung in the northern portion of Sikkim and the inhabitants of Kalimpong (Bentley, 107). He is also regarded as the first ritual specialist for the Lepchas. The story goes on that after fighting with the demi-god, both directly and indirectly, Laso Mung escaped to Saynol kung, a mountain in Mayal lyang. There he took refuge in the tree Sangli kung. In the legends, the Sangli kung (a type of sago palm tree) has been mentioned as the final inhabitant of the demon king before his supposed death. The tree was cut down by the Lepcha warriors and Laso Mung was finally defeated after a vicious battle. His body was chopped to pieces and turned to ashes so that he could not resurrect (Doma, 20). The continuous battle with the demon king and his defeat mark an important phase in Lepcha origin story. The whole story gives the Lepchas a sense of reawakening from a dark period. The long war taught them about animals, birds, trees, the usage of medicinal plants and other things necessary for survival. Even they learned to count time also. The day Laso Mung was defeated is kown as the last day, Marlavo, of the last month of the Lepcha twelve month calender. The next day, in Lepcha folk narratives, is known as Namsoong or Nambun, the first day of the first month of the Lepcha new year (Doma, 21).

Laso Mung and Lepcha's fight for socio-cultural existence in Darjeeling District :

The Laso Mung myth of the Lepchas represents their fight for survival against the threat of annihilation posed by the demon king. These efforts of the Lepchas to exist can be analysed from socio-political perspective. The northern part of Sikkim and the Darjeeling district of West Bengal are known as the primary habitants of the Lepchas. These lands are known as, as stated earlier, 'Mayel Lyang' or 'Delightful Region' or 'Land of Hidden Paradise' (Das & Pal, 1). If we try to assess the history of the Lepchas, we will locate their struggles against various socio-political threats within their own lands. Lepchas of Darjeeling district are constantly facing the aggressive political oppression by the Gorkhas and Nepalis. Because of the majority in numbers, the Gorkhas and the Nepalis are getting the political superiority in the district. As a result, the Lepchas are lacking the foothold to maintain their cultural integrity. The issue of 'Gorkhaland' has impacted the Lepcha indigenous development a great deal. The Gorkha National Liberation Front has been a massive obstacle for the Lepchas to gain any political ground in Darjeeling district. The chauvinism of the Gorkhas can be parallelly seen in the Laso Mung myth. The demon king stands for the doom of the Lepchas and their lands. Their efforts to defeat him can be seen as a political struggle to challenge the politically powerful Gorkhas and the Nepalis. Generally, there are four Lepcha political associations fighting for the Lepcha indigeneity—the Indigenous Lepcha Forum (ILF), the Lepcha Youth Association (LYA), the Indigenous Lepcha Tribal Association (ILTA) and the Lepcha Rights

Movement (LRM) (Das & Pal, 4). Their major concern is the political instability the Lepchas are facing in the Darjeeling district of West Bengal. The Lepchas believe that the people of Bengal still consider them as untouchables and that is the main reason for the lack of any effort to understand their plights. This issue of untouchability is separating them to become an integral part of Bengal culture. To improve their chance of survival, both as a community and a cultural body, Lepcha organizations have put forwarded some necessary demands- a separate Lepcha Development Council, preservation and application of Lepcha language in the academic structure and reservation of seats for the Lepchas in the State Assembly and the Parliament (Ghosh, 2010). The Lepcha Rights Movement has also given a memorandum to the District Magistrate of Darjeeling on 18th August, 2011 for the sake of the protection of their lands, language and ethnic indigenous cultural identity. On 5th February, 2013, Government of West Bengal has approved the formation of a separate Lepcha Development Board (LDB) (Das & Pal, 5-6). It is fascinating to see how the Lepchas' political struggle is deeply connected to their origin story, particularly in their fight against Laso Mung. If we consider the demon king's ability to manipulate the Lepchas by taking the forms of several animals and birds to endanger their existence, it can be interpreted as the false consciousness promoted by the main stream cultures. False consciousness is a tool for manipulating the ideas of the oppressed class by using various modes of social artifacts (Nayar, 181). Even when we are talking about their protagonists in their battle against the demon, Jor Bongthing and Tamsang thing, they can be seen as the carriers of their indigenous values in front of the whole world to secure their linguistic and cultural freedom. The tale of Laso Mung symbolically states the survival of the Lepchas against all odds to upheld their cultural indigeneity. It can be seen as a motto statement for them to gain socio-political stability in the cultural-politico milieu of West Bengal.

Conclusion :

Though the Laso Mung myth actively symbolizes the attempts of the Lepchas to secure socio-political freedom, it can be viewed as a double edged sword also. Laso Mung himself was made an outcast by his parents. He became an untouchable. That became the motive behind his revenge against the Lepcha community. It can be noted that, perhaps, the Lepcha themselves have been securing the idea, through their folk tales, that political and cultural antagonism can lead to alienation which can, eventually, dissolve the identity of any community. Thus, Laso Mung can be interpreted as tool which can remind the Lepchas of the crime committed by their divine parents; at the same time it can glorify the victory of the Lepchas over something evil denoting their indigenous unity.

Referrences

1. Bentley, J. Laso Mung Sung: Lepcha Oral Tradition as a Reflexion of Culture. Bulletin of Tibetology. University of Cambridge.
2. Das, K. & Pal, A. The Lepchas in Darjeeling and the Demand for a Separate Development Board. University of North Bengal. Vol. 6. 2021.
3. Doma, Y. Legends of the Lepchas: Folk Tales from Sikkim. Tranquebar: Chennai. 2018.
4. Ghosh, N. The Forgotten People Lepchas Demand Justice. 2013.
5. Nayar, P. K. Contemporary Literary and Cultural Theory: From Structuralism to Ecoriticism. Pearson. 2009

Climatic Thoughts of Rabindranath Tagore
An Ecocritical Study

Agnidev Manna

Ecocriticism is an approach to literature that promotes ecological literacy by encouraging readers to become eco-conscious. It emerged as a reaction to man's anthropocentric attitude of dominating nature and is associated with Environmental criticism, Animal studies, Green Cultural Studies and more. The term 'Ecocriticism' was first introduced by William Rueckert in 1978. It means a criticism of the environment represented in literature and emphasises the connection between human and non-human worlds. Patrick D. Murphy describes it as a literary "criticism that arises from and is oriented toward a concern with human and nonhuman interaction and interrelationship".[1] Rabindranath Tagore, the first non-European Nobel laureate, expressed his environmental consciousness through his works, emphasising the interdependence and harmony between humanity and the rest of the world, including plants, animals, the earth, the atmosphere and the wider universe.[2] This article will explore Tagore's perception of climate and its impact on humanity and the physical environment.

Climate-Culture Entanglements in Bengal : The climate is one of the many different natural phenomena that have a significant impact on human existence. Bengal is situated in a climatic region of tropical nature. There are six different seasons and substantial temperature variations. The region is susceptible to cyclones, monsoons, and severe rain. The tropical climate of Bengal is strongly represented in all of its shapes and flavours in Rabindranath's environmental ideas. Indeed, the climate is not only the actual physical attribution of the

environmental framework but also a cultural composition that rises out of perceptions, meanings, spirituality, deliberations, discourses, and distinct knowledge bases.[3] The confluence of climate and culture can also be seen wonderfully in the thoughts of Rabindranath Tagore, a nature lover. Tagore portrayed the emotional and rational values of indigenous people that lie at the heart of performing a number of social and religious rituals during various seasons. Most of his songs written in Santiniketan talked of a profound spiritual presence in the harmony of nature amidst the various seasonal moods. Indeed, Tagore organised several festivals in Santiniketan and wrote songs for each.

Tagore was well-acquainted with the severe weather fluctuations that plagued Santiniketan, a city in the heart of an arid land with its dusty, red roads and far-off horizons. In his song "Prakhar Tapan Taapey," he beautifully encapsulates the essence of a scorching summer day as the heat of the season steadily intensifies:

> In the intense heat of the sun, the earth shivers in deep thirst, the winds rage
> I come to a temple and cry at the end of a long journey 'open, open, open the doors.[4]

The monsoons in South Asia bring a sense of calm and joy to those who experience them, especially farmers who rely on the rain for their livelihoods. Rabindranath Tagore, a renowned writer, was particularly fascinated with the monsoon; his beautiful descriptions are considered a classic. His song "Abar eseche ashad akash chheye" captures the transition from a harsh summer to an ecstatic monsoon in the subcontinent.[5] His other works, such as Barshamangol, Naukadubi, and Shraboner Gagoner Gan, are some of his most well-known writings where rain, the clouds, and the monsoon feature prominently. The following verse gives an idea about the depth and elegance of his depiction of Varsha:

> Clouds heap upon clouds, and it darkens. Ah, love, why
> dost thou let me wait outside at the door all alone?
> In the busy moments of the noontide work I am with the crowd,
> but on this dark lonely day it is only for thee that I hope.[6]

Santiniketan celebrated the monsoons with Varsha mangal, a dance and music festival written to commemorate the showers. The poet greeted the showers with a cry for their "cooling, thirst-quenching nectar of companionship", referring to the rains as "Shyamal sundar," or the verdant beauty:

> Green beauty, you are welcome.
> Fetch your cool thirst-quenching nectar of togetherness,
> The parted lady is waiting impatiently, staring high into the sky.[7]

Tagore's songs use rich imagery to capture the subtleties of lyrics in music and rhythm. His song about the revitalising effect of rainfall on an arid region is heart-breaking as he says goodbye to the showers like a close friend. He

wrote, “O verdant shade, surely you don’t need to depart after pouring out your last showers”.[8]

Autumn or Sharad was a season of gleaming brightness, clear skies, swaying bulrushes in the fields, mounds of harsingher on verdant patches, and floating white clouds. Tagore said, about an autumn day :

Autumn, your gift of sunshine
Overflows your hands
Joined in auspicious offering,
Floods creation.[9]

This wonderful and evocative description catches the essence of the abridged season of Sharad, which students in Santiniketan commemorate as Sharadotsav.

Late autumn, or Hemant season, was a time of starry evenings and skies. Tagore's vision of Hemant was captured in four songs, including his well-known piece “Heemero ratey oyi gogoney”.[10] During this season, flower gardens were deserted, birds were silent, and bulrushes were shedding their leaves into the river. However, Tagore celebrated the joy of this season with Diwali, the festival of lights. The countless stars in the night sky seemed to encourage people to light their lamps of Deepika, bringing hope and light to dispel darkness and despair.

Winter is a season of great importance, yet the poet only wrote a handful of songs during this time. The arrival of the dew drop signifies the onset of winter. The arrival of winter also brings a bountiful harvest and beautiful weather. Most of the work during this season involves harvesting crops and transporting them back home. Tagore invites a celebration of the season of Paush with its ripe harvest. As Tagore eloquently states, “The season of Paush hails you, come hither, come hither / Her platter is filled with ripe harvest, come let us celebrate.”[11]

Spring was celebrated by Tagore as a liberating and hopeful free spirit after the long winter. It brought a gentle breeze that caused enchantment with its fragrant floral scent and a soothing moonshine that lulled to sleep. In contrast to the gloomy Varsha, it was flirty and frivolous. In a song, Tagore skilfully conveyed the magic of spring:

light touch do I feel, a few words do I hear
And I conjure in my mind spring's full moon
The intoxicating red of the 'Palash.'
Mixed with a dash of Champa’s heady fragrance
I weave with music into a net of colour and fervour.[12]

In Santiniketan, the festival of Holi was joyfully celebrated, marking the arrival of spring. The day began with female students singing and inviting locals to join in the festivities, which included a parade through the alleys to a mango grove adorned with colourful stoles—girls dressed in mustard-coloured saris, symbolising spring, performed on a beautifully painted

platform with alpona. Tagore would typically commence the festivities with his recitations, followed by his famous springtime songs:

> The southern gate is unbarred. Come, my spring, come!
> Thou wilt swing at the swing of my heart, come, my spring, come![13]

Basantotsav ended with a colourful moonlit feast of song and dance using red powder and sandalwood.

Tagore found a spiritual presence in nature that maintained balance despite impermanence. He felt blessed by this divine revelation. Tagore's song Nataraj was performed at the 1927 Holi celebrations in Santiniketan. It explored the contrast between the mutability of human existence and the permanence of nature, with Nataraj/Shiva's cosmic dance symbolizing external beauty and individual emotion. Tagore later reorganized and renamed the song Riturangashala to emphasize the importance of seasons and time to Shiva.

Tagore's Vision on Environmental Degradation and Climate Change:

The Earth is getting warmer due to excessive green house gas emissions, causing environmental catastrophes and impacting daily life. Human health emergencies are becoming more frequent. During his time, Rabindranath was acutely aware of the adverse effects of anthropogenic climate change. Rabindranath pointed out the dangers of destroying forests and consumerism in various articles and books. He suggested restraining greed for sustainable development.

Tagore warned against disrupting the balance between human life and nature. In his essay Aranyadevta, the poet expresses his belief that modern humans enjoy a luxurious living and are particularly susceptible to this. After moving to the city, they contributed to the destruction of forests for urban living, which decreased rainfall, increased the risk of desertification and engulfed the population. Tagore's discussions on the problem of human destruction were not limited to India but extended globally. The issue of protecting forests from human greed is universal. America's history of losing vast forests has resulted in sandstorms and agricultural damages, highlighting the disastrous consequences of such greedy actions on the environment. Tagore's thoughts emphasize the critical role of forests in purifying the air and the need to safeguard them.[14]

Rabindranath believed that air pollution was a significant hindrance to developing rural areas. In the past, Northern India was a lush and hospitable environment, but it was destroyed due to human greed. As a result, air pollution levels have increased, rainfall has decreased, and desertification has become more prevalent. Tagore believed that the only way to combat the destruction of forests and the resulting dangers is to restore our love and respect for nature. He suggested invoking Bardatri Vanalakshmi by planting a forest to protect the environment, reduce air pollution, and increase rainfall. Rabindranath believed that the environment relied heavily on the presence

of trees. In the story of Balai, the main character held a solid connection to a tree which was unfortunately destroyed due to human greed. Tagore believed life was a precious gift from God, but due to their desires, humans created the means of their destruction. The role of plants in cleansing the air through leaf shedding and soil fertilisation is deemed essential.[15]

Rabindranath introduced several festivals celebrating nature, including Varsha Utsav, Halkarshan Utsav, Navanna Utsav, Sharodutsav, and Vasant Utsav. These festivals aimed to inspire people to connect with nature and plant more trees, enhancing the beauty of their lives. Every year, during the monsoon festival, a ceremony was held to plant trees and honor Rabindranath Tagore's birthday in Santiniketan. In 1938, Tagore delivered the essay Aranyadevta at the tree plantation festival. Tagore wrote a book of poetry, Banavani, which centred around trees. He also wrote "Marubijayer Ketan Udao O Shunye", urging for more green spaces through plantations.[16] His vision was to develop a sense of respect for nature by building a spiritual bond between trees and the students of Santiniketan. He believed that more trees needed to be planted to maintain environmental stability. He envisioned Santiniketan as a model of living in harmony with nature, where more trees would be planted in the fallow lands during the monsoons.

Conclusion

Tagore's philosophy was greatly influenced by the Upanishad, which emphasised sustainable development, eco-ethical human living, and the oneness of nature. Rabindranath created an awareness of how the unpredictable greed of people can disturb the environment and how weather and climate-related issues can affect the lives of modern people practically and emotionally. Tagore was passionate about addressing climate change, created initiatives like the tree-planting programme, and urged to come closer to nature. Furthermore, he organised several festivals for each season in Santiniketan, such as Ritu Ranga (for all the seasons), Basant Utsav (for spring), Barsha Mangal (for the monsoons), and Sharad Utsav (for the autumn). His Santiniketan and Sriniketan culture promotes harmony between nature, landscape, and human settlement planning. This culture can inspire global community consciousness and environmental activism. His low-cost remedial options can help create a world without borders for better, holistic living conditions.

References

1. Mishra, Sandip. "Ecocriticism: A Study of Environmental Issues in Literature." BRICS Journal of Educational Research, vol. 6, no.4, 2016, pp. 168–170.

2. Pal, Tapas. "Tagore's Aesthetic Visions: Pioneer of Geo-Environmental Awareness." British Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 2, no.1, 2011, Pp. 138–146.
3. Carey, Mark. "Climate and history: A critical review of historical climatology and climate change historiography". WIREs Clim Change 2012, vol. 3, no. 3, 2012, pp. 233–249. doi:10.1002/WCC.171
4. Som, Reba. Rabindranath Tagore: The Singer and His Song. U.K: Penguin, 2009.
5. Chakrabarti, Ranjan. Climate, Calamity and the Wild: An Environmental History of the Bengal Delta, c.1737-1947. Delhi: Primus Books, 2022.
6. Tagore, Rabindranath. Gitanjali. Kolkata: Woodpecker, 2018.
7. See https://www.geetabitan.com/lyrics/rs-e/eso-shyamalo- sundaro-english-translation.html, accessed 17 November 2021.
8. Som, Rabindranath Tagore: The Singer and His Song.
9. https://gitabitan-en.blogspot.com/search/label/Autumn%20-%20Shorot, accessed on 12 May 2023.
10. Som, Reba. "Significance of the environment in the songs of Rabindranath Tagore." Gitanjali and Beyond: Rabindranath Tagore and the Environment, edited by B. Fraser and C. Kupfer. Edinburg: Edinburg Napier University, 2018, pp. 46-56.
11. Ibid.
12. Som, Rabindranath Tagore: The Singer and His Song.
13. See https://www.ibiblio.org/eldritch/rt/king.htm, accessed on 12 May 2023.
14. Tagore, Rabindranath. Palliprakiti. Kolkata: Visva-Bharati Granthana Vibhaga, 1986.
15. Jana, S. "Rabindranather Poribesh Vabna." Tagore's Thinkings on Environment and Sustainable Development, edited by R. Sen and S. Bhattacharyya. Kolkata: Rabindra Bharati University, 2013, pp.125–142
16. Ibid.

Partition and Vilification of Body : Exploring Violence against Marginalized Women in the Select Writings of Dalits in Bengal

Biswadeb Rajbanshi

Mass migration victimized women, children and others during partition of Bengal and Punjab in 1947. The polarity of power based on religion led the contemporary nationalists to choose the provision of religion. Contemporary nationalists could hardly think about the highest cost which was paid by women. Their interests overlooked the basic human-bonding, relation and security. Thus marginalized women were raped, abducted, traumatized to persuade masculine libidinous desires and established womanhood in derogatory sense. Migrated people after Partition get another identity and they are treated as Jew by mainstream society. Hence, suffering of migrated Dalit women depicts a new reality (Naya-reality) of caste-based gender discourse. A study of partition literature is important to explore the communal history and post-colonial consciousness of home in relation to cultural, literary history of the subcontinent.

- **Violence against Dalit Women before Migration**

Kapil Krishna Thakur's 'Anya Ihudi' ('The Other Jew') explores violence against migrated Dalit women during partition and after partition of India. Thakur manifests how those helpless refugees were leaving East Pakistan and a large number of Hindu minority in Bangladesh were forced to convert their religion into Islam by the extremists. He has witnessed the levels of oppression upon Bengali women who are victims of being particular a gender, a religious community and refugees. In the story 'The Other Jew' ('Anya Ihudi'), Bistu pandit

is a helpless refugee who has previously worked as a teacher but after migration to India he becomes a helpless refugee and settles down beside the train line of Eastern Railway from Sealdah. In his writing 'The Order of Discourse', Michael Foucault writes about 'the production of discourse' which is 'at once controlled, selected, organized and redistributed' in every society'. Policies of certain political and religious extremists targeted minority people toward off its powers. Dalit women, being subjugated thrice within their own community had to suffer the worst as the dominant groups easily targeted those Hindu Dalit women as their prey. Hence, they could either resist the oppression or they have to quit. Thus, a mass exodus took place. Thakur's story exposes this large number of refugees who were forced to migrate from East Pakistan. Psychologically it was the object of their (Razakars) desires. Thakur substantiates the politics and scenario of its dirty desires upon the woman's body. In patriarchal social structure, body of women gets exploited by various forms of masculine desires. Being minority in East Pakistan, Thakur manifests different forms threat from those religious and political extremists who are called Razakars. The story shows how the body of women is possessed by man. So, when Brojo asked Bistupandit about Jhunu, one of the daughters of Bistupandit, he replies , 'Bejo, Jhunu is no more...She was killed. My beautiful, innocent daughter...' This killing is manifestation of desires to translate struggle and violence against Dalit women that became an object of desires even in India during Partition and after Partition. Thakur writes :

> She has not died. She was killed. My beautiful, innocent daughter...'That dirty, rotten scoundrel .Ferumiya. One day when Jhunu was coming back from college, Feru and his mates Kidnapped her. Feru wanted to marry her . She did not agree. They assaulted her all through the night and just before daybreak...(Singha and Acharya 81).

Killing is done sophisticatedly to provide traumatic state of uncertainty. This form of domination upon the refugees get maximized during and after the Partition. The religious idendity of Ferumiya simply gets exposed. Hence, Brajabasi repies :

> That's why we left our home so early. I told you to do the same thing. You didn't listen to me then, you were not ready to accept me. Today you accept me, but for accepting me what a heavy price you had to pay! It's not Ferumiya only, I tell you...
>
> Brajabasi wanted to say something harsh but controls himself. Within such a short span of time he does not want to forget that once they had kept the highest seat of honour in their society reserved for the man who is now sitting in front of him.(81)

- **Vilification of Body**

Partition brings forth the nemesis in the lives of common who ultimately had uncertainty, trauma and this metaphor of violence ultimately provided distorted memory that occured both in collective levels individual. Here

Bishtucharan's remark 'I won't have peace until I can marry Runu off'(81). In patriarchal social system marriage is associated with honour for women. As a father he couldn't protect one of his daughters. Ferumiya destroyed one of his daughters. Hence, at any cost he wants his daughter Runu here. But masculine libidinous desires vilified Raunu's body. She is raped by frenzied drunken members. Thakur substantiates the patriarchal political scenario and its dirty desires upon the woman's body. The story shows how the body of women becomes a possession of man. Bistu Pandit, the father of Jhunu and Runu, describes the incident of gang rape in East Pakistan. Another rape is followed infront of his eyes. Thakur writes :

> Those frenzied, drunken members of so-called 'decent families' forcibly pull Runu, Shiuli and other girls of Chenno's age out of the huts and demonically take them to darkness on the other side of the railway line.
>
> 'Alas! Allas!' Bishtucharan cries out. Though portions torn off from their saris sealed the mouths of the girls, he can still hear the sounds of their groaning.(89).

So, this incident reminds him of the Albadar Group, who intentionally vilified bodies of women in East Pakistan. This oppression is common in Dalit literature. Migrated Dalit women are often victims of violence and brutality. In his testimonio Interrogating My Chandal Life, Manoranjan Bypari recollects this incident as "a ruthless saga of massacre and rape arson and plunder" (Bypari 236). The nature of vilification and exploitation is sometimes toxic and exposes a link of methodology of suppression. The Human Rights Watch World Report 2000 exposes this nature of violence in the socio-cultural context of India. Bankim Chandra Mandal in his book Caste Based Violence on Dalit Women: An Inquiry into Social Reality has remarked, "the use of sexual abuse and other forms of violence against Dalit women as tools by landlords, dominant castes and the police to inflict political lessons, crush dissent and labour movements within Dalit communities."

Henrietta Louise Moore, a British social anthropologist, argues about the complexity of the institutional structures of states in her book Feminism and Anthropolgy. In the complexity of institutional structure, though state policies are not designed to "oppress" or "discriminate" against women, end results contradict with the certain regulations that aim to protect mother, children from discrimination, oppression of social practices. Moore thinks that state policies which "may be extremely contradictory"(Moore129) in its performance upon women when "administrative, legal and coercive systems are the main means through which the state structures relationship between society and the state" (136). Hence, the dominant economic class and caste establish masculine identity and cultural construction of masculinity through the state apparatuses.

The nature of bureaucratic oppression upon Dalit women is a disguise violence structured and restructured by the dominant economic class and

caste. This act of repression upon Dalit women was conducted by the police in West Bengal during 1970s and 1980s. Though oppressions of deprivations upon Dalits in West Bengal exist in a "very sophisticated manner" as Monohar Mouli Biswas Comments in his Bengali Dalit Poetry Past and Present: A Critical Study.

In her book 'The Other Sides of Silence: Voices from the Partition of India', Urbashi Bhutalia describes vilification and pathetic condition of women. Bhutalia describes this as 'orgy of violence' under the flow of psychological trauma and torture. Rape and other forms of atrocities were beyond descriptions. Condition of Dalit women was the worst. The attacks were made on two levels. First, women were seen as an embodiment o community honour and second their bodies are sources of producing another body. Though they change the land to get security but threat and trauma avail here. The insecurity for women under patriarchal social order is the established truth. The fundamental question gets confronted for being confused about the possible safeguards. Will religion be able to save the body of Dalit women or they would save their lives? And which one would they protect- religion or life? The state policies regarding the issues of migration and Marichjhnapi promote a gender-based sexual savagery. Both have secret and masculine enigma to perform through transgression and murder.

- **Conclusion**

The Partition of India occurred due to monolithic concept of religion. Women were raped, abducted, vilified during and after the Partition of India. Even the majoritarian people of the Hindu community could not save them from Hindu antisocial. Hence, Dalit women were the worst victims as they were killed, abducted, raped, vilified by dominant religious groups – Hindus in India and Muslims in East Pakistan. So, the concept of home or 'real home' gets distorted and the question reverberates, "O Bejo, my Bejo...for what then did you leave your home behind?'' (90) The Partition is a holocaust in Post-Colonial consciousness that has left an unresolved question as reflected in the end of the story, 'Tell me, you tell me…where is our real home?'

Referrences

1. Butalia, Urvashi. The Other Side of Silence. Penguin Books, 2017
2. Bypari, Manoranjan. Interroating My Chandal Life: An Autobiography of a Dalit. Translated by Shipra Mukherjee. Sage Publication, 2018
3. Singha, Sankar Prasad and Indranil Acharya. Survival and other stories : Bangla Ddalit Fiction in Translation. Orient BlackSwan Private Limited, 2012

The Effect of Imperial Propagandas on the Conscience and Consciousness of Bengali People and Deconstructing the Usage of Subtext in Children's Literature

A Postcolonial Study of Satyajit Ray's The Tree with Golden Leaves

Subhranil Ghosh

As we all know that Satyajit Ray¸ one of the greatest Bengali writers and filmmakers, wrote many writings including Children's Literature. He created several characters like Professor Shonku, Feluda, and Tarini Khuro and experimented with different literary genres and techniques with these characters. Ray's writing in the genre of children's literature spread a certain morality. The characters teach how to live in society, how society has been gone and what is readers role in society. Overall, Ray's works continue to inspire and captive readers of all ages. Normally though we cannot find any kind of political touches in Shonku's stories but here in my topic one can find political touch. As Mukherjee argued, according to Edward Said's "Postcolonial Theory, the Western world has considered the East as the 'other, the inferior. The East has been the mythical unknown, the home to savage and barbaric beings" (Mukherjee & Dasgupta, 2023). As Professor Shonku was aware of this idea, used this dogma as a form of leverage to manipulate Herr Goring to make him act how Shonku had wanted to. While he had nothing to do with the medicine, he said that the found the tree in his dream. But Herr Goring although trying to usurp the ownership of Miracurall doesn't understand the nuanced reality of the Sanatan spiritualism. My topic is Satyajit Ray's "The Tree with Golden Leaves", Professor Shonku, the protagonist, discovered "Swarnaparnee",

not a tree but an herb. To discover the herb Shonku faced so many barriers. After discovery, he gave the name of the herb "Miracurall, a miracle to cure all complaints." He used the herb for the treatment of many diseases for many people and also helped the German Jew Norbert Steiner's father Heinrich Steiner. There Shonku faced the secret police agency Gestapo came to take Professor Shonku to cure the problems of those NAZI party members. Herr Goring, the head of the Gestapo, tried to confiscate medicine for his treatment and their members. In that state, Shonku used the misconception and the traditional superstition belief to create fear in Herr Goring's mind. But Saunders, a British friend of Shonku, took out the Miracurall pill from his bag and replaced it with the sure, hit sleeping pill, 'Seconal.'

The Swastika is an ancient symbol used for thousands of years in various cultures around the world, including Hinduism, Buddhism, and Jainism. It has been used as a symbol of 'good luck' and 'well-being'. Early Western travelers were inspired by its positive vibe and started using it back home believing something good will happening to them. It was also used on products such as Coca-Cola, and Kodak film, and even on the American 45th infantry division during world war I. In the 19th Century German scholars translating old Indian texts, suddenly noticed the similarities between their language and the language of Sanskrit. They concluded that Indians and Germans must have had a shared ancestry. And from the culture of Asia in the 20th century, the Nazi party adopted the symbol Swastika and later they used the symbol as its emblem and turned it into a symbol of hatred, racism, and genocide in World War II later they normalized its meaning to the society. According to the holocaust survivor Freddie Knoller, "For the Jewish people the swastika is a symbol of fear, of suppression, and of extermination. It's a symbol that we will never be able to change" (Campion,2014). The holocaust against the Jews by the Nazi party is putting fear as they used the symbol in their flag. In the story "The Tree with Golden Leaves" Heinrich Steiner said, "They are using the swastika as their symbol, emblem! Su, i.e., fine; Asti, i.e., its presence; hence, Swasti, and from there we arrive at Swastik. They call it swastika!" (Ray, S. P. 166). And all the meaning of it is an ironical one.

Professor Shonku a discoverer of 'Swarnaparnee', went to Germany for helping the Jew family, Norbert Steiner's father Heinrich Steiner as Norbert came to London in the house of Saunders. The Germans did not know about the mysticism of Indian culture, they think that Indians are a barbarian race. That's why Herr Goring used to say "You belong to a race which has been subjugated for over 200 years and yet you have this audacity!" (Ray, S. P. 172) In Germany, Shonku has been trapped by the secret police agency Gestapo to help the upper leader of the Nazi party to cure their problems. After coming to Carinhall he meets with Herr Goring who has been suffering from excessive sweating, and wants to confiscate the 'Miracurall' pill for

curing his disease and also for their leaders. And there, Professor Shonku used Indian traditional beliefs and misled him by saying that it was the herb he finds in his dream, he has control over it. He also said if this medicine is administered forcefully, it will not only yield no result, it harm.

In the story, Shonku's friend Jeremy Saunders wrote an excellent article on biology in the renowned science-based English journal, Nature. They wrote letters and sent them by airmail. At the time of Eight months, there's something ominous happens and Saunders by curing with the help of a miracurall pill, came to India to take away Professor Shonku. There Shonku meets with Saunders's wife Dorothy who used political propaganda on the conscience and consciousness of Shonku and used to say to Professor Shonku when he takes a walk with Dorothy on the way to Hampstead Heath, she said, "You know, there's something called 'mad after power' in English. Hitler is mad in that sense. He is dreaming and planning to grab the entire European mainland and turn it into a greater Germany or what they fashionably call the Lebensraum." (Ray, S. P. 152) And later also said, "I've developed such an adverse reaction to Germany and the German race that every time I hear someone go there my first reaction is always to stop that person from doing so" (Ray, S. P. 159). So, here Dorothy wanted to show the Germans as their enemy and those Britishers who colonized India they were good human beings, they came to India not only for colonization but for civilized and educated Indians. They show that Indians are the white men's burden, it is their responsibility to uplift the race, the British system, and their rules normalized to the society of India. That's the mindset Shonku is unable to understand as those Britishers (Saunders and Dorothy) were acting with him as a friend only for the sake of his remarkable discovery "Miracurall, a miracle to cure all complaints". The Britishers also want the medicine for their race and those Nazi party members, also want it for their own. So, each group has the same kind of dazzlement. That's why they send the medicine for chemical analysis if they find any kind of new chemical, they manufacture the medicine artificially. So, we can easily try to understand that Shonku has been used as a tool from both sides, no one is not his actual friend, and all want to use him for surviving their race.

Subtext is a powerful tool in children's literature and can be used to convey important messages and themes. Satyajit Ray's 'Swarnaparnee' (The Tree with Golden Leaves) is an excellent example of how subtext can be used to explore complex ideas and emotions. In Ray's other stories 'London e Feluda', and 'Hirak Rajar Deshe' he uses the subtext explicitly. And one main thing is that in Professor Shonku's series apart from 'Swarnaparnee' Satyajit Ray never discussed any political matter anywhere. Firstly, In the story after discovering the 'Miracurall, a pill to destroy all illness' Professor Shonku met with his penfriend Saunders and later when he visits Germany to cure one of the Jew's problems, he gets caught by the Gestapo secret police

agency and there they also want the pill to cure their problems and he also gave the medicine to Goring. So, Professor Shonku used it as a political tool for surviving both parties. Secondly, in the story one of the Nazi party's members confiscate the medicinal pill and wants to produce the medicine artificially for their purpose alike in World War II the Nazi party uses the symbol of Swastika and turned the symbol of hatred, racism, and genocide. As we all know Swastika is a symbol of 'good luck' and 'well-being' but they used it as an ominous sign because of which when the Jews saw the sign, they were afraid.

● Conclusion

The impact of imperial propaganda on the conscience and consciousness of Bengali people has been significant. The use of propaganda by colonial powers played a significant role to change the mindset of Professor Shonku and after that how he acts throughout the whole story, how he used as a political tool for both parties, and how he used the traditional stigmatized misconception of the Nazi members. Satyajit Ray's creation Professor Shonku's 'Swarnaparnee,' deconstructs the usage of subtext in children's literature, and highlights the need to recognize and critically analyze the message conveyed through the text. Through his work, Ray emphasizes the importance of understanding the hidden meaning and subtexts in literature. As the story is used as a tool for promoting cultural pride and reflects the contributions of Bengali scientists and intellectuals so one can research those points. Also, the story could be used to encourage greater representation and diversity in children's literature.

Referrences

1. Ray, Satyajit : 'The Tree with Golden Leaves'. The Final Adventures of Professor Shonku. Penguin. 2020.
2. Mukherjee, Rajarshi, and Koyel Dasgupta. "Decoding Crime and Punishment in Colonial India : Analysing Surjatamashi, Nibarsaptak, and Thugee or Thug." International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS) 8.1 (2023).
3. Campion, B. M. J. (2014, October 23). How the world loved the swastika—until Hitler stole it. BBC News. https://www.bbc.com/news/magazine-29644591

Tiger of Bengal, A.K Fazlul Haque in the Light of history

Sk. Ekramul Hossain & Debalina Debnath

A. K Fazlul Haque is a prominent political figure of the Indian subcontinent. His full name is Abul Kashem Fazlul Haque. However, he is known as 'Haque Sahib' to the political world and to the people of the country and abroad. A. K Fazlul Haque, Father of Bengali nationalism, beloved, undisputed public leader of the hardworking people and originator of Pakistan's Lahore resolution, took various initiatives or programs to suppress injustice, exploitation and oppression throughout his life. Honesty, love and compassion were his main tools in political ideology. And this noble person has written a living history of the rule of Pakistan starting from the early days of British rule.

The talented, handsome, undisputed public leader was born on October 26, 1873 in Saturia village of Rajapur police station of Barisal district in the lap of Bangajanani in his maternal uncle's house. Haque Sahib was the only child of the couple, Kazi Muhammad Wazed and Saidunnessa. However, his ancestral residence was in Baufal upazila of Patuakhali district of present Bangladesh.

Mr. Haque completed his primary education at home and later he was enrolled in Gramya Pathshala. In 1881, he was admitted to Barisal District School in class iii. In 1886, he won a scholarship in the eighth grade. In 1889, he stood first among Muslim students in the then Dhaka division in the entrance examination. He moved to Calcutta for higher education. In 1891, he passed the F.A. examination in the first division from the Presidency College, Calcutta. The brilliant, sharp-witted A. K Fazlul Haque gained approach of Acharya Prafulla Chandra

Roy, the then Professor of Chemistry at the Presidency College. A. K Fazlul Haque's versatile genius caught the attention of Acharya Prafulla Chandra Roy. After passing the F.A. examination, he graduated with first class honours in Mathematics, Chemistry and Physics in 1893. After passing the B.L from Ripon College, Calcutta in 1897, he enrolled himself in the Calcutta High Court. After working in the Calcutta High Court for two years, he directly started law business in 1900.

2

In 1905, India was in turmoil due to the partition of Bengal. At that time Rabindranath started 'Raksha Bandhan Utsav' in order to suppress the Bengal Secession Movement. Tagore composed the song, "Banglar mati/ Banglar Jol/ Banglar Bayu/ Banglar Fol…"1 ("Soil of Bengal/ water of Bengal/ air of Bengal/ fruits of Bengal…") to inculcate fraternity and unity among the mass so that the partition can be curbed. At that time Nawab Salimullah of Dhaka formed the 'All India Muslim Education Conference' on December 30, 1906 to protect the interests of Muslims. A committee was also formed in this conference. He got the responsibility as the joint secretary of the committee. The conference later led to the formation of the Muslim League in 1906.

In 1911 A. K Fazlul Haque was working as an Assistant Registrar of Cooperatives Department. Later, the post of registrar being vacant, the British did injustice to Fazlul Haque's qualifications by appointing Rai Bahadur Jamini Kant Mitra to that post. Fazlul Haque was not a man to tolerate this injustice. Sir Salimullah encouraged Fazlul Haque to quit his job and fight against the British. Along with Khan Bahadur Hashem Ali Khan, Haque Sahib came to Calcutta to meet the respected Guru Sir Ashutosh. Seeing Fazlul Haque, Sir Ashutosh got annoyed and said, "I have repeatedly told you to quit your job, yet can you not recover yourself from the infatuation to slavery?" In reply Fazlul Haque said, "At the end of the month, we get the salary at the same time..." Hearing the reply, Sir Ashutosh advised him, "Start advocacy in the High Court without delay. I will give you rupees five hundred a month from my pocket until you can't stand on your own feet." Fazlul Haque resigned from the job. But the government did not accept it and granted him a long leave and after the leave he was sent an order to join as the SDO of Diamond Harbour. But Fazlul Haque did not accept the job and started pleading in the Calcutta High Court in 1911 and within a year was considered one of the best advocates of the High Court. Fazlul Haque no longer had to take the financial help of Sir Ashutosh. Advocacy has rarely seen such rapid growth. Sir Ashutosh, Mahatma Ashwinikumar and Sir Salimullah gave unfailing love, encouragement and motivation to Haque Sahib. Shardul of Bengal, the first Prime Minister of undivided Bengal jumped into the freedom movement of India by receiving the love, compassion and companionship of these three great men.

An undisputed political figure, the handsome Fazlul Haque joined the All India National Congress. He became the leader of the Muslim League and the Indian National Congress. At this time he became the secretary of the 'Nikhil Bharat Khilafat Committee'. In 1918, He became the president of the annual conference of the Bharat Muslim League in Delhi. A. K Fazlul Haque first presided over of the conference. In 1919 he became the president of the Muslim League of India.

Urgently calling for the preservation of the wealth and unity of the Provincial Muslim League, he said–

> The city of Dhaka where I am speaking in front of you today is the birthplace of the Muslim League, so by thwarting our political activities, the political organization of billions of Muslims in India can deal a serious blow to the Muslim League, if any such decision is taken today in the heart of the historic city of Dhaka, in my judgment, nothing could be more unfortunate than this. Of course, I can also emphasize that our vision of the original purpose and ideals must be broadened and widened. There is no sense in closing our eyes and only dreaming of a glorious future. Keeping a deep connection with the reality, we have to fight with uncompromising attitude against the unlimited obstacles in the way of achieving our goals. Our momentum will be bold and unstoppable until we achieve our political goals.[2]

On February 2, 1919, a protest meeting was called against the infamous Rowlatt Act. The meeting was held at College Square, Kolkata. The meeting was presided over by Sher-e-Bangla AK Fazlul Haque. In protest against this infamous law, Mr. Haque asserted–

> We know that a bill is going to be raised in the royal administration council very soon. The purpose of that bill will be to write a tomb of all kinds of political activities in this country, don't we have the ability to understand this today? Why are the public leaders silent today? Why are the voices of the countrymen silent today? Can't they come forward today with angry outcry by taking away the sound from the chest of barbarians...? Make the leaders present among us today strengthen with the whip of words. Forget all the mutual disputes, all the factions. Come forward hand in hand on the same platform, give space in the heart to initiate only India's auspicious thoughts. A fair constructive program is the only way they can serve the country with, expect the respect and support of the countless devotees.[3]

A conference was held in Dhaka on 13 December 1920. Sher-e-Bangla while addressing this conference criticized the policy of boycott and said–

> Our main discussion today is whether we should withdraw our boys and girls from educational institutions; it has been said that we have no more room for discussion on the matter...The policy of boycotting educational institutions will be against our interests. Our purpose will not be fulfilled, on the one hand and it will cause irreparable damage to our national interest on the other. In order to boycott educational institutions at present, we have to take a two-pronged approach. Firstly, by denying the help form the govt. aided institutions in order to endanger their existence and secondly by

withdrawing millions of children despite having no national educational institutions of their own and blocking their access to education.[4]

During 1921 the Non-cooperation Movement intensified. Finally, Mahatma Gandhi, Father of the Nation withdrew the Non-Cooperation Movement in 1922. In the same year A.K Fazlul Haque contested the Khulna by election of Bangladesh. He won with huge votes. Lord Lytton was the Governor of Bengal at that time. In 1924, he was elected as a member of the Legislative Council from Khulna. At this time, Fazlul Haque became the Minister of Education and Health. Needless to say, Swarajya Dal won majority under the leadership of Chittaranjan Das and Motilal Nehru. He resigned from the post of minister on August 1, 1924. Thinking about the plight of the peasant society, he became involved in the politics of the peasant society at this time. On July 4, 1929, 25 Muslim members of the Bengal Legislative Council gathered in Calcutta for the betterment of the peasant society of Bengal.

Ramsay Macdonald convened a round table meeting in London to outline the governance structure of India. Mahatma Gandhi, Father of the Nation, rejected the round table meeting on behalf of the Congress but the Muslim League participated in the first round table meeting. Fazlul Haque, the tiger of Bengal, gave a speech in favour of independent election. He also demanded major representatives from the Muslims from the Punjab province. The second round table meeting was held in 1931-1932. The Congress attended this meeting. However, as the communal question was not resolved, the governance of India passed into the hands of the British government.

In 1934, the People's Conference was held in Dhaka. In this conference Fazlul Haque was elected president of Nikhil Banga Praja Samiti. In 1935, a conference of Bengali Praja Samiti was held in Mymensingh, Bangladesh. The conference began with the songs of the rebel poet, Kazi Nazrul Islam and the mystic artist Abbasuddin. This Praja Samiti later gave birth to the Peasant Praja Party. He was elected the Mayor of Calcutta Municipal Corporation in 1935. He was the first Muslim Mayor of Kolkata Municipal Corporation.

In March 1937, Khwaja Nazimuddin, a member of the Nawab family of Dhaka, contested in the Bengal Legislative Council election from the Patuakhali constituency on behalf of the Peasant Praja Party. On the eve of this election Haque sahib said –

> I am now going to contest such an election where powerful lords and knights are there against me. If I am defeated, Allah forbid, it will be more glorious than that of Nepoleon's at the battle of Waterloo.[5]

The election symbol of Muslim League was 'Hurricane' and the symbol of Haque Sahib's Krishak Praja Party was 'plough'. The slogan of the Peasant Praja Party was 'The land belongs to the plough, the price belongs to the sweat'. Finally, in Patuakhali Fazlul Haque got 13,000 votes, Khwaja Nazimuddin got 5,000 votes. Fazlul Haque won by 8,000 votes. In this election, the farmers

Praja Party won 39 seats, the Muslim League won 38 seats. After reaching an agreement with the Muslim League in the election, Haque Sahib formed the 11 member Union Council of Ministers. Three of the ministers were from the Krishak Praja Party, three from the Muslim League, three from the Hindu caste and two from the scheduled communities. He took the Oath in presence of the then governor, Anderson. The member of the Legislative Council was Sir Azizul Haque, Jalaluddin Hashmi was the Deputy Speaker and Abul Kashem Fazlul Haque, the tiger of Bengal took charge as the Prime Minister of Bengal.

Abul Kashem Fazlul Haque was the first Prime Minister of the undivided Bengal. He took various steps during his tenure as Prime Minister. But he gave the most importance on the field of education. He thought – 'Education is the backbone of the nation'. In the field of education his contribution is unforgettable. He established two hostels namely Taylor Hostel and Cormichael Hostel in Calcutta in 1916. During his period the collection of rents from the poor peasants was stopped forever. He was the first to adopt the policy of abolishing the zamindari system without compensation. On August 18, 1938, during Fazlul Haque's ministry, the Bengal Tenancy Act Amendment was passed and the unrestrained tyranny of the landlords ended forever. In 1939 he introduced the 'Bengal Employment Recruitment Code'. He reserved 50 percent of job vacancy for the Muslims in the council of Ministers. In this year, the Debt Arbitration Board was strengthened by amending the 'Chashi Khatak Act'. In 1940, Haque Sahib passed the 'Mahajani Act'. In the same year, he enacted the 'Shop Workers Act' which ordered shop workers to have one day off a week and other benefits. Dhaka, Rajshahi, Khulna and Daulatpur established agricultural institutes for the modernization of agriculture. He promulgated the 'Jute Ordinance' in 1938 with the aim of paying fair price to the jute growers. He formed the Progressive Union Party with Sarat Chandra Bose and Shyamaprasad Mukherjee, the vice-president of Hindu Mahasabha, and later became the leader of this party.

In the session of the Muslim League held in Lahore on 23 March, 1940 under the chairmanship of Muhammad Ali Jinnah, Fazlul Haque of Bengal presented a draft on behalf of the Muslim League. The draft was prepared by the then Chief Minister of Punjab, Sikandar Hayat Khan. But the historic Lahore proposal was a demand or proposal for a separate state for the Muslims living in the Indian subcontinent. Chowdhury Khalikuzzaman and other Muslim leaders of that time supported this proposal. The Lahore Proposal was later termed as the 'Pakistan Proposal'. When India was partitioned in 1947, Sher-e-Bengal was not seen on the main stage of politics, but the seeds of partition were planted by the hand of A. K Fazlul Haque in Lahore in 1940. The Lahore proposal made him famous.

On March 26, 1946, Fazlul Haque contested from both the seats of Barishal and Bagerhat, Khulna as a candidate in the Bengal Legislative Council election and won from both the seats. But his party was defeated as a whole. At that time Hossain Shaheed Suhrawardy formed the cabinet. Fazlul Haque took charge as the Chief Minister of Bengal. After the formation of the state of Pakistan, Haque started practicing law in the Dhaka High Court. In 1951 he was appointed the Attorney General of East Pakistan. He supported the Language Movement in 1952. However, on December 4, 1953, the United Front government was formed by Fazlul Haque in collaboration with Hussain Shaheed Suhrawardy and Maulana Abdul Hamid Khan Bhasani. On April 3, 1954, Haque Sahib formed a four-member cabinet. The historic United Front's 21-point programme created a huge stir across the country in the 1954 elections. Details of the 21-point program are given below—

i. Bengali will be made one of the official languages of Pakistan.
ii. The zamindari and all rent-collecting tenures shall be abolished without compensation and the evicted lands shall be distributed among the landless peasants, the rents shall be reduced fairly by pronouncements and the practice of collecting rents by certificate shall be abolished.
iii. To nationalize the jute business by bringing it under the direct management of the East Pakistan government, the jute farmers will be provided with a fair source of jute and by investigating the jute scam of the Muslim League ministerial period, all those involved will be punished and their ill-gotten property will be confiscated.
iv. Co-operative farming system will be introduced for the improvement of agriculture and government assistance will be provided to improve all types of cottage industries and handicrafts.
v. In order to make East Pakistan self-sufficient in salt industry, salt factories will be set up in the coastal areas in cottage industries and large scale industries and the salt scam of the Muslim League ministry period will be investigated and the concerned persons will be punished and all their ill-gotten money will be confiscated.
vi. The country will be protected from floods and famines by digging canals and providing irrigation.
vii. East Pakistan will be made self-reliant in industry and food by industrializing scientifically and modernizing agriculture and establishing all economic and social rights of workers in accordance with the principles of the International Labor Union.
viii. The work of industrial and artisan moneylenders should be arranged.
ix. Free and compulsory primary education will be introduced simultaneously in the country and equitable salary and allowances will be provided to teachers.

x. To radically change the education system, education will be made scientific and effective, teaching will be done only through mother tongue, and all schools will be included in the same level to remove the existing distinctions between government and private schools, and all schools will be converted into government-aided educational institutions, and suitable salaries and allowances will be provided to teachers.

xi. By revoking and repealing the reactionary laws like 'Dhaka and Rajshahi University Act', making universities into autonomous institutions, higher education will be made cheaper and accessible and hostels will be arranged at low cost and convenient.

xii. Expenditure on governance will be reduced across the board and to this end all highly salaried government employees will be increased and their incomes will be proportionately adjusted. The ministers of the United Front cannot accept more than 1000 taka as salary.

xiii. Effective measures will be taken to stop corruption, nepotism and bribery. For this purpose, all public and private officials and businessmen will be accounted for from the year 1940 to the present time and their property will be confiscated if they fail to give satisfactory compensation.

xiv. To repeal and cancel the notorious laws like the 'Public Safety Acts and Ordinances' etc. all prisoners held without trial shall be released and those accused of treason shall be made trial in open courts and the right of press and assembly shall be free and absolute.

xv. Judiciary and administrative departments will be separated.

xvi. The Prime Minister of the United Front will fix the location in a relatively less luxurious house instead of the current house and the current house will be converted into a dormitory for the time being and later a Bengali language laboratory.

xvii. A Martyr's Minar will be constructed at the spot as a mark of holy memory of those martyred by the Muslim League government demanding Bengali as one of the national languages and their families will be given suitable compensation.

xviii. February 21 will be declared as 'Shaheed Day' and recognized as a holiday.

xix. East Pakistan will be made self-governing and sovereign based on the historic Lahore Resolution and all matters and powers except for national defence, foreign affairs and currency will be transferred to East Pakistan and the headquarters of the Defense Department will be established in West Pakistan and the Naval Headquarters in East Pakistan and the armament factories will be constructed to make East

Pakistan self-sufficient in self-defense.

xx. If any seat of the Council becomes vacant during the tenure of the United Front Cabinet, it shall organize by-elections to fill it within three months and if the nominee of the United Front is defeated in three consecutive by-elections, the Council of Ministers shall resign.

xxi. The United Front Council of Ministers shall not extend the term of the Legislative Council under any pretext. Before Six months of the expiry of the term of the legislative council, the cabinet shall resign and arrange free and fair elections.

The full council of ministers was formed on 15 May. Fazlul Haque took charge as the Chief Minister. On June 5, 1955 election to the Constituent Assembly was again held on the basis of parity and a coalition government was formed. A. K Fazlul Haque was the home minister of this government. Hossain Shaheed Suhrawardy was the leader of the opposition. The Constitution of Pakistan was adopted on February 29, 1956 and came into effect on March 23. At that time, Haque Sahib resigned from the post of Home Minister of Pakistan and came to Dhaka from Karachi at the age of 83 and assumed the responsibility as the Governor of East Pakistan on March 24, 1956. On April 1, 1958, the Central Government of Pakistan removed him from the post of Governor. He then retired from political life at the age of 86.

3

Talking about the end span of Sher-e-Bangla's life, Mr. Mofizuddin Sahib wrote in his memoirs–

> December 1961. The evening of Haque Sahib's life has come to an end. Sometimes his words are lost. Sometimes he laughs remembering the stories of his past life, sometimes he cries out feeling the current situation. Sometimes he says: I will go to Chakhar to visit my parents' graves to pray for their departed souls. When a little liquid food is brought before him he said: an elephant needs the whole banana garden to quench his hunger. How can this meagre food quench his hunger?[6]

On 27 October 1958, Abul Kashem Fazlul Haque was awarded the title of 'Helal-e-Pakistan', the second highest medal of Pakistan. On September 30, 1961, the students and teachers of Dhaka University gave him a felicitation. He was also granted the Lifetime membership of the Hall. After this reception he did not attend any public meetings. He was admitted to Dhaka Medical College on March 27, 1962. He was under treatment there for a month.

'Mahiruh' of the century, the legend and bright star of the undivided India's political sky suddenly fell out of the orbit after shining for a long time. The 'Uncrowned King', the embodiment of hopes and aspirations of the people of Bengal's wilderness, port-towns and rural areas of Bengal, Sher-e-Bangla Abul Kashem Fazlul Haque breathed his last on Friday at 10:20 am

on April 27, 1962 at Dhaka Medical College Hospital at the age of 88 after serving as the undisputed hero of history for the past half a century and more.

Finally, he was buried in Dhaka University area. The graves of Hussain Shaheed Suhrawardy and Khwaja Nazimuddin are there in the same place. The graves of these three are known as the 'Shrine of the Three Leaders'. Radio Pakistan stopped all programs on that day and recited the Quran Sharif. The national flag was kept half-mast to pay special homage to the legendary leader. All educational institutions and schools and colleges in Pakistan declared a holiday on Monday, April 30.

To commemorate his name a residential hall has been named after him in Dhaka University. There is a student residential hall in Quetta after his name. Bangladesh Agricultural University named a hall after him. Patuakhali University of Science and Technology has a student residence hall after his name. The National Cricket Ground of Bangladesh, Sher-e-Bangla Cricket Stadium, Mirpur, Dhaka is famous as the home of cricket in Bangladesh. There is an agricultural university named after him in Dhaka, the capital of Bangladesh, which was established in 1938. It is the first agricultural education institute in Indo-Pak subcontinent. The National Parliament of Bangladesh is located at Sher-e-Bangla Nagar which is named after him.

Sher-e-bangla's personality was a combination of surprising elements. His personality was full of wisdom, genius and logic on one side and generosity, simplicity, passion and enthusiasm on the other. He loved the deprived section of the society from the bottom of his heart and sacrificed his life for their welfare. Mr. Haque will be remembered by farmers and labourers. The farmers of Bengal who today grow crops on the hard soil of the field with the help of plough will lament that Sher-e-Bangla is no more. After returning home from the market, the day labourers will lament that Sher-e-Bangla is no more. The peasant bride while lighting the evening lamp in Parnakuti will lament that Sher-e-bangla is no more. An immortal fairy tale will be born out of these regrets and tears of countless people.

4

Finally, it can be said that Sher-e-Bangla, Abul Kashem Fazlul Haque, one of the greatest Bengalis, always thought—"The interest of the nation will be the interest of the individual. The welfare of the nation will be the welfare of the individual." Acharya Prafulla Chandra Roy once said about Haque Sahib :

> There is a great truth behind all the political truths. That is the existence of the Bengalis. The future existence of the Bengalis depends on the unity of Hindus and Muslims. Fazlul Haque is the symbol of this unity. I do not value the Indian nationalism of the right wing political parties. What I value is the Bengali nationalism. Only Fazlul Haque can establish this nationalism. Fazlul Haque is not only a pure Bengali from head to toe but also a pure

> Muslim by heart. I have never seen such a wonderful combination of pure Bengaliness and pure Muslimness. I am not saying this on behalf of Fazlul Haque as our student. I am saying this on behalf of the truth. The combination of pure Bengaliness and pure Muslimness is the future of the Bengali. Fazlul Haque is the symbol of that combination. Do not break this symbol. Do not disrespect Fazlul Haque. If the Bengali do not honor Haque Sahib then sorrows and sufferings will befall on the Bengali.[7]

The success of Sher-e-Bangla's politics is worth seeing. But there are limitation to his politics which are undiscussed or under-discussed in the broader sense. But the limitations of his politics should also be discussed. The Lahore proposal put forward by him in 1940 was a curse to the Bengali. Haque Sahib as the undisputed leader of the Bengali nationalists should have proposed for the formation of a single Bangladesh or Purvadesh with all Bengali speaking communities and territories under its influence. He made a mistake by proposing to build a country dominated by only one religious community. Besides, his trying to gain respect from all irrespective of Hindus and Muslims falls under his political limitations. But in the long run, I just want to say, 'Sher-e- Banglar aalo / Ghore ghore jwalo' (Light the lamps of Sher-e-bangla's ideals in every household).

Referrences

1. Rabindranath Thakur : 'Gitabitan', Swadesh Paryaya, www.milansagar.com
2. Bhavesh Roy : 'Sher-e-Bangla A. K Fazlul Haque', Publisher Swapna Nath, Pandulipi, 38/2, Bangla Bazar, Dhaka 1100, Publishing year, June, 1995, Second Edition, November 2004, P. 31
3. Bhavesh Roy : 'Sher-e-Bangla A. K Fazlul Haque', Publisher Swapna Nath, Pandulipi, 38/2, Bangla Bazar, Dhaka 1100, Publishing year June, 1995, Second Edition November 2004, P. 36
4. Bhavesh Roy : 'Sher-e-Bangla A. K Fazlul Haque', Publisher Swapna Nath, Pandulipi, 38/2, Bangla Bazar, Dhaka 1100, Publishing year June, 1995, Second Edition November 2004, P. 38
5. Bhavesh Roy : 'Sher-e-Bangla A. K Fazlul Haque', Publisher Swapna Nath, Pandulipi, 38/2, Bangla Bazar, Dhaka 1100, Publishing year June, 1995, Second Edition November 2004, P. 54
6. Bhavesh Roy : 'Sher-e-Bangla A. K Fazlul Haque', Publisher Swapna Nath, Pandulipi, 38/2, Bangla Bazar, Dhaka 1100, Publishing year June, 1995, Second Edition November 2004, P. 90
7. Abul Mansur Ahamad : 'Amar Dekha Rajnitir Panchas Bochor', Khosrej Kitabmahal, 15 Bangla Bazar, Dhaka 1100, Reprint Sep, 2013, P. 135-136

Bibliography

i. B.D. Habibullah: 'Shere Bangla', Prothama Publications, Bangladesh, Publication date- 1st January, 2016

ii. Helal Uddin : 'Banglar Bagh A. K Fazlul Haque', Rabeya Books,

Bangladesh

iii. Tapan Roy Chowdhury : 'Bangalnama', Anand Publishers, Kolkata, 4th edition November 2013

iv. Syed Nazmul Abdal : 'Shere-Bangla', Panjeri Publication, Bangladesh, Reprint-2015

v. Mosharraf Hossain Yusuf : 'Krishakbandhu Shere Bangla', Fair Publishing House, Bangladesh, First Edition- 2014

vi. Abul Mansur Ahamad : 'Amar Dekha Rajnitir Panchas Bochor', Khosrej Kitabmahal, 15 Bangla Bazar, Dhaka 1100, Reprint Sep, 2013

vii. Bhavesh Roy : 'Sher-e-Bangla A. K Fazlul Haque', Publisher Swapna Nath, Pandulipi, 38/2, Bangla Bazar, Dhaka 1100, Publishing year June, 1995, Second Edition November 2004

Bengal Famine of 1943 and Indian People's Theatre Association (IPTA)

Bijoy Mandal

The present paper is humble attempt to analyse the discourse of Bengal famine and the Indian People's Theatre Association (IPTA). The Famine of Bengal was highly destructive in Bengal province. Bengal famine also knew as Panchaser Manwantar1. The origin of the word 'famine' can be traced to the Latin word 'fames' meaning hunger. Hunger is an emotional word associated with fundamental bodily sensations which impact living things to seek for food in a multitude of curious ways.

As far as causes are concerned famine are two types— man made and nature made mainly caused by dearth of rainfall, drought, flood, storm etc. These may bring about disasters effects resulting in famine. Thus, famines in these instances are caused by natural calamities. But the man made famines takes place at the time of scarcity caused by war black marketing and profiterring by the traders and brokers resulting in mass starvation. According to A. Sen, most famines aren't created by food shortage. Harvest failure, reduction in food imports, droughts etc are often contributing factor— but far more important are the social system that determine now a society's food is distributed. The famine of 1943 was fall out both man made and nature made disasters.[2]

In this paper I argue the Bengal famine of 1943 appeared in undivided Bengal and the role of Indian People's Theatre Association in cultural history of Bengal which is significant benchmark during famine period.

Indian peoples Theatre Association was greatly influenced by the famine of 1943. The people's theatre movement of the forties of last century was not formed and consolidated in one

or two days. Feudal society was gradually breaking down with the advent of British colonialism and that gave rise to capitalist made of production. As a result with the abolition of old traditional landlord class, amateur theatre or opera groups, patronized by those landlords, naturally lost their pride and position. In the history of Bengali theatre, theme was either traditional puranic or Mythical or to some extent new historical or romantic. Operas like 'Punyer Joy Paper Kshay' (Victory of Piety, Decay of Sin), could not satisfy the growing aspirations of spectators of those emerging days. Afterwards, with the emergence of newly born cinema: omnipotent influence of films put great influence upon the spectators, so theatre and opera slackened to some extent. In this backdrops some theatre-loving youth, with the aim of revitalising this art, tried for some innovation and thus they brought about new vision in this sphere in the decade of forties. This new vision gradually took the from of a movement, known as 'peoples theatre movement', here it must be acknowledged that this new Peoples Theatre movement was born within the womb of traditional professional stage theatre. This movement evolved as a consequence of emergence of new political, historic and cultural consciousness.[3]

This movement exerted influence not only on the sphere of drama-writing, but also it inculcated mass consciousness in socio-economic, political and cultural lives. Mandira Roy has said, 'The term 'Peoples Theatre movement' denotes a particular juncture of time when the environment on the stage become somewhat monotonous and slackened, this movement brought about an odour of fresh wind in the gasping stage theatre. The word 'Peoples Theatre' means not only the drama of people, at the same time, a cultural and theatrical movement.'[4]

While discussing literature and dramas, socio-economic and political issues must come to the forefront. National movement started its journey form the very inception of National Congress, founded in 1885. Muslim League was founded in 1906. Bengal was portioned in 1905 and in 1911 it was repealed. In reaction to these happenings, nationalism continued to flourish in the early part of 20th century. Besides, armed revolutionary activities started and continued through upto third and fourth decades. The first phase of the nationalist movement was slow, youth of the country did not like it as it mainly stressed upon prayer and petitions. Though under the leadership of Gandhiji took the shape of a real mass movement, and it attracted almost all sections of the people, but the section of educated youth was not attracted proportionately. They insisted upon more aggressive and direct struggle against foreign rule. They felt that it would not be possible to overthrow the British yoke only by the Gandhian style of movement, non-violent passive resistance. For this enlightened youth section resorted to the path of armed struggle, with the aim of building an independent India,

free from any kind of exploitation and oppression. Here lies the significance of revolutionary movement.

Background of IPTA : First World War took place and continued from 1914 to 1918. Socialist state was established in Russia in 1917. Various organizations were formed in 2nd and 3rd decades of 20th century in Indian sub-continent. Various incidents happened in the early part of this century, such as formation of 'Yugantar', 'Anushilan', Maniktola bomb case, sacrifice of revolutionaries like Kshudiram, Arabinda, Barin Ghosh, Bagha Jatin etc, corridor battle at Writers' Building, Chittagang armoury raid, etc etc.

Sisir Kumar Bhaduri appeared on the Bengali state in post first world war period. He inculcated a new vigour in the art of dramaturgy through his new style, gesture, direction etc. He introduced several reforms in the stagecraft within the conventional ownership relation and depending upon taste and liking of the spectators, he modified old themes, but with better skill and his personal superb acting. Yet his efforts gave no better result, he could not mobilize others with his new ideas.

British rulers promulgated Raolatt Act in 1919. Imprisonment without trial, inhuman torture, ban on meeting, firing all were legitimized by this Act. Communist Party was formed in exile in 1920 (Taskent in then soviet Union). Though it took several years to take shape of a real party organization. During this period two journals bearing communist thought—'Ganabani' and 'Langal' were published.

Meerut Conspiracy Case was fabricated in 1927. All India Kisan Sabha was established in 1936 in Lucknow. During thirties, fascist powers assumed power and came to the surface on world scene, associated with great depression, frustration, alienation. On the opposite side, people were unified, fraternity and communist consciousness imbued them, Journals and periodicals have always important contribution in the history of social, political development of Bengal. Several literary circles were mobilized around the periodicals, such as— 'Kallol', 'Kalikalam', 'Shikha' etc, which stirred the field of art and culture of Bengal and exerted widespread influence on the society as a whole.

When fascist aggression was imminent all over the world, Anti-Fascist Workers Congress was held in Paris in 1933. Social Democrats, Communists and progressive intellectuals of Europe and the world took part in the Congress. As a part of this initiative, World Congress Against Fascism and war was held under presidentship Romain Rolland, Indian Progressive Writers Association or Bharatiya Pragati Lekhak Sangha was formed in 1936. In the same year Pragatisheel Chhatra Sangathan, Chhatra Federation were also formed. Indian Committee of League Against Fascism and War was established, with Rabindranath as its President. But no initiative or efforts, on the part of progressive humanist personalities of the world could not check

the war. Second World War started in 1939. British government was a party to the war. Hitler of Germany, Musolini of Italy[5], Tejo of Japan, General Franco of Spain established autocratic rule in their respective countries, there they smashed all democratic institutions and freedom and right of people where any kind of people's freedom is in peril, naturally art and culture become victim of such onslaught. Since the beginning of thirties, Fascist power rose its head in Germany, Italy, Spain etc. various artist organizations and freedom-loving people took initiative to resist Fascism.

Communist Party was formed in the thirties. Many youth, inspired with communist ideology, started to talk about new ideas in art and literature. This new genre of artists and literatures started to publish pamphlets, articles, books etc. It was said in the manifesto of Progressive Writers Association—

> We believe that the new literature of India must deal with the basic problems of hunger and poverty, social backwardness and political subjection.[6]

During war years, excitement, anguish, anxiety, horror of war subsided all other values. Japanese invasion in China, Hitler's attack on Soviet Russia (22 June, 1941), fall of Singapore, Burma at the hands of Japanese, all these happenings compelled Bengalis to think in other way. After the attack on Soviet Union, Communist Party of India declared the war as 'Peoples War' and started propaganda in defence of Soviet. In 1941, Friends of Soviet Union was formed, young writer and organizer Soumen Chanda was assassinated by fascist goondas on the street of Dhaka, while leading a procession. In protest against this heinous murder progressive artists and literatures assembled in University Institute Library (28th march, 1942) in Kolkata, this assembly gave birth to the 'Anti-Fascist Writers and Artists Association'.

IPTA's initiatives to combat Bengal Famine 1943 :

During war years people of Bengal had to bear the brunt of indirect effects of war-economy depression, frustration, unemployment, natural calamities like flood, cyclone. Along with these, British and their lack profit-monger created a disastrous famine - like situation, which is commonly known in the history as 'Great Famine of 1350 Bangabda'. Man-made famine and natural disasters, both devastated the lives of Bengal, more over horror of war and ruthless torture of British rulers. In this juncture Quit India movement started. Rural Bengal was devastated. Rural people, out of starvation rushed to the towns, fifty lacs of people, died in this famine. When Bengali society and the whole nation was agitated in reaction to famine and war, Bengali stage hackneyed with old fashion. Contemporary situation was not reflected in the dramas—'Professional theatre was still illuminating, hiding its face like ostrich, from the bitter realities and playing the same conventional historic, puranic or social dramas (colourfull portraits of upper class Bengali theatre was still then absorbed in fantasy of nationalism Fall of Mewar, Saffron Flag), or person-centric emotion (Biraj Bou, Banglar Meye (girls of Bengal) or divine

devotional (Karnarjjun, Sita, Narayan). Bengali theatre was then ruminating within the boundary of ethical and religious values and emotion of fluid patriotism.'[7]

During the Lucknow Congress in 1936, All India Progressive Writers Association was formed under the Presidentship of Munshi Premchand, most notable and famous Hindi literature of the time. In its continuation, People Theatre Conference was held in Mumbai on 22 May, 1943, during the fourth conference of Pragati Lekhak Sangha. Monoranjan Bhattacharya (1889-1954), Bishnu De (1909-1982), Binoy Ghosh (1917-1989), Shambhu Mitra (1915-1997), Bijan Bhattacharya (1915-1978), represented form Bengal. Though their efforts Indian Peoples Theatre Association was established as an all India Organization.

After effect of the war, economic crisis, vicious cycle of communalism, fascist trends, the great famine of 1943, active people's resistance and revolt against subjugation, call of Quit India movement, inner current of communist consciousness—all these made such a background that contemporary professional theatre was not capable to cope with the new spirit. IPTA came forward to reflect these trends on the stage with its newly-created dramas and songs.

Cultural programme, held in the eve of the conference of Communist Party, from 23 May to 1 June, in Natyahbharati (Grace Cinema Hall) attracted the culture-loving people. The ventures of initial period was staging of dramas — 'Agun' (Fire) (Poverty of poor starving people, their horrid life is the theme of this drama.) by Bijan Bhattacharya, 'Laboratory' (The scientist is also a human being, he can not rest lonely shutting his laboratory's doors in this distress of people, he must stand by the people.) by Binay Ghosh, 'Homeopathy' (Religious dogmatism and superstitions of people, their efforts to liberate themselves from it.) by Manoranjan Bhattacharya. On the eve of this conference, several performances were presented, such as— the Ballet titled 'Mai Bhukha Hoon' (I am hungry), the dance of famine, an action song titled 'Sun Hindke Rahanewale (listen, the inhabitants of Hind or India), the recitation of the poem 'Madhubhangshir Gali' of Jyorindra Maitra by Shambhu Mitra, recitation of 'Jawanbandi' (Confession) (Exodus of starving people from rural area to the towns.) by Bijan Bhattacharya, folk songs by Nirmalendu Choudhury. In April 1944 from Bengal, a cultural squad for the first time had reached Bombay. The squad became more familiar in Bombay as 'Voice of Bengal' owing to good publicity exposure from news media. Binoy Ray, Harindranath Chattopadhyay acted as formal leaders of Voice of Bengal.

'Nabanna' (1944) was the boldest and most stirring drama of Bijan Bhattacharya within the stream of peoples theatre. It was based on famine, not only that, it was somewhat a novel innovation. About this drama, the

playwright has told: 'In the backdrop of famine, epidemic, natural calamities and countrywide freedom movement, it has turned the situation to a cruel cultrination. Each and every problem is coming to the fore with gigantic and wide form, so that it seems— man is helpless to overcome, to the word the untoward incident that are happening today. Conscious intellectual mind is also perplex in vascilation and confusion. In this time of acute distress, I started to write 'Jawanbandi' in the backdrop of Midnapur district, land of martyr Matangini Hazra, theme background is confession or utterance of the chief character Pradhan Samaddar.'[8]

'Nabanna' was first staged in the Srinangam Theatre on 24 October, 1994, a production of IPTA. Bijan Bhattacharya and Sambhu Mitra were the directors. The stage personalities like, Bijan Bhattacharya, Sambhu Mitra, Sudhi Pradhan, Gangapada Basu, Charu Prakash Ghosh, Sajal Raichowdhury, Ranjit Basu, Ajit Mitra, Gopal Halder, Lalita Biswas, Manika Bhattacharya acted in it. Successful stage performance of 'Nabanna' by IPTA strengthened cultural movement all over India. Bijan Bhattacharyas's name was engraved in the history of Bengali theatre.

The story is laid down in four acts, fifteen scenes. The story starts with a riot scene in a Bengal village Aminpur, actually it was a movement against British imperialism. Next episode — Aminpur devasted by flood, cyclone. Peasants including Pradhan Samaddar become victims, with it extreme exploitation of black marketers and usurers. Helpless lot migrate to Kolkata. There they had to resort to begging in the streets, yet minimal food is not available. They are defeated by the dogs in foraging contest in the Dustbin. Pradhan can not bear the brunt of cruel behaviour of the riches and becomes mentally deranged. Dead bodies are lying stray here and there. In the midst of such sad happenings, their return to the native village, starting of cultivation anew and celebration of 'Nabanna' (feast of newly grown rice.) Sunil Datta has said, 'It is very difficult to resist the fall of tears down seeing the scenes of famine and epidemic stricken Bengal.'[9]

The drama 'Deepshikha' was written by Digindra Chandra Bandyopadhyay, a responsible cadre of IPTA, during the after-years of the famine. The famine was virtually a great famine. A village bride is the central character. She, being a victim of famine, takes shelter in a town with her two babies. There she is unable to get a single granule of alms. Though this village woman, the whole problem of refugees is depicted here. She talks about her distress: 'Babu, I am not a thief, I was a bride of a well-to-do peasant family. Now I beg for alms are scarce during this famine. These two babies are tossing about out of starvation for consecutive two days. There is nothing to give them. So I have picked it up. I am not a thief. Babu, let me leave …'[10]

Core representation : Stalwart musician and music directors, such as Salil Choudhujry, Hemanga Biswas, Anal Chattopadhyay, Basudev Dasgupta,

Jyotirindra Maitra were associated with IPTA. During the great famine, massive wailing and cry of distress was heard in the rural life, along with horror of epidemic owing to exploitation and repression of black marketeers, hoarders, landlords with the connivance of British rulers. Call to the rural people, peasant masses to build resistance can be traced in lyricist Basudev Dasgupta's civic cultural consciousness. He cautioned the peasants and workers to be alert and to their rights over crops grown with their to it—

'Hoonshiar —
O Saathi Kishan Mazdoor Hoonshiar …'[11]
[Be alert
Oh peasants and workers, be alert. ...]

Song of Salil Choudhury brought a new life in IPTA. He tried his best to regenerate the activities of IPTA. Peasants suffered too much from epidemic in British rule. Crops were washed out in the flood. In 1945 he composed this song addressing the flood-affected people—

'Des Bheseche Baner Jale Dhan Giyeche Mare
Kemane Baliba Bandhu Praner Katha Tore
Gharete Chaul Nei Parane Piran Nei
Anahare Diba Nishi Bhasi Nayan Lore
Kemane Baliba bandhu Praner Katha Tore.'[12]
[The country has been flooded paddy has dried up
How can I express, my friend, my sad affairs
Rice is scarce, not even clothes
In starvation weep day and night
How can I express, my friend my sad affairs.]

The demands of the peasants during the early phase of Tebhaga movement in 1946-47 are uttered in this song of Salil Choudhury—

'Hein Samalo, hein Samalo
Hein Samalo Dhan Ho, Kastete Dao Shan Ho
Jan Kabul Ar Man Kabul
Aar Debo Na Aar Debo Na
Rakte Bona Dhan Moder Pran Ho…'[13]
[Oh Beware! Oh Beware!
Oh keep your paddy safe, sharpen the sickle
Pledge our life and dignity
No more, no more we would give our
Paddy, sown with our blood. ...]

We may seek a new vista in the songs of Hemanga Biswas. There is assurance to live, pledge to build a new Bengal, dreams of life of Proletariat. Paddy in granary for starving masses, happy laughing children— this is the assurance and pledge lying in the ethos of Hemanga Biswas' songs. Dreams of proletariat to survive is turned into active resistance in his song —

'Banchbo Banchabore Amra Banchbore Banchbo
Banga Buker Panjar Diya

Naya Bangla Garbo
Bibhed Ganger Bandhbo Dui Kool
Bandjhbo Aabar Milaner Pool
Jata Bastuhara Sarbahara Sukher Griha Garbo.'[14]
[We survive and rescue to live, rescue and survive
Would build a new Bangla with our
Broken ribs.
We would bind the two banks of division-gulf
Would build the bridge of union
We, the homeless have-nots would build our happy homes.]

Nibaran Pandit composed the following lines on the eve of Ninth conference of All Injdia Kisan Sabha in May, 1945 —

'Ek Sathe Chal Garbo Mora Ranga Duniya
Sabe Mile Thakbo Setha Bibhed Bhuliya.'[15]
[Oh fellows, march together, we would build new world
Together we live forgetting all divisions.]

During the famine of 1943, thousands of people migrated form their villages to Kolkata to beg mere some drops of rice gruel, died in the streets. The artists of IPTA organised several tours of performances all over India and thus collected relief material for famine-stricken people. During this time, Jyotiringdra Maitra composed the following song, titled 'Naba Jivaner Gan' (Song of New Life) —

Na Na Na
Manbo na Manbo Na
Koti Mrityure Kine Nebo
Pranpane
Bhayer Rajye thakbo Na.'[16]
[No No No
We would not admit
Would buy crores of lives
At the cost of our lives
Would not live in reign of fear.]

Starvation death began to happen just after the Quit India movement in 1942. The dead bodies were seen lying stray in the streets of Kolkata. The song of new life was carried on during the whole of year of 1350 Bangabda —

'Pathe Pathe Shanka
More more Baje Mrityur jayadanka
Dhan Gourab Makha yuddher Anga
Aamra To Sainik
Bubhukshu Dainik
Aamra Ki Debo Rane Bhanga?'[17]
[Panic in the street
At every crossing death-drum beats
Glory of rich becomes a part of war

We are mere soldiers
Starving Daily
Would we run from the battle field?]

Still in the present times, the cultural activities are going on, are somehow influenced by programmes of IPTA. Various initiatives taken by IPTA during famine years, made it a pioneer in the new path. In which way IPTA inspired the people in the struggle to protect their rights and consciousness, in the same way, IPTA is functioning in present times. The art, flourished in thirties and forties was the art to strive for life, to stand up boldly, to establish its right, the same art is still now doing the same function and sending the same message, here lies its relevance.

Referrences

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bengal_famine_of_1943
2. Amarty Sen : 'Poverty and Famines', An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford, London, 1981
3. Darshan Chowdhury : 'Gananatya Andolan', (Movement of the Masses), Anustap, 1994 P. 1
4. Mandira Roy : 'Gananatya and Nabanatya : A Debate' (Population and Novelty), Bama Pustakalaya, 2004, P. 4
5. "Mussolini was a Convinced Internationalist and Revolutionary, Violently Opposed to Parliamentary Activities and to the Socialist Acceptance of Parliamentary Procedure." Carsten F. L. "The Rise of Fascism London: Methuen and Co.", 1967, P. 21
6. Darshan Chowdhury, op.cit,, P. 12
7. Ibid, P. 13
8. Bijon Bhattacharya : 'Nabanna', 1996, P. 28-29
9. Sunil Dutta : 'Natya Andolaner 30 Years', National Literature Council, 2001, P. 47
10. Digindra Chandra Bandopadhy : 'Dipsikha', Bengal Publisher, 1st Scene
11. S. Rudra, (ed) : 'Basudev Dasgupta Ganasangeet Sangraha' (Mass Song Collection), Nath Brothers, 1997, P. 256
12. Samir Kumar Gupta & Salil Chowdhury : 'Pratham Jivan O GanaSangeet' (Early Life and Folk Songs), Milemishe, 1418, P. 198
13. Ibid, P. 207
14. S. Rudra, (ed) : 'Hemanga Biswas Ganasangeet Sangraha' (Hemanga Biswas Mass Song Collection), Nath Publishing, 1990, P. 98
15. Dilip Mukhopadhya (ed) : 'Nibaran Pandit Gananatya Sangher Gaan' (The Songs of People Theatre Organisation), Ganaman Prakasan, 2014, P. 27
16. Jyotirindra Moitra : 'Nabajiboner Gaan' (The Song of New Life), P. 87
17. Ibid, P. 88

Kurmi Movement in Post-Colonial Bengal A Social Survey of Jangalmahal.

Somnath Rana

Natural beauty fascinates all of us. Some groups of people living very close in the lap of nature from the early time. Most of them are well identified. Many scholars have shown interest to study about those Indigenous peoples who depend on nature. This trend has increased in recent time. Multiple research Works have been started on their socio-cultural life, economic life, religion, etc. All these indigenous peoples are commonly called tribes. Tribes are the ethnic groups having their own culture, customs and lifestyle. They are the most marginalised, deprived, depressed social community. There is a large scope of research on tribes as a part of subaltern studies. Around the Chhatanagpur Plateau a well define natural territory by the four rivers Damodar,Kanshabati,Subarnarekha and Baitarani most of the people living for the long time with the distinct cultural identity known as Kurmi. In West Bengal Purulia, Bankura, Midnapore, Jhargram, Malda, Murshidabad, and West Dinajpur district; in Jharkhand Ranchi, Hazaribagh, Santhal Pargana, and Singhbhum district; in Odisha Mayurbhanj,Sundargarh, Keonjhar, Bonai district are the main habitation area of Kurmis. Although they had shifted several times from Sindh area to Gangetic plains and finally reached Chhotanagpur region.1 We can see some Kurmis in Assam and Bangladesh. They migrated for seeking employment. The study of the Kurmi movement will open a new space from the social prospective.

The article focused on cultural life of Kurmis to know their actual socio- economic position. The main objective of the article is finding factors which were responsible for deprivation

of Constitutional recognition of Kurmis as Scheduled Tribe. To establish the justification of Kurmi movement the article can give us proper direction.

Archival materials and Govt. Census Report were used as a primary source. Extensive library work done properly. Several interviews were taken for the research. As secondary sources journals, relevant articles played important role for this purpose. All kinds of source collected in proper manner, and used very carefully after examining.

Extant literary survey had been done for this purpose. Many scholars expressed their valuable ideas and information regarding this issue. Samresh Basu's novel 'Amm Mahato', the character of Aam Mahato gives a beautiful identity of the Mahato ethnic group. In this novel, the physical and characteristic features of Aam Mahato are revealed. Ganu Mahato's character also describe in detail.2 Bibhutibhushan Bandyopadhyay's novel 'Aranyaka',where the beautiful identity of the Mahato people were expressed.3 Mahato is the most widely used surname of the Kurmi people live in Ranchi, Jharkhand, Hazaribagh, Purulia, Assam, Midnapore, Jhargram etc. Based on the report of the Anthropometric Measurement and Ethnography Survey they live in Bihar and Orissa of the Bengal Presidency. H. H. Risley published a book entitled 'Tribe and Caste of Bengal' in 1891 and described the kurmis as tribal people.4 On the basis of Indian census W.G.La and J.H.Hatton have identified the totemic kurmi as primitive tribes.5 E.T.Dalton says the Kudmi are the descendants of the oldest aryan colonizers. K.S.Singh (1978), however, adopts a political economic approach to understand the transition of kurmi community. The founder of West Bengal Kurmali Academy, Padmalochan Mahato has written about the home land of kurmi community in the introduction of his famous book 'Kurmali Bakaran'.[6]

Ethnographic, linguistic, sociological studies have found evidence that the totemic Kurmi people in the Chhotanagpur Plateau were Dravidian descent,they were indigenous people of India.7 Kurmi is a totemic tribes and still known by his totemic name. (Kurm = tortoise) It was considered to be one of the adibasi (tribal) communities in Chotanagpur till 1931, even declared as a 'criminal tribe.'8 Since the closing period of the nineteenth century a section of this Community proved to be efficient agriculturists and achieved considerable economic advancement. This relative economic security and affluence of the Kurmi – Mahatos vis-à-vis the other adibasi communities, led them to resent their adibasi affiliation possibly due to the stigma of backwardness attached with it. This sanskritisation drive resulted into their claiming a caste status deserting that of a 'tribe.' This effort ultimately resulted in the de-scheduling of the community in 1931. The colonisation of the adibasis in Chotanagpur started much earlier than the British colonialism. It began with the process of indigenous state formation in the adibasi region when the local chiefs acquired the crucially important agricultural surplus and encouraged the settlement of the Non-adibasi outsiders,

having superior agricultural technology, in the adibasi region. With this started the process of peasantisation of the adibasi who were basically dependent on the forest land having exposure to a low level of development in agricultural technology.9 British colonialism while maintaining this process added some newer dimensions into it. Through the dismantling of the communal mode of production and introduction of private right in land it forced on the adibasi to adopt the improved agricultural techniques of the outsiders, the people of the plains. This resulted into the increase in the degree of mutual interdependence among the adibasi and the non-adibasi peasants. With the penetration of the market in the tribal economy such a peasantisation process of the adibasis got further developed. The introduction of the new land revenue system by the British rulers made it a compulsion to pay land revenues in terms of money. This created a demand for money in the non- money economy of the indigenous adibasis of Chotanagpur. While the adibasi communities who were still in the occupation of hunting and gathering suffered due to this, the relatively advanced adibasis by adopting the superior agricultural technology brought into the region by the outsiders .Economic affluence gained through this process gave birth to the process of sanskritisation through which, the tribal society was moving closer to the caste system. The sanskritisation attempt of the Mahatos, was taken by a prosperous agricultural community of the region. This attempt at Sanskritisation of the Chotonagpuri kurmi in the early part of the twentieth century got a good support From the Hindu Kurmi of the Gangetic Bihar.10 To satisfy their sanskritised aspiration for Kshatriya status they started to promote the feeling of brotherhood and kinship among the Kurmi living in different parts of India. They even tried to establish their kinship ties with the Kunbis of Maharashtra. To meet their end an organization named All India Kurmi Kshatriya Mahasabha was also formed in 1894.11 In the 17th session of the "All India Kurmi-Kshatriya Conference" held at Muzaffarpur (1929), it was resolved that Chotanagpuri Kurmi were similar to all other Kurmi living in India. In this conference three delegates from Manbhum were present on behalf of the Chotanagpur Kudmis and they also wore the sacred thread there. Attempt at perceived vertical social mobility of this sort is, however, not unique to the Kurmi community alone. In the early part of the 20th century many communities of the Bihar plains viz. Goalas, Ahirs, Koeris etc. have exhibited the similar tendency towards the sanskritisation.

The Kurmi of Chotanagpur at present, however, denies the viability of such a Sanskritisation drive. They realised that it was a 'conspiracy' of a very tiny elite section comprised of either the Zamindars or the rich peasants of the Mahato community who actually proved to be successful agriculturists due to their large landholdings. They felt that the general Mahato people never aspired for the Kshatriya status. They assert their similarity with the

adibasi on the grounds of language, culture, custom and religion. They point out that it is a ploy of the ruling political and economic elites to divide the adibasi to destroy their solidarity and numerical strength. Besides the sanskritistion drive, what makes the Kurmi's situation distinct is that just within a span of few decades the same community began to disown their sanskritised social status. To analyse this one needs to have a very close look on the decades of exploitation, oppression and subjugation to which a majority of them have been exposed in the Chotanagpur plateau region from the early part of the twentieth century. The totemic believes among the tribes is a significant part of the spiritual, religious, social and cultural lifestyle. All animal totems include as supernatural creatures of mythology and legend in the tribal culture and literature had special meaning, characteristics and significance. Kurmi of Chotanagpur region started a movement to establish their identity as totemic tribes. Kurmi language was neglected and the victims of deprivation. So, Kurmi community focused to develop their mother tongue kurmali language, and literature. Beside the kurmali language, Kurmi people nourished their distinct cultural practices years after years. Their songs, dance, festivals social practices made them separate from others tribal community in this region. The Kurmi rituals in everyday life in its cultural context are a pattern of symbolic communication that is supposed to guide the member of the community in their social activity. Mahatos are basically thirteen festivals in twelve months. They celebrate various festivals including Karam, Sahara, Jitia, Surya Pujo, Poush Sankranti.12 The Mahato villages are filled with joy during the festival, as they enjoy their traditional variety of food. They became hospitable. Their neighbourhood became glad with the sound of drums. There are various jhumura songs and dances. The conference of Adivasi Kurmi Samaj held on December 27, 1987 at Junjhka, PS- Arsha, district- Purulia,West Bengal under the presidentship of Takur Das Mahato (IAS, Reted), near about one lakh aboriginal Kurmi were present in the conference. The conference unanimously passed a resolutions.13 This conference of the Adibasi Kurmi Samaj resolved that the aboriginal (Mahatos) community of the Chatanagpur Division and Santhal Pargana Division in Bihar and Purulia, Bankura, Midnapur district and other areas within the state of West Bengal and districts of Mayurbhanj, Keonjhar, Sundargarh and other areas within the state of Orissa which had been included in the tribal list before 1931 and which has now been included in Annexure one (1) of the Backward Classes list in the state of Bihar is a tribal community.The members of the conference requested the Government of India to take immediate legal and constitutional steps for re-inclusion of the aforesaid aboriginal Kurmi community of these areas in the list of scheduled tribes in accordance with the provisions of Article 342 of the Constitution of India.

Further this conference also unanimously resolved that the kurmali language be recognised as a regional and tribal language in Bihar, West Bengal and Orissa. Members of the conference requested the concerned

Governments of West Bengal, Bihar and Orissa to take necessary steps for Kurmali language. They demanded to open educational institutions with immediate effect like Ranchi University where students can learn kurmali language from Intermediate to Master degree. Different conference of Kurmi, like Ranchi (1972),Conference of Kurmi in Ramgarh,(1975),Conference of Kurmi in Mayurbhanj, Orissa(1977),Conference of Kurmi in Ranchi(1978),Conference of Kurmi in Jamshedpur(1979),Conference of Kurmi In Jharkhand(1986),Conference of Kurmi in Raipur, Bankuda, West Bengal (1986), Conference of All Jharkhand Students and Intellectuals (1986), conference of Kurmi in Sili (1987), conference of Kurmi in Purulia (1987) and Conference of the Jharkhand Co-ordination Committee in Ramgarh(1989).In this way Kurmi community organized themselves and spread social consciousness to established their identity as a totemic tribes in this region.

Some research work has done on several issues of kurmi community in this region. But there are many other aspects of research on Kurmi community. The socio-economic conditions of Bengal kurmis, mainly in Jangalmaha was not discussed properly. There are many accounts of cultural activities of kurmi but we can't see any research work on their distinct culture as a part of aboriginal community.

Referrences

1. Bayly,Susan.Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth century to the Modern Age. Cambridge University Press,(2001) P. 200
2. Basu Samaresh : 'Amm Mahato', Dey's Publishing, 1977
3. Bandopadhyay Bibhutibhushan : 'Aranyak', Fifth Section, Katyani Book Stall(1939) P. 3
4. Risley H. H. : 'Tribes and caste of Bengal', (1891) P. XLVI
5. Hutton J. H. : 'Census of India-1931 Vol-1, Part-1
6. (https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fbengali.sangbadekalavya.co.in%2F2021%2F03%2Fpurulia-kudmali-language-certificate-course-started.html&oq=https%3A%2F% 2Fbengali.sangbadekalavya.co.in%2F2021%2F03%2Fpurulia-kudmali-language-certificate-course-started.html&aqs=chrome..69i58j69i57.12447j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
7. Dalton E.T : 'Descriptive Ethnology of Bengal', P. 317
8. Lacay W.G. 1933. Census of India 1931. Vol. VII Bihar and Orissa. Patna,Superintendent, Bihar and Orissa, Appendix – v
9. https://marxbadipath.org/article/kurmi-andolon/159
10. Das Arvind N : "Class in Itself, Caste for Itself: Social Articulation in Bihar." Economic and Political Weekly Vol.19, No.37, 1984, P. 1618.
11. Jaffrelot Christophe, "India's silent revolution: the rise of the lower castes in North India'' London, 2003, P. 197
12. Mahato Mangal, Kurmali Poet, Interview. 2020, 5th January
13. https://archive.org/details/hinducastesands00bhatgoog

A Brief Study of the Scientific Temperament, Ethical Sensibility, and Exploitative Aspects of it in Bengali Culture through Select Texts of Saradindu Bandyopadhyay

Ekta Kar

Saradindu Bandyopadhyay's writings hold a special place in Bengali's literary conscience, sometimes as Byomkesh, sometimes as Ajit, sometimes as Barada Charan, sometimes as Sadashib, he talked about the lives of ordinary people. Be it romance, historical fiction, horror stories, or murder mysteries, his writing is nevertheless, a reflection of Bengal. In the Gramophone Pin Mystery, it is about a Bengali hitman Prafulla Roy while the victim is Ashutosh Mitra an innocent middle-aged fellow, while Calamity Strikes gives us both the victim and culprit Debkumar Sarkar, a poverty-stricken Bengali scientist.

As a writer, Saradindu Bandyopadhyay created a notable character Byomkesh Bakshi who doesn't like the word 'detective' he calls himself an 'inquisitor'-a seeker of truth. In both stories, the writer threw in clues, through Byomkesh and the narrator Ajit. In the story, the Gramophone Pin Mystery, Byomkesh assumed the appearance of Ashutosh Mitra just by hearing footsteps of his in the stairway, just like Sherlock Holmes, a fictional detective created by Sir Arthur Conan Doyle. This assumption proves Byomkesh's power of deduction and his sharp intellectual capability.

In Detective Fiction, clues play a very important role, and as the murder weapon in Calamity Strikes is not only odd but bluntly fictional, not generally used in murder mysteries, like knives or firearms, Bandyopadhyay had to throw some clues

that indirectly led to the crime, without giving the readers much of a shock and help them to comprehend the way of murder, which a skillful reader will catch. For starters, there is the clue of the insurance, which Byomkesh did not like, as it gave people ulterior motives and increase criminal intention in the psyche of ordinary people. Again, an apparently innocent reference of 'they could not even invent an insect repellant that worked!' (Bandyopadhyay & Guha, p. 139) can be understood as essential clues to recognizing the poison motif. Another subtle clue would be Byomkesh saying, 'Really, the grass is always greener,' only that's not what Byomkesh said in the Bengali text, whatever he said, got lost in the process of the translation. What Byomkesh really said, was, 'বিষের সঙ্গো খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কর' meaning that the person is incapable yet talks a lot, however, the subtle clue is 'বিষ' meaning poison (Bandyopadhyay, P. 163).

In an interview with a renowned journalist, Partha Chattopadhyay, of Anandabazar Patrika, the author himself stated that he wanted to write detective fiction with such sagacity so that its literary conscience can be preserved on an intellectual level (Chattopadhyay. P, 1001). Subhadra Kumar Sen wrote that most characters written by Saradindu, are Bengali and Bihari, city-dwellers, or suburban-dwellers. He never went outside the society and the collective consciousness of the people, he knew well and understood (Sen, p.6). Tapasi Bandyopadhyay also wrote that Saradindu Bandyopadhyay was not a highbrow writer, he wrote for all. So, his stories touched all educated and non-educated alike. In his stories, as mankind and its psyche, through its weal and woe, hope and despair get portrayed, making all the characters livelier (Bandyopadhyay. T, p. 19). And this can be seen through two villains or rather culprits of the stories too, Prafulla Roy's first appearance in the story is like a typical Bengali, with a very common name, and Debkumar Sarkar on the other hand, is a Bengali scientist, with thick glasses and a walking stick. In both texts, they are trying to exploit science, using it to commit crimes. But, in the case of Prafulla, he is using it to spread chaos, while, Debkumar is being exploited himself, getting destroyed by the chaos or rather 'the calamity' that he wanted to use.

Pramila Bhattacharya wrote in her book, কথাশিল্পী শরদিন্দু : মন ও শিল্প, unscrupulous, mad in the lust of money, this professional murderer's name is Prafulla Roy (Bhattacharya, P. 1959). Which is simply not true, cause never in the story, there was a single mention of any demand for any amount of money. There was no reference to money in the advertisement, that was published in the newspaper. Not even the letter, that Ajit received from a Muslim man when he was standing under the lamppost in disguise, says even something close to a give-and-take policy. So, why did Prafulla, or rather the unnamed assassin invent this type of high-tech weapon and not demand anything for the cost of his hard work? The answer might lie, in a speech

by Batman's butler Alfred Pennyworth, when he was explaining the motive of Joker behind the bloodshed he caused to Bruce Wayne, "Some men just wanna watch the world burn" in the Christopher Nolan-directed movie, The Dark Knight. It is plausible, that both share the same ideology. Prafulla was the oriental counterpart of the Joker, projecting scientific chaos. Prafulla can be a replica of Joker. Through science, Prafulla burned people's lives in exchange for no money. Roy was the agent of chaos and destruction. But Debkumar Sarakar's condition is different. As previously discussed, Bandyopadhyay wrote about ordinary people's lives, Debkumar's story is a pure reflection of Indian scientists' lack of funding. Debkumar although, a scientist, didn't have enough capital to support his invention.

Ajit, being the face of everyman, can be seen making fun of the Indian scientists saying, "But far from that, they could not even invent an insect repellent that worked! Nonsense of the first order" (Bandyopadhyay & Guha, p. 139), which then Byomkeh agreed with and later regretted not recognizing Debkumar's cry for help. The irony of the fate of Debkumar was that he invented such a weapon that can never be identified.

Debkumar expressed his feeling through his speech, "the innovator carefully conceals his discovery deep within his heart and continues to wander in search of great knowledge. But he is alone; there is nobody who will come to his aid; instead, he fears that the moment someone else gets the hint of his discovery, the credit will be snatched away from him. There are plenty of grasping thieves waiting to defraud the inventor and appropriate the discovery" (Bandyopadhyay & Guha, p.140-141). So, what is the solution for these people? As Byomkesh also said "Quite unexpectedly, Debkumar had to come upon an extraordinary invention. But due to lack of funds, he could not properly use it. With an invention such as this, you cannot apply for a patent, because it has no value in the commercial market. But if war-prone, an expansionist nation like Germany, Japan, or France ever got wind of the formula, they would immediately start producing this lethal poison in their laboratories. The inventor wouldn't be able to do a thing and he wouldn't stand a chance to gain anything out of his invention" (Bandyopadhyay & Guha, p.165). But people like Byomkesh and Ajit didn't want to acknowledge the real truth and the suffering condition of scientists, in their country, they just wanted to enjoy the glory of having breakthrough inventions. Prafulla, on the other hand, also invented that killer bell, yet, he was not interested in patenting his weapon, he hid his invented weapon far from the eyes of the world. Debkumar's invention dominated him but his intentions were good as he wanted a moderate future for himself and his children. And the path he took to achieve this future was not good at all, Unfortunately, his invention snatched away his children's lives. As Byomkesh said—

> Debkumarbabu had churned the high seas of science and come up with what he thought was the most wonderful of the invention. Little did he know that he had only succeeded in dredging up the most poisonous, the most satanic of vipers. His little flames of poison ruined everything that he held for dear. (Bandyopadhyay & Guha, p.167)

But Prafulla's deadly invented weapon made him powerful. Roy's weapon was in his fist and he made himself the master of it so this is how they foil each other. And finally, Byomkesh asked his ultimate question to Ajit by saying "Ajit you are a writer. Don't you think there is a lesson to be learned in all this? The day that man discovered the tools to kill another human being, he also brought into being a weapon that could boomerang upon him at any time. The Sophisticated weaponry that is, in great secrecy, being produced all over the world today, might one day serve to destroy the entire human race. Like a demon who sprung into being from Brahma's imagination like Frankenstein's monster, it won't even spare its creator. Don't you think so?" (Bandyopadhyay & Guha, p.169). So, from this, we can get a glorious picture of Bengal which consisted of more than enough intelligent and talented people like Prafulla and Debkumar but, mostly, due to poverty or lack of funding or the fear of sabotage, never made them a public face.

References

1. Bandyopadhyay, S & Guha, S. Picture Imperfect, and other Byomkesh Bakshi Mysteries. Penguin Books. 1999.
2. Bandyopadhyay, S. Byomkesh Samagra. Ananda Publishers Private Limited. 2000
3. Bandyopadhyay, T. Satyanweshi Saradindu. Chaturanga, year 59, no. 1&2. Kolkata. 1999.
4. Bhattacharya, P. Kothashilpi Saradindu: Mon O Shilpa. Kolkata. 1959.
5. Chattopadhyay, P. Byomkesher Songe Sakkhatkar. Byomkesh Samagra. Ananda Publishers Private Limited. 2000.
6. Sen, S. Rahasyaswrasta Saradindu. Chaturanga, year 59, no. 1&2. Kolkata. 1999.

কৃতজ্ঞতা

ড. প্রদীপ ঘোষ

ড. কুন্তল ঘোষ

ড. রাকেশ জানা

শ্রী অভি কোলে

স্বপন হাজরা

গবেষণা প্রবন্ধ সংকলনে টিম গৌরী

দেবারতি মল্লিক (সহ-যুগ্মসম্পাদক), তাপস পাল (সহ-যুগ্মসম্পাদক), মধুসূদন সাহা, বৈশাখী পাঠক, কাকলি মোদক, অস্মিতা মিত্র, শোভনলাল বিশ্বাস, সৈকত মাহাতো এবং জগন্ময় মণ্ডল।

শ্রদ্ধা ও নমস্কার

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী

বাণীরঞ্জন দে

তপন মন্ডল

বিদিশা সিন্‌হা